ব্রিটিশ রাজ্যের অর্থব্যবস্থার ভিত্তি

ব্রিটিশ রাজ্যের অর্থব্যবস্থার ভিত্তি

সব্যসাচী ভট্টাচার্য

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী

কলকাতা

অনুবাদিকা ঃ গীতা মুখোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ ঃ আগষ্ট ১৯৬৫

প্রকাশক

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোং
২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক

প্রশান্ত রায়
মাঝি পত্রিকা-প্রেস
৭ সুকিয়া রো
কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুখবন্ধ

ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, গবেষণার ফলাফল বৃহত্তর পাঠকসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাঁরা আমাদের কাছে আশা করেন, গবেষণার কাজ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত হোক। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিকরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনাম এবং মর্যাদা পেতে পারেন বটে, কিন্তু তাতে উপকৃত হন ভারতবর্ষের একটি সীমিত শ্রেণীর পাঠকরা মাত্র। শিক্ষা এবং গবেষণার বাহন হিসেবে হিন্দী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐসব ভাষায় রচিত যোগ্য মানের ইতিহাসগ্রন্থের অভাবও বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। যেহেতু ভারতবর্ষের ইতিহাসই আমাদের প্রথম লক্ষ্যবস্তু, সেহেতু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিছু 'বিদগ্ধ' রচনা এবং যেখানে ইতিহাস গবেষণার বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ ও ইতিহাসের সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি বিবৃত করা হয়েছে তেমন কয়েকটি বই বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হবে।

আলোচ্য গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ব্রিটিশ রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পর একটি তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিলো। এই বিবর্তনের পেছনে ছিলো যে-সব ব্যক্তি এবং ভাবনা ধারণা, এ-গ্রন্থটিতে তাদের সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিভিন্ন গোষ্ঠি, সিদ্ধান্তপ্রণেতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানগুলোকে পর্যালোচনা করে দেখা হয়েছে। ব্রিটিশনীতির শেষ ফলশ্রুতি হলো ব্রিটিশশাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমতের উদ্ভব এবং তার সংগঠন। সুতরাং উনিশ শতকের সত্তর দশকে যে অর্থনীতিভিত্তিক

জাতীয়তাবাদ শুরু হয়েছিলো তাকে বোঝার পক্ষে এ-গ্রন্থটি একটি অত্যাবশ্যক পটভূমির কাজ করছে।

অনুবাদিকা শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়কে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রামশরণ শর্মা
অধ্যক্ষ
ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

ঋণ আমার অনেক। সে-সব ঋণের কথা ভাবলেও আনন্দ হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ. ত্রিপাঠী আমার প্রথম গবেষণা প্রচেষ্টায় নির্দেশকের ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁর প্রতি আমার ঋণের পরিমাণ সম্পূর্ণভাবে স্থির করা সহজ নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ এন. কে. সিংহ এবং ইণ্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অব এ্যাডভান্সড্ স্টাডির ডিরেকটর অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় আমাকে যে উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়েছেন, তার জন্য তাঁরা আমার ধন্যবাদার্হ।

শিক্ষক, সহকর্মী এবং ছাত্রদের কাছে পাওয়া যে বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ঋণ, সে ঋণের স্বীকৃতি দেওয়া যায় শুধুই সাধারণ পন্থায়। কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে স্নাতকপূর্ব শ্রেণীতে অধ্যয়নকালেই আমি যে সব রচনা শোনাতাম তার প্রতি সহৃদয় আগ্রহ দেখাতেন অধ্যাপক এস. সি. সরকার, এইজন্য তাঁর নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ বিপন চন্দ্র, কলকাতার ইণ্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অব ম্যানেজমেণ্টের ড. বরুণ দে এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ এস. গোপাল কখনও এককভাবে কখনও বা সম্মিলিত ভাবে এই গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে দীর্ঘস্থায়ী আলোচনা করেছেন। তাঁদের কাছে এবং কলকাতা দিল্লী ও অক্সফোর্ডের আরও অনেকের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। লেখার মধ্যে যদি কিছু ভুলভ্রান্তি কিংবা ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে থাকে তবে তার জন্য আমি একাই দায়ী।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ এবং ইণ্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড্ স্টাডি এ-গবেষণা কার্যের জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন, প্রকাশনারও ব্যয়ভার গ্রহণ করেছেন। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দি কমিটি

অব সাউথ এশিয়া স্টাডিজ্ এবং ইতিহাস বিভাগ ১৯৬৯-৭১ সনে (শিক্ষকতার দায়িত্ব থেকে এক দফার জন্য রেহাই দিয়েও) নানাভাবে উৎসাহপূর্ণ বাতাবরণ তৈরী করে দিয়েছিলেন ; ডঃ রেমণ্ড কার এবং পরিচালকমণ্ডলী আমাকে (অক্সফোর্ড) হ্যারিসন ফেলোশীপের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। তাঁদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাই।

ভারতবর্ষের বাইরে ছিলাম বলে শ্রীযুক্ত এইচ. আর. সান্যাল সারণীগুচ্ছের কিছু কিছু দেখে দিয়েছেন ; প্রারম্ভিক নিবন্ধ রচনার জন্য গৃহীত বিষয়বস্তু, ফুটনোটে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন প্রাসঙ্গিক পত্রপত্রিকার সম্পাদকরা ; স্যর চার্লস ট্রাভেলিয়ানের ব্যক্তিগত নথিপত্র দেখার অনুমতি দিয়েছেন নর্দাম্বারল্যাণ্ড, মরপ্যাথের শ্রীমতী পলিন ডাওয়ার, এবং চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের গ্রন্থাগারিক কুমারী এম. প্যাটারসন আমাকে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী থেকে দলিলপত্রের মাইক্রোফিল্ম সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এ জন্য তাঁদের সকলের কাছে আমি গভীর ঋণ স্বীকার করি। নয়া দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব ইণ্ডিয়া, কলকাতার ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী, লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, অক্সফোর্ডের বদলেয়ান এবং অক্সফোর্ডের ইণ্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট লাইব্রেরীর মহাফেজ ও গ্রন্থাগারিকরা নথিপত্র দেখতে দিয়ে এবং তাঁদের অভিজ্ঞ হাতের সাহায্য দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। তাঁদের প্রতিও আমার ধন্যবাদ।

সব্যসাচী ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

শব্দসংক্ষেপ

Accts.	Accounts branch, Finance Dept. Proceedings.
Ag. Rev. & Com. Progs.	Proceedings of the Governor-General in Council in Agriculture, Revenue and Commerce Department.
App.	Appendix.
D. N. B.	Dictionary of National Biography (London).
Ec. H. R.	Economic History Review.
E. H. R.	English Historical Review.
Elgin Papers	Papers of James Bruce, 8th Earl of Elgin (1811-63), Governor-General of India 1862-63 (MSS Eur. F. 83, I. O. L.).
Exp.	Expenditure branch, Finance Dept. Proceedings.
Fin. Desp.	Financial Despatch, Govt. of India-Secretary of State for India.
Fin. Progs.	Proceedings of the Governor-General in Council in Finance Department.
Fin. S. R.	Separate Revenue branch, Finance Department Proceedings.
Home Progs.	Proceedings of the Governor-General in Council in Home Department.
Home (Public) Desp	Home Department Despatches, Public branch, Govt. of India—Secretary of State for India.
Home Rev. Progs.	Home Department Proceedings, Revenue branch.

Home S. R. Progs	Home Department Proceedings, Separate Revenue branch.
J. Ec. H.	Journal of Economic History.
K. W.	'Kept with', archival notation for additional papers enclosed with files on proceedings of the Governor-General in Council.
Lawrence Papers	Papers of Sir John Lawrence, first Baron Lawrence (1811-1879), Governor-General of India 1864-69 (MSS Eur. F. 90, I. O. L.).
L. C. A. Progs.	Proceedings of the Indian Legislative Council (Abstract), new series.
L. C. Progs.	Proceedings of the Legislative Council of India (old series).
L. & P.	Leave and Pensions branch, Finance Dept. Proceedings.
Mayo Papers	Papers of Richard Bourke, 6th Earl of Mayo (1822-72), Governor-General of India 1869-72 (Add. 7490, Cambridge University Library).
Mily. Desp.	Military Despatch, Govt. of India—Secretary of State for India.
Mily. Progs.	Proceedings of the Governor-General in Council in Military Department.
Miscell.	Miscellaneous branch, Finance Dept. Proceedings.
M. M. P. R.	Moral and Material Progress Report (Parliamentary Papers).
P. P H. C.	Parliamentary Papers (House of Commons).
P. P. H. L.	Parliamentary Papers (House of Lords).
Public	Public branch, Home Dept. Proceedings.
P. W. D. Progs.	Proceedings of the Governor-General in Council in Public Works Department.
Rev.	Revenue branch, Home Dept. Proceedings.
Rev. Desp.	Revenue Despatch, Govt. of India—Secretary of State for India.

Rly. Desp.	:	Railway Despatch, Govt. of India—Secretary of State for India.
R. N. P.	:	Report on Native Press (National Archives of India).
Sel. Comm.	:	Select Committee.
Sep. Rev.	:	Separate Revenue branch, Finance/Home Dept. Proceedings.
S. V. N.	:	Selections form Vernacular (Native) Newspapers (National Archives of India).
Trevelyan Papers	:	Letter-books of Sir Charles Edward Trevelyan (1807 86), Governor of Madras, 1859-60, and Finance Member, Governor-General's Council, 1862-65 (microfilm, Bodleian Library, Oxford).
Wood Papers	:	Papers of Sir Charles Wood, first Viscount Halifax (1800-85), Secretary of State for India, 1859-66 (MSS Eur. F. 78, I. O. L.)

For a fuller explanation of the abbreviations and for notes on the sources see the Bibliographical Note.

ভূমিকা

Charles Lamb ছিলেন ভারত-সাম্রাজ্যের অর্থব্যবস্থা নির্বাহের বিশাল যন্ত্রে নিয়োজিত বহু সামান্য কর্মচারীর মধ্যে একজন। লণ্ডনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অ্যাকাউন্টেন্ট-জেনারেলের অফিসে কাজ করতে গিয়ে তিনি একবার একখানি বইয়ের "সমালোচনা" লিখে ফেলেছিলেন। জনৈক David Booth-এর লেখা বইটির নাম 'Tables of Simple Interest', ল্যাম্বকে বোধহয় দৈনিকই বইখানি ঘাঁটতে হত। তিনি লিখেছিলেন: "এই পুস্তক আর সব মামুলি পুস্তকের ন্যায় নহে, কারণ, এই পুস্তকের interest (অর্থাৎ সুদ এবং আগ্রহ!) শেষ পর্যন্ত বাড়তেই থাকে।"[১] লেখকেরা কদাচিৎ নিজেদের লেখা সম্পর্কে মোহমুক্ত থাকেন। তবু বর্তমান রচনাটি মামুলির ব্যতিক্রম বলে প্রমাণিত হবে এবং ঐ রকমভাবে পাঠকের আগ্রহ শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারবে এরকম ধরে নেওয়া বাস্তবানুগ নাও হতে পারে। গ্রন্থকার নিজের প্রয়োজনে যে পথ ভাঙবেন বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করা যায় পাঠককে কষ্ট দিয়ে সে পথ ভাঙানোয় বিশেষ কিছু কৃতিত্ব নেই। সেই কারণে এই বইয়ের ইপ্সিত চৌহদ্দী সম্পর্কে মোটামুটি একটা ছবি হাজির করাই ভূমিকার উদ্দেশ্য। প্রথম পরিচ্ছেদের উদ্দেশ্যও তাই! ঐ পরিচ্ছেদে পাঠকদের সঙ্গে কুশীলবদের পরিচয় ঘটানো হয়েছে এবং আলোচ্য পর্যায়ের নির্দিষ্ট সমস্যাগুলির রূপরেখাও এতে উপস্থিত করা হয়েছে।

বিদ্রোহ (Mutiny) নামে খ্যাত বিপুল অভ্যুত্থানের পরিসমাপ্তির সময় থেকেই ভারতের রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা সম্বন্ধে এই অনুশীলনটির শুরু। এই কাজ আরম্ভ করার পক্ষে ১৮৫৮ সালটি সুবিধাজনক। বিদ্রোহ যে আর্থিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল তার ফলে কর্মনীতির এক নতুন গতিমুখ নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। অর্থবিষয়ক ক্ষমতার হাত বদলের সঙ্গে বড় বড় প্রতিষ্ঠানগত (institutional) পরিবর্তনও এই একই সময়ে ঘটেছিল। ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসানও এই পরিবর্তনেরই সাক্ষ্য। (প্রতিষ্ঠানগত কাঠামোর পুনর্বিন্যাস দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে

এবং কর্মনীতি সংক্রান্ত প্রধান প্রধান প্রশ্ন তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।) ১৮৭২ সালটিকে এক পর্যায়ের শেষ ও আর এক পর্যায়ের শুরু বলে গণ্য করা যায়। তার কারণঃ 'গ্রেট ডিপ্রেশান' নামে পরিচিত মন্দার শুরু, ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৬ সালের মধ্যবর্তী কালে পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত প্রধান অর্থনীতি, বিশেষতঃ গ্রেট ব্রিটেনের অর্থনীতি যার কবলে পড়েছিল; টাকা-স্টার্লিং বিনিময় হারের কিছু পরিবর্তন; ১৮৭১-৭২ সালে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ সম্পূর্ণ হওয়া; ১৮৭২ সালে আমাদের কাহিনীর অন্যতম প্রধান চরিত্র Mayo-র প্রশাসনের অবসান; আর সর্বোপরি ষাটের দশককে বিশিষ্ট করেছিল যে সব পুনর্নির্মাণধর্মী প্রবণতা সেগুলির অবসান। অতএব ১৮৫৮ থেকে ১৮৭২ এই কালপর্যায় কিছুটা ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ। এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু চূড়ান্ত তাৎপর্যময় যুগটিকে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনের জন্য বেছে নিয়েছি। ব্রিটিশ রাজের বিবর্তনে এই কাল-পর্যায়ের অর্থব্যবস্থা সংক্রান্ত ইতিহাসকে কেন তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হয়। এই প্রশ্নের জবাবই এই পরিচ্ছেদে ও পরবর্তী পরিচ্ছেদে দেবার চেষ্টা করা হবে।

*

এই বইটি একটি সাম্রাজ্যের অর্থব্যবস্থা সম্বন্ধে। এ কথা সুবিদিত যে রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা রাজনীতি ও অর্থনীতির সীমারেখায় অবস্থিত। এক দিকে 'নির্ভেজাল' রাজনৈতিক অথবা প্রশাসনিক ইতিহাসের আনুষ্ঠানিক-আইননিষ্ঠা এবং অপরদিকে রাজনৈতিক পটভূমিকা বিবর্জিত 'নির্ভেজাল' অর্থনৈতিক ইতিহাসেই কেবল নিবিষ্টচিত্ততা, উভয়ের দ্বারাই এই বিষয়ের অনুশীলন ব্যাহত হতে পারে। সাম্রাজ্য সম্পর্কে অনুশীলনে প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিভঙ্গি হল আইন-সর্বস্ব। এই দিকে পথিকৃৎ সিভিল সার্ভিসের লোকেরা ও আইন-বিশারদরা আনুষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁরা যে ইচ্ছাকৃতভাবেই নিজেদের অনুশীলনকে এই ধারায় সীমাবদ্ধ করেছিলেন তা বোঝাই যায়। কিন্তু তাঁদের উত্তরসূরীদের দ্বারা অনুসৃত এই প্রথা আমাদের এমন বহু প্রশ্ন উপেক্ষা করতে শেখায় যার জবাব আইন ও বিধির অনুশীলন, বিধিবদ্ধ কাজের বিশ্লেষণ এবং আনুষ্ঠানিক সরকারি যন্ত্রের অঙ্গগুলির কেবল বিবরণ দিয়ে হয় না। উদাহরণস্বরূপ কর্মনীতি

নির্ধারণের জন্য আইনের চক্ষে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ছাড়াও আরও অনেকে অর্থবিষয়ক নীতি নির্ধারণে অংশ নিতেন। বহুর উপর বর্তায় এমন সব সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব গুটিকতক লোকের উপর দেওয়া হত, আর সেই বহুর মধ্যে কিছু লোক ওই গুটিকতককে প্রভাবিত করার চেষ্টা করত। নীতি নির্ধারণ করার ক্ষমতা যাদের হাতে ছিল তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য বহু গোষ্ঠী চেষ্টা করত। এদের কিছু গোষ্ঠী প্রভাব খাটাতে সমর্থ হত এবং ফলতঃ শাসননীতি বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করত। অনেকে তা পারত না, তবু তারা সিদ্ধান্ত করার মালিকদের বোঝানোর বা চাপ দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেত। পারস্পারিক ক্রিয়ার এই গতিশীল প্রক্রিয়া এবং নানারকম বিচার-বিবেচনা ও চাপ যা সিদ্ধান্ত ও কাজের ধাঁচ ঠিক করত, সেগুলিকে কেবল কোন কর্তৃপক্ষের কি আইনগত ক্ষমতা ছিল এই নিরিখে বোঝা যায় না। আবার আইনের ও বিধির কোনও স্পষ্ট পরিবর্তন ছাড়াই সিদ্ধান্ত করার ক্ষমতা প্রশাসনিক উঁচু মহলের এক স্তর থেকে অপর স্তরে চলে যেত একথা যখন বিবেচনা করা যায় তখন আইন-সর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গির অপ্রতুলতা সমানই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যোগাযোগ সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ একটি উপযুক্ত উদাহরণ। ভারতীয় টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার শুরু (১৮৫৪), ইউরোপের সঙ্গে ভূপৃষ্ঠ দিয়ে টেলিগ্রাফ সংযোগ (১৮৬৮), সময় সংক্ষেপ-কারী সুয়েজ জলপথ খোলা (১৮৬৯) এবং সর্বোপরি সমুদ্রগর্ভে সবে পাতা টেলিগ্রাফের তার (১৮৭০) ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে এবং ভারতের অভ্যন্তরে যোগা-যোগের গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। এতে ভারত সরকারের উপর ইংল্যাণ্ডের কর্তৃ-পক্ষের নিয়ন্ত্রণ ও প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণ আরও পোক্ত হল ও প্রশাসনিক যন্ত্রের নীচের মহলেও আগাগোড়া তাই ই হল, আবার অর্থগত নিয়ন্ত্রণ কড়া করার মারফৎই কেন্দ্রীয় সরকার যা সর্বোচ্চ (Supreme) সরকার (তৎকালে ভারত সরকার এইভাবে অভিহিত হত) প্রাদেশিক (বা অধস্তন) সরকারগুলির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করতে পারল। Sir Charles Trevelyan-এর কথায় রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণের কর্মনীতি অনুসরণ করে কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় অলক্ষ্যে "ব্রিটিশ ভারতের গঠনে······এক সাংবিধানিক পরিবর্তন প্রবর্তিত করেছিল।" "কারণ অর্থব্যবস্থা যেহেতু একটা সরকারের অঙ্গগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, স্বভাবতই সেটা অন্য সব কিছুকে গ্রাস করে ফেলে ও ঢেলে সাজে।"[২]

যদি আমরা প্রচলিত আইন-সর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করি তবে এই ধরনের প্রক্রিয়াগুলি, যথা, চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির প্রভাব, যোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির দরুন ক্ষমতা-কেন্দ্রের হাতবদল, অথবা সরকারি যন্ত্রের অঙ্গীভূত অংশগুলির মধ্যে আনুষ্ঠানিক আইনগত সম্পর্ক ছাড়াও আইন বহিভূ'ত প্রভাব প্রতিপত্তি, ইত্যাদি নজর এড়িয়ে যায়। কোনও ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপরেখার পর্যালোচনা শুরু হওয়া উচিত আনুষ্ঠানিক আইনগত কাঠামো দিয়ে (অর্থবিষয়ক ক্ষমতার ব্যাপারে এই কাঠামো দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পর্যালোচিত হয়েছে), কিন্তু এখানেই আলোচনা শেষ হওয়া উচিত নয়। শাসনযন্ত্রের চালচলনের ঢং দেখতে হবে এবং সেটা দেখে বোঝা যায় যে সেই যন্ত্রটি আনুষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরেকার বহু গোষ্ঠীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের মধ্যে থাকে। এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা কতকগুলি শব্দ ব্যবহার করেছি যার ব্যাখ্যা দরকার।

'আমলাতন্ত্র' (Bureaucracy) শব্দটি যে অর্থে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তা আদৌ নিন্দাসূচক নয়। বিকল্প শব্দ একটা হতে পারত, সে হল সিভিল সার্ভিস। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে এই শব্দটির উদ্ভব হয় এবং ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের সংগঠন সম্বন্ধে Charles Trevelyan ও Northcote-এর রিপোর্ট (১৮৫৪) প্রকাশিত হবার পর ইংল্যাণ্ডে শব্দটি ব্যাপকভাবে চালু হয়। 'আমলাতন্ত্র' শব্দটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে তার কারণ ভারতে সিভিল সার্ভিস বলতে বোঝাত ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, অর্থাৎ গোড়ায় কোম্পানির চুক্তিবদ্ধ (covenanted) বেসামরিক চাকুরেদের। 'আমলাতন্ত্র' বলতে বোঝায় যাঁরা ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন না এমন লোকেরা সহ সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের।

'স্বার্থ-গোষ্ঠী' (interest group) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেই সব গোষ্ঠী সম্বন্ধে যাদের কিছু কিছু উদ্দেশ্যে অভিন্ন লক্ষ্য আছে এবং যে সব গোষ্ঠী নিজেদের মতে অথবা প্রকৃতই অভিন্ন-স্বার্থ। অর্থাৎ যাদের এক ধরনের চাহিদা-সমষ্টি অথবা কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে চাহিদা পূরণের অভিন্ন আকাঙ্ক্ষা আছে। এই সমস্ত গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ সংগঠন সম্বন্ধে আমরা ততটা আগ্রহশীল নয় যতটা আগ্রহশীল সেই সমস্ত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যেগুলির মারফৎ এই সব গোষ্ঠী তাদের লক্ষ্য অনুযায়ী সরকারি সিদ্ধান্ত আদায়ের উদ্দেশ্যে নীতি নির্দ্ধারকদের, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের আনুষ্ঠানিক

কর্তাদের, কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করত। যে গোষ্ঠী সরকারের উপর এইভাবে চাপ দিত, বলা যায় অপ্রত্যক্ষভাবে তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে (decision making process) অংশ নিত, অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ আমলাতন্ত্রের সদস্যরা নিজেদের কাজের গতিধারা ও রূপায়ণের কৌশল স্থির করতেন সেই প্রক্রিয়ায় তারা অংশ নিত। অর্থাৎ সরকারের উপর প্রভাব ফেলতে বা চাপ দিতে সক্ষম এমন সব গোষ্ঠীর প্রভাব সম্পর্কে আমরা আগ্রহশীল। আমাদের অনুশীলন সেই সব গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ যারা ভারত সরকারের অর্থনৈতিক, বিশেষ করে অর্থবিষয়ক কর্মনীতি নিয়ে মাথা ঘামাত। এই সূত্রে 'ক্ষমতা' ও 'প্রভাব' এ দুইয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য নির্দেশ প্রয়োজন। 'ক্ষমতা' শব্দটিকে আমরা ব্যবহার করতে পারি সরকারি সিদ্ধান্ত নেবার আইনানুগ কর্তৃপক্ষের অধিকার বা সামর্থ্য বোঝানোর জন্য; আর 'প্রভাব' শব্দটিকে ব্যবহার করতে পারি আইনানুগ ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিদের দ্বারা সরকারি সিদ্ধান্ত নির্ধারিত করার (পরামর্শ দিয়েই হোক, বুঝিয়েই হোক আর কৌশল করেই হোক) শক্তি বোঝানোর জন্য।

কতকগুলি গোষ্ঠী একত্র হয়ে হয়ত আরও বেশি প্রভাব খাটাতে পারে। এগুলির নাম দেওয়া যেতে পারে 'প্রভাবশালী স্বার্থ সমাবেশ (interest constellation)। Mayo, Argyll বা Trevelyan এই অর্থেই বোধহয় রেলপথ বা তুলাসংক্রান্ত স্বার্থের কথা বলেছিলেন।[৩] আপাতত আমরা বেশি আগ্রহশীল স্পষ্টতরভাবে চেনা যায় এমন সংগঠিত স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে, কারণ প্রভাবশালী স্বার্থ-সমাবেশের মত বৃহত্তর গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে সামান্যীকরণ করাটা সহজ কিন্তু পরখ করাটা কঠিন। এ রকম দাবি করা চলে না যে স্বার্থগোষ্ঠীগুলির প্রভাব একটা পরিমেয় বস্তু। কিন্তু গোষ্ঠী-গুলির ধাঁচ, তাদের পদ্ধতি ও লক্ষ্যবস্তু এবং গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সঙ্ঘর্ষ ও সংযোগ সম্পর্কে অনুশীলনে লাভ হতে পারে।[৪] আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলি দুটি ব্যাপক ধাঁচের মধ্যে পড়ে।[৫] প্রথম ধাঁচের গোষ্ঠীগুলি দৃঢ়সংবদ্ধ ও অত্যন্ত সুসংগঠিত গোষ্ঠী, অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক থেকে প্রত্যেকটি গোষ্ঠীই মোটামুটি সমপ্রকৃতির (homogenious) এবং ওই সব স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে অনুসরণ করে চলে। দ্বিতীয় ধাঁচের চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে স্বার্থের কিছু অনৈক্য দেখা যায়, (তবে তা সত্ত্বেও তারা একটা আনুষ্ঠানিক সংগঠন বা সমিতিতে ঐক্যবদ্ধ) এবং

তারা সাধারণভাবে সরকারি নীতি সম্বন্ধে মতামত দিত, কারণ গোষ্ঠীগুলির মধ্যেকার বৈসাদৃশ্য কোনও একটি একক অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর স্বার্থ নিয়ে বিশেষ ওকালতি করার প্রবণতাকে সংযত করে রাখত। প্রথম ধাঁচের গোষ্ঠীগুলির কাঠামো ও আচরণে অনেকটা ঐক্য দেখা যায়। দ্বিতীয় ধাঁচের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তেমন ঐক্য ছিল না, সেগুলি যেন কিছুটা পরস্পরের সুবিধার জন্য তৈরি অস্বস্তিকর জোটের মত: এ রকম একটা গোষ্ঠীর লোকেদের দীর্ঘমেয়াদী বস্তুগত স্বার্থ একই থাকত এমন কোনও কথা নেই। স্বার্থের সাদৃশ্য, জোটের সংগঠন ও গভীরতা, এবং অভীষ্ট লক্ষ্যের নির্দিষ্টতার নিরিখে এই দুটি ধরনের গোষ্ঠীকে বিশ্লেষণ করে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব। তৃতীয় আর এক ধরনের গোষ্ঠী ছিল যারা পাঁচ-মেশালি। তারা যে কোনও আনুষ্ঠানিক সংগঠনকে মদত দিত, লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে তারা ছিল কম সোচ্চার, সরকারি প্রক্রিয়ার কাছাকাছি পৌঁছানোর কৌশল আয়ত্ত করায় কম দক্ষ এবং আপেক্ষিকভাবে ক্ষণস্থায়ী। বাজারে প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত সভা, সরকারের কাছে ডেপুটেশন প্রেরণ, দুঃখকষ্ট সম্বন্ধে দরখাস্ত ও স্মারকলিপি পেশ—এই ছিল সরকারের কর্মনীতি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের প্রতিক্রিয়ার ধাঁচ। স্মারকলিপি পেশ করার সময়ে যদিও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দল বাঁধতেই হত, তবু এই পাঁচমেশালি গোষ্ঠীগুলো ছিল ক্ষণস্থায়ী এবং চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসাবে এরা কার্যকরী ছিল না। সাধারণ লোকের পক্ষে গভর্ণমেণ্ট হাউস অথবা সেক্রেটারিয়েটের উত্তুঙ্গ দেবস্থানে পৌঁছানোর সবচেয়ে বৈধ পথ ছিল দরখাস্ত পেশ করা। সরকারের যে কোনও প্রতিভূর কাছে স্মারকলিপি পেশের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল এবং সে অধিকার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। "নেরিয়াদ জেলা, কয়রার অধিবাসীদের" তরফ থেকে (১৮৬০ সালের জুন মাসে), "কলকাতার অধিবাসীদের" তরফ থেকে (১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাসে), অথবা "বম্বে শহর ও দ্বীপের ৩৬৪৬ জন দেশীয় ব্যবসায়ীর পক্ষ থেকে (১৮৫৯ সালের অক্টোবর মাসে) যে সব দরখাস্ত পেশ করা হয় সেগুলি সরকারের শ্রুতিগোচরে পৌঁছানোর জন্য এই ধরনের সাধারণ প্রচেষ্টার উদাহরণ।[৬] আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত কোনও প্রতিষ্ঠানের সাহায্য ছাড়াই এগুলি হয়েছিল। ভারত সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মনীতির উপর এই ধরনের স্মারকলিপি পেশের উদাহরণ অবশ্য বিরল: সমগ্র ভারতের সঙ্গে

জড়িত অর্থবিষয়ক কর্মনীতির বৃহত্তর প্রশ্নগুলি এই ধরনের স্মারকলিপিতে ততটা গুরুত্ব পেতনা, যতটা পেত নিছক স্থানীয় সমস্যাগুলি। ছোটখাট স্থানীয় ব্যাপারে ভারত সরকার নয়, জেলা বা মিউনিসিপ্যাল স্তরের আমলারাই সংশিলষ্ট থাকতেন এবং তাঁদের কাছে যথাযথ স্মারকলিপি পেশ হত। ভারত সরকারের অর্থসংস্থান সংক্রান্ত একটি ব্যবস্থাই মাত্র বহুসংখ্যক এই ধরনের জনগণের দরখাস্ত পেশের ইন্ধন যুগিয়েছিল, সে হল আয়কর প্রবর্তন। এ করটি জনগণের বেশ একটা বড় অংশের উপর বিশেষত ব্যবসায়ীদের উপর চেপেছিল। আর তাঁদের কাছে এটি ছিল একটি অপরিচিত উৎপাত।

প্রথম ধাঁচের স্বার্থগোষ্ঠীর উদাহরণ হল চেম্বার অব কমার্স (কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও করাচিতে), ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (কলকাতা) ক্যালকাটা ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশন, কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন (ম্যাঞ্চেস্টার), ইণ্ডিগো প্ল্যাণ্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (কলকাতা) ইত্যাদি। সমস্ত চেম্বার অব কমার্সেরই কর্তৃত্ব ছিল ইউরোপীয়দের। এর মধ্যে সবচাইতে প্রভাবশালী বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স (১৮৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত) প্রায় পুরোপুরিই ব্রিটিশদের নিয়ে গঠিত ছিল। যদিও এটা গোড়ার পর্যায়ে ততটা একান্ত ব্রিটিশ ছিল না যতটা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। ১৮৫৮ সালে এই চেম্বারটির সদস্যদের মধ্যে ভারতীয়রা ছিলেন ৫ শতাংশেরও কম।[৭] বম্বে চেম্বার অব কমার্সে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের, বিশেষতঃ পার্শী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিত্ব আরও বেশি ছিল। মাদ্রাজ ও করাচির অপর দুটি চেম্বার ছিল অনেক ক্ষুদ্রতর সংস্থা। সেগুলিতেও কলকাতারই মত প্রায় সকল কর্মকর্তাই ছিলেন ইউরোপীয়। আমরা দেখতে পাব যে এই চেম্বার অব কমার্সগুলির প্রধান আগ্রহের বিষয়বস্তু ছিল শুল্ক, বহিঃশুল্কের পরিমাণ নির্ণয়, দেশের মধ্যে মালচলাচলের উপর অন্তঃশুল্ক, মোহ্‌তুর্ফার মত ব্যবসায় কর ও বাণিজ্যের উপর লাইসেন্স কর, আয়কর এবং বাগিচা শিল্পের সঙ্গে সংশিলষ্ট ভূমি সংক্রান্ত আইন কানুন ইত্যাদি ব্যাপারে সরকারি কর্মনীতি। অপেক্ষাকৃত ছোট ব্যবসায়ীরা ক্যালকাটা ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন (১৮৩০)। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের তুলনায় তাঁদের লক্ষ্য অনেক সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরা প্রধানত নিজেদের দেয় কর লাঘবের চেষ্টা করতেন। এই অ্যাসোসিয়েশনের দাবি

ছিল জমি অথবা "স্থাবর সম্পত্তি" এবং "অলস পুঁজি" (idle capital) থেকে আয়ের উপর উচ্চতর হারে কর নেওয়া হোক যাতে ব্যবসায়ীদের উপর কর কমিয়ে আনা যায়।[৮] ইণ্ডিগো প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত), ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাণ্ড কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল এবং কুর্গের কফি বাগিচার ও আসামের চা-বাগিচার মালিকেরা (এঁরা দৃশ্যত তখনও কোনও স্বাধীন সমিতিতে সংগঠিত হননি, যদিও যুক্ত স্মারকলিপি পাঠানোর পক্ষে যথেষ্ট সংগঠন এঁদের ছিল) একত্রে ১৮৫৯ সাল থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। এঁরা জমি-সংক্রান্ত আইন-কানুনের পরিবর্তন দাবি করেছিলেন যাতে ভূমি-রাজস্ব থেকে রেহাই ও নিষ্কর জমি ভোগ অনুমোদিত হয়।[৯] ম্যাঞ্চেস্টার কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন স্বদেশের কর্তৃপক্ষের উপর যে প্রভাব খাটাচ্ছিল এঁদের কাজকর্ম তাকে আরও জোরদার করছিল। ১৮৫০ সাল থেকেই এই অ্যাসোসিয়েশনটি ভারত থেকে তুলো সরবরাহ বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেবার জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবি করে আসছিল। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে তুলোর সরবরাহ দারুণ কমে যাওয়ায় ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়ের কল মালিকদের পক্ষে এই সরবরাহ বৃদ্ধির প্রয়োজন বিশেষ জরুরী হয়ে উঠেছিল। কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন ভারত সরকারের কাছে যে সব ব্যবস্থা দাবি করেছিল তার মধ্যে একটি ছিল ভারতে তুলো-বাগিচা প্রতিষ্ঠায় পুঁজিপতিদের সুবিধার জন্য ভূমিসংক্রান্ত বিধির পরিবর্তন। এই অ্যাসোসিয়েশন ভারত সরকারের কাছে আরও দাবি করেছিল যে তুলো উৎপাদনকারী জেলাগুলি থেকে বন্দর পর্যন্ত রাস্তা তৈরী করতে হবে, ভূমি-রাজস্ব থেকে তুলোর চাষকে রেহাই দিতে হবে, তুলো রপ্তানির উদ্দেশ্যে বন্দরের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য অর্থ লগ্নি করতে হবে, তুলোয় ভেজাল বন্ধ করার জন্য আইন পাশ করতে হবে, এবং সাধারণভাবে "ইংল্যাণ্ডের উদ্বৃত্ত পুঁজি ও স্বাধীন ব্যবসা উদ্যোগের" পক্ষে ভারতে বিনিয়োগ সহজ করে তুলতে হবে।[১০] ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার অব কমার্স ও "পার্লামেণ্টে তুলা স্বার্থের প্রতিনিধি" (Cotton M. Ps) দ্বারা সমর্থিত এই অ্যাসোসিয়েশনটি গোষ্ঠীগত চাপ সৃষ্টির সর্ব-প্রকার কৌশল ব্যবহার করেছিল, যথা কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স ও সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে স্মারকলিপি পেশ (১৮৫৭, ১৮৫৯ সালের জুলাই, ১৮৬০ সালের এপ্রিল), ইণ্ডিয়া অফিসে প্রতিনিধিদল বা ডেপুটেশন প্রেরণ

(১৮৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি, ১৮৬১ সালের অক্টোবর), সংবাদপত্রে প্রচার (অ্যাসোসিয়েশনের সাময়িক পত্রিকা 'Cotton Supply Reporter'-এ), পার্লামেণ্ট সদস্যদের ধরাধরি (lobbying) এবং গভর্ণর জেনারেলের কাছে আবেদন (১৮৬০ সালের এপ্রিল, ১৮৬১ সালের মে)।[১১] ভারত সরকারের ব্যাপারে গ্লাসগো, লীডস, ডাণ্ডি ইত্যাদির চেম্বার অব কমার্স-গুলি অনেক কম সক্রিয় ছিল ঃ তবে ভারতের বহিঃশুল্ক সম্বন্ধে ম্যাঞ্চেস্টারের মত তারাও আগ্রহশীল ছিল।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনও ওইসব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতই একটা স্বার্থগোষ্ঠী ছিল। জমিদারি স্বার্থের অভিভাবক ও রক্ষক হিসাবে এই প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা থেকে ভদ্রতাবশে যাঁরা দৃষ্টি সরিয়ে নেন তাঁদের কাছে এই মত হয়তো অপছন্দ হবে ঃ এই অ্যাসোসিয়েশনকে অনেক সময় জাতীয়তাবাদী ভূমিকায় ফেলা হয় এবং এর দৃষ্টিভঙ্গী যে আত্ম-স্বার্থের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল একথা যদি আদৌ স্বীকার করা হয় তবে তাকে মহান আদর্শ থেকে বিরল বিচ্যুতি বলে এড়িয়ে যাওয়া হয়। জমিদারস্ অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (১৮৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত), পরবর্তীকালে যার নাম হয়েছিল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন তারই উত্তরসূরী। এই ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি উদারভাবে "সকল একাত্মতা (exclusivenes) পরিহার করে", "এ দেশের জমিতে মালিকানা স্বার্থ থাকাকেই" সদস্যপদের একমাত্র যোগ্যতা বলে ঘোষণা করে।[১২] ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির (১৮৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত) সঙ্গে এই সব সংস্থার সংযুক্তিতেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয় (১৮৫১)। সফর-রত জনৈক ইংরেজ সাংবাদিকের সুযোগ্য সংক্ষিপ্ত ভাষায় জমিদারদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী এই সংগঠনটিকে বলা চলে "সংগঠিত স্বার্থপরতার একটি প্রতিষ্ঠান"।[১৩] একটা জমিদার গোষ্ঠী হিসাবে এই অ্যাসোসিয়েশনকে সরকার যথোচিত গুরুত্ব দিত। এর বহু সদস্য লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে মনোনীত হয়েছিলেন। এই রকম একজন মনোনীত সদস্য ছিলেন প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। ১৮৬০-এর দশকে তিনি ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। আয়কর রিটার্ণ দাখিলের ফর্ম সম্পর্কে Richard Temple-এর নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটিতে যোগদানের জন্য তিনি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন (১৮৬০)।[১৪] অ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্যই ভূস্বামী

ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন বণিক ও অন্যান্য পেশার লোক। কিন্তু ধনী জমিদার শ্রেণীর লোকেরাই ছিলেন প্রধান অংশ এবং যাঁরা (শিশিরকুমার ঘোষের মত) আশা করেছিলেন যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বৃত্তিজীবী লোকেদের ঢোকাতে পারলে জমিদাররা ক্রমশ সংখ্যালঘুতে পরিণত হবেন পরবর্তীকালে তাঁদের মোহমুক্তি ঘটেছিল। এই মোহমুক্তির ফলে গঠিত হল "মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে······আরও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে" প্রতিনিধিত্ব করানর জন্য একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন।[১৫] অর্থ-বিষয়ক কর্মনীতি সম্পর্কে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মতামত তার শ্রেণী-প্রবণতাকে যথেষ্ট ভাল করেই পরিস্ফুট করে। ১৮৬০ সালে এই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (Permanent Settlement) আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে এই অভিযোগে জমিদারদের আয়ের উপর প্রত্যক্ষ করের বিরোধিতা করেন।[১৬] লবণের উপর শুল্কবৃদ্ধির জন্য তাঁরা ১৮৬১ সালে দাবি জানান—এই কর প্রধানত বসবে গরীব মানুষদের উপর, কাজেই অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের কাছে তা "সবচেয়ে কম আপত্তিজনক" বলে বোধ হয়েছিল। অ্যাসোসিয়েশন আশা করেছিল যে লবণ থেকে অধিকতর রাজস্ব আদায় উচ্চতর আয়-বিশিষ্ট গোষ্ঠীদের আয়করের "নিপীড়ণ" থেকে খানিকটা রেহাই দিতে সরকারকে সমর্থ করবে।[১৭] ১৮৭১ সালে স্থানীয় শুল্কের (যথা রাস্তা সেস ও শিক্ষা সেস) মারফৎ অর্থ সংগ্রহ করে স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজ করায় অ্যাসোসিয়েশন বাধা দেয় এবং আবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধুয়ো তোলে।[১৮] ১৮৬৮ সালে যখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অর্থ-বিষয়ক কর্মনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য "উপযুক্ত দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্রলোকদের নিয়ে গঠিত একটি পরামর্শদাতা পর্ষদ গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করে তখন স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেল তাঁদের অভ্যস্ত বচনচাতুর্য বর্জন করে সোজা বলেন যে এই ধরনের সংস্থা "অল্প কয়েকটি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করবে যাদের সুস্পষ্ট স্বার্থ হবে নিজেদের উপর কর এড়ান"।[১৯]

এই সব স্বার্থগোষ্ঠীর তুলনায় দ্বিতীয় ধাঁচের গোষ্ঠীগুলি পৃথক, এগুলি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক-ভিত্তিক এবং শ্রেণীগতভাবে পাঁচ-মেশালি এবং এরা অতটা সঙ্কীর্ণতাপ্রসূত লক্ষ্য অনুসরণ করত না। ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন, রিফর্ম সোসাইটি, বম্বে অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদিকে হয়তো এই শ্রেণীতে ফেলা

যায়। নওরোজির প্রভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন লণ্ডনের রাজনৈতিক জগতে একটি লবি (lobby) হয়ে ওঠার ততখানি কাছাকাছি পেঁাছেছিল যতখানি ষাটের দশকের শেষভাগে ভারতীয়দের পক্ষে সংগঠিত করা সম্ভব ছিল। নওরোজি যেভাবে ভেবেছিলেন তা হল লণ্ডনে ভারতীয় স্বার্থের উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য ও সেই স্বার্থরক্ষার একটি কর্মকেন্দ্র হিসাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন কাজ করবে, সেখানে খবরাখবর প্রচার করবে এবং এই সব কাজ ভালভাবে করার জন্য তহবিল সংগ্রহ করবে। লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্ররা এবং ভারতে কাজ করছিলেন এমন ইংরেজরা এতে যোগ দিয়েছিলেন (১৮৬৮ সালে ইংরেজরা মোট সদস্যসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ছিলেন)। কিছু তরুণ ভারতীয়, যাঁরা কলকাতা ও বোম্বাই থেকে অন্তত সাময়িকভাবে ঘরছাড়া হয়ে পড়েছিলেন, তাঁরাও এর সভ্য ছিলেন। এই অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যমণ্ডলীর গঠন, বিশেষ করে তার মধ্যে এই তরুণ ভারতীয়দের উপস্থিতি এবং লণ্ডনে এর কর্মস্থল হওয়ার ফলে, অ্যাসোসিয়েশনটি কিছু কালের জন্য "জনস্বার্থের ও সাধারণভাবে ভারতবাসীদের কল্যাণের"[২০] প্রবক্তার ভূমিকা নিতে সমর্থ হয়েছিল। লণ্ডনে এই ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সভায় Evans Bell-এর মত মোটামুটিভাবে উদারনীতিবাদীরা "সাম্রাজ্য শাসন নীতির ভিত্তি হিসাবে বিশ্বাস"-এর মূল্যের উপর জোর দিয়েছিলেন ; এই সভায় Sir Charles Trevelyan এই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কেও জল্পনাকল্পনা করেছিলেন যে সাম্রাজ্যশাসক "প্রভু ও শিক্ষকেরা" এক সময় ভারত ছাড়বেন "সে দেশের কোনও ক্ষতি না করে" ; এমন কি Bertle Frere-র মত রাজশক্তির সর্বময় কর্তৃত্বের এমন ঘোর সমর্থকও ভারতীয় "জনমত" সম্পর্কে তাঁর মতামত এখানে ব্যক্ত করেছিলেন।[২১] 'Journal of the East India Association'-এ প্রকাশিত অ্যাসোসিয়েশনের কার্যবিবরণী, সেক্রেটারি অব স্টেট এবং পার্লামেণ্টারি সিলেক্ট কমিটি ইত্যাদির কাছে তাঁদের স্মারকলিপি থেকে বোঝা যায় যে অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃস্থানীয় সদস্যরা অর্থ-বিষয়ক প্রশ্নাবলী সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁদের কিছু কিছু মতামত বেশ অগ্রসর ছিল (যথা চলতি রাজস্ব থেকে পূর্তকাজের খরচ যোগানর তৎকালীন চালু ব্যবস্থার বদলে "ঋণ ও পরিশোধ তহবিলের (Sinking Fund) একটা যথাযথ ব্যবস্থা"র পক্ষে তাঁদের ওকালতি) এবং নওরোজির বক্তব্যসমূহ (বিশেষ করে ১৮৭০ সালে

অ্যাসোসিয়েশনের সভায় পঠিত "ভারতের চাহিদা ও সংস্থান" 'Wants and Means of India' শীর্ষক রচনাটি) এই বিষয়ের উপর প্রকাশ্য আলোচনাকে এক নতুন স্তরে তুলে দিয়েছিল।[২২] তবু ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন দেশত্যাগীদের এক জাতীয় ত্রিশঙ্কু রাজ্য হয়ে রইল, আর এর একমাত্র ভারতীয় শাখা, ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অব বম্বে (১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত) আশ্চর্য রকমের অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা নিয়েছিল। একমাত্র ভারতীয় অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে পার্লামেণ্টারি একটি সিলেক্ট কমিটি নিয়োগ উপলক্ষে বোম্বাই শাখা সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে তাদের দরখাস্তে (১৮৭১) ইংল্যাণ্ডে 'খরচের (home charges) বিষয়ে যাতে তদন্ত হয় তার পক্ষে কিছু যুক্তি দেবার চেষ্টা করেছিল।[২৩] এই সংস্থা যে বম্বে অ্যাসোসিয়েশন থেকে পৃথক এটা বোধ হয় বলা দরকার। বম্বে অ্যাসোসিয়েশনও প্রায় ওই একই সময়ে অনুরূপ দরখাস্ত পাঠিয়েছিল।[২৪] বম্বে অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়েছিল ১৮৫২ সালে। পার্শী, গুজরাতী ও মহারাষ্ট্রীয়—অর্থাৎ বোম্বাইতে প্রধান তিন সম্প্রদায়ের লোকই এই অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য হয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন বৃত্তির ক্ষেত্রে খ্যাতনামা লোকেদের টানতে সক্ষম হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ আর, জি, ভাণ্ডারকর এবং সোরাবজী সাপুরজী বেঙ্গলী। এঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন এলফিনস্টোন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। নাথুভয় মঙ্গলদাস এবং জামসেদজী জীজীভয়ের মত ব্যবসায়ীরাও একে সমর্থন করতেন। বম্বে অ্যাসোসিয়েশন মূলত স্থানীয় ধরনের প্রশ্নে আগ্রহান্বিত ছিল, যথা: এরা চেয়েছিল উন্নততর ও অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল পূর্তকর্ম; ১৮৭১ সালে এরা বাড়ির উপর কর ও নগর শুল্কের (octroi duty) মত স্থানীয় করের বিরোধিতা করেছিল; লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সংস্কার ও সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের প্রবেশ সুগম করার জন্য কলকাতায় ও অন্যান্য জায়গায় যে দাবি উঠেছিল তাতেও এরা যোগ দিয়েছিল।[২৫] ভারতীয় অর্থব্যবস্থা সম্পর্কিত বৃহত্তর প্রশ্নাবলীতে এই অ্যাসোসিয়েশন আশ্চর্যভাবে নীরব ছিল; বোধহয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এই জাতীয় বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য চেম্বার অব কমার্সকে (এখানে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের তুলনায় ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব বেশি জোরদার ছিল) অপেক্ষাকৃত কার্যকর মাধ্যম হিসাবে দেখেছিলেন।

যে সব ভাবধারা ভারতীয় অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের মৌলিক উপাদান

ষাটের দশকে সেগুলি ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছিল (পঞ্চম পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে) ; আর স্থানীয় সংস্থাগুলির অনেকে, যথা বোম্বে অ্যাসোসিয়েশন, পুণা সার্বজনীন সভা ও মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন মতামত প্রকাশ এবং সরকারের ওপর চাপ দেওয়ার কৌশল কেবল আয়ত্ত করতে শুরু করেছিল। ইংল্যাণ্ডে এইসব কৌশল প্রয়োগের সঙ্গে ব্যক্তিগত-ভাবে পরিচিত থাকার দরুন নওরোজি অবশ্য একটা অনন্য স্থান অধিকার করেছিলেন ; তা ছাড়া অবশ্যই তাঁর কর্মকেন্দ্র লণ্ডনে হবার দরুন অবস্থান-গত একটা সুবিধাও তিনি পেয়েছিলেন। ১৮৭১ সালে ভারতীয় অর্থব্যবস্থা বিষয়ক পার্লামেণ্টারি সিলেক্ট কমিটিকে তিনি বলেছিলেন, "ইংরেজ স্বার্থের প্রতিনিধিরা ভারত সরকারের উপর এমন চাপ দেন যে পার্লামেণ্ট যদি তার কর্তব্য না করে এবং নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভারতীয়দের প্রতি ন্যায় বিচার করতে হবে বলে চেষ্টা না করে তা হলে এ দিক থেকে আশা খুবই কম।"[২৬] এই ধরনের চাপ প্রতিরোধ করার জন্য নওরোজি পাল্টা-চাপের চাল শুরু করেন, যদিও সরকারি সিদ্ধান্ত যাদের হাতে তাদের কাছে (অথবা তাঁর ভাষায় "যেসব মাথা থেকে নীতি নির্দেশ আসে" ও "যেসব হাত নীতি কার্যকর করে" তাদের কাছে) পৌঁছন তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না। প্রচারের কার্যকারিতাকে বোধ হয় তিনি অতিরঞ্জিত করে দেখেছিলেন ; আর ব্রিটিশ "ন্যায্য ব্যবহারের" (fair play) ধারণা বলে যাকে মনে করা হত তার খাতিরে ভারত সরকারকে পথপ্রদর্শক করতে পার্লামেণ্ট কতটা প্রস্তুত এ বিষয়েও তাঁর আশাটা বোধহয় অতিরঞ্জিত ছিল। তবে নিজেদের কথাটা ভাল করে উপস্থিত করার জন্য, তাঁর পক্ষে মত ও সহানুভূতি আকর্ষণ করার জন্য যা কিছু উপায় তাঁর আয়ত্তে ছিল নওরোজি তা ব্যবহার করতেন, আর "ইংরেজ স্বার্থের প্রতিনিধিরা"-ই নিজেদের আচরণ দ্বারা তাঁকে এ পথ দেখিয়েছিলেন। 'India its Government under Bureaucracy'-র লেখক এবং 'Reform Tract Series'[২৭]-এর প্রকাশক John Dickinson কর্তৃক ১৮৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়া রিফর্ম সোসাইটি ইংল্যাণ্ডে মতামতের যে বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল নওরোজির পক্ষে তা সহায়ক হয়েছিল। কিছু মানবিক আবেদনসম্পন্ন ব্যাপারও উৎসাহীদের আকৃষ্ট করেছিল, যথা : আফিম তৈরিতে ও আফিমের ব্যবসায়ে ভারত সরকারের অংশ গ্রহণের বিরুদ্ধে ১৮৬০ সালের আন্দোলন। এর ফলে পরবর্তীকালে ১৮৭৪

সালে সোসাইটি ফর দা সাপ্রেশন অব অপিয়াম ট্রেড-এর জন্ম হয়েছিল.।[২৮]

চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি কর্তৃক ব্যবহৃত কলা-কৌশলের প্রকৃতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় কর্তৃপক্ষের সর্বময় ক্ষমতাভিত্তিক ব্যবস্থায় অনেকটা সীমাবদ্ধ। সরকারি সংস্থার কাছে পেঁছনার জন্য সাধারণভাবে ব্যবহৃত উপাদানগুলি ছিল দরখাস্ত বা স্মারকলিপি পেশ। (১) মনে হয় নিম্নোক্ত ধরনের একটা প্রথা গড়ে উঠতে শুরু করেছিল: ভারতবর্ষে এই স্মারকলিপিগুলি সর্বপ্রথম পাঠান হত নিম্নতর ধাপের সরকারি কর্মচারীর কাছে (যথা প্রাদেশিক বোর্ড অব রেভেনিউ অথবা ভারতীয় অর্থবিষয়ক দপ্তরের সেক্রেটারি—বোধহয় জমি কেমন পরীক্ষা করার জন্য—তারপর পাঠান হত সরকারের সর্বোচ্চ কর্তাদের কাছে, যথা গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল), আর শেষ পর্যন্ত পাঠান হত সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়া-র কাছে। অপরপক্ষে ইংল্যাণ্ডের চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি সরাসরি সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে হাজির হত, তিনি স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেলের কাছে বার্তাটি পাঠিয়ে দিতেন। প্রত্যক্ষভাবে ভারত সরকারের সঙ্গে কারবার করে খুশি হতে চাইলে ইংল্যাণ্ডের চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির কাছে সে পথ বেছে নেবার দরজাও খোলা ছিল। কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন যেমন তাদের লণ্ডনের চেষ্টা নিয়ে সন্তুষ্ট না থেকে স-পরিষদ গভর্ণর জেনারেলের সঙ্গে সরাসরি লেখালিখি করেছিল।[২৯] কিছু কিছু ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বিশেষত লণ্ডনে অবস্থিত ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন সরাসরি সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে লেখালেখি করেছিল। ১৮৭০ সালে যখন একটি পার্লামেন্টারি সিলেক্ট কমিটি[৩০] নিয়োগ প্রত্যাসন্ন মনে হয়েছিল তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং বম্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন ঐ ইণ্ডিয়া হাউসের চূড়ান্ত আদালতেই আবেদন করেছিল। পিরামিডের চূড়ার—অর্থাৎ ইণ্ডিয়া অফিস ও পার্লামেন্টের সান্নিধ্য ইংল্যাণ্ডের চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীদের ভারতে অবস্থিত গোষ্ঠীদের চেয়ে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দিত। নওরোজি সেকথা বুঝেছিলেন।

স্মারকলিপি প্রেরণ অধিকতর কার্যকর হত যখন সেটা কয়েকটি গোষ্ঠী অ্যাসোসিয়েশনের সমন্বিত প্রয়াস হত। কিন্তু ভারতীয় অ্যাসোসিয়েশনগুলি ছিল মূলত স্থানীয় গোষ্ঠী, ব্রিটিশ চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির মত সমন্বিত

প্রয়াসে তারা সক্ষম ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, ব্রিটিশ চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির একটি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বসম্পন্ন অভিযানের কথা ধরা যাক—শোরার (Saltpetre) উপর শুল্ক হ্রাসের আন্দোলন। ১৮৬০ সালে ৪২টি লণ্ডন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ভারত থেকে শোরা আমদানির ব্যবসায়ে যারা নিযুক্ত ছিল (প্রধানত ইউরোপ মহাদেশে পুনরায় রপ্তানির জন্য), তারা এই অভিযানের সূত্রপাত করেছিল। তারা সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছিল যে ভারতীয় রপ্তানি শুল্ক তাদের ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতিকর। দু মাসের মধ্যে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স'ও এ লড়াইয়ে সামিল হ'ল। বম্বে চেম্বার অব কমার্স বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের দু মাস পরে রপ্তানি শুল্কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ পাঠাল। মাদ্রাজ চেম্বার অব কমার্সের প্রতিক্রিয়াটা খানিকটা দেরীতে হয়েছিল, ১৮৬১ সালের মে মাসে। কিন্তু দেরীটা তারা পুষিয়ে নিয়েছিল সরকারের কাছে তিন তিনটি স্মারকলিপি পেশ করে। করাচি চেম্বার অব কমার্স ১৮৬২ সালের এপ্রিলে আন্দোলনে যোগ দিল। ব্যাপারটাকে জিইয়ে রাখার জন্য আলাদা আলাদা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি (যথা সিন্ধুপ্রদেশের শোরা প্রস্তুতকারকেরা এবং কলকাতায় রপ্তানি ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্রিটিশ ফার্মগুলি) একত্র হয়ে মাঝে মাঝে আবার স্মারকলিপি পাঠাচ্ছিল। ১৮৬৫ সালে এই শুল্ক একবার কমিয়ে দেওয়া হল, আবার কমান হল ১৮৬৬ সালে। এই হল লেগে থেকে ও একযোগে কাজ করার ফল।[৩১] ভারতীয়দের পক্ষে এ রকম সমন্বিত প্রয়াস তখনও সম্ভবপর ছিল না।

(২) সিদ্ধান্ত নেবার মালিকদের কাছে পৌঁছানর আর একটি পদ্ধতি ছিল ভারত সরকারের সর্বোচ্চ কর্তাদের কাছে অথবা সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে প্রতিনিধিদল প্রেরণ। উদাহরণস্বরূপ, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স যখন বহিঃশুল্কের পরিমাণ নির্ধারণ ব্যবস্থা (customs valuation system) সম্বন্ধে অসন্তোষ বোধ করেছিল তখন কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও ম্যাঞ্চেস্টারের চেম্বারগুলি ইতিপূর্বে পরপর অনেকগুলি স্মারকলিপিতে[৩২] যে সব অভিযোগ করেছিল সে সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ফিনান্স মেম্বারকে একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তারা রাজী করাতে পেরেছিল (১৮৬০ সালের অক্টোবর মাসে)। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬২ সালের মধ্যে কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন কয়েকবার সেক্রেটারি অব স্টেটের

কাছে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল। ভারতে যাবার একটু আগে ফিনান্স-মেম্বার Wilson ও Laing ম্যাঞ্চেস্টারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[৩৩] ভারতীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে অনুরূপ প্রতিনিধিদল প্রেরণের অল্পই উদাহরণ পাওয়া যায়। (১৮৬০ সালে কলকাতার মাড়োয়াড়ি ব্যবসায়ীরা বাংলা সরকারের দপ্তরে গিয়েছিলেন। তাঁরা বলতে গিয়েছিলেন যে আয়কর নির্ধারকদের তদন্তে যদি এ কথা প্রকাশিত হয় যে "ব্যবসায়ে তাঁদের দ্বারা নিয়োজিত অর্থের কতটা তাঁদের নিজেদের আর কতটা অন্যের" তবে তার ফলে বহু মাড়োয়াড়ি কুঠি বিপন্ন অথবা দেউলিয়া হবে)।[৩৪] দেখা যায় যে ব্রিটিশরা ক্ষোভ জানানর জন্য এই পদ্ধতিকে যত ঘন ঘন ব্যবহার করতে পারতেন ভারতীয়রা তা পারতেন না। সম্ভবত মুখোমুখী সাক্ষাৎটা কার্যকর হত না। ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্টদের সঙ্গে অধীনস্থ জাতির মানুষদের সামাজিক দূরত্ব যেভাবে বাড়ছিল তাতে এটা কিছু আশ্চর্যজনক নয়।

(৩) ক্ষোভ জানান ও প্রতিকার পাওয়ার উপায় হিসাবে স্মারকলিপি ও দরখাস্ত করার বিনীত পদ্ধতি যাঁরা যথেষ্ট বলে মনে করতেন না তাঁদের কাছে একটা তৃতীয় পদ্ধতি খোলা ছিল, সে হল সংবাদপত্রে প্রচার। কিছু কিছু চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর নিজস্ব প্রচার মাধ্যম ছিল। এর পরিসর হয় খুব নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ হত, যেমন কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন 'Cotton Supply Reporter' নামে একটি সাময়িকী বের করত, নয়তো একটা পূর্ণাঙ্গ সংবাদপত্র হতে পারত, যেমন ছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের প্রাধান্যে গঠিত একটি বোর্ড অব ট্রাস্টি কর্তৃক প্রকাশিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট'।[৩৫] এতটা প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও প্রচার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের জন্য অন্যান্য সংবাদপত্রও পাওয়া যেত। ভারতে ইউরোপীয় বণিকমহল Englishman অথবা Pioneer কাগজকে প্রায়ই এইভাবে ব্যবহার করতেন। অনুরূপভাবে নওরোজি এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনে তাঁর সহযোগীরা বোম্বাই-এর প্রধান পার্শী পত্রিকা 'রাস্ত গফতার'-কে ব্যবহার করতেন। এই প্রসঙ্গে একটা মজার ব্যাপার হল ভারতীয় মালিকানার ইংরেজি সংবাদপত্রগুলির লেখায় অদ্ভুতভাবে দুই নৌকায় পা দিয়ে চলা, আন্দোলনমূলক ও সবিনয় আপসমূলক মনোভাবের পাল্টাপাল্টি প্রকাশ। কারণ সম্ভবত এই যে পত্রিকাগুলির বক্তব্য উপস্থিত করতে হত কেবল এক

ধরনের নয়, দুই ধরনের পাঠকের কাছে ঃ এক অধীন জাতির 'শিক্ষিত' ("enlightened") মহল, আর শাসক জাতির "সহানুভূতিশীল" মহল। এই জাতীয় সাংবাদিকতার এই বৈশিষ্ট্যটি কারও নজর এড়িয়ে যেতে পারেনা।

(৪) পার্লামেণ্টে লবি করার কায়দার সঙ্গে ভারতীয়রা পরিচিত হতে শুরু করেছিলেন। সব কটি লবিই প্রত্যক্ষ আত্মস্বার্থের মতলবে তৈরি হত না। মানবিক আবেদন সম্পন্ন বিভিন্ন ব্যাপারে আগ্রহশীল অনেক নাগরিক গোষ্ঠীকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যারা মদত দিতেন। আফিম-বিরোধী গোষ্ঠীটি ছিল এই রকম একটি লবি ঃ বছরের পর বছর সদস্য-বিরল পার্লামেণ্ট সভায় কিছু কিছু এম. পি উঠতেন, আর সেক্রেটারি অব ষ্টেট-এর অর্থ-বিষয়ক বিবৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ভারত সরকার যে আফিম ব্যবসায়ে জড়িত তার "নৈতিক দিক থেকে নিন্দনীয়" চরিত্রের প্রতি নজর আকর্ষণ করতেন। আফিম-বিরোধী লবিতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এম. পি. হলেন Col. Sykes, R. N. Fowler, Sir W. Lawson, Stephen Cave এবং M. Fowler।[৩৬] পার্লামেণ্টে আর এক ধরনের লবি করা হত বাণিজ্যিক স্বার্থগোষ্ঠীগুলির তরফ থেকে। ভারতীয়রা যতটা সমর্থন জমায়েত করতে পারতেন তার তুলনায় স্বভাবতঃই ইংল্যাণ্ডের কোনও স্বার্থ-গোষ্ঠীর লবি অনেক বেশি শক্তিশালী হত (যথা তুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পার্লামেণ্ট সদস্যারা ("Cotton M.Ps"—যাঁদের মধ্যে ছিলেন J. B. Smith এবং T. Bazley এবং তাঁদের সাহায্য করতেন Watson, Crawford ও অন্যান্যরা)। সাধারণত সহানুভূতির বন্ধন যদিও স্বার্থের গ্রন্থির চেয়ে দুর্বল, তবু ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল কিছু লোকও পার্লামেণ্টে ছিলেন যাঁরা সেক্রেটারি অব ষ্টেট ও ভারত সরকারকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলতে পারতেন। Disraeli ও Stafford Northcote-কে লেখা চিঠিতে Mayo অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে উল্লেখ করেছিলেন এই সব "ভারতীয় বিক্ষোভের ধ্বজাধারী" "আমূল পরিবর্তনপন্থী" ("Radicals") যাঁদের "ভারত সরকারের প্রতি বিরূপ প্রস্তাবগুলিকে সমর্থন করার একটা সহজাত প্রবৃত্তি আছে" এবং এইসব "হাল্কা হাওয়ার ভাসা কলাবিলাসী (dilettanti) ভারতীয় রাজনীতিবিদ"দের[৩৭] সম্পর্কে। অনেকদিন ধরে জমা হওয়া এই ক্রোধ ফেটে পড়ার উপলক্ষ হয়েছিল ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থা সম্পর্কে পার্লামেণ্টের একটি সিলেক্ট কমিটি

নিয়োগ। ইণ্ডিয়া অফিস (ভারত সরকারের লণ্ডনস্থ অফিস) থেকে Argyll লিখেছিলেন এ "একটা আপদ", তবে নিরুপায় হয়ে সহ্য করতে হবে এমন একটা উৎপাত হিসাবে জিনিসটার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন।[৩৮] ফিনান্স মেম্বার Richard Temple (Mayo ও Argyll-এর ন্যায় কেবল গোপন ব্যক্তিগত চিঠিপত্রেই অবশ্য) "মিষ্টার এফ-এর প্রশ্নাবলী" যেগুলি "আদৌ প্রশ্নই নয়, আসলে ভারত সরকারের উপর পরোক্ষ আঘাত" সেগুলির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন।[৩৯] যে সমালোচকটিকে Temple এইভাবে আলাদা করে বেছে নিয়েছিলেন খুব সম্ভবত তিনি হলেন Henry Fawcett, কেমব্রিজে অর্থনীতির অধ্যাপক (১৮৬৩-৮৪), এবং ব্রাইটন থেকে নির্বাচিত পার্লামেণ্ট সদস্য (১৮৬৫ ও ১৮৬৮ সালে নির্বাচিত)। ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতির জন্য তিনি ছিলেন সুবিদিত, প্রায় বলা যায় কুখ্যাত। ট্রিনিটিতে তাঁর ছাত্র Henry Hyndman-এর তিনি অন্যতম গুরু ছিলেন। James Geddes এবং নওরোজির রচনাবলীতে প্রভাবিত হয়ে Hyndman ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল একজন প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন।[৪০] পার্লামেণ্টের হস্তক্ষেপ বা কোনও নাক-গলান এম. পি-র অতি-উৎসাহকে যদিও কলকাতার সরকারি ভবন (Government House) অথবা ইণ্ডিয়া অফিসের সুনজরে দেখার সম্ভাবনা ছিলনা, তবু ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, বম্বে অ্যাসোসিয়েশন এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন এই সব সুযোগের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করত। নওরোজিকে যে সিলেক্ট কমিটির কাছে ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনা উপস্থিত করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদের মুখপাত্র হিসাবে তাঁর স্থানটিকে প্রায় আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল বলে মনে করা হত। উপরোক্ত সংস্থাগুলি কর্তৃক প্রেরিত স্মারকলিপিগুলি থেকে একথা সুস্পষ্ট যে ১৮৭১ সালে ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যখন পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটি গঠিত হল তখন পার্লামেণ্টের এই তদন্তকে তারা অভিযোগ জানাবার একটা উপায় হিসাবে দেখেছিল। সিলেক্ট কমিটির কাছে লিখিত বিবৃতিতে নওরোজি বলেছিলেন "দায়িত্ববোধের অভাব" ভারত সরকারের মধ্যে "যে সব ভ্রষ্টতার জন্ম দেয় সাম্রাজ্যের উপর মহান পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ তার অনেক কিছু ঠেকাবে।"[৪১]

এই তদন্তটি ছিল ব্রিটিশ জনগণ ও পার্লামেণ্টকে ভারতের প্রকৃত অবস্থা জানানর এক অনন্য সুযোগ। বলা কঠিন এই সব অ্যাসোসিয়েশনে নওরোজির মত লোকেরা সত্যিই একথা বিশ্বাস করতেন কিনা যে ভারতের প্রতি সমস্ত অন্যায়ের প্রতিকারে উৎসুক এক পার্লামেণ্টে ভারতের সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবটা পূরণ করাটাই কেবল দরকার, তা হলেই অলৌকিক ভাবে অন্যায়ের প্রতিকার ঘটে যাবে। একথা সত্য যে তখন জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের অনেকের ভাষায় ঐ জাতীয় কথা এবং তার সঙ্গে ইংরেজ জাতীয় চরিত্র, ন্যায়-বিচার বোধ ইত্যাদি সম্পর্কে অস্পষ্ট সাধারণ উক্তির—খুবই চলন ছিল। তবে সেটা মনে হয় একটা রীতি মাত্র, খেলার চালের একটা ধরন, একটা কায়দা, ইপ্সিত লক্ষ্যে পেঁছানর জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত একটা মাধ্যমের বেশি কিছু ছিল না।

(৫) শেষত একটা চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও ভারত সরকারের মধ্যে পরামর্শ ও মতামত আদান-প্রদানের আর একটা পথ ছিল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে, সরকার নিয়োজিত কমিটি ইত্যাদিতে গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের মারফৎ। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে চেম্বার অব কমার্সের ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যদের মনোনয়ন, বহিঃশুল্কের পরিমাণ নির্ধারণ ব্যবস্থা সংশোধন কমিটিতে S. N. Bullen-এর (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি) অন্তর্ভুক্তি (১৮৬০)[৪২], আয়কর রিটার্ণ সংশোধন কমিটিতে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন) অন্তর্ভুক্তি (১৮৬০),[৪৩] ১৮৬৬ সালের শুল্ক (Tariff) কমিটিতে J. A. Crawford-এর (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স) অন্তর্ভুক্তি[৪৪]—বে-সরকারি ব্যক্তিহিসাবে গুরুত্বসম্পন্ন গোষ্ঠীগুলির মুখপাত্রদের সযত্নে নির্বাচনের এই সমস্ত ও অন্যান্য উদাহরণ এই সব গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য ভারত সরকারের আগ্রহের ইঙ্গিত দেয়। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ক্ষমতা এত সীমাবদ্ধ ছিল এবং এই সমস্ত কমিটিগুলির কর্তব্য ও কাজ এত সামান্য ছিল যে এই সমস্ত সংস্থায় বেসরকারি ব্যক্তিদের আনুষ্ঠানিকভাবে জড়িয়ে থাকার ভিতর দিয়ে যোগাযোগের দরজা খুলে রাখার ও কতকগুলি মত প্রকাশের কাজটুকুই চলত। অন্যত্র আমরা লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে মনোনীত বে-সরকারি ভারতীয়দের মধ্যে ভূস্বামী অভিজাত ব্যক্তিদের অতিরিক্ত প্রাধান্য সম্পর্কে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসন্তোষের কথা

উল্লেখ করেছি।[৪৫] লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের বিতর্কগুলি যেহেতু সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত (যদিও খানিকটা ভাসা-ভাসা ভাবে), এবং এর কার্য বিবরণীও যেহেতু সহজেই পাওয়া যেত, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ব্যাপারে তাই ইতিহাসবিদরা অনেকখানি মনোযোগ দিয়েছেন, কিন্তু কাউন্সিলের বিতর্ক যে নীতি-নির্ধারণকে আদৌ প্রভাবিত করত তার বিশেষ কোনও সাক্ষ্য পাওয়া যায়না।

স্মারকলিপি পেশ, প্রতিনিধিদল প্রেরণ, সংবাদপত্রে প্রচার, পার্লামেন্টে লবি করা এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অথবা সরকারি কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব—এইগুলিই ছিল চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগের প্রধান রাস্তা। তবে এর বাইরেও যোগাযোগের দ্বারা সিদ্ধান্ত-গ্রহণকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনাকে বাদ দেওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপীয় বণিকদের প্রশাসনের নীচুর তলার লোকেদের উপর কিছু প্রভাব ছিল। ১৮৬০ সালে কলকাতায় বহিঃশুল্কের ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করতে গিয়ে Ashley Eden বহিঃশুল্ক বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের যোগ-সাজস সন্দেহ করেছিলেন।[৪৬] শেষোক্তদের দ্বারা প্রস্তাবিত হার এবং বহিঃশুল্ক কালেক্টর কর্তৃক প্রস্তাবিত হারের মধ্যে "আপস করেই" শুল্কহার নির্ধারিত হত। Eden "দেখেছিলেন অধিকতর প্রভাবশালী বণিকেরা যে সব পণ্য নিয়ে প্রধানত কারবার করতেন সেইগুলির শুল্কই সাধারণত অনেকটা কম ধরা হত।"[৪৭] এই ধরনের দুর্নীতি ব্যাপক ছিল এমন কোনও সাক্ষ্য নেই। এটাকে বোধহয় একটা নমুনা হিসাবে ধরা যায় না। সে যাই হোক, সরকারের সর্বোচ্চ সদস্যারা এই ধরনের যোগ-সাজসের সম্পর্কের মধ্যে ঢুকবেন এটা আশা করা যেত না; কিন্তু ভারতে তাঁদের স্বদেশবাসীদের সামাজিক চাপের ছোঁয়াচ থেকে তাঁরা কি মুক্ত ছিলেন? এই প্রশ্নের জবাবটি গুরুত্বপূর্ণ।

মনে হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইউরোপীয় ও এ দেশবাসীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সামাজিক দূরত্বের ফলে এক দিকে ইউরোপীয়দের কাছে এ দেশের মানুষের পৌঁছ (access) আরও কমিয়ে দিয়েছিল, অপর দিকে ইউরোপীয়দের মেলা-মেশার পরিধিকে আরও সঙ্কীর্ণ করে ফেলে নিজেদের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের চাপের কাছে তাঁদের আরও নতিশীল করে তুলেছিল। স্রোতে যাঁরা গা ভাসিয়ে দিতেন তাঁরা এ চাপ ততটা অনুভব করতেন না,

কিন্তু স্রোতের বিরুদ্ধে যাঁরা যেতেন চাপের ক্ষমতা তাঁরা টের পেতেন। Sir Charles Trevelyan ও Mayo যখন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের সাধারণ অনুভূতির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখন তাঁদের এই অভিজ্ঞতাই হয়েছিল। Trevelyan দেখেছিলেন যে "আমলা-সংহতির মনোভাব" ("service feelings") এবং "ফৌজী-সংহতির মনোভাব" ("espirit de corps") ব্যয়হ্রাসের প্রধান অন্তরায় হয়েছিল।[৪৮] "অসদাচরণের" ("jobbing") কিছু ঘটনা তাঁর চোখে পড়েছিল "যা প্রধানত ভাই-ভাই ভাব (brotherly feeling) থেকেই উদ্ভূত হয়।"[৪৯] ১৮৬৫ সালে তাঁর বাজেটে যখন তিনি অপরাপর পণ্যের মধ্যে চা, কফি ও পাটের উপর রপ্তানি শুল্কের প্রস্তাব করেছিলেন তখন তিনি ভারতস্থিত ইউরোপীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র মনে করত যে তিনি "বাগিচা-স্বার্থের প্রতি বিরূপ",[৫০] মনে করত যে, ফেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ার ভাষায়, তাঁর "বাণিজ্য ও বণিক সম্প্রদায়ের প্রতি সক্রিয় সমর্থনের অভাব"[৫১] আছে। সেক্রেটারি অব স্টেট নতুন রপ্তানি শুল্ক মন্থর করতে রাজী হলেন না, ভারত সরকার নিজেদের দ্বারা পাশ করা এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি তুলে নিতে বাধ্য হল, আর বছর ঘোরার আগেই ইংল্যাণ্ড থেকে W. N. Massey Trevelyan-এর বদলি হিসাবে এসে গেলেন।[৫২] Mayo-র ঘটনাটি আরও কৌতূহলোদ্দীপক কারণ তাঁকে আমলাতন্ত্র ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যেকার চাপের মোকাবেলা করতে হয়েছিল। সামরিক ব্যয় কমানর চেষ্টা করে তিনি দেখলেন সর্বোচ্চ সেনানায়কের (Commander-in-Chief) সঙ্গে লড়াই লেগে গেল: "লিখিত মন্তব্য চালাচালির যুদ্ধে" ("warfare of notes") চলল, তাতে সেনাবাহিনীর প্রধান দেরি করা ও এড়িয়ে যাওয়ার ফেবিয়াস সুলভ (Fabian) কৌশল নিলেন (একটা সিদ্ধান্ত ঝুলিয়ে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র তিন মাস আটকে রাখলেন), শত্রুর পাশ কাটিয়ে গেলেন (সেক্রেটারি অব স্টেট ও কাউন্সিলের সভ্যদের সঙ্গে সরাসরি চিঠিপত্র লিখে); আর সর্বোপরি সামরিক সদস্য (Military Member) এক সরাসরি প্রত্যাক্রমণ করে বসলেন (সামরিক নয়, বে-সামরিক ব্যয় হ্রাসের এক প্রস্তাব দিয়ে)।[৫৩] Mayo সৈন্যদের রসদ যোগানর বিভাগের ও বাসস্থান নির্মাণের খরচ ছাঁটাইয়ের "সকল নিন্দার ভাগী হলেন;"[৫৪] "সামরিক বাহিনীর বেকার চাকুরেদের"[৫৫] সঙ্গে এবং "এর আগে যাঁরা

ব্যয় সঙ্কোচের জন্য চিৎকার পাড়ছিলেন''[৫৬] সেই সব সহকর্মীদের সঙ্গেও নাছোড়বান্দা হয়ে লড়ে গেলেন। সেক্রেটারি অব স্টেট সামরিক বাহিনীর ব্যয়-সঙ্কোচের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন, পরাজিত হয়ে Mayo তিক্তভাবে লিখলেন "স্বার্থপরতাকে পরাস্ত করা কঠিন। জনসেবাটা সকলের বিচারে গৌণ বিবেচ্য।"[৫৭] চুক্তিবদ্ধ (covenanted) সিভিল সার্ভিসের লোকেরা যখন অধিকতর পেন্সনের জন্য ১৮৭০ সালে "আন্দোলন" করছিলেন তখনও এই একই ধরনের সংহতি দেখা গিয়েছিল। ফৌজী-সংহতির মনোভাবের' প্রভাবে গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর পরিষদ এঁদের বিষয়টি সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে সুপারিশ করেছিলেন।[৫৮] এই ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ এই ধরনের চাপের কাছে কম নতিশীল বলে প্রমাণিত হল ঃ যাই হোক অর্থ-সংস্থানের স্বল্পতার জন্য পেন্সন বাড়ান গেল না। এক সরকারি বিবরণে Argyll ইঙ্গিতময় মন্তব্য করলেন যে গভর্ণর জেনারেলের পরিষদে কেবল আইনের ভারপ্রাপ্ত সদস্য (Law Member) এবং গভর্ণর জেনারেল ছাড়া আর সকলেই সিভিল সার্ভিসের লোক এবং "বিষয়টিতে সকলেই ব্যক্তিগতভাবে স্বার্থান্বিত।[৫৯] Argyll-এর মতে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের লোকেরা "সাম্রাজ্যের মধ্যে, সম্ভবত সারা পৃথিবীতেও''[৬০] অন্য যে কোনও চাকুরের চেয়ে বেশি মাইনে পেতেন। আরও অবসরকালীন ভাতার জন্য সিভিল সারভেন্টদের আবেদনকে সেক্রেটারি অফ স্টেটের চিঠিতে যেসব কড়া কথা ছিল তা সিভিল সার্ভিসের লোকেদের ক্ষুব্ধ করবে এই ভয়ে Mayo Argyll-কে এটি প্রকাশ না করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।[৬১] চুপিচুপিই ব্যাপারটার ইতি ঘটান হয়েছিল। এই সব উপাখ্যান থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে কতকগুলি পরিস্থিতিতে এমন কি প্রশাসন ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও এমন ধরনের আচরণের উদ্ভব হয়েছিল যা বাইরেকার স্বার্থ-গোষ্ঠীর আচরণের সঙ্গে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ, আর "ভাই-ভাই ভাব", "ফৌজী সংহতির মনোভাব", স্বদেশবাসীদের মধ্যে সহানুভূতি ইত্যাদি কম প্রভাবশালী ছিল না। তবে নীতি নির্ধারণ ব্যাপারে সামাজিক চাপ সম্বন্ধে আরও সামান্যীকরণ করার আগে সিভিল সার্ভিসের লোকেদের সামাজিক পটভূমিকা, ভারতে বাকি ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ, তাঁদের সঞ্চয়ের আর্থিক বিনিয়োগ এবং প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে তাঁদের উপর বর্তায় এমন সব সরকারি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব আরও অনেক বেশি জানা

আমাদের দরকার। তবে এটা অনস্বীকার্য যে সামাজিক চাপ ছিল সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করার একটা উপায়, আর তা আরও জোরদার হত যেহেতু সরকারি ও বেসরকারি ইংরাজ মহলে একই ধরনের ধারণা ও চিন্তা, আচরণের একই আদর্শের অনুসরণ ও দুই মহলের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের প্রত্যাশা।

সামাজিক চাপের উদ্দেশ্য ছিল "সহানুভূতি" যোগাড় করা। শাসকদের সর্বময় কর্তৃত্ব-ভিত্তিক ব্যবস্থায় বেশির ভাগ চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীরই দাবি না মিটলে পাল্টা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার ক্ষমতা থাকত না। ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার অব কমার্স অথবা কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশনের মত শক্তিশালী গোষ্ঠী—হয়তো ভারতের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি অব স্টেটকে বেকায়দায় ফেলতে পারত, ভারতে চেম্বার অব কমার্স-গুলিও অনুরূপভাবে হৈ চৈ করতে পারত। তবে সাধারণভাবে চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি বড় জোর যা করতে পারত তা হল বোঝান, অনুরোধ করা, ব্যাপারটা হাজির করা, পরামর্শ দেওয়া। কাজেই সহানুভূতি পাওয়া সে দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিদেশীর শাসনে এ দেশীয় গোষ্ঠীগুলির অবস্থা দুই জাতির মধ্যে সামাজিক দূরত্বের ফলে যৎপরোনাস্তি হীন দেখা যায়। এই দূরত্ব ভারতীয়দের তুলনায় ব্রিটিশ স্বার্থগুলিকে বিপুল সুবিধা দিয়েছিল।

চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির ধরন ও পদ্ধতি সম্পর্কে উপরে যা বলা হল, বলা বাহুল্য যে তা এদের কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের নির্যাস উপস্থিত করছে এবং এদের কোনও কোনও কর্মপদ্ধতিকে তুলে ধরছে। এখানে সমস্ত সংগঠন বা সমিতির একটা তালিকা তৈরি অথবা তাদের কার্য-কলাপের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ইতিহাসবিদেরা এ বিষয়ে অনেক কাজ করে গিয়েছেন। আমরা যে বিষয়ে বেশি আগ্রহশীল সে হল সরকার ও চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর তার প্রতিক্রিয়া। স্বার্থের সমপ্রকৃতি, গোষ্ঠী হিসাবে সংগঠন ও সংহতির গভীরতা এবং লক্ষ্যসমূহের নির্দিষ্টতার নিরিখে প্রকারভেদ করে আমরা প্রথম প্রকার (type) ও দ্বিতীয় প্রকার গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য টেনেছি : প্রথম প্রকার হল চেম্বার অব কমার্স, ভূস্বামীদের সমিতি, বাগিচা-মালিকদের সমিতি, ব্যবসায়ীদের গোষ্ঠী ইত্যাদি, আর দ্বিতীয় প্রকার হল প্রথম যুগের

রাজনৈতিক সমিতি, নানারকম পরার্থপর মতামত-গোষ্ঠী, সংস্কার সাধনে উৎসাহী সংগঠন প্রভৃতি। পাঁচ-মেশালি এবং ক্ষণস্থায়ী গোষ্ঠীও ছিল। অপেক্ষাকৃত কম সোচ্চার ও অসংগঠিত জনগণ হয়তো স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মাঝে মাঝে জমা হতেন, বহু সংখ্যায় দরখাস্তে স্বাক্ষর দিতেন অথবা প্রতিনিধিদল পাঠাতেন, এই সব পাঁচ-মেশালি ও ক্ষণস্থায়ী গোষ্ঠীগুলি ছিল তাঁদের ক্রিয়াকলাপেরই ফল। কিন্তু এ কোনও চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নয়। প্রতিষ্ঠিত সংস্থিতির (system) মধ্যে ফলপ্রসূভাবে কাজ করার দিক থেকে বা এই খেলায় সফল চাল দেওয়ার দিক থেকে বিচার করলে প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের গোষ্ঠী এবং ক্ষণস্থায়ী পাঁচ-মেশালি গোষ্ঠীকে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দেওয়া যায়। অপর পক্ষে প্রচলিত সংস্থিতির সম্ভাব্য বিনষ্টির দিক থেকে বিচার করলে ক্রমটি হবে সম্পূর্ণ উল্টো। প্রথম ধরনের গোষ্ঠীগুলি এই কলা-কৌশলে ইতিমধ্যেই সুদক্ষ ছিল, দ্বিতীয় ধরনের গোষ্ঠীগুলি খেলার কায়দা-কানুন শিখছিল, অধ্যবসায় সহকারে স্মারকলিপি দিচ্ছিল, লবি করছিল ও সাধারণভাবে 'হৈ চৈ করছিল'। Mayo-র ভাষায় "নীরব বহু"[৬২] অর্থাৎ সাধারণ লোকেরা এ খেলায় অপটু ছিলেন। তাঁদের বিক্ষোভ ও দাবি প্রকাশিত হত বাংলাদেশের নীল বিদ্রোহ অথবা দাক্ষিণাত্যের হাঙ্গামার (Deccan Riots) মত বিপুল অভ্যুত্থানের মধ্যে। (বাংলা দেশের) নীল বিদ্রোহে যে সব রায়ত যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা মুষ্টিমেয় জমিদারের এবং গ্রামীন সমাজের বাইরে কলকাতায় শিক্ষিত মোক্তার, সাংবাদিক ও মিশনারিদের সমর্থন পেয়েছিলেন।[৬৩] অনুরূপভাবে দাক্ষিণাত্যের রায়তেরা বর্ধিত ভূমি-রাজস্ব ধার্যের বিরুদ্ধে তাঁদের আন্দোলনে পুনা সার্বজনিক সভার সমর্থন পেয়েছিলেন। সভা রায়তদের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্তও শুরু করেছিল।[৬৪] কিন্তু ১৮৫৯ সালে বাংলার এবং ১৮৭৫ সালে দাক্ষিণাত্যের এই অভ্যুত্থানগুলি ছিল বহুকালের জমা বিক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, এর নেতৃত্ব শহুরে, শিক্ষিত, চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির কৌশল-বিশেষজ্ঞদের হাতে ছিল না। বলা হয়েছে, যে "নীল গোলযোগ সংক্রান্ত কাগজপত্রে নেতা হিসাবে নাম পাওয়া যায় যে সব গ্রামের মুখ্যা বা গোড়লের তাদের সংখ্যা এত বেশি যে তালিকা করা যায় না।··· এক গ্রামে কিছু নেতা দাঁড়িয়েছে, তারা অবিশ্বাস্যরকম অল্পসময়ের মধ্যে পাশাপাশি অনেকগুলি গ্রামে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে, আবার তেমনি

তাড়াতাড়িই তা হারিয়ে ফেলেছে।[৬৫] দাক্ষিণাত্যের রায়তদের দরখাস্তগুলি—নমুনাস্বরূপ ১৮৭৩ সালের জুলাই মাসে ইন্দাপুরের একখানি দরখাস্ত এক গ্রামের সভায় শুরু হয়ে ক্রমশ বাড়তে বাড়তে ২৬৯৪ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত বিরাট দরখাস্তে পরিণত হয়েছিল—দাক্ষিণাত্যের হাঙ্গামার পূর্বাভাস দিয়েছিল। "১৮৭৫ সালের হাঙ্গামা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত", আর পুনা সার্বজনিক সভা যে ধরনের সংগঠিত অভিযানের কথা ভাবছিল এ আদৌ সে রকমের ছিল না।[৬৬] সরকার বাংলা ও দাক্ষিণাত্যের আন্দোলনের উত্তর হিসেবে আইন পরিবর্তনের পথে গিয়েছিল। সরকার রায়তদের অভিযোগ সম্পর্কে নজর দিতে বাধ্য হয়েছিল। বাংলা ও দাক্ষিণাত্যের রায়তরা যা করেছিল বলা-বাহুল্য তা "জ্ঞানীগুনী" (elite) চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির সুচারু খেলার নিয়ম-কানুনের পরোয়া করেনি।

নীতি নির্ধারণের ক্ষমতার যারা অধিকারী তাদের প্রভাবিত করার জন্য সামাজিক চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা ছাড়াও ব্রিটিশ স্বার্থ গোষ্ঠীগুলি এই খেলায় ভারতীয়দের তুলনায় আরও অন্যান্য সুবিধা ভোগ করত। ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের সরাসরি পৌঁছনর সামর্থ্য চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ১৮৭৫-৭৯ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের মালপত্রের উপর আমদানি শুল্ক রহিত করার (ও পরে ভারতীয় সূতীবস্ত্র উৎপাদকদের উপর পাল্টা সমকারী [countervailing] শুল্ক বসিয়ে দেওয়ার) জন্য সেক্রেটারি অব স্টেটের হস্তক্ষেপ এই পক্ষপাতিত্বের এক নাটকীয় প্রদর্শনী হিসাবে জনমানসে প্রতিভাত হয়েছিল। সুতীবস্ত্র ও চট উৎপাদকদের উপর রপ্তানি শুল্ক হ্রাসের প্রশ্নে ইণ্ডিয়া অফিসের হস্তক্ষেপ ততটা নাটকীয় না হলেও কিছু কম ফলপ্রদ ছিল না। ব্রিটিশ স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলির একযোগে চাপ দেওয়ার ক্ষমতা প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় গোষ্ঠীগুলির তুলনায় অনেক বেশি ছিল। নতুন ধরনের চাপ-প্রতিচাপের খেলায় নিজের কোলে ঝোল টানার যে কৌশল ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হত তার অভাবে ভারতীয়রা অসুবিধায় পড়তেন। ব্রিটিশ স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলির সাফল্যের অংশত কারণ ছিল এই সুবিধাগুলি (তবে সে কেবল অংশতই, আসলে অনেক গভীর কারণ ছিল); এই ধরনের সাফল্যের উদাহরণ হল ঃ কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন ও বাগিচা-মালিকদের অ্যাসোসিয়েশনগুলির ১৮৬২ সালে ভূমি সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন পরিবর্তন করাতে সক্ষম হওয়া ; ডাণ্ডি চেম্বার অব কমার্স, যারা ১৮৬৯ সালে

চট উৎপাদকদের উপর আমদানি শুল্ক রহিত করাতে চেয়েছিল ১৮৭০ সালে তাদের তা আদায় করা ; ব্যবসায়ের লাভক্ষতি নিরপেক্ষভাবে রেলপথে ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের রাষ্ট্রের কাছে সুদের গ্যারান্টি আদায় করে নেওয়া ; ম্যাঞ্চেস্টার কর্তৃক সেখানকার উৎপাদকদের উপর আমদানি শুল্ক একবার ১৮৬২ সালে ও আর একবার ১৮৬৩ সালে কমিয়ে নেওয়া এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৭৯ সালে একেবারে রহিত করান।[৬৭] অবশ্য সমস্ত ব্রিটিশ স্বার্থ-গোষ্ঠীই সমান প্রভাবশালী ছিল না। বাংলার চটকলের মালিকেরা—যাদের বেশির ভাগ ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের লোক—১৮৭০ সালে ডাণ্ডি চেম্বার অব কমার্সের কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন। (একথা লক্ষ্য করা দরকার যে দু-পক্ষের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল প্রধানত অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বাজারে)। শোরা উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের শোরার উপর রপ্তানি শুল্ক কমানর জন্য পাঁচ বছর ধরে লড়তে হয়েছিল। (এ বাণিজ্য অবশ্য স্বাভাবিক মৃত্যুর পথেই চলেছিল কারণ ইউরোপে কৃত্রিম শোরা উৎপাদনের কৌশল বের হওয়ায় সেখানে রপ্তানির বাণিজ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল)। তবু মোটামুটি বলা যায় সরকার চটপট ও ইতিবাচকভাবেই সাড়া দিয়েছিল। সরকারকে প্রভাবিত করায় ম্যাঞ্চেস্টারের সাফল্য ইতিহাস-বিদদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, কিন্তু ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলিও কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কতকগুলি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করায় বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সাফল্যের আশ্চর্যজনক ইতিহাস পাওয়া যায়। ১৮৫৯ সালের এপ্রিল মাসে এই চেম্বার উচ্চ শুল্ক (tariff) ধার্যের (বিদ্রোহের সময় অত্যধিক সরকারি খরচের অন্যতম ফল) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করল ঃ ১৮৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে Wilson কর্তৃক অনেক-গুলি রপ্তানি শুল্ক (চট, পাট, শনের তন্তু, কাঁচা চামড়া, পশম প্রভৃতির উপর) রহিত হল।[৬৮] ১৮৬০ সালের আগস্ট মাসে এই চেম্বার ম্যাঞ্চেস্টার, বোম্বাই ও মাদ্রাজের চেম্বার অব কমার্সের দ্বারা সমর্থিত হয়ে বহিঃশুল্কের পরিমাণ নির্ধারণ ব্যবস্থার সংশোধন দাবি করল ঃ ১৮৬০ সালের অক্টোবর মাসে সরকার এই সংশোধনের জন্য বেঙ্গল চেম্বারের একজন প্রতিনিধিসহ একটি কমিটি নিয়োগ করল।[৬৯] ১৮৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রপ্তানি শুল্ক কমানর জন্য শোরা উৎপাদকদের দাবি বেঙ্গল চেম্বার সমর্থন করল ঃ ১৮৬৫ সালের মার্চ মাসে শুল্ক কমান হল (মণ পিছু ২·০০ টাকার

জায়গায় ১'০০ করা হল)।[৭০] ১৮৬৫ সালের এপ্রিল মাসে চেম্বার চা, কফি, চট, চামড়া ও পশম ইত্যাদির উপর Trevelyan প্রস্তাবিত নতুন রপ্তানি শুল্কের বিরোধিতা করল : ১৮৬৫ সালের মে মাসে সেক্রেটারি অব স্টেট এই সব শুল্ক মঞ্জুর করতে অস্বীকার করলেন এবং জুন মাসে ভারত সরকার এই সব শুল্ক তুলে নিল।[৭১] ১৮৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে শোরার উপর শুল্ক আরও কমানর জন্য চেম্বার দাবি করল : সেই বছরেই আবার কমান হল (১ টাকা মণ প্রতি থেকে মূল্যের ৩ শতাংশ করা হল)।[৭২] ১৮৬৭ সালের নভেম্বরে চেম্বারে বহিঃশুল্কের পরিমাণ নির্ধারণ ব্যবস্থার সংশোধন (বিশেষত সুতীবস্ত্র ইত্যাদির উপর) দাবি করল : ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই সংশোধনের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হল (সুতোর তৈরি জিনিসপত্রের উপর শুল্ক ১৫% কমিয়ে দেওয়া হল)।[৭৩] দুটি ক্ষেত্রে চেম্বার তখন সফল হয়নি। ১৮৬৭ সালের মার্চ মাসে রপ্তানি শুল্ক কমানর জন্য শস্য ব্যবসায়ীদের অন্দোলনকে চেম্বার সমর্থন করেছিল :[৭৪] গমের উপর শুল্ক ১৮৭৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ওঠেনি। আর প্রত্যক্ষ করের বিরোধিতা করে চেম্বার একটা অনিবার্যভাবে অসফল চেষ্টা করেছিল, কারণ জানাই ছিল যে রাজস্বের সম্ভাব্য একটা বড় উৎস একেবারে ছেড়ে দিতে সরকার অনিচ্ছুক ছিল।[৭৫]

ব্রিটিশ অথবা ভারতীয় যে সব চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এই খেলায় অংশ নিত তাদের কারোরই যদিও ফলাফলের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল না, তবু মোটামুটি ব্রিটিশ স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলির প্রয়াস অপেক্ষাকৃত বেশি ও দ্রুত সাফল্যমণ্ডিত হত। আবার বলা যাক—তার মানে এই নয় যে শেষোক্তরা যা চাইত সব সময়ে তাই-ই পেত : কারণ সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক (constraints) ছিল। ব্রিটিশ স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলির দাবি ছাড়াও সাম্রাজ্যের সংস্থিতির অনেক চাহিদা ছিল। সাম্রাজ্য ব্যবস্থাকে চালু রাখতে হবে, তার বৈধতা ও নিরাপত্তা, তার অর্থ-ব্যবস্থা টিঁকিয়ে রাখার ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা চলবে না। কাজেই সাম্রাজ্য ব্যবস্থার নিজস্ব প্রয়োজন বা চাহিদা থেকেই অনেকগুলি প্রতিবন্ধকের উদ্ভব হত। প্রথমত, ব্রিটিশ স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলি যত চড়াগলায় ও যত জেদের সঙ্গে কর ছাড়ের সুবিধা, বহিঃশুল্ক রদ, আয়করের বিলুপ্তি প্রভৃতি দাবি করুক না কেন সরকারকে এগুলি বিবেচনা করতে হত সামগ্রিক অর্থ-সংস্থানের পটভূমিকায়। সরকারের

মধ্যে যদি কুলোত তবে সুবিধা দেওয়া হত। আয়কর—চেম্বারের পক্ষে ও বেতনভোগীদের পক্ষে যা ছিল একেবারে অসহ্য—তার ক্ষেত্রে সরকারের কোনও বিকল্প উপায় ছিল না। এই ক্ষেত্রে অথবা সুতোর জিনিসের উপর আমদানি শুল্কের ক্ষেত্রে চেম্বার অব কমার্সের দাবি সম্পর্কে সরকারের নেতি-বাচক প্রতিক্রিয়ার মর্মার্থ ছিল এই যে সরকার যদি পারত তা হলে এই সব কর উঠিয়ে দিত, কিন্তু পারছে না। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে যেমনি সুযোগ মিলবে অমনি করে দেওয়া হবে। এতে ইংরেজ স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলি পুরো সন্তুষ্ট হয় নি। ব্যবসায়ী, বা যে কোন করদাতাই, নিজের আয়ুষ্কালের মধ্যেই কর হ্রাস চাইবেন, এদিকে সরকার অত ব্যস্ত নয়, অর্থ-ব্যবস্থা যাতে টি'কে থাকে তার জন্যই বেশী আগ্রহী সরকার ধীরে ধীরে এগোন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত (যথা ১৮৮২ সালে যে প্রায় সম্পূর্ণ অবাধ বাণিজ্য চালু হল তার দিকে ক্রমে ক্রমে এগোন)। যাকে প্রাসঙ্গিক কাল-পরিমাণ (relevant time-span) আখ্যা দিতে পারি স্বার্থ-গোষ্ঠীর তুলনায় সরকারের পক্ষে তা দীর্ঘতর হত।

দ্বিতীয়ত সরকার জন-মানসে নিজের ভাবমূর্তি সম্বন্ধে একেবারে বেপরোয়া ছিল না। তাই দেখি Bartle Frere "জনগণের নাড়ি বোঝার" জন্য সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন, Mayo লক্ষ্য করেছিলেন যে ভারতীয়রা অর্থ-বিষয়ক প্রশ্ন সম্পর্কে "বেশ সজাগ" হয়ে উঠছিলেন, এবং এমন কি ঐতিহ্যগতভাবে শান্ত মাদ্রাজেও বোর্ড অব রেভিনিউ অনুভব করতে শুরু করেছিল যে সরকারের সিদ্ধান্তগুলি "এখন তীক্ষ্ণভাবে পরীক্ষিত হচ্ছে, আমাদের প্রজাগণের ক্রমশ বেশি সংখ্যার দ্বারা বেশ নিপুণভাবে আলোচিত হচ্ছে।...[৭৬]" "ইউরোপের বড় বড় উৎপাদক দেশগুলিতে" ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা যে চট, তুলো ইত্যাদি কাঁচামালও রপ্তানি করত তার শুল্ক রদের (১৮৬০) পক্ষে Wilson-এর বিস্তারিত ভাষণ, অথবা অর্থ-সংক্রান্ত সঙ্কট সত্ত্বেও তুলাজাত উৎপাদনের উপর শুল্ক হ্রাসের পক্ষে Laing-এর ওকালতি (১৮৬১ ও ১৮৬২) থেকে মনে হয় যে ফিনান্স মেম্বাররা তাঁদের প্রত্যক্ষ শ্রোতৃবর্গ, অর্থাৎ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সরকারি সদস্য এবং 'বে-সরকারি' সদস্য নামে পরিচিত অনুগত মনোনীত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যেই ভাষণ দিচ্ছিলেন না। এ "জনমত" নামক সেই বিমূর্ত সত্তার কাছে ব্রিটিশ স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলিকে প্রদত্ত সুবিধাগুলির পক্ষে যুক্তি হাজির করার প্রয়াস। কারণ Trevelyan যাকে

বলতেন সরকারের "সদ্ভূদ্দেশ্যের সুনাম"[৭৭] তা রক্ষা করার গুরুত্ব কম ছিল না। ভাইসরয় ও ফিনান্স মেম্বারদের গোপন চিঠিপত্রে জনমানসে সরকারের ভাবমূর্তি সম্পর্কে উদ্বেগের অপ্রত্যক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। যে সব সিদ্ধান্ত জনগণের অপ্রিয় হবার আশঙ্কা অথবা যে সব খবর তাঁদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে সেগুলি গোপন চিঠিপত্রে আলোচিত হত। আমদানি শুল্ক হ্রাসের পক্ষে বিশেষ করে ভারতীয় সুতীবস্ত্র উৎপাদকদের উপরে সমকারী পাল্টা শুল্ক (countervailing excise) বসিয়ে দেওয়ার জন্য (ভারতীয়দের তৈরি সুতীবস্ত্রের উপর একটা অন্তঃশুল্কের রূপে অথবা ভারতের সুতোকলগুলির উপর একটা বিশেষ করের রূপে) Wood-এর ওকালতি বেশির ভাগটাই ছিল কেবল Elgin ও Bertle Frere-র গোচরে।[৭৮] "এ দেশীয় তাঁতি সংক্রান্ত কাগজপত্র" ("native weaver papers")—অর্থাৎ দেশীয় বয়ন শিল্পের অধোগতি সম্পর্কে Trevelyan কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাবলী (চতুর্থ অধ্যায়ে ২০৯-১০ পৃষ্ঠায় দেখুন) সীমিত পাঠকদের জন্য ছাপা হয়েছিল, বাজেট ছাপার সময়ে যে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় এ ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছিল। Trevelyan, Wood-কে অবিলম্বে আশ্বস্ত করেছিলেন যে গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিল ও ইণ্ডিয়া অফিসের জন্য এক ডজনেরও কম কপি ছাপা হয়েছিল এবং "ইংল্যাণ্ডে বা ভারতে আর কারও" এ সব কাগজপত্র দেখতে পাবার আশঙ্কা নেই।[৭৯] তেমনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করার জন্য ১৮৬২ সালের বহুল প্রচারিত সিদ্ধান্ত থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি Caranborne, Argyll, Lawrence ও Mayo তাঁদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে গোপন আলোচনার মারফৎ নিয়েছিলেন এবং ১৮৭১ সাল পর্যন্ত এই নতুন কর্মনীতি প্রকাশ্যে স্বীকৃত হয়নি।[৮০] জনমতের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সরকারের উদ্বেগের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল। বিদ্রোহের পরবর্তী বছরগুলিতে এই উদ্বেগ তীব্রতর হয়েছিল—Charles Wood ও Wilson-এর মধ্যেকার ব্যক্তিগত চিঠিপত্র[৮১] থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়—কিন্তু এমন কি পরেও এটা অর্থ-বিষয়ক কর্মনীতির উপর একটা সীমা আরোপ করতে থাকে, কারণ এ কর্মনীতি ভারতীয় চক্ষু ক্রমশ বেশি করে সমালোচকের দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখছিল।

তৃতীয় আর এক ধরনের প্রতিবন্ধকের (constraint) বা বাধ্য-বাধকতার বিবেচনা থেকে যে ইংল্যাণ্ডের সরকারের চক্ষে ভারত সাম্রাজ্য বিশ্ব-জোড়া সমগ্র

সাম্রাজ্যের কেবল একটা অংশ হিসাবে গণ্য এবং ভারত সাম্রাজ্যকে ডাক দেওয়া হত "বৃহত্তর সাম্রাজ্যের স্বার্থের" বেদীমূলে "বলিদানের" জন্য। এখন, এই অংশের যারা অংশীদার তারা সমগ্রের এই চড়া দাবি থেকে যতখানি সম্ভব আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করত। উদাহরণ স্বরূপ ব্রিটিশ যুদ্ধ দফতর (War office) ও নৌসচিব-সভা (Admiralty) ভারত সরকারের উপর বিরাট ব্যয়ভার চাপিয়ে দিয়েছিল যা ভারত সরকার কমাতে বা এড়াতে চেষ্টা করেছিল। যুদ্ধ দফতরের Cardwell দাবি করেছিলেন যে ব্রিটিশ সৈন্যদের খরচের জন্য ভারত সরকার ন্যায়তঃ অর্থ দিতে বাধ্য কারণ ভারত সরকার ব্রিটিশ সৈন্যদের সংরক্ষিত বাহিনী (reserve force) হিসেবে ব্যবহার করে। ভারতের বাইরেকার সামরিক অভিযানের যে ব্যয়ভার তা ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে অসম হারে বণ্টনের অভ্যাস যুদ্ধ দফতরের ছিল এবং তারা তারও পক্ষে যুক্তি হাজির করত।[৮২] Argyll যদিও একথা স্বীকার করেছিলেন যে ভারতের উপর চাপান এই সব ব্যয়ের কিছু কিছু অত্যধিক ছিল, কিন্তু তিনিও একথা বলেছিলেন যে সামরিক ব্যয়ের প্রশ্নটা "কোন ভারতীয় নয়, গোটা সাম্রাজ্যের" এবং এ "কেবল ভারতের এই মুহূর্তের প্রয়োজনের পট-ভূমিকায় নির্ধারিত হতে পারে না।"[৮৩] ইণ্ডিয়া অফিসের মারফৎ যুদ্ধ দফতরের সঙ্গে ভারত সরকারের আলাপ-আলোচনা ইংলণ্ডকে ভারতের দেয় কমাতে পারল না। এই ব্যাপারে "সুবিচার অথবা ন্যায্য ব্যবহার" না করার বিরুদ্ধে Lawrence-এর প্রতিবাদ এবং "এখানকার অসন্তোষ দূর করা কঠিন হবে"—এই মর্মে Mayo-র আশঙ্কা গ্রাহ্য করা হয়নি।[৮৪] অনুরূপভাবে ভারত সমুদ্রের সাধারণ ও নৌ-প্রতিরক্ষার জন্য অ্যাডমিরালটিকে দেয় অযৌক্তিক একটা পরিমাণ টাকা প্রতি বছর আদায় করার বিরুদ্ধে ভারত সরকার অনেক জোরাল যুক্তি উপস্থিত করেছিল। Lawrence লিখেছিলেন "আমার ধারণা ইংল্যাণ্ড এই কর্তব্য পালন করে বাণিজ্যের সুবিধার বিনিময়ে", এবং Mayo এই আদায় ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে "ঘোর জলদস্যুতা" বলে অভিহিত করেন।[৮৫] ভারত সরকারের স্বার্থের পক্ষে বলার এই উদাহরণ ও অনুরূপভাবে আর কিছু উদাহরণকে কখনও কখনও ভারতের অভিভাবক-দের পক্ষপাতশূন্যতা ও 'মহত্বের' নিদর্শন হিসাবে তুলে ধরা হয়। তা হয়ত হতে পারে। কিন্তু যেটা মনে রাখা দরকার তা হল, এটা স্বাভাবিক যে ভারত সরকারের সদস্যারা তাঁদের সরকারের রাজস্বের উপর বাইরের দাবি কমানর

চেষ্টা করবেন (এ ক্ষেত্রে যদিও নিস্ফল ভাবে)। একেবারে একই রকম ব্যবহার করত প্রাদেশিক সরকারগুলি ও প্রশাসন বিভাগগুলি যারা কেন্দ্রীয় (অথবা সর্বোচ্চ) সরকারের তহবিল থেকে যতটা বেশি সম্ভব বরাদ্দ পাওয়ার জন্য কামড়াকামড়ি করত।[৮৬] একটি অংশের সংস্থানের উপর বৃহত্তরের বা সমগ্রের হস্তক্ষেপে শাসন-যন্ত্রের কোনও অংশের প্রতিক্রিয়ার এই ছিল সাধারণ ধরণ।

ব্যবস্থাগত এই সব প্রয়োজন, অর্থাৎ অর্থ-ব্যবস্থা টিঁকিয়েরাখার প্রয়োজন, জনগণের সতর্ক পরীক্ষার মুখে "সদুদ্দেশ্যের সুনাম" বজায় রাখার প্রয়োজন এবং নিজের সংস্থানের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ ঠেকানর প্রয়োজন, এগুলি ছাড়াও আরও নানারকম উপাদান ছিল, যৌক্তিক এবং অযৌক্তিক, যা ইংল্যাণ্ডের স্বার্থ ও ভারতে ব্রিটিশদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার সময়ে ভারত সরকারকে প্রভাবিত করত।

প্রথম দেখা যাক অযৌক্তিক উপাদানগুলিকে : এ কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের সামাজিক পেঁাছের দরুন এবং সামাজিক চাপ-সৃষ্টির ক্ষমতার দরুন ব্রিটিশ স্বার্থগোষ্ঠীগুলির পক্ষে "সহানুভূতি" পাওয়া সহজতর ছিল। তা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে একথাও সত্য যে সরকারের সর্বোচ্চ স্তরে এরকম ব্যক্তিও থাকতেন যাঁরা খানিকটা দূরে দূরে থাকতে চাইতেন, এমন ব্যক্তি যাঁরা ধরুন কলকাতার একজন ব্রিটিশ চট ব্যবসায়ী বা বোম্বাইয়ের একজন কাঁচা চামড়ার বিক্রেতার কাজকর্ম নিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে মাথা ঘামাতেন না। Mayo-র মত একজন অভিজাত ভারতে বে-সরকারি ইউরোপীয়দের অর্থাৎ বাণিজ্য ও শিল্পে নিযুক্ত ইউরোপীয়দের তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতেন, তিনি বলতেন : ওরা "এখানে আসে কালা আদমীদের কাছ থেকে যত পারে টাকা আদায় করতে।...এই শ্রেণীর লোকের প্রতি আমার কোনও সহানুভূতি নেই, আর তারাও সেকথা জানে।"[৮৭] Sir Charles Trevelyan এবং ভারতে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যেও "সক্রিয় সহানুভূতির" অনুরূপ অভাব ছিল বলে মনে করা হত। ফিনান্স মেম্বারদের মধ্যে একমাত্র Wilson-ই একটা সামান্য ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এক কালে তাঁর ব্যবসা ছিল টুপি তৈরির। তৎকালীন হাসিঠাট্টা ও রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রের মধ্যে এই রকম একটা ব্যবসা সম্পর্কে সাধারণ অশ্রদ্ধার ভাব প্রতিফলিত হত। (এই বইতে

ওই রকম দুটি ব্যঙ্গ চিত্র দেওয়া হয়েছে)। Elgin একটু বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন যে প্রথম দুজন ফিনান্স মেম্বার James Wilson ও Samuel Laing (Laing কিছু রেলপথ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন) "মধ্যবিত্ত ফাটকাবাজারী ব্যবসায়ের একটু উঁচু মহলের" লোক ছিলেন, "ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধরণের ব্রাহ্মণ" আর কি![৮৮] John Lawrence ছাড়া সমস্ত গভর্ণর জেনারেলই অভিজাত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন, আর এই শ্রেণীর প্রায় কেউই ব্যবসায়ীদের উঁচু নজরে দেখতেন না। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার তাঁরা ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্য ও প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে অন্যান্য সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের মতই ওয়াকিবহাল ছিলেন। উপরন্তু ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যারা ঢুকতেন তাঁরা ইংল্যাণ্ডের সমাজের খুব উঁচু স্তর থেকে আসতেন না, যেখানে "ফরেন সার্ভিস" ইত্যাদিতে বেশ অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাই ঢুকতেন। G. O. Trevelyan যাদের "প্রতিযোগিতা-ওয়ালা" (অর্থাৎ প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় পাশ করে সিভিল সার্ভিস অফ ইণ্ডিয়ায় ঢুকেছিলেন) বলে অভিহিত করেছিলেন তাদের অনেকেই হয়তো বাণিজ্য সম্পর্কে অভিজাত সুলভ তাচ্ছিল্যের অংশীদার ছিলেন না। সে যাই হোক এ কথা মনে হয় না যে সচিবালয়ে (Secretariat) অথবা ইণ্ডিয়া অফিসে ব্যবসার প্রতি অভিজাত-সুলভ বিরূপ মনোভাব এত বেশি ছিল যাতে করে আর পাঁচজনের মত একজন সাধারণ কর্মকর্তা সেই চোখে ব্যবসায়ীদের দেখবেন "যে চোখে একজন অবিবাহিতা বৃদ্ধা সমস্ত পুরুষকে দেখেন—যেন তাঁরা সবাই মিলে ওঁর কাছে অতর্কিত কোনও অবৈধ অনুগ্রহ আদায় করে নেবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।"[৮৯] তাছাড়া কেবল উন্নাসিকতা কোনও দিন ব্যবসায়ীদের নিবৃত্ত করতে পারে নি। এবং একথা সুবিদিত যে জাতীয় ভাবাবেগের কাছে আবেদন ("আমাদের সম্রাটের মুকুটে উজ্জ্বলতম রত্ন"…"এই বিশাল বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য" "সূর্য কখনও অস্ত যায় না"… ইত্যাদি) প্রায় যাদুর মত কাজ করেছে।

আমলাতন্ত্রের জড়তা, সরকারি যন্ত্রের মর্যাদা-মন্থর গতি, "শাসন বিভাগীয় মতের" অলঙ্ঘনীয়তা, এবং সাধারণ একজন আমলার তা থেকে এদিক-ওদিক করার অনিচ্ছা—এগুলিও ঈপ্সিত বস্তুলাভে ব্যগ্র ব্যবসায়ীদের পথে প্রতিবন্ধক হত। কেবল বিদ্রোহের মত একটি সঙ্কট ও তার সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মেয়াদ শেষ হবার মত একটি আলোড়ন সরকারকে

তার অভ্যস্ত অনড়তা থেকে বিচলিত করেছিল। ষাটের দশকে Wilson ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের দ্বারা রচিত নতুন কর্মনীতি শীঘ্রই উচ্চতম থেকে নিম্নতম স্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের পক্ষে প্রায় প্রশ্নাতীত কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্যে পরিণত হল। এই সমস্ত অনড় ধারণা, যৌথভাবে সেগুলি 'বিভাগীয় মত' বলে পরিচিত ছিল, সেগুলি একটা বিশেষ অর্থনৈতিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ঃ এ বিষয়টিতে আমরা পরে আসব।

উপরে যে সব প্রতিবন্ধকের কথা আমরা উল্লেখ করেছি সেগুলি সাপেক্ষে নিয়ামক উপাদানটি ছিল স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলি কতখানি চাপ সৃষ্টি করতে পারে তার মাত্রা। এটা নির্ভর করত, আমরা যে সব পদ্ধতির বর্ণনা দিয়েছি সেগুলি কতখানি কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হত, তার উপর ; আর সামগ্রিক আর্থিক পরিস্থিতির দ্বারা। এখানে মনে রাখা দরকার যে "ব্যয় অপেক্ষা আয় বেশি এমন সুষম বাজেট" ("Balanced budget") অথবা "ঋণ শোধের ক্ষমতার" ("Solvency") বাঞ্ছনীয়তা তৎকালে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার ছিল। স্বার্থ-গোষ্ঠীর সৃষ্ট চাপের সাফল্য আরও নির্ভর করত ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের তৎকালীন নীতি ও "বিভাগীয় মত" ইত্যাদির দ্বারা আরোপিত সীমার বাইরে সরকারকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কি হচ্ছেনা তার উপর। সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে সকল ব্রিটিশ স্বার্থ-গোষ্ঠী সমান সফল হত না। উদাহরণ স্বরূপ, বার্মায় ব্রিটিশ খাদ্যশস্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে (১৮৬৭ সালে তাঁরা খাদ্যশস্যের উপর শুল্ক কমাতে চেয়েছিলেন কিন্তু ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল), অথবা ভারত থেকে শোরা রপ্তানি ও সেই শোরা ইংল্যাণ্ড থেকে পুনরায় রপ্তানিকারকদের চেয়ে (শুল্ক কমানর জন্য তাঁদের আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৮৬০ সালে এবং ৫ বছর পরে তা আংশিক সাফল্য অর্জন করেছিল) স্বভাবতই ডাণ্ডি অথবা ম্যাঞ্চেস্টারের স্বার্থগোষ্ঠীগুলি অধিকতর প্রভাবশালী ছিল। শস্য বা শোরার কারবারে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলি ছোট ছিল, চাপ দেওয়ার ক্ষমতা তাদের সামান্যই ছিল ঃ কেবল চেম্বার অব কমার্সগুলির সমর্থনই প্রার্থিত সুবিধা আদায়ে তাদের সমর্থ করেছিল।

কাজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণকরীরা সকল ব্রিটিশ স্বার্থ-গোষ্ঠীর সম্পর্কে সমানভাবে সাড়া দিতেন না। এ কথাটার উপরও জোর দেওয়া উচিত যে সকল ব্রিটিশ চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির স্বার্থও সব সময়ে রাজস্ব সংক্রান্ত

সকল ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুরূপ ছিল না। সাধারণ সমর্থন লাভের জন্য প্রত্যেক গোষ্ঠীই তার নিজস্ব আংশিক স্বার্থকে "জাতীয় স্বার্থ" বলে উপস্থিত করত। কিন্তু এই ধরনের দাবিকে গুরুত্ব দেওয়া অথবা স্বার্থের সম্পূর্ণ সমপ্রকৃতি থাকবে এ কথা ধরে নেওয়া অন্তত স্বল্প মেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অসম্ভব। একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন নিম্নোক্ত উদাহরণগুলি বিচার করা যায়: যেমন ডাণ্ডির চট উৎপাদকদের (যারা চট উৎপাদকদের উপর আমদানি শুল্ক রদ দাবি করেছিল ও তা আদায় করেছিল) বনাম বাংলার ব্রিটিশ চটকল মালিকদের কথা; ম্যাঞ্চেস্টারের তুলাজাত দ্রব্য উৎপাদক বনাম সুতোকলের যন্ত্রপাতির ব্রিটিশ রপ্তানিকারকদের কথা; অথবা প্রশাসনে ছাঁটাই করার জন্য বিটিশ ব্যবসায়ীদের দাবি (যাতে করভার লাঘব হয়) বনাম ছাঁটাই সম্পর্কে আমলাতন্ত্রের বিরোধিতার কথা। পরের পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা দেখতে পাব যে এই উল্টোপাল্টা চাপ, বিভিন্ন স্বার্থের মধ্যে সহযোগ ও পুনর্মিলন এবং জনমত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের প্রভাবিত করার জন্য প্রতিযোগী অভিযান এক অত্যন্ত জটিল চিত্র উপস্থিত করে।

যাঁরা ধরে নেন যে স্বার্থগুলি সম্পূর্ণ সমপ্রকৃতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্ভাব্য অযৌক্তিক উপাদানগুলিকে যাঁরা যথাযথ গুরুত্ব দিতে ব্যর্থ হন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের উপর আরোপিত বাধাগুলিকে যাঁরা খাটো করে দেখেন তাঁদের মধ্যে এই জটিলতা অগ্রাহ্য করার ঝোঁক দেখা যায়।

আমরা দেখিয়েছি যে: (ক) রাষ্ট্রীয় অর্থ-ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রশ্নে নীতি নির্দ্ধারণ অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় বহু স্বার্থ-গোষ্ঠী অংশগ্রহণ করত, প্রত্যেকেই চেষ্টা করত নিজের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল সিদ্ধান্ত পেতে (যথা বিনিয়োগকারীরা চেষ্টা করতেন রাষ্ট্র যাতে তাঁদের সুদের গ্যারান্টি দেয়, ব্যবসায়ীরা চেষ্টা করতেন রাস্তা, বন্দর এবং ব্যবসায়ের সাধারণ অর্থনৈতিক বুনিয়াদ-গড়ার জিনিসের দরুন স্থায়ী খরচের সঙ্গে জড়িত ব্যবস্থাবলী (Economic overheads) উন্নত করতে, বাগিচা ও খনি মালিকরা চেষ্টা করতেন তাদের স্বার্থে অনুকূল ভূমি সংক্রান্ত নিয়মকানুন পাশ করাতে, শহুরে বৃত্তিজীবী লোকেরা চেষ্টা করতেন রাষ্ট্রীয় অনুদান-প্রাপ্ত শিক্ষা চালু করাতে, ব্যবসায়ীরা ও ভূস্বামীরা চেষ্টা করতেন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কাছে পৌঁছানটা যাতে প্রতিষ্ঠানগতভাবে স্বীকৃত হয়, অর্থাৎ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ইত্যাদিতে যাতে প্রতিনিধিত্ব থাকে)। অথবা স্বার্থ গোষ্ঠীগুলি সচেষ্ট

থাকত যে সিদ্ধান্তগুলি নিজেদের পক্ষে যাতে যথাসম্ভব কম প্রতিকূল হয় (যথা, ভূস্বামীরা চেষ্টা করেছিলেন কৃষি আয়ের উপর কর কমানর, ব্যবসায়ীরা লাইসেন্স করের মত ব্যবসায় কর কমানর, আমদানি ও রপ্তানি-কারকরা শুল্ক কমানর এবং সাধারণ করদাতারা রাষ্ট্রীয় ব্যয় কমানর)।

(খ) চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ ও সরকারি নীতি নির্দ্ধারক বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রক্রিয়াটির ফলাফল প্রভাবিত হত বিভিন্ন রকম প্রতিযোগী সহযোগী, ও বিরোধী গোষ্ঠীর চাপ ও পাল্টা-চাপের দ্বারা, প্রত্যেক চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও সরকারের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্কের বাইরেকার কতকগুলি প্রতিবন্ধকের দ্বারা এবং অযৌক্তিক উপাদান যথা সামাজিক উন্নাসিকতা, অথবা কিছু অনড় ধারণা ও সেই সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দেরও দ্বারা। (গ) কাজেই এই প্রক্রিয়ার ফলাফল আগে থেকে একেবারে ঠিক মত বলা যেত না, তবে এমন. সব ঝোঁক ছিল যার দরুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার এক ধরনের ফলাফলের চেয়ে আর এক ধরণের ফলাফলের সম্ভাব্যতা বেশি হত: ব্রিটিশ স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলি (যারা অধিকতর সুবিধাভোগী ছিল, যথা ইণ্ডিয়া অফিস ও পার্লামেন্টের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের রাস্তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভারপ্রাপ্তগণ সমাজের আয়ত্বাধীন কিনা, এবং সমাজের চাপ তাদের উপর সৃষ্টি করা সম্ভব কিনা, লবি করার কলা-কৌশল রপ্ত থাকা, এবং গোষ্ঠীর ভিতরে ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে যাদের সুযোগ-সুবিধা বেশি ছিল) নিজেদের পক্ষে অনুকূল সিদ্ধান্ত পাবার সম্ভাবনা তাদের অনেক বেশি ছিল। উপরোক্ত বিবৃতিটি কিঞ্চিৎ জবড়জ হয়ে গেল, কিন্তু খেলাটা ছিল রীতিমত সুচারু ও সূক্ষ্ম।

একটা অনুমিত ছক বাঁধা নীতি থেকে শুরু করাটা এবং বাজেট বক্তৃতা, নৈতিক ও বৈষয়িক অগ্রগতি রিপোর্ট (Moral and Material Progress Report) এবং পার্লামেন্টে বাৎসরিক অর্থ-বিষয়ক পর্যালোচনা ইত্যাদিতে প্রকাশিত কর্মনীতি সংক্রান্ত বিবৃতিগুলির ভিত্তিতে "কর্মনীতির" একটা ছবি খাড়া করাটা হয়তো আমাদের পক্ষে সরলতর ও সম্ভবত সহজতর পন্থা হত। কিন্তু ঐ পন্থা এবং ইপ্সিত কার্যধারা ও বাস্তবে অনুসৃত কার্যধারা উভয়ের জন্যই "কর্মনীতি" কথাটার ব্যবহার একটি পার্থক্যকে অস্পষ্ট করে তোলে—সেটাহল "কর্মনীতি সংক্রান্ত ধারণা" এবং "কার্যে অনুসৃত কর্মনীতি"র মধ্যে পার্থক্য। অনুসৃত কর্মনীতিকে তবেই কেবল ধরা যায় যদি প্রথমেই

একটা ছক থেকে এগোনোর বদলে আমরা বাস্তবে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কৃত-কাজগুলির টুকরো সাজিয়ে প্যাটার্ণটা আবার তৈরী করি, যদি সংশ্লিষ্ট পটভূমিকা থেকে সিদ্ধান্তগুলি কি করে এল তা লক্ষ্য করি, যে প্রক্রিয়ায় পর-পর কতকগুলি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অর্থাৎ কর্মনীতি রূপ পরিগ্রহ করে, সেই প্রক্রিয়াকে অপরাপর যাঁরা প্রভাবিত করেন তাঁদের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের পারস্পরিক ক্রিয়ার একঘেঁয়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিবরণ বলে প্রথম দৃষ্টিতে যাকে মনে হয় তার প্রতি নজর দিই। যাঁরা কেবল কর্মনীতিগত ভাবধারার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন একথাটা প্রায়ই তাঁদের নজর এড়িয়ে যায় যে স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলিও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সঙ্গে সঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য যে কর্মনীতির ধারাবাহিকতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের প্রতি-ক্রিয়ার মধ্যে একটা প্যাটার্ন চালু থাকাকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যাবে না যদি না আমরা কর্মনীতি কি হওয়া উচিত সে বিষয়ে তাঁদের ধারণা, তাঁদের অভ্যস্ত "রাজনৈতিক অর্থনীতি" তাঁদের চিন্তাশৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামগ্রিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শকে বিচার না করি। সাম্রাজ্যঘটিত মতাদর্শের সেই অংশের মধ্যে আমরা নিজেদের সীমিত রাখব অর্থ-বিষয়ক কর্মনীতি গঠনের সঙ্গে যা সরাসরি প্রাসঙ্গিক।

ভারতে অনুসৃত অর্থ-বিষয়ক নীতিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছিলেন যে সব অর্থনীতিবিদ তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন ভারতের প্রথম ফিনান্স মেম্বার James Wilson। লণ্ডনের 'The Economist' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবেই এখন তাঁকে সুখ্যাত মনে রাখা হয়। কয়েকটি অর্থ-নৈতিক পুস্তিকার রচয়িতা হিসাবে তাঁর কিঞ্চিৎ খ্যাতি ছিল। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অন্যতম Karl Marx তাঁকে "উচ্চ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন একজন অর্থনৈতিক মান্দারিন" বলে বর্ণিত করার ভিতর দিয়ে তাঁর মর্যাদার সঠিক মূল্যায়ন করেছিলেন।[৯০] আধুনিক অথনীতিবিদ যারা তাঁর রচনার মূল্যায়ন করেছেন, যথা Schumpeter ও Cairncross—তাঁরা Wilson-এর অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে বিশেষ মৌলিকতা কিছু দেখতে পান নি।[৯১] অর্থনীতির বিজ্ঞানে তাঁর অবদান সামান্য, কিন্তু তাঁর জামাই Walter Bagehot-এর ভাষায় তিনি ছিলেন একজন "বিরাট বিশ্বাস-উৎপাদক," ("Great belief-producer") অর্থাৎ চমৎকারভাবে জনপ্রিয় করে তুলতে পারতেন (Brilliant populariser)।[৯২] এই গুণের সঙ্গে

"রাজনৈতিক অর্থনীতির বিজ্ঞানের ব্যবহারিক মূল্যের" উপর তাঁর দখল তাঁকে বহু অপরিচিত তত্ত্ববিদকে ম্লান করে দিতে সমর্থ করেছিল। (উদাহরণ স্বরূপ এই রকম একজন বিস্মৃত তত্ত্ববিদ ছিলেন Edward West। Wilson-এর মত তিনিও ভারতে এসেছিলেন এবং অকালে মারা গিয়েছিলেন মুনাফার হারের ক্রমক্ষীয়মানতার তত্ত্বে (falling rate of profit) ও খাজনা তত্ত্বে (Rent theory) তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান করেছিলেন। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি (Law of diminishing returns) রচনায় তিনি Ricardo-এর পূর্বসূরী ছিলেন—Ricardo সেকথা স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু বোম্বাইতে রেকর্ডার ও প্রধান বিচারপতি হিসাবে কাজ করার জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে চলে আসার পর আর তিনি অর্থনৈতিক অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে পারেন নি।[১৩]

ইংল্যাণ্ডের সমসাময়িক অর্থনৈতিক চিন্তার সঙ্গে পরিচিত ছাড়াও Wilson পার্লামেণ্টের সদস্য, ট্রেজারির অর্থবিষয়ক সেক্রেটারি এবং বানিজ্য বোর্ডের সহ-সভাপতি থাকার দারুন রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। ভারতে ফিনান্স মেম্বার হিসাবে Wilson বড় ধরণের প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন প্রবর্তিত করতে চেয়েছিলেন এবং তিনি "ভারতের অর্থবিষয়ক প্রশাসনে অর্থনৈতিক নীতিসমূহের প্রভাবকে স্থায়িত্ব দেবার আশা" পোষণ করতেন।[১৪] অর্থ-বিষয়ক দফতরে Wilson-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ Sir Richard Temple Wilson-এর অর্থ-বিষয়ক ব্যবস্থাবলী সংক্ষেপে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করেছিলেন: "তিনি সর্বপ্রথম ভারতে ইংরাজি ধাঁচে তৈরি অর্থ-বিষয়ক বাজেট প্রবর্তিত করেছিলেন—জনমানসকে নতুন আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপিত করেছিলেন—সামরিক ও রাজনৈতিক একটা প্রচণ্ড আন্দোলনে ছিন্নভিন্ন অর্থ ব্যবস্থাকে একত্র করেছিলেন—লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কাছে তিনটি নতুন করের প্রস্তাব করেছিলেন এবং এর মধ্যে অন্যতম কর অর্থাৎ আয়করকে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কয়েক ধাপ পার করিয়ে নিয়েছিলেন, কাগজী অর্থের (Paper Currency) একটা পরিকল্পনা করেছিলেন—ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয় সশস্ত্র ফৌজের জন্য সেনাবাহিনীর গোটা ব্যয়ের উপর সামরিক ফিনান্স কমিশন ক্রিয়াকলাপ শুরু করেছিলেন—বে-সামরিক ব্যয়ের বহুবিধ শাখার ক্রিয়াকলাপের পুনঃপরীক্ষার জন্য একটি কমিশন বসাতে পেরেছিলেন—হিসাব পরীক্ষা ও হিসাব রাখার

তৎকালীন ব্যবস্থার পুনঃপরীক্ষা করেছিলেন—তাছাড়া অর্থ বিষয়ক মন্ত্রী এবং সাধারণভাবে সরকারের অন্যতম সদস্য হিসাবে যে সব নানা ধরনের দায়িত্ব বর্তাত সে সব তো তাঁকে করতেই হত।[৯৫] Temple জোর দিয়েছিলেন প্রধানত প্রশাসনিক উদ্ভাবনগুলির উপর। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে যথাযোগ্য স্থানে এগুলি আলোচনা করেছি (এক মুদ্রানীতি ছাড়া- সেটা আমাদের আলোচ্য রচনার চৌহদ্দীর বাইরে)। এই সব প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তনের চেয়ে বোধহয় কর্মনীতিকে Wilson যেভাবে মোড় ঘুরিয়েছিলেন তা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

অর্থনৈতিক উদারনীতিবাদের কর্মনীতিসমূহের যে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা ব্রিটেনের হয়েছিল তা থেকে Wilson তাঁর কর্মনীতির নির্দেশক ধারাগুলিকে টেনেছিলেন। ১৮৬০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারিতে প্রদত্ত তাঁর বাজেট ভাষণ যাতে তিনি সর্বপ্রথম ভারতীয় অর্থ-বিষয়ক কর্মনীতিকে একটা অখণ্ড সমগ্র হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন সেটি বহুল পরিমানে ১৮৫৩ সালে প্রদত্ত Gladstone-এর বিখ্যাত বাজেট ভাষণের মত ছিল। বস্তুত Wilson-এর সমালোচকেরা মনে করতেন যে অর্থ-ব্যবস্থা সম্পর্কে সমসাময়িক ব্রিটিশ নীতিসমূহ প্রয়োগের ঝোঁক তাঁর এত বেশি ছিল যে তা একটা দোষের পর্যায়ে দাঁড়াত। উদাহরণ স্বরূপ Trevelyan-এর কাছে ওটা যে "নিতান্তই একটি Gladstone সুলভ বাজেট" সেটাই ছিল ওর প্রধান ত্রুটি ঃ Wilson-এর প্রত্যক্ষ সহকর্মীদের কাছে এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের কাছে আবার সেটাই ছিল প্রধান আকর্ষন।[৯৬] Schumpeter উল্লেখ করেছিলেন যে সমকালীন ইংল্যাণ্ডে অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে Gladstone-এর নীতিগুলি ছিল প্রায় তর্কাতীত স্বতঃসিদ্ধ সত্য।[৯৭] Wilson-এর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কেউ কেউ বিভিন্ন বিষয়ে সরাসরি Gladstone-এর উপদেশ নিতেন।[৯৮] তবে তেমন সরাসরি পরামর্শ ঘন ঘন আসত না। Wilson-ই ছিলেন Gladstone-এর নামের সঙ্গে সংযুক্ত রাষ্ট্রীয় অর্থ-ব্যবস্থার নীতিগুলিকে ভারতে প্রবর্তনের প্রধান উদ্যোক্তা। অন্যতম প্রধান নীতি ছিল এই যে সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি "সুষম বাজেট" রচনা করার, অর্থাৎ আয় যাতে ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয়। Wilson-এর এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত তাঁর উত্তরাধিকারী হিসাবে যাঁরা এসেছিলেন এই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু উদ্বৃত্তকে সরকারি ঋণ পরিশোধের জন্য নিয়োজিত

করা উচিৎ—Gladstone-এর এই নীতিকে সুসঙ্গতভাবে অনুসরণ করা হয় নি।

"করধার্য কেবল রাজস্ব আদায়ের জন্য" এই বাক্যটির মধ্যে রয়েছে আর একটি অবিচল বিশ্বাসের বস্তু। এর অর্থ হল রাজস্ব এমনভাবে আদায় করতে হবে যাতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের দ্বারা সবচেয়ে কম হস্তক্ষেপ হয়ঃ কোনও কর যদি না থাকত তা হলে অর্থনীতির গতি প্রকৃতি যে রকম হত করধার্যের দ্বারা তার কোনও বিচ্যুতি অথবা পরিবর্ত্তন করা চলবে না। এই নীতির দুটি অনুসিদ্ধান্ত ভারতীয় নীতি-রচয়িতাদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ছিলঃ শুল্ক ধার্যের মারফৎ দেশীয় শিল্পকে কোনও সংরক্ষণ (Protection) দেওয়া চলবে না এবং প্রত্যক্ষ করের ব্যাপারে কোনও ক্রমবর্ধমান হারের (Progression) কর চলবে না। ভারত সরকার যখন ঘোষণা করেছিল "রাজস্ব-সংক্রান্ত উদ্দেশ্য ছাড়া অপর কোনও উদ্দেশ্যে ভারতে আমদানি শুল্ক বসান হয় না "তখন তারা কি বলতে চেয়েছিলেন তা এক নজরে স্পষ্ট না হতে পারে।[৯৯] Wilson-এর উত্তরাধিকারী Laing অর্থটি পরিষ্কার করে তুলে ধরলেন, তিনি বললেনঃ "অবাধ বাণিজ্যের নীতি হল করধার্য করা কেবল রাজস্ব আদায়ের জন্য" এবং শুল্কের দ্বারা "সংরক্ষিত (Protected) স্বার্থের বিকাশকে উদ্দীপিত করা" চলবে না।[১০০] ক্রমবর্ধমান হারে করকে অর্থনৈতিক উদারনীতিবাদের মৌলিক নীতির উপর আঘাত হিসাবে দৃঢ় ভাবে বর্জন করা হত। একদল দরখাস্তকারী যাঁরা আয়করের "ক্রমানুপাতিক হার" চেয়েছিলেন, তাঁদের জবাবে Wilson বলেছিলেন করধার্যের লক্ষ্য মোটেও "মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা" নয়।[১০১]

শেষত, রাষ্ট্রীয় কর্মনীতির দিক থেকে বিচার করলে এই সব নীতির মধ্যে নিহিত অবাধ নীতির (Laissez faire) অর্থ ছিল রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে একটা সঙ্কীর্ণ ধারণা, আর অর্থ-বিষয়ক ব্যবস্থাপনার দিক থেকে বিচার করলে এর অর্থ ছিল রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে একেবারে যা না হলেই নয় এমন সর্বনিম্ন স্তরে নামান। কতকগুলি কর্মনীতি সংক্রান্ত ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত নিষ্ক্রিয়তার কৈফিয়ৎ হিসাবে যদিও অবাধনীতির কথা তোলা হত, কিন্তু এ নীতি কখনও ব্যবহারিক কর্মনীতির পথ-নির্দেশক হিসাবে কাজ করেনি। আমরা দেখিয়েছি (প্রথম পরিচ্ছেদে) যে বাস্তবে যে কর্মনীতি অনুসৃত হত তাকে অবাধ নীতির চেয়ে বৈষম্যমূলক হস্তক্ষেপের নীতি বললেই বোধহয় আরও সঠিক বর্ণনা হয়।

অর্থনৈতিক উদারনীতিবাদের দর্শন এবং Gladstone-এর নামের সঙ্গে সংযুক্ত অর্থ-ব্যবস্থা সংক্রান্ত নীতি সমূহ থেকে নিৰ্গত এই সব 'সাধারণ' ধারণা ছাড়াও আর কিছু ছিল যাকে বলা যায় ভারতের জন্য 'বিশেষ তত্ত্ব'। সমসাময়িক প্রথাসিদ্ধ জ্ঞানের মূর্ত প্রকাশ স্বরূপ শব্দগুলিকে (সুষম বাজেট, অবাধ নীতি, কেবল রাজস্বের জন্য করধার্য, ইত্যাদি···) কর্তব্যমাফিক পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেও নীতি-রাচয়িতারা ভারত সাম্রাজ্যে সরকারের যে সব বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে হত সে সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। প্রথমত, নিরাপত্তার প্রয়োজন : ঘনঘন তরবারির ব্যবহার ছাড়াই প্রজাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের বশ্যতা এবং একটা সংখ্যালঘু অংশের সহযোগিতা যদি যোগাড় করাও যেত তবু সৈন্যবাহিনীই ছিল ব্রিটিশ আধিপত্যের চরম ভিত্তি। সামরিক খাতে ব্যয় সংকোচ এমন একটা আদর্শ যা ইংল্যাণ্ডে অনুসরণ করা চলত, কিন্তু ব্যয়কুণ্ঠ কর্মনীতি অনুসরণ করে সেনাবাহিনীকে দুর্বল করা ভারতবর্ষে ইংরাজের পক্ষে একটা মূর্খতা হত। বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা থেকে ভারতে একটা বৃহৎ ইউরোপীয় সেনাবাহিনী মোতায়েন রাখার প্রয়োজনটা আবার বেশি করে ভেসে উঠেছিল। এই রকম একটা সেনা-বাহিনী যাকে ভারতের বাইরের জন্যও সংরক্ষিত ফৌজ (Reserve force) হিসাবে নিয়োগ করা যাবে, তার ব্যয়ভার ভারতীয় করদাতাদের উপর চাপান যেত। প্রয়োজন হলে এ রকম নিয়োগের জন্য দেশীয় ফৌজকেও পাওয়া যেত। এই রকম একটা ব্যবস্থার বিরাট রাজনৈতিক সুবিধা ছিল। এর ভিতর দিয়ে এশিয়া ও আফ্রিকায় ইংল্যাণ্ডের শত্রুদেরও ভয় দেখান যেত, অপর দিকে ইংল্যাণ্ডের করদাতাদেরও অনেকটা রেহাই দিতে পারা যেত। (তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১১০-১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)। আর্থিক ঘাটতি কমানর জন্য Mayo যখন সামরিক ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেক্রেটারি অব স্টেট তখন এই ব্যবস্থার এই বিশেষ চরিত্রটিরই উল্লেখ করেছিলেন : সামরিক ব্যয়ের পরিমান "এই মুহূর্তের ভারতীয় চাহিদার নিরিখেই কেবল নির্ধারিত হতে পারে না।"[১০২] ষাটের দশকের প্রথমভাগে প্রখ্যাত ইংরেজ র‍্যাডিকাল রাজনীতিবিদ Joseph (Retrenchment) Hume-এর ভাইপো Col. Hume-এর নেতৃত্বে পরিচালিত সামরিক ফিনান্স কমিশন ব্যাপক ছাঁটাই করেছিল—কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত ভারতে দেশীয় ফৌজের সংখ্যা কমান যাতে তাদের ও ভারতে মোতায়েন ব্রিটিশ ফৌজের মধ্যে একটা

নিরাপদ অনুপাত বজায় রাখা যায়।[১০৩]

দ্বিতীয়ত, একথাও অনুভূত হয়েছিল যে ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি বা কোনও ধরনের অনুদানের মারফৎ ভারতে মূলধন বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। "রাষ্ট্রীয় ঝুঁকিতে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠান" বলে যাকে অভিহিত করা হয় তার সবচাইতে সুবিদিত উদাহরণ ছিল বিনিয়োগকারীদের সুদের গ্যারান্টিওয়ালা চুক্তির ভিত্তিতে ভারতীয় রেলপথ নির্মান। এই বিনিয়োগকারীরা প্রায় সবাই ব্রিটিশ ছিলেন ঃ অংশীদারদের (Share holder) মোট সংখ্যা—১৮৭০ সালে যা ছিল (৫১,৮৯০) তার মধ্যে মাত্র প্রায় ০·৬ শতাংশ ছিলেন ভারতীয়, আর তাঁদের হাতে মোট বিনিয়োগের মাত্র ১ শতাংশের সামান্য একটু বেশি ছিল।[১০৪] এই ব্যবস্থা সম্বন্ধে অন্যত্র যে সব কথা বলা হয়েছে (তৃতীয় পরিচ্ছেদে) তা এখানে পুনরাবৃত্তি করার আমাদের দরকার নেই। রেলপথের বিকাশের ব্যাপারে সরকারের অভিজ্ঞতা তাকে অপরাপর ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করে তুলেছিল। ৫ শতাংশ সুদের সরকারি গ্যারান্টি সহ ১০ লক্ষ পাউণ্ড মূলধন-ওয়ালা একটি সেচ কোম্পানি মাদ্রাজে গঠিত হয়েছিল, সেটি ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। সেটি এমন সময়ে গঠিত হয়েছিল যখন ম্যাঞ্চেষ্টার কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন ভারতে তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পূর্তকর্মের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে "ইংলণ্ডের উদ্বৃত্ত পুঁজি ও স্বাধীন ব্যবসাকে" সুযোগ দেবার জন্য সরকারের উপর চাপ দিচ্ছিল।[১০৫] ১৮৭০ সাল নাগাদ গ্যারান্টি দেওয়া সুদের ব্যবস্থা থেকে সরকার সরে যাচ্ছিল। ১৮৬০ এর দশকের প্রথমভাগে "নিজের বৈধ কাজকর্মের সীমা না ছাড়িয়ে ব্যবসায়ীকে চটপট সাহায্য" করতে সরকার উৎসুক ছিল।[১০৬] এই দশকের শেষে গ্যারান্টি দেওয়া সুদের ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন থেকেও সরকার জোর দিয়ে বলেছিল যে "ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের পথিকৃৎ হিসাবে কাজ করাটা সরকারের পক্ষে প্রায়ই কর্তব্য হতে পারে।"[১০৭] অবশ্য কেবল চা শিল্পের ক্ষেত্রেই সরকার এই ভূমিকা নিয়েছিল ঃ প্রাথমিক বিনিয়োগ ও শিল্পোদ্যোগীর ঝুঁকির (Enterpreneurial risk) অনেকটাই ছিল রাষ্ট্রের, ব্রিটিশ চা-বাগিচা মালিকরা তখনই হাতে নিতেন যখন ব্যাপারটা নিরাপদ হয়ে উঠত।[১০৮] বিদ্রোহের আগেকার কালে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে এই একই ধরণের কিছু বিচ্ছিন্ন ও নিস্ফল চেষ্টা হয়ে-

ছিল।[১০৯] মোটের উপর সরকারের ঝোঁকটা ছিল শিল্পোদ্যোগীর ভূমিকা নেবার বদলে বরং অপ্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায়ীকে সাহায্য করার।

এই অপ্রত্যক্ষ সাহায্যটা ছিল যে সব জিনিস ব্যবসায়ের সাধারণ অর্থ-নৈতিক বনিয়াদ গড়ে, যথা রাস্তাঘাট, যানবাহন প্রভৃতি তৈরির স্থায়ী খরচের (Economic overheads-এর পর থেকে স্থায়ী খরচ বলে উল্লেখিত) মারফৎ। J. S. Mill অনগ্রসর অর্থনীতিতে সরকারের এই ভূমিকার উপর জোর দিতেন।[১১০] James Wilson মনে করতেন ভারত সরকারের সর্ব-প্রধান কর্তব্য হল "তুলো, পাট, শন প্রভৃতির তন্তু, পশম ও ইউরোপের কাঁচামালের বর্ধিত উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পূর্ত কর্ম ও রাস্তার" ব্যবস্থা করা।[১১১] ষাটের দশকের গোড়ার দিকে জোরটা ছিল "তুলো রপ্তানির পথের" উপর। রেলপথ কোম্পানির পত্তনকারীরাও তুলো উৎপাদক জেলাগুলিতে রেলপথ পৌঁছানর গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। কোর্ট অব ডাইরেক্টরস ও সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে প্রেরিত স্মারকলিপিতে কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন কাঁচামাল রপ্তানির সুবিধার জন্য পূর্তকর্ম, রাস্তা, বন্দর প্রভৃতির বর্ধিত বিনিয়োগের দাবি করেছিলেন।[১১২] আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়কার "তুলোর দুর্ভিক্ষ" এই সব জরুরী বিষয়ের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। ম্যাঞ্চেস্টার সঙ্কট যখন তুঙ্গে যখন ইণ্ডিয়া অফিস ভারত সরকারকে এই বলে জোর তাগাদা দিচ্ছিল যে "দেশের বাণিজ্যিক শিল্পকে সাহায্য করার জন্য সেচ, তুলো রপ্তানির রাস্তা ও অপরাপর কাজে আপনাদের ব্যয় বিনিয়োগের পূর্ণ মূল্য যাতে উশুল করা যায় সেই বিষয়ে সতর্কতার প্রয়োজনের আর কোনও বিবেচনা দ্বারাই এই ব্যয় সীমিত হওয়া উচিত নয়।"[১১৩] তুলোর প্রধান সরবরাহকারী বম্বে প্রেসিডেন্সি ১৮৬৩-৬৬ সালে পূর্তকর্মে মোট সাধারণ বিনিয়োগের প্রায় ২৪ শতাংশ পেয়েছিল, যেখানে বাংলা প্রেসিডেন্সি পেয়েছিল ১৭ শতাংশ ও মাদ্রাজ পেয়েছিল ১৩'৯ শতাংশ। ১৮৬৩-৭২ সালের মধ্যে বোম্বাইতে সাধারণ পূর্তকর্মের গড় ব্যয় ছিল প্রতি বর্গমাইলে ৭৯ টাকা; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে, বাংলায় ও মাদ্রাজে এই অঙ্ক ছিল বর্গমাইলে যথাক্রমে ৭৯ টাকা, ৩৪ টাকা ও ৪৫ টাকা।[১১৪] ১৮৬৫ সালে আমেরিকা থেকে তুলো সরবরাহ আবার শুরু হওয়া এবং উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা বোম্বাইয়ের প্রতি বিশেষ অনুকূল্যের এবং সেচ ব্যবস্থার চেয়ে রেলপথের সঙ্গে সংযোগসাধক পথ

নির্মানকে অগ্রাধিকার দেবার কর্মনীতিকে সংশোধিত করল। কিন্তু সেচ ইত্যাদি স্থায়ী বিনিয়োগে সরকারি ব্যায়ের একটা প্রধান প্রতিবন্ধক রয়ে গেল ঃ সে হল অ-লাভজনক কাজে, অর্থাৎ যে সব কাজে পূর্তকর্ম সংক্রান্ত নির্মাণের জন্য ব্যয়িত মূলধনের সুদের খরচ যোগানর মত যথেষ্ট রাজস্ব ওঠে না, সেগুলিকে মদৎ দেওয়ায় ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের অনিচ্ছা। (তৃতীয় পরিচ্ছেদে ১২৭-২১ পৃষ্ঠা)

চতুর্থত, একথা মনে করা হত যে ভারত যাতে কাঁচামাল সরবরাহের বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে তার জন্য সরকারের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত। "কাঁচামাল রপ্তানিকে উৎসাহিত করা আমাদের আভ্যন্তরীণ সম্পদ উন্নত করার শ্রেষ্ঠ উপায়" (Wilson), "কৃষিই তার প্রধান শিল্প হওয়া উচিত (Trevelyan), এবং যে সমস্ত প্রধান কাঁচামাল উৎপাদনে এ দেশের বিশেষ সুবিধা আছে সেইগুলির সঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যের (ইউরোপ থেকে) বিনিময়" (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স)—এই ছিল উপনিবেশ ও শিল্প সমৃদ্ধ ইংলণ্ডের মধ্যে আদর্শ শ্রমবিভাগ।[১১৫] তুলো, পাট, শন, পশম, চামড়া, কাঠ ইত্যাদিকে এবং সেই সঙ্গে ইউরোপীয় মালিকানাধীন বাগিচাগুলির উৎপন্ন, অর্থাৎ চা ও কফিকে রপ্তানি শুল্ক থেকে মুক্ত রাখার নীতি Wilson নির্দ্দিষ্ট করে গিয়েছিলেন। (২১০ পৃষ্ঠা ও পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে দেখুন)। ভারতের অর্থনৈতিক ভূমিকা হল কাঁচামাল সরবরাহ করা এই নীতির অন্যতম অনুসিদ্ধান্ত এই ছিল যে কাঁচামাল যোগানের জন্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি ধরনের মূলধনী পন্যের (Capital goods) অবাধ আমদানি হওয়া উচিত। ১৮৪৫ সালের পর থেকে জাহাজের হাল তৈরির জন্য প্লেট-লোহা, কৃষির (প্রধানত বাগিচার) জন্য যন্ত্রপাতি, খনির ও রেলপথের সাজ সরঞ্জাম ১৮৪৫ সাল থেকে বিনা শুল্কে আমদানি হত। (২১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)। এটুকুও ম্যাঞ্চেস্টারের সন্দেহের উদ্রেক করেছিল ঃ "ভারত যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের উৎসাহ নিয়ে অন্যায় করছে, তাদের স্বাভাবিক ব্যবসা হল কাঁচামালের উৎপাদন।"[১১৬] ভারতের ভূমিকা হল ব্রিটেনে কাঁচামাল সরবরাহ এই নীতির দ্বিতীয় অনুসিদ্ধান্তটি যোগ করলেন কেউ কেউ, তা হল ব্রিটেনের উচিত ভারতকে "উপনিবেশে" পরিণত করা। Wakefield-এর 'Arts of Colonisation' বইতে (১৮৪৯) তিনি ব্রিটেন থেকে উত্তর আমেরীকায় ও অস্ট্রেলেশিয়ায় মূলধন ও শ্রমিক রপ্তানি করে

এই সব জায়গার "উৎপাদক ক্ষমতা" বৃদ্ধির বিপুল সম্ভবনার দিকে নজর আকর্ষণ করেছিলেন। Edward West এই ধারায় ভারতের ঔপনিবেশিকী-করণের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর পুস্তিকার শিরোনামাই তাঁর কর্মসূচীর সার উপস্থিত করে, এই শিরোনামা হল : ব্রিটিশভারতে প্রবাস যাত্রা : জয়েন্টস্টক কোম্পানিগুলির পক্ষে এবং যে সব প্রবাসীর হাতে মূলধন আছে তাঁদের পক্ষে লাভজনক বিনিয়োগ : উদ্যোগী ও বুদ্ধিমান লোকের কর্মসংস্থান : তুলো, রেশম, চিনি, চাল, তামাক, নীল এবং গ্রীষ্মমণ্ডলের অপরাপর উৎপন্নের প্রচুর সরবরাহ : শিল্পজাত দ্রব্যের বর্ধিত চাহিদা···(১৮৫৭)। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে এই "ঔপনিবেশিকী-করণের" ধারণার কিছু উৎসাহী প্রবক্তা ছিলেন, আর পতিত জমি নিষ্কর প্রজাসত্ত্ব হিসাবে যাতে বিলি হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ভূমি সংক্রান্ত আইন-কানুন পরিবর্তনের জন্য বাগিচা-মালিকদের দাবিতে এই ধারণা আরও মদৎ যুগিয়েছিল। অনেক ইউরোপীয় আসবেন ও "স্থায়ীভাবে বসবাস" করবেন এ রকম প্রত্যাশা যদি থেকে থাকে তবে তা অলীক প্রমাণিত হয়েছিল। West তাঁর স্বদেশবাসীকে দিয়ে যে দেশে উপনিবেশ বসাতে চেয়েছিলেন সে দেশের সঙ্গে তিনি যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন না। উপরন্তু Wakefield-এর পরিকল্পনার সমালোচনায় Merivale উল্লেখ করেছিলেন যে উপনিবেশ গড়ে তোলাটাই শেষ কথা নয়, এবং প্রবাসযাত্রা ও বিনিয়োগকে কৃত্রিমভাবে সাহায্য করার চেয়ে লাভ-ক্ষতির প্রশ্নটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।[১১৭]

সাম্রাজ্যের মধ্যে পরিপূরক বিকাশের (complementarity) নয়া-বাণিজ্যবাদী (Neo-mercantilist) ধারণা থাকার দরুন এবং কাঁচামালের উৎপাদনে ভারতের তুলনামূলক সুবিধার উপর জোর থাকার দরুন ভারতের শিল্পোৎপাদন সম্ভাবনা সম্বন্ধে অতিরিক্ত মাথাব্যথা আশা করা যেত না। প্রচলিত-শিল্পগুলির কি হল ? "শিল্প-বিনাশ" (De-industrialization) সমস্যাটি মাঝে মাঝেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠত। এটা যে গোটাটাই রূপ-কথার ব্যাপার নয় সে ধারনা হয়েছিল একমাত্র ফিনান্স মেম্বারের যিনি একটা দেশজ শিল্প সম্বন্ধে তদন্ত করছিলেন। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের অনুরোধে এ তদন্তের হুকুম দিয়েছিলেন Trevelyan। ১৮৬২-৬৪ সালে ম্যাঞ্চেস্টারের খুচরো মালের চাহিদা সাময়িকভাবে হ্রাস পায়। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে ইংল্যাণ্ডের কাপড়ের মূল্য সামান্য বৃদ্ধি,

সুতি কাপড়ের বদলে শনজাত ও পশমি কাপড়ের প্রবর্তন, "ব্যবহারযোগ্য মূলধন তুলো রপ্তানির অধিকতর লাভজনক ফাটকায় চলে যাওয়া" এবং ভারতীয় মুদ্রাবাজারে সঙ্কোচন ছিল এই চাহিদা হ্রাসের কারণ।[১১৮] "ম্যাঞ্চেস্টারের মালের জন্য যা দাম দেওয়া হয় তার চেয়ে কম খরচে (ভারতে) কাপড় তৈরীর অবকাশ আছে"—বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের এই আশঙ্কা সহজ বোধ্য।[১১৯] Trevelyan একটা তদন্ত করেন, সেটি অযোধ্যা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সমূহ, মধ্যপ্রদেশ সমূহ ও বাংলায় জেলান্তরে প্রসারিত হয়। (২০৯-১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)। তদন্ত থেকে উদ্ঘাটিত হয় যে চাহিদা হ্রাস পেয়েছিল উপরোক্ত কারণগুলির দরুন, আরও দেখা যায় আমেরিকার গৃহযুদ্ধের শুরু থেকে কাঁচামালের দরবৃদ্ধির দরুনই তাঁতীরা ভারতীয় বাজারে হটে যাচ্ছিলেন। Trevelyan, Sir Charles Wood এর কাছে রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে কাঁচা তুলোর দরবৃদ্ধির দরুন (অনেক মাল জমে যাবার জন্য ইংল্যাণ্ডের কাপড়ের দরেও সামান্য বৃদ্ধি হয়েছিল) "দেশীয় তাঁতীদের বিব্রত অবস্থা অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল, অনেক জায়গায় গুরুতর দুর্দশায় পড়তে হয়েছিল"।[১২০] 'তুলোর চড়া দামের জন্য তুলো বোনা কমিয়ে ফেলতে এবং বহু জায়গায় বন্ধ করে দিতে (তাঁতীরা) বাধ্য হয়েছিল"।[১২১] কিন্তু "ভারতীয় সমাজের সুস্থ প্রগতিশীল অবস্থা" এমনিই ছিল যে "যদিও কঠোর দুর্দশা হয়েছিল, তবু বাইরেকার কোনও ত্রান সাহায্য ছাড়াই তা সহ্য করা হয়েছিল। অংশত এই কারণে যে তাঁতীরা ছিল সাধারণ ভাবে শিল্পোৎপাদক আবার সেই সঙ্গে কৃষিজীবীও, তবে তার চেয়েও বড় কারণ ছিল সাধারণভাবে শ্রমের সক্রিয় চাহিদা থাকা। শেষত, বিরাট তাঁতী জনসংখ্যার (আপনি জানেন যে শহর ঘনসন্নিবিষ্ট থাকা ছাড়াও দেশের প্রত্যেক গ্রামেই এঁদের বসতি ছিল) উপর চাপ শিল্পোৎপাদন থেকে কৃষিতে উত্তরণের সুফল প্রসব করেছিল যা ভারত ও ইংল্যাণ্ড উভয়ের পক্ষেই সমান কল্যাণকর ছিল……।"[১২২] Trevelyan এর তদন্ত লব্ধ এই চিত্র অবশ্য তাঁতশিল্প একেবারে শেষ হয়ে গেল এমন প্রমাণ করে না। প্রকৃতপক্ষে দেশীয় কুটীর শিল্প আশ্চর্য স্থিতিস্থাপকতার পরিচয় দিয়েছিল। তবুও এই তদন্ত লব্ধ তথ্যের গুরুত্ব ছিল, কারণ এই সময়ে একটা দেশজ শিল্প সম্পর্কে এইটিই ছিল একমাত্র সুব্যবস্থিত তদন্ত। দেশীয় শিল্পের যে অবক্ষয় Trevelyan দেখেছিলেন তাকে একটা

অবশ্যম্ভাবী এবং কাম্য পরিণতি বলে সকলে স্বীকার করেননি। এক দশক পরে Ashley Eden ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখেছিলেন: "জনাধিক্য থেকে সমাজে যে সব সমস্যার উদ্ভব হতে পারে তার মোকাবিলা করার উপায় হিসাবে সবচেয়ে যা উপযোগী তা হল একটি শিল্পোৎপাদক শ্রেণীর সৃষ্টি এবং কৃষি যত লোককে যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করতে পারে তার প্রায় দ্বিগুণ লোকের হাত থেকে কৃষিকে রেহাই দেওয়া।"[১২৩] তবে প্রশাসনের অধিকাংশ সহকর্মীর কাছে Eden এর এই উদ্বেগকে মনে হয়েছিল একটা হাস্যকর খামখেয়ালী, আর Trevelyan এর তদন্তকে মনে হয়েছিল কর্তব্য বহির্ভূত একটা বাহুল্য। শতাব্দীর শেষপাদে যতক্ষন দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট (Famine commission) এবং, জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদদের রচনাবলী এ বিষয়ের পুনর্মূল্যায়ন, অন্তত অতীত অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা, করতে বাধ্য করেছিল ততদিন পর্যন্ত বিষয়টি আর শাসক শ্রেণীর মনোযোগ আকর্ষণ করেনি।

সাধারন একজন আমলার প্রয়োগ সর্বস্বতা ও "তত্ত্বগন্ধী যুক্তি"-র প্রতি বিরূপতা যেখানে প্রায় পৌরাণিক খ্যাতি লাভ করেছিল—বস্তুত আই.সি.এস গাথায় একটা গর্বের বস্তু হিসাবে স্থান পেয়েছিল, কিন্তু ইংল্যাণ্ড থেকে আগত ফিনান্স মেম্বার Wilson, Laving ও Massey তৎকালীন অর্থনীতির ভাবধারা ও নীতির ভাণ্ডার থেকে উদারভাবে আহরণ করতেন। যেমন ব্যবসায়ী শ্রেণীগুলির উপর বিশেষ ট্যাক্স বসানর সপক্ষে "উপকার" তত্ত্বের (benefit principle) আশ্রয় নেওয়া হত। "সকল শ্রেণীই নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়েছে·········কিন্তু প্রধান উপকারটা তুলনাতীতভাবে পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর কাছেই গিয়েছে।"[১২৪] একথাটা বলা হয়েছিল লাইসেন্স করের সপক্ষে—যা ব্রিটিশ শাসন থেকে উপকার পায় এমন সব শ্রেণীকে বাধ্য করত "এই সব সুবিধার খরচ বহনে তাদের ন্যায্য অংশ নিতে"। রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ থেকে প্রাপ্ত উপকার অনুযায়ী প্রজাদের কর দিতে হবে এই যুক্তির যদিও গণ্যমান্য বংশমর্যাদা ছিল—যার উৎস ছিল Hobbs ও Grotious পর্যন্ত, তবু এর ব্যবহার একটু আশ্চর্যই বটে, কারণ সমসাময়িক অর্থনীতিবিদরা, বিশেষ করে J. S. Mill এই স্বার্থ বা উপকারের নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।[১২৫] Adam Smith এর "সক্ষমতার নীতি" (Principle of ability) Ricardo ও J. S. Smith এর দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল।

বোধ হয় Mill এর প্রভাবে উপকার নীতির সঙ্গে সক্ষমতা নীতিও Wilson ও Laing কর্তৃক উল্লেখিত হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকাস্থ জমিদাররা, যাঁরা কর দিতে সুস্পষ্টভাবে সক্ষম অথচ ১৭৯৩ সালের ১ নং রেগুলেসনের এক মিথ্যা ব্যাখ্যার আশ্রয়ে অন্যায় রেহাই ভোগ করে আসছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এই সক্ষমতা নীতি একটি লাগসই হাতিয়ার হয়েছিল। "উপকার নীতি" এবং "খরচ খরচার" দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া সুবিধার খরচ খরচা তোলার জন্য প্রজাদের কিছু দেওয়া উচিত—এই যুক্তি ষ্ট্যাম্প ট্যাক্সের আলোচনায়ও বড় হয়ে উঠেছিল। Wilson এই যুক্তি দিয়েছিলেন যে বানিজ্যিক আইন, বিচারালয় প্রভৃতি চালু রাখার খরচ ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্ক মালিকদের বহন করা উচিত।[১২৬] এই যুক্তিই ব্যবসায়িক লেনদেনের দলিলপত্রের উপর বিশেষ ষ্ট্যাম্প শুল্কের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিল। এই যুক্তি সমস্ত বিচার বিভাগীয় ও আইন গত দলিলপত্রের উপর ষ্ট্যাম্প শুল্কের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছিল : বিচারকর্ম নির্বাহের খরচ অন্তত আংশিক বহন করতে হত মামলাকারীদের। (সাধারণ ষ্ট্যাম্প শুল্ক এই যুক্তিতে সমর্থিত হয়েছিল যে এতে অপ্রয়োজনীয় মিথ্যা মামলা মোকর্দমা বন্ধ করা যাবে)।

সে যাইহোক, কি উপকার নীতি, কি সক্ষমতা নীতি কোনটারই ব্যবহারিক তাৎপর্য ছিল না। যে ধারনার এরকম তাৎপর্য ছিল তা হল অর্থনৈতিক উদারনীতিবাদের মধ্যে সহজাত ভাবে নিহিত "সমতার নীতি" (Principle of equality) করের দ্বারা আয় ও সম্পত্তির বর্তমান আপেক্ষিক বন্টনকে নড়চড় করতে দেওয়া উচিত নয়। ক্রমবর্ধমান হারে করের প্রশ্নটা তুলতেই দেওয়া হত না। Wilson লিখেছিলেন "মানুষের অবস্থা সমান সমান করে দেওয়া" সরকারের কাজ নয়।[১২৭] যদিও James Mill তাঁর History of India বইয়ের এক অখ্যাত আধ্যায়ে একথা স্বীকার করেছিলেন যে আয়ের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার (diminishing marginal utility) বেন্থামপন্থী তত্ত্বের নিরিখে ক্রমবর্ধমান হারে (progressive) কর সমর্থনযোগ্য, তবু J. S. Mill এবং রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবস্থার নীতি সমূহের অপরাপর গোঁড়া প্রবক্তা ক্রমবর্ধমানহারে (progressive) করের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন, তাঁদের মতে এটা হত "শিল্প ও অর্থনীতির উপর একটা কর······ ··· প্রতিবেশীদের চেয়ে কঠোর-

তর পরিশ্রম করা ও তাঁদের চেয়ে বেশি সঞ্চয় করার উপর একটা শাস্তি।"[১২৮] অবশ্য এমন কি J. S Mill পর্য্যন্ত অর্জিত আয় ও অনুপার্জিত (unearned income) ভূমির মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে তফাৎ করার প্রয়োজন স্বীকার করেছিলেন এবং মৃত্যু করের (death duty) পক্ষে বলেছিলেন। কিন্তু আয়ের উৎসের ভিত্তিতে তফাৎ করার নীতি Wilson ও তাঁর পরবর্তীদের দ্বারা গৃহীত হয়নি। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স এবং ক্যালকাটা ট্রেডস এ্যাসোসিয়েশন এই যুক্তি দিয়েছিল যে "পরিশ্রমের ফলের" উপর ভূসম্পত্তির আয়ের চেয়ে নিম্নতর হারে কর ধার্য করা উচিত।[১২৯] ক্যালকাটা ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশন তাদের বক্তব্যের সমর্থনে Mill এর নামের আশ্রয় নিয়েছিল, কিন্তু কাজ হল না। সরকার যদিও সমাপনীয় (terminable) অর্জিত আয় এবং মূলধন থেকেও ভূমির মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি থেকে আয়ের মধ্যে তফাৎ করাকে স্বীকার করেনি, তবু কোনও বিশিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বৈষম্য না করার নীতি ব্যবসায় ও বৃত্তি থেকে আয়ের উপর লাইসেন্স ট্যাক্সএর বিরুদ্ধে জোরাল যুক্তি হিসাবে ক্রমশ গৃহীত হয়েছিল। ১৮৬০ সালে উচ্চতর আয়ের উপর সামান্য একটু উচ্চতর কর হারের বিধান পাশ করা হয়েছিল; কিন্তু ব্যাখ্যার সময়ে Wilson সেটা যে নিম্নতর আয়ভোগী যারা লাইসেন্স ট্যাক্স ও আয়কর দুই-ই দেয়, তাদের উপর "দুনো বোঝা" (double action) বন্ধ করার জন্য এবং ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্যের নীতির প্রতি কোনও স্বীকৃতি নয় এই মর্মে সতর্ক বিবৃতি দিয়েছিলেন।[১৩০]

এই সব প্রত্যক্ষ কর মোট রাজস্বের অনুপাতে সামানই হত, এই সময়ে কখনও ৫ শতাংশের বেশি হয়নি। রাজস্বের দুটি বৃহত্তম উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব, ও আফিম রাজস্ব, এ দুটি ছিল যথাক্রমে ৪০ শতাংশ ও ১৫ শতাংশ। আফিম রাজস্ব অংশত আফিমের—যে আফিম মূলত ব্রিটিশ ভারতের বাইরে মধ্য ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলিতে উৎপন্ন হত এবং বোম্বাইয়ের ভিতর দিয়ে যেত তার উপর শুল্ক থেকে উশুল হত। আর অংশত উশুল হত বাংলার আফিম বিক্রি থেকে, সেটা ছিল সরকারের একেবারে একচেটিয়া ব্যাপার। এই সেকেলে একচেটিয়া কারবার স্বভাবত অবাধ বাণিজ্যের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিকতাবাদী ও নৈতিক কর্তব্য-সম্মত দৃষ্টিভঙ্গি উভয় দিক থেকেই নিন্দার্হ ছিল।[১৩১] এই দুটি যুক্তিই অগ্রাহ্য করে ও একচেটিয়া অধিকার বজায় রেখে সরকার তার স্বভাবসিদ্ধ নীতিপ্রিয়তার পরিচয় দিয়েছিল। Mayo লিখেছিলেন "একটা ধারনার জন্য অনেক

মূর্খতা আমরা করেছি, তবে আশা করি যে এ রকম একটা নির্বুদ্ধিতার কাজ [আফিমের একচেটিয়া কারবার ছেড়ে দেওয়া] আমরা করে বসব না।"[১৩২] আফিম-বিরোধী আদর্শবাদীরা একচেটিয়া কারবার আঁকড়ে থাকার সরকারি সঙ্কল্পে কোনও ফাটল ধরাতে পারেন নি।

"করের বোঝা" বলে যাকে অভিহিত করা হত তার হিসাব থেকে সরকার আফিম রাজস্ব ও ভূমি রাজস্ব উভয়কেই বাদ দিয়েছিল। আফিমকে সঠিক ভাবেই বাদ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু জাতীয়তাবাদী মুখপাত্ররা 'ভূমি কর' বাদ দেওয়ার প্রবল বিরোধিতা করেন। সরকারি মত ছিল যে ভূমি রাজস্ব (land revenue) কোনও কর (tax) নয়। একটা কেবল সংজ্ঞাগত ব্যাপারের উপর এতটা গুরুত্ব আরোপ দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। কেবল উপযোগিতাবাদী তত্ত্বের প্রভাব দিয়েই একে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই তত্ত্বের দ্বারা J. Strachey নিশ্চয়ই প্রভাবিত হয়েছিলেন যখন লিখেছিলেন "স্মরণাতীত কাল থেকে তত্ত্ব ও ব্যবহার উভয়তই রাষ্ট্র ভূ-সম্পত্তির বৃহত্তর অংশের অধিকারী হয়ে আসছে এবং খাজনার যতটা অংশ নেওয়া সম্ভব বা উপযুক্ত বোধ হয়েছে ততটা নিয়ে আসছে। ভারতে ভূমি-রাজস্ব কেবল জমির খাজনার (rent) এই অংশটিই।"[১৩৩] ঐতিহাসিক বিবৃতি হিসাবে এটার সন্দেহ জনকতার উপর জোর দেওয়া এখন নিষ্প্রয়োজন, তেমনি নিরর্থক এই চিন্তাধারার উৎস অন্বেষণ। প্রশ্নটা হল উপযোগিতাবাদী (utilitarian) প্রভাব যখন অস্তগামী সেই সময়ে এটি একটি অবিচল বিশ্বাসের বস্তু হয়েরইল কেন, এবং কেন ভূমি-রাজস্ব খাজনার (rent) একটা অংশ ও একটা কর-বহির্ভূত (non-tax) উৎস এই সংজ্ঞা সরকারি প্রবক্তাদের লেখায় এত গুরুত্ব পেল। তার মধ্যে কেবল Ricardo বা Mill-এর প্রতি আনুগত্যের চেয়ে বেশি কিছু ছিল। সরকার জমি থেকে নিজের আয় বাড়ানকে সম্ভব ও উপযুক্ত দুই-ই মনে করত এবং দেশের কিছু সম্পন্ন ও স্পষ্টত করধার্যের যোগ্য অংশে 'ভূমি রাজস্বের' (land revenue) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার ফলে যা সে ছেড়ে দিয়েছিল, কর (tax) রূপে তাই-ই ফিরে পেতে চাইছিল। Wilson-এর আয়কর ছিল জমিদারদের উপর কর ধার্য করার প্রথম প্রয়াস। কর থেকে রেহাই পাবার জন্য "জমিদারদের দাবি" কে তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন।[১৩৪] ভূমি-রাজস্বকে যদি কর বলে ব্যাখ্যা করা হত তা হলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে ভূমি-রাজস্ব দাতাদের উপর আর কোনও দাবিদাওয়া (অর্থাৎ আয়কর,

রাস্তা-সেস, শিক্ষা-সেস প্রভৃতি) থেকে চিরকালের জন্য রেহাই হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেত। সেই কারণেই ভূমি রাজস্বকে খাজনার একটা অংশ হিসাবে, আয়ের একটা কর-বহির্ভূত উৎস হিসাবে ব্যাখ্যা করার জন্য সরকারের এই জেদ। উপরন্তু এই রকম একটা সংজ্ঞা সরকারকে তথাকথিত "করের বোঝার" হিসাব থেকে ভূমি-রাজস্বকে বাদ দেওয়ার সুযোগ দিত। আফিম রাজস্বের সঙ্গে ভূমি রাজস্বও যদি বাদ দেওয়া হত তা হলে দৃশ্যত মাথা পিছু করের বোঝাগুলো ধরলে যা হত তার অর্ধেক হয়ে যেত। আসলে মনে হত যেন ব্যাপক জনগণ প্রায় কোনও করই দিতেন না। "কর" বলে অভিহিত করা যায় এমন একটি মাত্র অবদানই যেন সরকারি রাজস্বে তাঁদের ছিল, সে হল নুনের উপর যে শুল্ক তাঁরা দিতেন। এই-ই ছিল সরকারি অভিমত এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র ভক্তিভরে তারই পুনরাবৃত্তি করত।

আমরা যে বলেছি উপযোগিতাবাদের প্রভাব ১৮৬০ এর দশকে কমে যাচ্ছিল তার একটু বিশ্লেষণ দরকার। উত্তর ভারতে ভূসম্পত্তিবান অভিজাতরা সামাজিক ব্যবস্থায় ঐতিহ্যগতভাবে যে স্থান অধিকার করতেন Canning কর্তৃক সেই আসন তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়ার কর্মনীতির প্রবর্তন, এবং বিদ্রোহের পর সামাজিক সংস্কারের বিস্ফোরক বিধানগত অস্ত্রগুলিকে সম্বরণ করার রক্ষণশীল সঙ্কল্প এক নতুন যুগের পত্তন সূচীত করল। সে যুগের বৈশিষ্ট্য হল সরকারের সীমিত অবাধ নীতির দর্শন। ভূমি-রাজস্ব নীতির ক্ষেত্রে Bird, Pingle ও Thomason কর্তৃক সমর্থিত উপযোগিতাবাদী চিন্তাধারা থেকে সরে গিয়ে "জমিদারতন্ত্রের পক্ষে একটি প্রতিক্রিয়াকে J. S. Mill যথাযথ ভাবে ধরেছিলেন।[১৩৫] Mill তাঁর প্রভাবশালী বন্ধু H. S. Maine ও W. T. Thornton কে এই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, আর বিষয়টা ভাল করে বোঝানর জন্য তত্ত্বগত নিহিতার্থের উপর ততটা মনোযোগ দেন নি যতটা মনোযোগ দিয়েছিলেন যে সব ব্যবহারিক পরিণামের আশঙ্কা তাঁর ছিল সেইগুলির প্রতি। Mill বলেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত জমিদারদের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ভূমি রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত "সরকারের পক্ষে ক্ষতিকর বন্দোবস্ত" হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু ১৮৬২ সালের মধ্যে সরকার কথা দিয়েফেলেছিল ঃ ১৮৬২ সালে Sir Charles Wood সিদ্ধান্ত করলেন যে অস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকাগুলিতে যতশীঘ্রসম্ভব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

প্রবর্তিত হবে। এই সিদ্ধান্ত থেকে সরকার ক্রমে ক্রমে কেন সরে গেল তার কারণগুলি চতুর্থ পরিচ্ছেদে (১৭২-৯২ পৃষ্ঠায় দেখুন) আলোচিত হয়েছে। একথা বলা যেতে পারে যে এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাত্ত্বিক বিবেচনার সামান্যই প্রভাব ছিল—তা সে উপযোগিতাবাদের পক্ষেই হোক, আর বিপক্ষেই হোক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরোধীরা অবশ্যই খাজনা সম্বন্ধীয় উপযোগিতাবাদী মতবাদের কথা তুলেছিলেন (যেমন Sir John Strachey)।[১৩৬] কিন্তু ভারত সরকারকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্প্রসারণ থেকে যা প্রতিনিবৃত্ত করেছিল তা এই মতবাদ নয়। সে কারণগুলি হল রূপোর দাম পড়ে যাওয়া এবং জমির ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি—ষাটের দশকের গোড়ার দিকে Sir Charles Wood এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবক্তারা যা হবে বলে ধরতে পারেন নি ; আর চূড়ান্ত কারণ হল ভূমি থেকে আয়ের ভবিষ্যৎ বৃদ্ধির অংশের উপর দাবি ছেড়ে দিলে সরকারের যে ক্ষতি হবে তাকে আবার ফিরে পাওয়ার মত একটা কর-ব্যবস্থা রচনা করতে সরকারের অসুবিধাবোধ। উপযোগিতাবাদী দর্শনকে কেন্দ্রস্থলে রেখে ব্যক্তি হিসাবে প্রশাসকদের সেই মতবাদ গ্রহণ বা বর্জনের নিরিখে ভূমি রাজস্ব নীতির বিচার করাটা হল আসল কথাটা খেয়াল না করা : এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি মতবাদের প্রভাবকে বে-মানানভাবে বড় করে দেখে, সিদ্ধান্তকারীদের ব্যবহারিক বুদ্ধিকে খাটো করে দেখে এবং সমগ্র ভাবে অর্থ-বিষয়ক কাঠামো ও অর্থনৈতিক দৃশ্যপটকে নজরে রাখতে পারে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্নে ভাবধারার সংঘর্ষ অবশ্য এক দিক দিয়ে কৌতূহলোদ্দীপক, সে হল এই সংঘর্ষ উপযোগিতাবাদের পাল্টা একটা সামাজিক দর্শন খাড়া করেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত যখন গৃহীত হয়েছিল সেই সময় যাঁরা ইণ্ডিয়া অফিস ও অর্থ দফতরের নেতৃত্ব করছিলেন অর্থাৎ Sir Charles Wood এবং S. Laying, তাঁদের কাছে এর অর্থ ছিল উপযোগিতাবাদী সামাজিক ভাবদৃষ্টির একটি বিকল্প। এর অর্থ হল "এক ধরনের সমাজের ভিত্তি যা হয়তো তত সহজে শাসিত হবে না, কিন্তু যা সভ্যতা ও প্রগতির উপাদানের দিক থেকে বিচিত্রতর ও সমৃদ্ধতর", এমন এক সমাজ যেখানে "ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবৃদ্ধি" সম্ভবপর হবে।"[১৩৭]

"সরকারের প্রতি প্রায় নিশ্চিতভাবে প্রসন্ন" হবে এমন একটা ভূস্বামী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা সরকারের উৎসাহের একটা বড় কারণ

ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা গোড়ায় স্থগিত ও পরে বর্জিত (১৮৭১) হয়ে থাকলেও সেটা অবাধ নীতির দৃষ্টি ভঙ্গির বিরুদ্ধে উপযোগিতাবাদীর জয়লাভ ততটা নয়, যতটা সরকারের নীতি নির্দ্ধারকদের ওপর তাদের আয়ত্তের বাইরে অর্থনৈতিক পরিবর্তন সমূহের (যথা বিশ্ববাজারে রূপোর দর পড়া এবং ভারতে জমির দাম বাড়ার) প্রভাব।

উপযোগিতাবাদজাত যুক্তি প্রণালীতে (felicific calculus) এবং নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ বিশ্বাসের উপর ১৮৫৭-এর বিদ্রোহ এক বিরাট ধাক্কা দিল। বিদ্রোহ তার উত্তরফল হিসাবে বিজিত দেশের শাসক জাতির ভূমিকা সম্বন্ধে স্বীকৃতি, এক তীব্র সচেতনতা নিয়ে এল। ঘুমন্ত বর্ণবিদ্বেষ প্রকাশ পেয়ে গেল। John Lawrence-এর ভাষা ব্যবহার করলে বিদ্রোহ ছিল "বর্ণে বর্ণে যুদ্ধ", আর বিদ্রোহের পরবর্তী পর্যায়ে বর্ণবৈষম্যের ভাব প্রবল হয়ে উঠল।[১৩৮] এর ফলে রাজার ও প্রজার জাতের মধ্যে কেবল একটা সামাজিক ব্যবধানের প্রাচীরই উঠল না—চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি যে খেলা খেলছিল তাতে এই: ব্যবধান গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছিল—উপরন্তু বর্ণবৈষম্যমূলক বিভিন্ন তত্ত্বেরও উদ্ভব হল। গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে আইন সম্বন্ধে ভারপ্রাপ্ত সদস্য (Law Member) (১৮৬৯-৭২) J. Fitzjames Stephen এর রচনায় শাসকদের সর্বময় কর্তৃত্বের প্রতি সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণবৈষম্যের প্রকাশ্য বিবৃতি রয়েছে। Liberty, Equality, Fraternity গ্রন্থে তিনি এমন সব ভাবধারার প্রকাশ করেছিলেন যা "বেকানুন ছোট জাতদের" উপর শাসনকারী আমলার মনোভাবের মধ্যে অন্তর্নিহিত, যথা: মানুষের মৌলিক অ-সমতা, "বিজয়ী জাতির শ্রেষ্ঠতা", বিজয়ী জাতির লোকদের নিয়ে তৈরি স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের প্রয়োজনীয়তা।[১৩৯] তত্ত্বের দিক থেকে শাসকদের সর্বময় কর্তৃত্ববাদের এই নমুনাটি উপযোগিতাবাদের অন্তর্নিহিত একটি উপাদানেরই সম্প্রসারণ এবং ইতিহাসের বিচারে এক বর্ণের উপর আর এক বর্ণের রাজকীয় আধিপত্যের স্বপক্ষে যুক্তি। রাজকীয় বাণী প্রচারে Stephen-এর চেয়ে বেশি সফল হয়েছিলেন Greater Britain (১৮৬৮) এর রচয়িতা Sir. Charles Dilke Gobineau এর বর্ণগত অসমতার চিন্তাধারা, Darwin-এর একটা ইতর ব্যাখ্যা এবং সারা পৃথিবীতে অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির একত্বের মহান ভাবদৃশ্য নিয়ে খিচুড়ি পাকান তাঁর বক্তব্য বেশ একটা ব্যাপক শ্রোতৃমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করেছিল। Dilke বলেছিলেন ভারত এমন একটি

ভূখণ্ড যাকে ব্রিটিশ শাসনের উপকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। ১৮৬২-৬৯ সাল পর্যন্ত গভর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলে আইনের ভারপ্রাপ্ত সদস্য Henry Maine-এর আদিম সমাজ ব্যবস্থা ও আইনকানুন সম্বন্ধীয় রচনাগুলি মননের অন্য একটা স্তরের অন্তর্ভুক্ত। ভারতীয় সমাজের বিকাশ আটকে যাওয়া সম্বন্ধে তাঁর মতের অনেক রকম ব্যাখ্যা হয়েছিল। ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগুলির অভিন্ন "আর্য" উত্তরাধিকার সম্পর্কে Maine-এর মতামতকে ভারতীয় আত্ম-মর্যাদার পক্ষে ব্যথাহর প্রলেপ হিসাবে উপযোগী ছিল, আবার তাঁর ভারতীয় জাতিগুলির জড়ত্ব (Stagnation) সম্পর্কিত তত্ত্ব প্রজার জাতের উপর কলঙ্কলেপন করার খুব উপযোগী। The Economist-এর Walter Bagehot এবং অর্থনীতিবিদ T. E. C. Leslie, Maine-র রচনার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।[১৪০] Leslie ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে Maine-র বক্তৃতা শুনেছিলেন। জার্মান ঐতিহাসিক অর্থনীতিবিদদের (German Historical Economists) মতো তিনিও অ-পাশ্চাত্য অর্থনীতিগুলির বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়েছিলেন। Bagehot যাকে সমাজ বিবর্তনের "প্রাক্-অর্থনৈতিক স্তর" আখ্যা দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে সচেতনতার জন্য তিনি Maine-র কাছে ঋণী ছিলেন। অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এসবের অন্তর্নিহিত অর্থ পরিষ্কার, তা হল উন্নত পাশ্চাত্য সমাজগুলির পক্ষে উপযোগী অর্থনৈতিক নীতি অনগ্রসর অর্থনীতিগুলির পক্ষে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। ভারত সম্পর্কে যে কোনও নির্দিষ্ট দাওয়াই-ই বাতলান হোক না কেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে পশ্চিমী সমাজে সরকারগুলির জন্য যে ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয় ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের জন্য তার চেয়ে অনেক বৃহত্তর ভূমিকা নির্ধারিত হয়েছিল। ভারতে ব্রিটেনের ভূমিকা হল "এক যুদ্ধমান সভ্যতার"—এই মর্মে Stephen-এর বিবৃতিকে John Strachey সপ্রশংস ভাবে উল্লেখ করেছিলেন। Strachey যখন লিখেছিলেন "আমরা আমাদের উপনিবেশ (dominion) বজায় রাখতে চাই, কারণ ভারতের প্রতি এই আমাদের সর্বোচ্চ কর্তব্য" তখন তার মধ্যে নিহিত পরিহাস সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না।[১৪১] Argyll যখন লিখেছিলেন "আমাদের নিজেদের উপনিবেশের নিরাপত্তা রক্ষা করা ভারতের জনগণের প্রতি আমাদের প্রথম কর্তব্যগুলির মধ্যে অন্যতম" তখন তিনিও শ্লেষ করার চেষ্টা করছিলেন না।[১৪২] যাঁরা সাম্রাজ্যের

মতাদর্শ গ্রহণ করে নিয়েছিলেন তাঁদের কাছে ভারত শাসনে ইংল্যাণ্ডের অধিকার ও দায়িত্ব প্রশ্নাতীত।

কিন্তু তবু এই রাশি রাশি "শুভাকাঙ্খার" মধ্যে একটা সন্দেহ মাঝে মাঝে মাথা তুলত। Trevelyan লিখেছিলেন "প্রভু ও শিক্ষকেরা" যখন বিদায় নেবেন সেই মুহূর্তটির জন্য ভারতকে কি প্রস্তুত করা হচ্ছে?[১৪৩] Comte-এর প্রত্যক্ষবাদী শিষ্য Richard Congreve প্রশ্ন তুলেছিলেন যে ইউরোপের পক্ষে সামাজিক বিবর্তনের নৃ-তত্ত্ব-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া এবং ভারতকে একটা নিকৃষ্টতর সভ্যতা মনে করা ও "সহানুভূতির বেপরোয়া অভাবের" দ্বারা চিহ্নিত একটা সরকার তার উপর চাপানো কি অযৌক্তিক নয়?[১৪৪] James Wilson জিজ্ঞাসা করেছিলেন ভারত চিরকাল ব্রিটেনের দ্বারা শাসিত হবে, না ভারতকে ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্বশাসনের জন্য প্রস্তুত করা হবে—ব্রিটেন কি সরাসরি এ প্রশ্নটার মোকাবিলা করছে?[১৪৫] এ রকম সন্দেহ ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে প্রকাশ্যে সাধারণত তুলতেন না। একমাত্র যে উপলক্ষ্যে এটাই প্রকাশ্য ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল সে হল তথাকথিত "মাদ্রাজ বিদ্রোহ", অর্থাৎ মাদ্রাজের গভর্ণর Charles Trevelyan-এর ১৮৬০ সালের বাজেট এবং অর্থ-ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ নীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিক্ষোভ (৬২-৬৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)। Trevelyan-এর উদ্দেশ্য ও কারণগুলি মিশ্র ছিল। অংশত এর পশ্চাতে ছিল তাঁর সুস্থ প্রশাসনিক বোধ: কলকাতাস্থ সরকার অত্যধিক কেন্দ্রীকরণের বিপদ বোঝার আগেই তিনি এই বিপদের আভাস পেয়েছিলেন এবং বিকেন্দ্রীকরণের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। Trevelyan-এরছিল কৌশল বোধের অভাব, রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের অবিচল মেজাজ। বিতর্কে তিনি শক্ত ছিলেন এবং শক্তি দেখান ছিল তাঁর প্রধান দুর্বলতা। মাদ্রাজ বিক্ষোভ অংশত ছিল 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' কাগজ যাকে "প্রাদেশিকতার মনোভাব" আখ্যা দিয়েছিল তারই প্রকাশ, অর্থাৎ মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বে-সামরিক নাগরিকদের স্বাধীনতার সন্দিগ্ধ মনোভাবের প্রকাশ।[১৪৬] কিন্তু প্রশাসনিক সুবিধা সম্পর্কে মতানৈক্য, বে-সামরিক আমলা-দের (Civil Servants) বিতর্কের উৎসাহ অথবা প্রাদেশিক ঈর্ষা থেকে এমন ঝড় কখনও ওঠেনি যেরকমের সম্মুখীন হতে হয়েছিল Trevelyan কে। Charles Trevelyan যে নিন্দিত ও কর্মচ্যুত হয়েছিলেন এবং তাঁকে যে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার কারণ তিনি মৌলিক প্রশ্ন

তুলেছিলেন। "জন প্রতিনিধিমণ্ডলীর (popular assembly) বাহ্যিক অনুকরণ সত্ত্বেও ভারতে জাতীয় স্বার্থের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব থেকে আমরা যৎপরোনাস্তি দূরে আছি।"[১৪৭] Trevelyan প্রতিবাদ তুলেছিলেন যে সরকার ইংল্যাণ্ডের অর্থ-বিষয়ক ব্যবস্থাকে ভারতের মাটিতে এনে লাগাচ্ছেন, কিন্তু এই ব্যবস্থার একটা মৌলিক চাহিদার, অর্থাৎ করদাতাদের প্রতিনিধিত্বেরই অভাব রয়েছে। একটা প্রকৃত প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে জনমত সরকারের উপর খানিকটা নিয়ন্ত্রণ রাখবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ সম্প্রদায়ের মতটাকেই জনমত বলে ভুল করা হচ্ছিল। "এ দেশে ইউরোপীয়দের প্রধান প্রধান ভোগ্যবস্তুর উপর (শুল্ক) ২০ থেকে ১০ শতাংশে হ্রাস এবং আমাদের স্বদেশে শিল্পোৎপাদনের প্রধান কাঁচামালগুলিকে ছাড়ের তালিকায় ঢুকিয়ে বাজেটকে জনপ্রিয় করেছে শাসকশ্রেণীর কাছে—আমরা যাকে জনমত বলি তার প্রতিনিধিত্ব করে।" Trvelyan-এর "শ্রেণী স্বার্থে আইন প্রণয়নের" সমালোচনাকে অমনি ছেড়ে দেওয়া যেত না : সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে নালিশ করার সময় স-পরিষদ গভর্ণর জেনারেল উপরোক্ত অংশটিকেই বিশেষত আপত্তিজনক ও বিপজ্জনক বলে বেছে নিয়েছিলেন। Trevelyan-এর দ্বিতীয় চূড়ান্ত অপরাধ এই ছিল যে তিনি সরকারের ইজ্জৎ হানি করেছিলেন। মাদ্রাজের গভর্নর ভারতীয় অর্থ-বিষয়রক কর্মনীতি সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনামূলক মতামত জনসমক্ষে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন এবং দেশীয়দের সেই আলোচনায় টেনে এনেছিলেন। Canning লিখেছিলেন : আমাদের অর্থাৎ স-পরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে অবশ্যই "আমাদের নিজেদের অভ্রান্ততা বলব না, কিন্তু, প্রশ্নাতীততাকে যতদূর সম্ভব তুলে ধরতে হবে।"[১৪৮] ভারতে সরকার যে কায়দায় গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে ইজ্জতের ভাবনাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করত। ইংরাজদের অধীন জাতি ও "প্রাচ্য মানসিকতা" সম্পর্কে বাঁধা ধারণা, বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা থেকে জাত ইংরাজদের নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি, ব্রিটিশ প্রশাসক এবং তাঁদের অধীনস্থদের অথবা তাঁরা সাধারণত যাঁদের সংস্পর্শে আসতেন সেই সব অনুগত দেশীয়দের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক—যাই তার মূলে থাকুক না কেন সরকারের মান মর্যাদার উপর ব্রিটিশ আমলারা যে গুরুত্ব আরোপ করতেন তা ছিল একেবারে তুঙ্গে। Trevelyan কে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে "মান যাওয়া" ঠেকান গেল, ইজ্জৎও বাঁচল।

ইজ্জতের প্রতি অন্ধভক্তি ছাড়াও সরকারি ধ্যান-ধারণার আর একটি উপাদানের সন্ধানও "প্রাচ্য মানসিকতা" সম্পর্কিত বাঁধাছকের মধ্যেই পাওয়া যায়। স্থায়িত্বের স্বার্থে সমাজের স্বাভাবিক নেতা ভূস্বামী অভিজাত সম্প্রদায়ের সমর্থন যোগাড় করা দরকার এ ধারণা বিদ্রোহের পর থেকে জোরদার হতে থাকে। অভিজ্ঞতার মধ্যে কিছু ভিত্তি এর ছিল। "অভিজাত সম্প্রদায়ের" পুনঃপ্রতিষ্ঠা বর্তমান রচনার চৌহদ্দীর মধ্যে নয়।[১৪৯] কিন্তু এই কর্মনীতির একটা দিক প্রাসঙ্গিক। ১৮৬২ সালে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের পত্তন হবার (১৮৬২) পর ১৮৭২ সাল পর্যন্ত সরকার তাতে যে কজন ভারতীয় সদস্যকে মনোনীত করেছিল তার প্রত্যেকে ভূস্বামী স্বার্থের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, আর অধিকাংশ ছিলেন ভূস্বামী অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক। মোট ১২ জন মনোনীত ব্যক্তির মধ্যে ৩ জন ছিলেন ক্ষমতাসীন রাজা (পাতিয়ালা, জয়পুর ও রামপুর), ৫ জন ছিলেন রাজা, মহারাজা ও নবাব খেতাবধারী ভূস্বামী (ভিজিয়ানাগ্রাম, কিশেনকোট, বর্ধমান, বলরামপুর, ঢাকা), আর বাকিরা ছিলেন জায়গীরদার, তালুকদার ও জমিদার (দেও নারায়ন সিং, দিনকর রাও, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ধেওরাজ সিং)। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের এই সব বে-সরকারি সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শটা ছিল নিতান্তই আনুষ্ঠানিক। কাউন্সিল ঘন ঘন বসত না। যেমন প্রথম দশ বছরে (১৮৬২-৭১) গড়ে প্রতি বছরে মাত্র ২৯টা করে সভা হয়েছিল।[১৫০] এর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অধিবেশনে কোনও ভারতীয় সদস্য উপস্থিত ছিলেন না। কার্য-বিবরণী দেখলে মনে হয় যখন তাঁরা উপস্থিতও থাকতেন তখনও সামান্যই অংশগ্রহণ করতেন। তবু ভূস্বামী অভিজাতদের মধ্যে থেকে সদস্য মনোনয়ন, সরকার তাঁদের উপর গুরুত্ব আরোপ করে সে ধারণাটা তাঁদের কাছে পৌঁছে দিত। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ঠিক এই দঙ্গলের লোক ছিলেন না—যেহেতু তিনি ছিলেন আইনজীবী এবং পুরানো লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কেরানীগিরিও করেছিলেন—তবু তিনি বাংলার জমিদার সংগঠন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তিনি ভূস্বামীও ছিলেন (বাংলায়), দিনকর রাও-ও তাই ছিলেন (আগ্রায়), কাউন্সিলে বসার সম্মানলাভের উপর তাঁর আর একটি বাড়তি দাবি ছিল, সে হল বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ রাজকে বশংবদ সমর্থন দান। ১৮৬৮ সালে কাউন্সিলে মনোনীত বলরামপুরের মহারাজা বিশ বছর ধরে অযোধ্যার ব্রিটিশ

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন (১৮৬২-৮২)। এটি ছিল তালুকদারদের একটি অ্যাসোসিয়েশন, সরকার এর মতামত বুঝতে চাইতেন (প্রধানত প্রাদেশিক ব্যাপারে): এর দফতর ছিল কাইজারবাগ প্রাসাদে—Canning এই প্রাসাদটি এদের দিয়েছিলেন। ১৮৭৬ সালে সরকারের সঙ্গে এই অ্যাসোসিয়েশনের সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে সরকার তালুকদারদের কাছ থেকে ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ করার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশনের চাঁদা সংগ্রহেরও ভার নিয়েছিলেন।[১৫১] ভূস্বামী অভিজাতদের প্রতি ও তাঁদের অ্যাসোসিয়েশনগুলির প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব শহুরে শিক্ষিত ও বৃত্তিজীবী লোকদের পছন্দ হত না। এমন কি হিন্দু পেট্রিয়ট, যে বস্তুত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র ছিল, সেই কাগজও মন্তব্য করেছিল যে "শিক্ষিত শ্রেণীকে প্রায় নিয়তই অবহেলা করা হয়" এবং Louis Napoleon বা Victor Emmanuel ইংল্যাণ্ডের সাধারণ লোকের যে পরিমান প্রতিনিধিত্ব করেন রাজা ভূঁইঞারা মহামান্য মহারানীর ভারতীয় প্রজাদের তার বেশি প্রতিনিধিত্ব করেন না।[১৫২] (এ হল ১৮৭০-৭১ সালের কথা। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মৃত্যুর দু'বছর পর তখন কাউন্সিলে কোনও বাঙালী ছিলেন না, তখন একমাত্র যে ভারতীয় সদস্য অধিবেশনগুলিতে যোগ দিতেন তিনি ছিলেন জয়পুরের মহারাজা)। পরবর্তী দশকে এই বিরক্তি আরও জোরদার হল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম দুটি অধিবেশনে "শ্রেণী ওয়ারি প্রতিনিধিত্বের" দাবি ধ্বনিত হয়েছিল, কারণ (সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির ভাষায় সমস্ত বড় স্বার্থগুলি যাতে যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব পেতে পারে" তারজন্য কাউন্সিলের দরজা খুলতে নেতারা উৎসুক ছিলেন।[১৫৩] ১৮৯২ সালের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস অ্যাক্ট এই দাবিকে আংশিকভাবে পূরণ করেছিল।

সাম্রাজ্যের মতাদর্শ ইতিহাসবিদদের কাছ থেকে যথাযোগ্য মনোযোগ পেয়েছে। বৃটিশ রাজের অবসানের পর সাম্প্রতিক লেখায় 'ভাবধারাগুলির' (ট্রাস্টিশিপ, পিতৃভাববাদ, উপযোগিতাবাদ ইত্যাদি) উপর জোর দেওয়া এক কল্পকাহিণীর সৃষ্টি করেছে কি না—ভাবটা যেন সাম্রাজ্যঘটিত কর্মনীতির জন্ম হত Burke বা Bentham বা Mill-এর অশরীরী আত্মার ঔরসে—সেটা ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখনের ইতিহাসবিদদের আগ্রহের বিষয়বস্তু হবে। সাম্রাজ্যবাদী ও কিছু জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-লেখনের ঝোঁক, স্বার্থগোষ্ঠীগুলির বদলে বরং মতাদর্শের প্রবক্তাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এক ধরণের জল্পনা-কল্পনার জন্ম

দেয় যা নিয়ে এখানে আলোচনা সম্ভব নয়। একথা অনস্বীকার্য যে এই সব ঝোঁক আছে। কাজেই স্বার্থগোষ্ঠীগুলির ভূমিকার উপর জোর দেওয়াটা দুই দিক থেকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে: হয় ব্রিটিশ কর্মনীতির অন্যায় চরিত্রায়ণ হিসাবে (ব্রিটিশ স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলির প্রভাবকে অতিরঞ্জনের অভিযোগের ভিত্তিতে), নয় ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের প্রতি কলঙ্ক আরোপ হিসাবে (তাঁদের ভাবধারা ও লক্ষ্যের অনুদার স্বার্থসর্বস্ব ব্যাখ্যার অভিযোগে)।

যে সময়টার পর্যালোচনা আমরা করলাম তখন বিটিশ স্বার্থগোষ্ঠীগুলি যে খেলায় পারদর্শী ছিল ভারতীয়রা তা আয়ত্ত করতে পারেন নি। দীর্ঘমেয়াদী বিচারে অবশ্য তাঁদের এই আপাত দৃষ্টিতে নিষ্ফল প্রচেষ্টাগুলি—জনমত জমায়েত, সমিতি সংগঠন, অভিযোগের প্রচার ইত্যাদির প্রচেষ্টা—একটি জাতীয় রাজনৈতিক দলের পথ পরিষ্কার করতে সাহায্য করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীগত স্বার্থগুলির সীমা অতিক্রম করে সামগ্রিক জাতীয়স্বার্থের চিন্তার একটা ধারা গড়ে উঠেছিল, যা গিয়ে দাঁড়াল অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদে। বৃটিশরাজের প্রতি বশ্যতা ও সহযোগিতা ক্রয় করার ব্যবস্থার মধ্যে এবং ভূস্বামী ও শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গোড়ারদিককার রাজনৈতিক লক্ষ্য ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শ্রেণী স্বার্থের এই উপাদানটির উপর জোর দেওয়ার মানে উপরোক্ত ধারাটিকে অস্বীকার করা নয়। পঞ্চম পরিচ্ছেদে (২৯৮-৩০৩ পৃষ্ঠায় দেখুন) আবার আমরা এ আলোচনায় ফিরে আসব। ব্রিটিশ স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির ব্যাপারে শাসননীতি নির্দ্ধারকদের একেবারে স্বেচ্ছায় কাজ করা সম্ভব ছিল না তাহা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এই সব চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি সব সময়ে সরকারকে তাদের ইপ্সিত পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারত না। এটাও পরিষ্কার যে ব্যবসায়ীরা ছাড়া অন্যান্যরাও ছিলেন—যেমন প্রাক্তন উপনিবেশিক, উগ্র স্বদেশপ্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক, উৎসাহী, সাংবাদিক, ইভ্যানজেলিস্ট এবং এই ধরনের অন্যান্যরা—যাঁরাও উপনিবেশিক প্রশ্নাবলী সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে অংশ নিতেন। এটাও স্পষ্ট যে অধীন উপনিবেশগুলি সম্বন্ধীয় ব্রিটেনের কর্মনীতি সম্পর্কে এই সমস্ত গোষ্ঠীর মতামতের একটা একশিল ঐক্য ছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে না। তাছাড়া Tennyson যাকে "সাম্রাজ্যবাদের ঐকতান" আখ্যা দিয়েছিলেন সেই মনোভাবটা কেবল শেয়ারের দালাল আর ফাটকা ব্যবসায়ীদের (Stock-jobbing) একলার সৃষ্টি ছিল না। এ কথাও স্পষ্ট

যে স্বল্প মেয়াদে বিচার করলে সমস্ত ব্যবসায়ী স্বার্থের একটা সহজাত সমপ্রকৃতি ধরে নেওয়া ভুল, এবং অনেক সময়েই স্বল্প-মেয়াদী বিবেচনাগুলিই ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলিকে পরিচালনা করত।[১৫৪] স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলির, বিশেষত ব্যবসায়ী স্বার্থের ভূমিকার বাস্তবানুগ মূল্যায়নের জন্য এ সব কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। শেষত, তাদের ভূমিকাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করলে হবে না, বিবেচনা করতে হবে ব্রিটেনের সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রেক্ষাপটে। ব্রিটিশ স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলির ভূমিকাকে বড় করে তুলে ধরার ব্যাপারে একটা সম্ভাব্য আপত্তি এই উঠতে পারে যে ব্রিটেনের বিদেশে বিনিয়োগের ভৌগলিক বণ্টন একথা সূচীত করে না যে ভারতে সাম্রাজ্য বজায় রাখার মধ্যেই ব্রিটেনের জরুরী অর্থনৈতিক স্বার্থ নিহিতছিল ; আপত্তি উঠতে পারে যে মোট উপনিবেশিক বিনিয়োগ ছিল সামান্য এবং অর্থনৈতিক স্বার্থগুলি সাম্রাজ্যঘটিত কর্মনীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্বের সমালোচকদের এই সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াকে স্বার্থান্ধ "মতাদর্শ" থেকে উদ্ভূত বলে খারিজ করে দেওয়া যায় না—তা যদি হয়েও থাকে তবু এই মত ঐতিহাসিক প্রমাণের নিরিখে বিচারের দাবি রাখে। ১৯১১ সালে Sir George Paish-এর প্রয়াস, তার পরে পরেই C. K. Hobson-এর (১৯১৪) এবং L. H. Jenks-এর (১৯২৪) রচনার পরেও ব্রিটিশ মূলধন রপ্তানির পরিমানগত বিচারের তিনটি বড় বড় প্রচেষ্টা হয়েছে A. H. Imlah (১৯৫৮) A. K. Cairncross (১৯৫৮) এবং Matthew Simon ও Harvey Segal-এর দ্বারা। এখন সন্দেহাতীত সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে যে ব্রিটেনের বৈদেশিক বিনিয়োগের একটা বিরাট অনুপাত সাম্রাজ্যের বাইরে ও স্বাধীন দেশগুলিতে নিয়োজিত ছিল।[১৫৫] এ বিষয়ে সর্বাধুনিক ও সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অনুশীলন হল Simon-এর (১৮৬৫); ১৮৬৫ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে ঋণপত্রের মারফৎ নতুন ব্রিটিশ বৈদিশিক বিনিয়োগের (new British Portfolio investment) ভৌগোলিক বণ্টন ও শিল্পগত গঠন সম্পর্কিত বিপুল পরিমাণ তথ্যের তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন—কম্পিউটরের সাহায্য ছাড়া এ করা অসম্ভব হত। তাঁর তদন্তে প্রাপ্ত অন্যতম তথ্য হল এই যে নতুন ব্রিটিশ বৈদেশিক বিনিয়োগের মধ্যে মাত্র ৪০ শতাংশ গিয়েছে সাম্রাজ্যে, আর ৫৯ শতাংশ গিয়েছে স্বাধীন দেশগুলিতে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশগুলির অংশ সবচেয়ে বেশি (যথাক্রমে ৩৪ ও ১৭ শতাংশ);

এশিয়া (১৪ শতাংশ) ও আফ্রিকা (১১ শতাংশ) অপেক্ষাকৃত অল্প অংশ পেয়েছে। Mathew Simon-এর হিসাব অনুযায়ী ইউরোপের বাইরে ব্রিটিশ বিনিয়োগের প্রায় ৬৮ শতাংশ গিয়েছিল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সাম্প্রতিক বসতিগুলিতে। ১৮৬৫ থেকে ১৮৭৩ সালের মধ্যে সাম্রাজ্যে ঋণপত্রের মারফৎ ব্রিটিশ বিনিয়োগ গড়ে প্রতি বছরে হয়েছিল ৯৮ লক্ষ পাউণ্ড, সেই তুলনায় স্বাধীন দেশগুলিতে হয়েছিল প্রায় ৩ কোটি ৪৯ লক্ষ পাউণ্ড। (সাম্রাজ্যের মধ্যেকার বিনিয়োগ ১৮৭৪ সাল থেকে বেড়ে ১৮৮৫ সালে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছয়—মোট বিনিয়োগের ৬৭ শতাংশ হয়, আবার নেবে গিয়ে ১৮৯০ সালে হয় ২৫ শতাংশ, নব্বই-এর দশকে অস্ট্রেলিয়ার খনিশিল্পের তেজিভাবের সময়ে আবার চড়তে থাকে, ১৯০৩ সালে অনেকটা চড়ে ৫৯ শতাংশে পৌঁছয়)।[১৫৬]

ব্রিটেন থেকে পুঁজির প্রবাহ বড় বড় ঢেউয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের উদ্দেশ্যে ছুটেছিল : ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সব চেয়ে বড় ঢেউ এসেছিল ১৮৬৫ সালের আগে, Simon-এর গবেষণার-সময় যখন থেকে শুরু। L. H. Jenks এর কথা অনুযায়ী "১৮৫৭ থেকে ১৮৬৫ সালের মধ্যে ব্রিটিশ পুঁজির প্রধান গতি ভারত-অভিমুখী ছিল······১৮৭০ সালের মধ্যে রেলপথে গিয়েছিল প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। এর আগে ব্রিটিশদের হাতে যে স্টক ছিল তা ছাড়াও অন্তত ৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ভারতীয় ঋণ তাদের হাতে এসেছিল। চা-বাগিচা, চট-কল, ব্যাঙ্ক (শেয়ার ও আমানত উভয় মিলে) ও জাহাজ চলাচল এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানায় অনুমান ২ কোটি পাউণ্ড নিয়োজিত হয়েছিল।"[১৫৭] Jenks উপরোক্ত মর্মে তাঁর প্রাপ্ত তথ্যের সংক্ষিপ্ত-সার উপস্থিত করেন। Simon এই সব তথ্য ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তার আলোচনা ১৮৬৫'র পর থেকে শুরু হয়েছে। C. K. Hobson ও Cairncross সহ অধিকাংশ গবেষক যেখানে ১৮৭০ সালের পরে পুঁজির গতির উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিলেন, ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির প্রধান ঢেউ তার আগেই এসে গিয়েছিল। ব্রিটিশ শেয়ার বাজারে পুঁজি সংগ্রহ করার সম্বন্ধে তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি হিসাবের খুঁতের কথাটাও তুলে ধরা দরকার : A. R. Hall উল্লেখ করেছিলেন যে ব্রিটেনের বাইরে কাজ করে যেসব ব্যাঙ্ক তাদের ব্রিটেন থেকে পাওয়া আমানত, অন্যান্য দেশের শেয়ার বাজার থেকে কেনা ঋণ-পত্র (Securities), ব্যক্তি বা

কোম্পানির দ্বারা বিদেশে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ইত্যাদিকে বাদ দেওয়ার দরুন পুঁজি সৃষ্টি সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে গবেষণা তথ্যের দিক থেকে অনেকখানি খুঁত রেখে দেয়।[১৫৮] Simon-এর হিসাবের এই খুঁত মনে রাখতে হবে তবু এই সব হিসাব নতুন ব্রিটিশ বিনিয়োগের প্রধানত আমেরিকান মহাদেশে এবং সাম্রাজ্যের বাইরের দেশগুলিতে প্রবাহিত হওয়ার প্রবণতাকে প্রমাণিত করেছে। Paish-এর গবেষণার সিদ্ধান্তও এই ছিল (১৯১১): আমেরিকা মহাদেশে ব্রিটিশ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৬৪ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড (তার মধ্যে ক্যানাডায় ছিল ৩৭ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড); সেই তুলনায় ভারতে ও সিংহলে ছিল ৩৬ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড, অষ্ট্রেলেশিয়ায় ৩৮ কোটি পাউণ্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ৩৫ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ড।[১৫৯]

ভৌগোলিক বণ্টন সংক্রান্ত তথ্য 'অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদে'র তত্ত্বের সমালোচকদের দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভবত পৃথিবীর কতকগুলি অংশে রাজনৈতিক আধিপত্য ও প্রত্যক্ষ শাসন অপ্রয়োজনীয় হয়ে গিয়েছিল: প্রত্যক্ষ শাসন বিনা সাম্রাজ্যবাদ সমানই, বা হয়তো আরও, লাভজনক হয়েছিল। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত কি করা চলে যে সাম্রাজ্য বজায় রাখার জন্য মূলধন বিনিয়োগের অভিপ্রায় অংশতও দায়ী নয়? বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে সাম্রাজ্য কম আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল সে বলা এক কথা, আর সাম্রাজ্যকে বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি কাজেই বিনিয়োগের কোনও অভিপ্রায়ই ছিল না সে বলা আর এক কথা। প্রথমত, কি ব্যবসায়ী, কি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কারোই পরবর্তীকালের ইতিহাসবিদদের মত পশ্চাদ্দৃষ্টি ছিল না। এক বিশেষ কর্মধারা (ধরা যাক আত্মহত্যার উদ্যোগ) পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নি (আগের তুলনার জের টেনে বলা যাক আত্মহত্যায় উদ্যোগী নিজেকে হত্যা করতে ব্যর্থ হল), সে ব্যাপারটা, ওই কর্মটি কখনও ঘটেনি, ভাবার কোনও কারণ নয় (তা হলে তো আত্মহত্যার চেষ্টার জন্য কোনও শাস্তি দেওয়া হ'ত না)। একান্তভাবে সাম্রাজ্যের মধ্যেই বিনিয়োগ হয় নি এই তথ্যের ভিত্তিতে একথা বলা চলে না যে সাম্রাজ্যের সঙ্গে বিনিয়োগের কোনও সম্পর্ক নেই। ঐতিহাসিক তথ্যাবলী থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে সাম্রাজ্যের বাইরে বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা ক্রমশ বেশি আকর্ষনীয় বলে প্রমাণীত হয়েছিল। কিন্তু বিনিয়োগকারীদের উপর অলৌকিক ভবিষদ্দৃষ্টি আরোপ করা চলে না। এমন কি

বিনিয়োগকারী ও সাম্রাজ্যস্রষ্টাদের পক্ষে যা জানা সম্ভব ছিল তাও তাদের বাস্তব খবরাখবরের পাল্লার মধ্যে না এসে থাকতে পারে। কতখানি খবরাখবর জানা যাচ্ছে তা স্বভাবতই বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। অসম্পূর্ণ খবরাখবরের ভিত্তিতে বিনিয়োগ, কাঁচামাল কাজে লাগান ইত্যাদির জন্য যে সব দেশকে বেশ উপযুক্ত মনে হত, সে সব দেশের উপর রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার বা বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই সম্ভব। এখনও পর্যন্ত স্বল্পোন্নত দেশে বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের পক্ষে অত্যাবশক বিষয়গুলি সম্পর্কে খবরাখবর অল্পই পাওয়া যায়, আর বিগত শতাব্দীতে সে সব খবর আরও কম পাওয়া যেত, কাজেই বিরাট বাজার সম্পর্কে দিবাস্বপ্ন, প্রমাণ নিরপেক্ষ "সহজাত" ব্যবসাবুদ্ধি, স্বার্থান্বিত চক্রগুলির দ্বারা উত্থাপিত স্লোগান মেনে নিতে তৈরি থাকা, লাভ জনক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে মন-গড়া চিন্তা ইত্যাদি—একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিত। এশিয়াখণ্ডে অধিকৃত দেশগুলি সম্পর্কে এই ধরণের অনেক আশা অলীক প্রমাণিত হয়েছিল এবং মূলধন অন্যত্র চলে গিয়েছিল। কিন্তু যতক্ষণ সে মোহ ছিল ততক্ষণ তা সাম্রাজ্যের ক্ষুধায় মদত যুগিয়েছিল। ব্রিটিশ পুঁজি যে এলাকায় কাজ করছে সেখানকার উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও তার চলে, এই উপলব্ধি যদি বাড়তেও থেকে থাকে, তবু অপরাপর শক্তির সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশে পুঁজি নিয়োগ সহজ ছিল না। এই ধরনের অধীন উপনিবেশে শাসক দেশ ছাড়া অপরাপর দেশ থেকে পুঁজির আগমন বিনা বাধায় হত না। সরকারি ঋণ-পত্রের মারফৎ বিদেশে নতুন ব্রিটিশ বিনিয়োগের ১ শতাংশ মাত্র বিদেশের অধীনস্থ দেশগুলিতে গিয়েছিল (যথা জার্মানআফ্রিকায় ও ডাচ ইণ্ডিজ-এ)।[১৬০] কাজেই নেতিবাচক দিক থেকেও আনুষ্ঠানিক সাম্রাজ্যের একটা গুরুত্ব ছিল।

শেষত, বিদেশে নিয়োজিত ব্রিটিশ পুঁজির একটা ক্ষুদ্র অংশ যাদের আয়ত্তে ছিল সেই ব্রিটিশ ভারতীয় স্বার্থ-গোষ্ঠীর প্রভাবকে আমরা কি অতিরঞ্জিত করছি? একটা স্বার্থ-গোষ্ঠীর প্রভাব তার বিনিয়োগ, মোট ব্যবসায়ের পরিমাণ, ইত্যাদির অনুপাতিকনা হয়ে তারবেশিও হতেপারে। আধিপত্যকারী দেশের মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের কেবল সামান্য অংশও যদি একটা অধীন দেশ বা উপনিবেশে লগ্নি করা হয়, যদি মোট ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র অংশও সেই উপনিবেশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহলেও (পুঁজিপতি বা ব্যবসায়ী বৃহত্তর অংশের মনে অপরাপর স্বার্থের কথা আছে

বলে) উপরোক্ত বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ীদের সংশ্লিষ্ট উপনিবেশ সম্পর্কে কিছু কম আগ্রহ থাকে না। ছোট স্বার্থ-গোষ্ঠীর প্রয়াস খাটো করে দেখা উচিত নয়। সমগ্র বিশ্বে মোট ব্রিটিশ বিনিয়োগের সঙ্গে ভারতে ব্রিটিশ বিনিয়োগের যে অনুপাত ভারতে সক্রিয় ব্রিটিশ স্বার্থগোষ্ঠীগুলির প্রভাব ঠিক সমান অনুপাতে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত নয়; আর নীতি নির্ধারকেরাও স্বার্থগোষ্ঠীগুলির "ওজন" একেবারে ওই অনুপাত অনুযায়ী নিক্তিতে মেপে নিতেন না; কিন্তু এই ভুল ধারণাই নিহিত আছে সেই বহুল প্রচারিত মতের পেছনে যে সাম্রাজ্যগুলিতে লগ্নিকৃত অর্থের ক্ষুদ্রতা প্রমাণ করে যে সাম্রাজ্য-ঘটিত নীতি নির্ধারণে বিনিয়োগ একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল না।

১৮৬৫-১৯১৪ সালের মধ্যে বিদেশে ঋণ পত্রের মারফৎ নতুন ব্রিটিশ বিনিয়োগের খাত-ওয়ারি বিভাগ করলে দেখা যায় যান-বাহন, রাস্তা-ঘাট, বানিজ্য-পোত নির্মাণ ও পূর্তকর্মে একটা মোটা ভাগ গিয়েছে: এই সব খাতে নিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ মোট পুঁজির ৬৯ শতাংশ (এর মধ্যে রেলপথের জন্য ৪১ শতাংশ); কাঁচামাল সং.ান্ত শিল্পে (কৃষি সংক্রান্ত ও খনি সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ) ১২ শতাংশ এবং শিল্পজাত দ্রব্য নির্মাণে ৪ শতাংশেরও কম। Simon এই থেকে সিদ্ধান্ত টেনেছেন "অতএব প্রাথমিক উৎপাদনকারী জাতিগুলির বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ইউরোপে রপ্তানি করার জন্য যে সব সুযোগ-সুবিধা দরকার সেইগুলির উন্নয়নের উপরই জোর দেওয়া হয়েছিল।"[১৬১] ভারতে রেলপথ সংক্রান্ত বিনিয়োগ বিষয়ক গবেষণায় Macpherson এবং Thorner দেখিয়েছেন যে ম্যাঞ্চেস্টার তুলা-স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলি রেলপথের উন্নতিতে সাগ্রহে মদত দিয়েছে: কাঁচা-মাল সরবরাহের আশা এ বিষয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল।[১৬২] ভারত থেকে তুলো সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ম্যাঞ্চেস্টারের আগ্রহ আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে বিশেষ করে তীব্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরবরাহের উপর ব্রিটেনের নির্ভরশীলতা কমানর উদ্দেশ্যে কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন সাম্রাজ্যের মধ্যে তুলো সরবরাহ উন্নত করার জন্য সবিশেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। (সরকারি হস্তক্ষেপের জন্য যাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁরা ছোট আঁশ-ওয়ালা ভারতীয় তুলো ব্যবহারের কৃৎকৌশলগত সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। এই ব্যাপারটা ভারতের সম্ভাব্য উৎপাদন সম্বন্ধে সংবাদের অবস্থা কত শোচনীয়

ছিল তা উদ্‌ঘাটিত করে ; ভারতীয় তুলো নিয়ে সমস্যা কি সেগুলি জানাজানি হবার পর এবং গৃহযুদ্ধের শেষে ১৮৬৪-৬৫ সালে আমেরিকা থেকে সরবরাহ আবার চালু হবার পর এই আন্দোলন থেমে গিয়েছিল)। প্রথম দুই ফিনান্স-মেম্বার-Wilson ও Layingকাঁচামাল সরবরাহকারী হিসাবে ভারতের ভূমিকার উপর যে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন এবং সেই নীতি যে পরে চালু থেকে ছিল সে কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৬০ ও ১৮৭০ সালের মধ্যে তুলোর রপ্তানি (সরকারি মূল্যে) আড়াই গুণ বেড়েছিল, কাঁচা পাটের বেড়েছিল ৬ গুণ এবং চামড়া রপ্তানি বেড়েছিল ৩ গুণ। মোট পণ্য রপ্তানির মধ্যে বয়ন শিল্পের কাঁচামাল (তুলো, পাট, রেশম ও পশম) রপ্তানি ১৮৬০-৬১ সালে ছিল ২৮ শতাংশ এবং ১৮৭০-৭১ সালে ছিল ৪৩ শতাংশের ও বেশি।[১৬৩] রেলপথ ও রাস্তা নির্মাণের কর্মনীতি ও শুল্কনীতি উভয়ের উপরেই কাঁচা মাল রপ্তানি বৃদ্ধিতে বৃটিশ স্বার্থের ছাপ দেখা যায় ; মোট বিচারে মনে হয় যে কাঁচামালের জন্য এই আগ্রহ বৃটেনের উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র খোঁজার চেয়ে প্রবলতর ছিল ভারতে বিটিশ বিনিয়োগের যে ঝোঁক দেখা যায়, যথা রপ্তানিমুখী চা বাগিচা ও নিষ্কাশন শিল্পে, অথবা রেলপথে বিনিয়োগ (যার একটা বড় অংশ খাস ব্রিটেনেই যন্ত্রপাতির উপর লগ্নি হয়েছিল), তার উদ্দীপক (linkage effect) প্রভাবের অভাব নিয়ে নীতি নির্দ্ধারকেরা মাথা ঘামান নি। আর সাম্রাজ্যের মধ্যে পরিপূরক বিকাশের নয়ামার্কেন্টিলিস্ট দৃষ্টি ভঙ্গির কথা মনে রাখলে এটাই প্রত্যাশিত। এদিকে ব্রিটিশ মূলধন-এবং এজেন্সি হাউজগুলির হাতে যে ব্রিটিশ মালিকানার পুঁজি ভারতেই সংগৃহীত তা ভারতকে "উন্নত করেছিল" এ কথা বাজেট পাশের দিনে ফিনান্স মেম্বার ও লেজিস লেটিভ কাউন্সিলের চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধির মধ্যে বাৎসরিক আনুষ্ঠানিক ভাষণ বিনিময়ে একটা পারস্পরিক অভিনন্দনের বিষয়বস্তু ছিল।

সরকারের ভূমিকাটা ধরে নেওয়া হত সম্ভব হলে নিষ্ক্রিয় এবং প্রয়োজন হলে সক্রিয় হবে—আর প্রয়োজন কদাচিৎই হত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে শিল্প-ক্ষেত্রে ব্রিটেনের নেতৃত্ব তর্কাতীত ছিল এবং ব্রিটিশ অর্থ-বিষয়ক ও বাণিজ্যিক স্বার্থগুলিকে সাহায্যের জন্য হস্তক্ষেপ কেবল মাঝে-মাঝে প্রয়োজন হত। ১৮৭০ সালের পূর্ববর্তী পর্যায়ে পৃথিবীর অপরাপর অংশে ব্রিটিশ নীতিকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে "অবাধ বাণিজ্যের সাম্রাজ্যবাদ" বলে। এই নীতির

সারমর্ম Carlyle-এর : একটা কথার রকমফের করে বলা চলে সম্ভব হলে পুলিশ ব্যবহার, না করেই ঢালাও ব্যবসা, প্রয়োজন হলে পুলিশ এবং ব্যবসা অথবা Galagher ও Robinson-এর ভাষ্য অনুযায়ী : সম্ভব হলে ইংরাজ শাসন বিনা বাণিজ্য, প্রয়োজন হলে শাসন সহ বাণিজ্য।[১৬৪] বাইরে এই সীমিত হস্তক্ষেপবাদ (interventionism) ভারতে অনুসৃত কর্মনীতির সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলত ; ভারতে বৃটিশ কর্মনীতিকে অপেক্ষাকৃত লাগসই সংজ্ঞার অভাবে আমরা বৈষম্যমূলক হস্তক্ষেপবাদ বলে অভিহিত করছি। কতকগুলি ক্ষেত্রে সরকার হস্তক্ষেপ না করার নীতি বজায় রাখত, যথা রাস্তা-ঘাট ও সেচ খরচের খাতে সরকারি ব্যয়ের সীমা নির্ধারণ, আয় পুনর্বণ্টনকামী ক্রমবর্ধমান আয় কর নীতি বিবেচনা না করা, দেশীয়শিল্পকে আমদানী শুল্ক দ্বারা রক্ষা করতে অস্বীকৃতি, বারংবার দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব সত্ত্বেও খাদ্যশস্য চলাচলে হস্তক্ষেপ না করা, শিল্প ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে অনিচ্ছা, আবার অন্যান্য কতকগুলি ক্ষেত্রে সরকারি ক্রিয়াকলাপ অবাধ নীতির সঙ্কীর্ণ পথ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগকে অনুদান করতে বা "গ্যারাণ্টি" দিত, চা ও কফি বাগিচায় বিনিয়োগকে সাহায্য করার জন্য ভূমিসংক্রান্ত নিয়ম-কানুনের পরিবর্তন করত। তুলো জাতীয় কাঁচামাল উৎপাদন বাড়ানোর জন্য অসাধারণ চেষ্টা করত এবং কাঁচামালের বৈদেশিক রপ্তানী ব্যবসায়ের স্থায়ী খরচ ও যান-বাহন ব্যবস্থার জন্য সরকারী খাতে বিনিয়োগের পক্ষে ঝোঁক বাড়াত। বেশির ভাগ ব্রিটিশ স্বার্থ-গোষ্ঠীই কেবল চাইত যাতে তাদের অনুকূল অবাধনীতি চালু থাকে (কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন এর গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম), '৬০-এর দশকে ব্রিটিশস্বার্থ-গোষ্ঠীর পক্ষে এর বেশি কিছু বড় একটা প্রয়োজন হ'ত না।

১৮৭০ সালের পরবর্তী পর্যায়ে সাম্রাজ্যের বাইরে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের মধ্যেকার সংযোগ একটি বহু বিতর্কিত বিষয় সাম্রাজ্যবাদের Hobson-পন্থী সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া নানা ধরণের দেখা গেছে:একটা অতি সাধারণ প্রতিক্রিয়া এই যে "একক অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় চলবে না"।.আবার অপেক্ষাকৃত আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়াও দেখা যায় : উদাহরণ স্বরূপ P. T. Bauer-এর মত যে "রাজনৈতিক উপনিবেশিকতাবাদের তথা-কথিত শোষক চরিত্র" ব্যাপক ভাবে প্রচারিত কারণ উন্নত দেশের বুদ্ধিজীবীরা "সেই সমাজ সম্বন্ধে অনীহা পোষণ করতেন যা তাঁরা যাকে উচিত প্রাপ্য মনে

করেন সেই খ্যাতি ও ক্ষমতা তাঁদের দেয় না" ; তাই এই বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের অনীহা অনুন্নত দেশগুলিতে প্রচার করেছেন উপনিবেশিকতার উপর শোষক চরিত্র আরোপ করে।[১৬৫] ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়ায় একটা ফল সাম্রাজ্য সংক্রান্ত ইতিহাসে অর্থনৈতিক উপাদানগুলির পাল্টা নিছক রাজনৈতিক উপাদানগুলিকে বড় করে তুলে ধরা। একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই যে Fieldhouse বা Gaelagher, অথবা Robinson ও Denny ইউরোপের নতুন কূটনৈতিক ছকের এবং রাজনৈতিক নিরাপত্তা সন্ধানের নিরিখে ১৮৭০ পরবর্তী সাম্রাজ্যের জন্য লড়াইকে ব্যাখ্যা করার ভিতর দিয়ে বাণিজ্যিক স্বার্থগুলির গুরুত্বকে খাটো করে দেখেছেন কি না।[১৬৬] D. C. M. Platt-এর সাম্প্রতিক গবেষণা (১৯৬৮) থেকে মনে হয় যে ব্রিটিশ নীতি নির্ধারণে অর্থ-ব্যবস্থা ও বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট স্বার্থগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই নিয়েছিল : "১৮১৫ থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে ব্রিটিশ বৈদেশিক নীতির ধারাবাহিকতা প্রচলিত রাজনৈতিক কূটনীতির সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। এই ধারাবাহিকতা নিহিত ছিল ব্রিটিশ নীতির দুটি প্রধান সূত্রে : জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং পৃথিবীর বাজারগুলিতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের ন্যায্য ও সমান সুযোগ সৃষ্টি করা ও বজায় রাখা।"[১৬৭] সাম্প্রতিক গবেষণায় মনে হয় যে এই দুটি উপাদান —অর্থাৎ নিরাপত্তা এবং অর্থনীতিক উদ্দেশ্য সমূহ-নিম্নোক্ত কারণগুলির জন্য ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত : শিল্পায়নের মধ্যে নিহিত বিশেষীকরণ, (Specialisation) আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাগের মাত্রা বৃদ্ধি, শিল্পোন্নত ইংলণ্ডের মধ্যে পাওয়া যায় না এমন সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা, এবং স্বনির্ভরতা হারানোর ফলে বিপন্ন নিরাপত্তার খাতিরে কাঁচামাল ও বাজারে প্রবেশ লাভের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার।[১৬৮]

অসম্পূর্ণ হলেও ভূমিকার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি বর্তমান রচনায় যে বিষয়কে আমরা সামনে তুলে ধরছি তার পশ্চাদপট হিসাবে কাজ করতে পারে। Dean Swift লিখেছিলেন "আফ্রিকার মানচিত্রের ফাঁক পূরণের জন্য ভূগোলবিদরা হাতী আঁকেন।" ভারতবর্ষের ইতিহাস রচয়িতাদের পক্ষেও এই সুবিধাজনক কৌশল লোভনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্থনৈতিক ইতিহাসের স্বীকৃত ভাষ্য পুনঃ পরীক্ষায় সম্প্রতি যে সব অগ্রগতি হয়েছে তার ফলে আমাদের জ্ঞানের ফাঁকগুলি এখন স্পষ্ট হয়ে

উঠছে। কয়েকটি সুবিদিত উদাহদণ দেওয়া যাক: এ কথা দেখান হয়েছে যে ১৮৮১ সালের পরবর্তীকালে শিল্প-বিনাশের বিষয়ে আদমসুমারি সংশ্লিষ্ট সংখ্যাতত্ত্ব থেকে পাওয়া তথ্য নির্ভর যোগ্য নয়, বিদেশে ব্রিটিশ বিনিয়োগ সংক্রান্ত গবেষণা ১৮৭১ সালের পরবর্তী কালপর্যায়ে সাম্রাজ্যে ব্রিটিশ মূলধন আসা সম্পর্কিত পুরাণো ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে, ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বয়ন শিল্পের বিনাশ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত মত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সেচ ব্যবস্থায় সরকারি বিনিয়োগের ফলাফল এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ও আভ্যন্তরীণ অর্থনীতির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া—উভয়েরই পুনঃ পরীক্ষা চলছে।[১৬৯] যে সব সমস্যা নিয়ে আমরা পর্যালোচনা করছি তার দরুন কখনও কখনও এই ধরনের প্রশ্ন নিয়ে কথা প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনা করতে হয়েছে। তার সব কিছু নিয়ে গভীর ভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভবও ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। এই সব চলতি বিতর্ক অবরোহ-অনুমান এর (deductive - hypothetical) স্তরে পরিচালিত হয়েছে এবং এগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য সাপেক্ষে অমীমাংসিত প্রশ্ন বলেই বিবেচনা করতে হবে। (উদাহরণ স্বরূপ এই প্রশ্নগুলির মধ্যে আছে ঐতিহ্যবাহী দেশীয় শিল্পগুলির বিনাশ সম্পর্কে সাধারণ ভাবে স্বীকৃত ধারণার সমালোচনা।) এ কথা বলা বাহুল্য যে বর্তমান রচনাটির ১৮৫৮ থেকে ১৮৭২ সালের ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ইতিহাস হয়ে ওঠার দাবি বা উদ্দেশ্য নেই।

শেষত, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি পাদ-টীকা দেওয়া যাক। স্বার্থগোষ্ঠীগুলি ও নীতি-নির্দ্ধারকদের মধ্যেকার পারস্পরিক ক্রিয়া (জোটবদ্ধ ও প্রতিযোগী গোষ্ঠীগুলির উল্টোপাল্টা চাপ, সিদ্ধান্ত-গ্রহণকারীদের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যের উপর পরিবেশের প্রতিবন্ধক, সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করত যে সব অযৌক্তিক উপাদান ও প্রবণতা, অনিশ্চয়তা ইত্যাদি) সম্পর্কে অমাদের পর্যালোচনা একত্র করে দেখলে একটা জটিল ছবি ফুটে ওঠে। এখন প্রশ্ন এই যে এই যুক্তি দেওয়া কি ঠিক হবে নীতিনির্দ্ধারক বা শাসকবর্গের দ্বারা প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত অনন্যভাবে নির্ধারিত হত এবং ফলত কর্মনীতির একটা সামগ্রিক ধারা বা গতিপ্রকৃতির কথা বলা মানে পা কেটে মানুষকে খাটে ঢোকানর মত (Procrustean bed) করে তথ্যকে জোর করে ছকে ঢোকান ? ("অদৃষ্টবাদের" ও "পূর্ব-নির্ধারিত ধারণার" সমালোচকেরা এই procrustean bed-এর বাঁধা বুলিটি সবিশেষ পছন্দ করেন)। এই

রকম বহু আপাত-সত্য যুক্তি উপস্থিত করা যেতে পারে, যথা : ম্যাঞ্চেস্টারের স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলিকে শুল্ক সম্পর্কিত সুবিধা দেওয়া হত না যদি, ধরা যাক, জারশাসিত রাশিয়া আরও আগ্রাসী হত এবং ভারত সাম্রাজ্য রক্ষা করার খরচ যদি আরও বেশি হত ; আয়কর বসত না যদি 'London Economist' এর James Wilson-এর বদলে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের Bartle Frere (Wilson-এর মৃত্যুর পর অস্থায়ী ফিনান্স মেম্বার) ফিনান্স মেম্বার নিযুক্ত হতেন, কারণ Frere সাধারণ ভাবে এই উদ্ভাবনের সঙ্গে পরিচিতও ছিলেন না, এসব পছন্দও করতেন না ; ভারতীয় অর্থব্যবস্থাকে খানিকটা ভারমুক্ত করার জন্য সামরিক ছাঁটাই কার্যকর করা হত যদি Napier of Magdala-র (ছাঁটাই প্রস্তাবিত হবার সময়ে যিনি কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ ছিলেন) মতন ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক বিদ্রোহের স্মৃতি তাজা থাকতে থাকতে Mayo-র ছাঁটাই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে খাড়া না হতেন ; আমেরিকায় যদি গৃহযুদ্ধ না হত তাহলে ভারত থেকে তুলোর সরবরাহ বাড়ানর জন্য ব্রিটেনে কোনও চাপ সৃষ্টি হত না—ইত্যাদি। এই রকম সব ঐতিহাসিক 'যদি'র আলোচনা নিরর্থক। প্রকৃতপক্ষে বিপরীত এরকম তর্ক করাও সম্ভব যে ম্যাঞ্চেস্টার যদি ভারত সরকারের কাছ থেকে শুল্ক ছাড় আদায় করে নিতে না পারত তা হলে এটা অসম্ভব নয় যে ভারতীয় উৎপাদনের উপর সরকারী (countervailing) অন্তঃশুল্ক বসে যেত, এবং দেখা যায় যে ১৮৬২ সালেই Wood এ রকম একটা শুল্কের প্রস্তাব করেছিলেন ; এ-রকম তর্কও সম্ভব যে আয়করের পরিকল্পনা নিয়ে Wilson-এর আবির্ভাবের আগেই ব্যবসা ও বৃত্তির উপর নানা রকম প্রত্যক্ষ করের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল ; এ যুক্তি দেওয়াও সম্ভব যে ইণ্ডিয়া অফিস যদি বিদ্রোহ-এর ব্যপার ভুলে গিয়ে এবং Napier কে অগ্রাহ্য করত তাহলেও এ কথা কল্পনাতীত যে ভারত সামরিক ব্যয়ভার থেকে মুক্ত হত, কারণ ব্রিটেনের ভারত-বহির্ভূত সাম্রাজ্যের স্বার্থ ভারতে এক বৃহৎ সামরিক ঘাঁটির দাবি করছিল বলেই এই ব্যয়ভার বাড়ছিল ; এ যুক্তিও দেওয়া যেতে পারে যে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু হবার ঢের আগে থেকেই সাম্রাজ্যের মধ্যে কাঁচামালের ব্যপারের স্বনির্ভরতার জন্য ম্যাঞ্চেষ্টারের প্রয়াস শুরু হয়েছিল।[১৭০] উদাহরণের সংখ্যাবৃদ্ধি নিরর্থক পরিশ্রম। চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি যে খেলা খেলত তাতে কারও জিৎ হত কারও হার হত। প্রত্যেকটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের (যার মধ্যে দিয়ে কোনও স্বার্থগোষ্ঠীর লাভ হত কারও ক্ষতি হত) একেবারে সঠিক চেহারা

ও সময় সম্বন্ধে ভবিষ্যবানী যদিও করা যেত না, তবু সামগ্রিক ভাবে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ার ফলাফলগুলিকে দেখলে যে অবশ্যম্ভাবী প্রবণতা দেখা যায় তাকেই শাসন নীতির ধারা বা গতিপ্রকৃতি বলা যায়। টুকরো ছবি জোড়া দেওয়ার খেলার মতন টুকরো সিদ্ধান্তগুলি যৌথভাবে একটা ছক তৈরি করে তোলে।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা যতদূর সম্ভব বিশেষজ্ঞদের ব্যবহৃত উপভাষা এড়াতে চেষ্টা করেছি—অর্থাৎ যেসব দুরূহ শব্দগুল সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষক কিছু রাজনীতি-বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদেরা বর্তমানে ব্যবহার করেন। একটা শাসন নীতির (উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্প্রসারণ না করার সিদ্ধান্ত (১৭২-৯২ পৃষ্ঠায় দেখুন) উদ্ভবকে বহু পাঠকের কাছে যা অপরিচিত অর্থহীন বাক্যসমষ্টি মনে হবে তেমন ভাষায় ভারাক্রান্ত না করে সরাসরি ঐতিহাসিক বিবরণ হিসাবে উপস্থিত না করতে পারার কোনও কারণ আছে বলে মনে হয় না। উপরন্তু সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাতের বর্ণনা ঘটিত তুচ্ছাতিতুচ্ছ বহু ব্যাপারকে সহজেই বাদ দেওয়া যায় বলে মনে হয়। সিদ্ধান্ত-গ্রহণের বিশুদ্ধ প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণেরও কার্যকারিতা থাকতে পারে, কিন্তু এই অনুসন্ধানের সেটাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আনুষ্ঠানিক কাঠামো উপস্থিত করা হয়েছে, আর আনুষ্ঠানিক-আইনগত কাঠামোর বাইরে সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করত যে সব উপাদান মুখবন্ধের এই পরিচ্ছেদে আমরা সেগুলির ইঙ্গিত দিতে চেষ্টা করছি। এই সব উপাদানের, বিশেষত ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে এই সব স্বার্থগোষ্ঠীগুলির ভূমিকার, আরও বিস্তারিত অনুশীলন সম্ভবত সাম্রাজ্যবাদী সরকারি ব্যবস্থার কর্মপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে, পরস্পর বিরোধী প্রভাবশালী স্বার্থগোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে এবং যে শাসন নীতি একটা বিদেশীশাসনের প্রতি বশ্যতা আদায় করেছিল ও তার স্থায়িত্ব বজায় রাখতে সাহয্য করেছিল তার সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধি আনতে পারে।

Mannheim যে বলেছিলেন "কেউ আমরা অশরীরী সত্যের অপার্থিব শূন্যে বিরাজ করি না"—সে কথার পুনরাবৃত্তির বোধহয় প্রয়োজন নেই।[১১১] কোনও ভারতীয় যখন, যে সব বিদেশী ভারতকে শাসন করেছিলেন তাঁদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করেন তখন "সহানুভূতির

অভাব" কাটিয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সহজ হয় না। আমাদের দেশের জনজীবনকে সাংঘাতিক ভাবে প্রভাবিত করেছে যেই সব ব্যাপার সেগুলিকে নিস্পৃহ ভাবে দেখাও কিছু সহজতর ব্যাপার নয়। নিজের বস্তুনিষ্ঠতার এই সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রয়েছি এ রকম ভান করাটা নিরর্থক। তবে উপস্থাপিত যুক্তি বস্তুনিষ্ঠ সাক্ষ্যের শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবহারের নিরিখে সমর্থন যোগ্য কি নয় পাঠকের পক্ষে তা বিচার করা সম্ভব হওয়া উচিত। যে সব নতুন প্রশ্ন এখানে তোলা হয়েছে তার অনেকগুলিই ভারত সাম্রাজ্যের অর্থশাস্ত্রের (Political Economy) [ইচ্ছা করেই আমরা অনেকটা যেন সেকেলে শব্দটি ব্যবহার করেছি] অনেক প্রশ্নের সঙ্গে সাধারণভাবে জড়িত। এর কিছু প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর এখনও দেওয়া সম্ভবপর নয়। আশা করা যায় বর্তমান রচনাটি এই সব প্রশ্নগুলির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণে সাহায্য করবে।

উল্লেখিত পুস্তকাদি (References)

১ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পাঁচ বছর আগে Charles Lamb সম্ভবত এই পর্যালোচনাটি Booth-এর 'Tables of Simple Interest' (London 1818), নামক গ্রন্থের প্রথম সাদা পাতাটিতেই হিজিবিজি করে লিখে রেখেছিলেন। MSS Eur. C. 128, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, S. C. Sutton-এর 'India Office Library' (London, 1967) পৃষ্ঠা ১৯-এ উদ্ধৃত।

২ Fin. Progs. ১৮৬০ এর ডিসেম্বর, ২নং, Charles Trevelyan কর্তৃক লিখিত Minute ১২ই মে ১৮৬০।

৩ উদাহরণ স্বরূপ Charles Wood-এর কাছে লেখা Charles Trevelyan-এর চিঠি পত্র দেখুন, ১২ই অক্টোবর ১৮৬৪, Trevelyan Papers, Letter book, ভল্যুম ৪৪ (Trevelyan অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভাবে এ কথা অস্বীকার করেছিলেন যে তিনি "বাগিচা স্বার্থের" প্রতি বিরূপ ছিলেন) ; Mayo-র নিকট Argyll, ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৭, ৭নং (ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় রেলপথ পরিকল্পনাটিকে "বর্তমানে খুবই গোপনীয়" রাখতে Argyll Mayo-কে

পরামর্শ দিয়েছিলেন—"বর্তমানে খুবই গোপনীয়" "কথা কটি মোটা কালিতে দাগ দেওয়া ছিল—যাতে রেলপথ স্বার্থকে উদ্বিগ্ন না করা হয়) Argyll-এর নিকট Mayo, ৯ই নভেম্বর ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪১, ৩০০ নং (ভারতে ইউরোপীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সম্পর্কে Mayo)। ব্যবসাগত স্বার্থ সম্পর্কে এই ধরনের স্পষ্ট উল্লেখ (এবং পরে উল্লেখিত এই রকম আরও কিছু) সরকারি চিঠিপত্রের তুলনায় সেক্রেটারি অব স্টেট গভর্নর জেনারেল ও ফিনান্স মেম্বারদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রেই বেশি পাওয়া যেত। এ সাবধানতার জন্য অপরাপর কারণের মধ্যে অন্যতম ছিল জনগণের দৃষ্টি থেকে মতের কিছু খোলাখুলি অভিব্যক্তি গোপন করা ; Mayo-র তাচ্ছিল্য, Trevelyan-এর খুঁতখুঁতে মেজাজ ইত্যাদির কথা জানলে তাঁদের স্বদেশবাসীদের কি যে প্রতিক্রিয়া হত ভারতেও মজা লাগে। (ভারতে বেসরকারি ইউরোপীয়দের সম্পর্কে Mayo লিখেছিলেন "কালা আদমিদের কাছ থেকে যত পারা যায় টাকা লুটবার জন্যই ওঁরা এখানে আসেন "); Trevelyan বলেছিলেন ("আমরা আর কি বেশি করতে পারতাম তা বললে ম্যাঞ্চেস্টারের চেম্বার অব কমার্সের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব")। Argyll-এর নিকট Mayo, ৯ই নভেম্বর ১৮৭০, পূর্বোল্লেখিত স্থানে দ্রষ্টব্য ; Wood-এর নিকট Trevelyan, Trevelyan Papers, Letter book, ভল্যুম ৪২। এখানে কেবল কাজে লাগার মত হাতিয়ার নিয়েই আমরা আগ্রহী এবং তত্ত্ববাগীশরা যে সব চুল-চেরা অর্থ নিয়ে বিতর্কে মেতে ওঠেন তার মধ্যে প্রবেশের কোনও দরকার নেই। চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা স্বার্থ গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক গবেষণা একান্ত ভাবে পশ্চিমী রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে—এবং এই গবেষণা-লব্ধ তত্ত্ব উপনিবেশিক ও অ-গণতান্ত্রিক এশিয় দেশগুলি সম্পর্কিত গবেষণায় প্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে। H. W. Ehrmann সম্পাদিত 'Interest Groups on Four Continents' (Pittsburgh, 1958) একটি চিত্তাকর্ষক তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থিত করেছে এবং David B. Truman-এর 'The Governmental Process' (New york, 1951) হল A. F. Bentley-র 'The Process of Government' (Chicago, 1908) প্রকাশিত হবার পর থেকে ঘটনাবলীর বিকাশের একটি

নিরীক্ষা ; Harry Eckstein-এর 'Pressure Group Politics' (Stanford, 1960) বইখানিও দেখুন। চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির ভূমিকা এবং সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থাবলী যা,আধুনিক বিশেষত সমসাময়িক ইতিহাসের উপর আলোকপাত করতে পারে, তার উপর সাম্প্রতিক গবেষণাগুলির তালিকা তৈরী করা নিরর্থক হবে এবং বস্তুত অসম্ভব। ১৯৫৪ সালে R. C. Snyder, H. W. Bruck and B. Sapin-এর 'Decision making as an approach to the Study of International Politics' প্রকাশের পর থেকে (Foreign Policy Decision Making ; Free Press of Glenkoe, 1962 দেখুন) —এই সব নিয়ে শুধু বৈদেশিক নীতিসম্বন্ধে সিদ্ধান্তগ্রহণসম্পর্কে গাদা-গাদা প্রবন্ধের জন্যই রীতিমত একটি গ্রন্থ-বিবরণীর প্রয়োজন ; এর মধ্যে কয়েকটিঐতিহাসিকদের প্রকৃত আগ্রহের বিষয়বস্তু (যথা, R. J. C. Butow-এর 'Japan's Decision to Surrender', (Standford, 1965)। আমরা চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কথাটি ব্যবহার করেছি ; অনেক ইংরেজ লেখক তার জায়গায় 'লবি' কথাটি অধিকতর পছন্দ করেছেন বলে মনে হয়। ইতিহাসবিদদের শব্দ তালিকায় সম্প্রতি নতুন শব্দ যোজনা অবশ্যই একথা বোঝায় না যে এই সব ঘটনাবলী ও প্রক্রিয়াগুলি ইতিপূর্বে তাঁদের মনোযোগ আকর্ষণ করেনি।

৫ আমরা আগে থেকে তৈরি কোনও শ্রেণী নির্দেশক (typological) ছক ব্যবহার করিনি। বোধগম্য হয় এমন ভাবে উপাত্তগুলিকে (data) সাজিয়ে এটা দেখানর চেষ্টা করা হয়েছে যে এখানে কতকগুলি আলাদা আলাদা ধরনের চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ছিল।

৬ Home Rev. Progs. ৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৬০, ১৫নং (পারসিক বিভাগ)। ১৮৬০ সালের ১৫ই জুন নেরিয়াদ জেলার, কয়রা, অধিবাসীদের পক্ষ থেকে দরখাস্ত। পূর্বোক্ত, এপ্রিল, ১৮৬৭, ৭নং, কলকাতার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি ঃ পরবর্তী ১৭৮ পৃষ্ঠা (বোম্বে দরখাস্ত) দেখুন।

৭ 'Bengal Directory' (Calcutta, 1858), 'বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স' ; Tyson কর্তৃক লিখিত বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স-এর ইতিহাস, ইচ্ছাকৃত তুষ্ণীভাব ও আত্মপ্রশংসামূলক সুর থাকা সত্ত্বেও এই

বইটিতে যথেষ্ট খবরাখবর আছে। বোম্বে ও করাচি চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত ঐতিহাসিক বিবরণ সম্পর্কেও এ কথা সত্য।

৮ Home Rev. Progs. এপ্রিল ১৮৬৭, ২০ নং। ১৮৬৭ সালের ২২শে এপ্রিল সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে কলকাতার ব্যবসায়ী সমিতির মাস্টার, কমিটি ও সদস্যদের দরখাস্ত। পূর্বোক্ত, মার্চ ১৮৬৭, ৫৫ নং ভাইসরয়ের নিকট দরখাস্ত, ১৫ই মার্চ ১৮৬৭।

৯ P. P. H. L. ১৮৬৩, ভল্যুম ২২ কোড ৮৭, পৃষ্ঠা ১৬০-৬২, ল্যাণ্ড হোল্ডার্স ও কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি, ৩১শে মে ১৮৬১; ইণ্ডিগো প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ২০শে নভেম্বর ১৮৬০; কুর্গের কফি প্ল্যান্টার্স, ২৫শে জুন ১৮৬২; কাছাড়ের সুরশিপুর চা কোম্পানির ডিরেক্টরবৃন্দ, ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬১।

১০ ১৮৫৭ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোর্ট অব ডাইরেক্টরস্‌দের কাছে কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশনের স্মারকলিপি; সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ২৬শে জুলাই ১৮৫৯; ভারত সরকারের নিকট ৩রা এপ্রিল, ১৮৬০ Issac Watts-এর 'The Origin and Progress of Catton Supply Association' (Manchester, mdccclxxi) পৃষ্ঠা ১১৯, ১২৫, ১৩১; এই রচনাটি খুবই মূল্যবান দলিল পত্র সংগ্রহ, এর পর থেকে বইটি Watts নামে উল্লেখিত হয়েছে।

১১ কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশনের কিছু কিছু কাজকর্ম সম্পর্কে এস. ভট্টাচার্যের 'Laissez faire in India' 'Indian Economics and Social History Review', জানুয়ারী ১৮৬৭, পৃষ্ঠা ১-২২ দেখুন।

১২ Reformer, ১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৭, বি. বি. মজুমদার কর্তৃক উদ্ধৃত, 'Indian Political Association and Reform of Legislative 1818-1917 (কলিকাতা, '১৮৬৭, পৃষ্ঠা ২৪)।

১৩ James Routledge-এর 'British Rule and Native Opinion in India' (London, 1878), পৃষ্ঠা ২১৯-২০।

১৪ পরবর্তী ২২৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

১৫ সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জির 'A Nation in Making' (London 1925), পৃষ্ঠা ৪০।

১৬ পরবর্তী ২২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১৭ Fin. Progs. জুন ১৮৬১, অ্যাকাউণ্ট নম্বর ৬১, গভর্ণর জেনারেলের নিকট কলকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ, ৫ইজুন, ১৮৬১।

১৮ রাস্তা সেস বিল সম্পর্কে হিন্দু পেট্রিয়ট ৫, ১২, ও ১৯ শে জুন ১৮৭১; জমিদারদের উপর শিক্ষা ও রাস্তা সেস সম্পর্কে পূর্বোক্ত, ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭১, ২৩শে জানুয়ারি ১৮৭১, ১০ই জুলাই ১৮৭১।

১৯ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার। Fin. Desp. ৮৬ নং, ৩রা এপ্রিল ১৮৬৮।

২০ 'Journal of the East India Association' ভল্যুম ১, ১ নং,১৮৬৭।

২১ পরবর্তী ৩০, ৭৭, ২৭১ পৃষ্ঠায় দেখুন।

২২ পরবর্তী ১৪৩-৪৪, ২৮৩-৮৪ পৃষ্ঠায় দেখুন।

২৩ পরবর্তী ১৭৬ পৃষ্ঠায় দেখুন, ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের বম্বে শাখার দরখাস্ত, 'Journal of the E. I. A, ভল্যুম ৫, পার্ট ২, ১৮৭১, পৃষ্ঠা ১৩০-৩২।

২৪ পরবর্তী ১৩২ পৃষ্ঠায় দেখুন।

২৫ P. P. H. C. ১৮৭১, ভল্যুম ৮, কোড ৩৬৩, পরিশিষ্ট পৃষ্ঠা ৫১১, বম্বে অ্যাসোসিয়েশন ও বম্বে প্রেসিডেন্সির স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষ থেকে দরখাস্ত (১৮৭১)। স্থানীয় কর সম্পর্কে পরবর্তী ৯৬, ৯৭ পৃষ্ঠায় দেখুন; বি. বি. মজুমদার, পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৬৮-৭৩। অনিল শীলের 'The Emergence of Indian National Movement (Cmbridge. 1968), পৃষ্ঠা ২২৯-৩১।

২৬ ডি. নওরোজির 'Speeches and Writings of Dadabhai Naoroji' (Madras 1908), পৃষ্ঠা ১৭২, পরিশিষ্ট ডি, Statement to the Select Committee on East India Finance, 1871'।

২৭ J. Dickinson (১৮১৫-৭৬) Cotton and Roads in Western India, (1851), 'Dhar not Restored' (1864), 'Government of India under a Bureaucracy' (1853), ইত্যাদি প্রকাশ করেন; বিদ্রোহের পর অনুকম্পার আবেদন করার জন্য এবং ভারতের প্রতি সহানুভূতির জন্য তিনি পরিচিত।

২৮ পরবর্তী ২৭৪, ২৭৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।

২৯ ভারত সরকারের নিকট কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশনের স্মারকলিপি, ৩রা এপ্রিল, ১৮৬০, Watts পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৩১। Home Rev. Progs. ৬ই জুলাই ১৮৬১, ৭নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি, ১৫ই মে ১৮৬১। পূর্বোক্ত, ডিসেম্বর ১৮৬১, ২নং. ওই একই, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৬১।

৩০ পরবর্তী ১৩২, ২৬৯ পৃষ্ঠায় দেখুন। Fin. Progs. জুলাই ১৮৬৮, S. R. ১৪ নং, ১৮৬৯ সালের ৩১শে মে সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট কলকাতায় অনুষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভার বিনীত স্মারকলিপি।

৩১ পরবর্তী ১৯৩ পৃষ্ঠায় দেখুন। Home S. R. মার্চ ১৮৬১, ৬নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি H. W. J. Wood, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬১; ৭নং Messers Brandram Bros. এর লণ্ডনের অপরাপর ৪১টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে L Wood এর নিকট, ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৬০; ৭নং (এ), C Wood-এর নিকট ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি MacMicking, ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৬০। Home S. R. এপ্রিল ১৮৬২, ২৫ নং, কমিশনার অব কাস্টমস্-এর নিকট বম্বে চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি, ২১শে মে ১৮৬১। পূর্বোক্ত, করাচি চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারির কাছ থেকে চিঠি। পূর্বোক্ত, এপ্রিল ১৮৬২, ২৮ নং, ফোর্ট সেণ্ট জর্জ-এর বোর্ড অব রেভিনিউ-এর সেক্রেটারির নিকট মাদ্রাজ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি, ৮ই মে ১৮৬১; পূর্বোক্ত, ৪২ নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট মাদ্রাজ চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি, ২৮শে জানুয়ারি ১৮৬২; পূর্বোক্ত ৪৫ নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট মাদ্রাজ চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি, ৯ই এপ্রিল ১৮৬২। পূর্বোক্ত, ২০শে ডিসেম্বর ১৮৬২, ৮নং বম্বের গভর্নরের নিকট সিন্ধুর শোরা উৎপাদকদের ও ব্যবসায়ীদের দরখাস্ত, মে ১৮৬২। পূর্বোক্ত, ৫ই মার্চ ১৮৬১, ৮নং ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট Messrs Schoene, Kilburn & Co., এবং, কলকাতার ৪টি অপরাপর প্রতিষ্ঠান, ১লা মার্চ ১৮৬১।

২ ১৮৬০ সালের আগস্ট মাসে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি

H. W. J. Wood কর্তৃক সংগঠিত সেক্রেটারিয়েটের কাছে প্রতিনিধিদল প্রেরণ। Home S. R. Progs, ১লা অক্টোবর ১৮৬০, ভারত সরকারের সেক্রেটারির কাছে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি ২৭শে আগস্ট ১৮৬০। Home S. R. Progs. ২৭শে জুলাই ১৮৬০, ২৬ নং ফোর্ট সেণ্ট জর্জ-এর সরকারের সেক্রেটারির কাছে মাদ্রাজ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি W. H. Crake, ৩০শে জুন ১৮৬০; পূর্বোক্ত, ১০নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির কাছে বম্বে সরকারের সেক্রেটারি, ১৪ই মে ১৮৬০। ট্যারিফ কমিটিতে চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি গ্রহণ সম্পর্কে Home S. R. Progs. ১লা অক্টোবর ১৮৬০, ১, ২ ও ৬ নং। মাদ্রাজ ও বম্বে চেম্বার প্রতিনিধি পাঠায়নি; তারা বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের Bullen কে তাদের প্রতিনিধি মনোনয়ন করেছিল এবং সরকার Bullen কে ট্যারিফ কমিটির সদস্য নিযুক্ত করে।

৩৩ Annual Report of the Cotton Supply Association, ৫নং, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৬২, পূর্বোক্ত, ২নং, ১৮৫৯। Watts পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১১৯ ও পরবর্তী।

৩৪ পরবর্তী ২২৭-২২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। Home Rev. Progs. ২০শে অক্টোবর ১৮৬০, ৪২ নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট বাংলা সরকারের সেক্রেটারি, ২রা অক্টোবর ১৮৬০।

৩৫ বি. বি. মজুমদার, পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ৩৭। এ. শীল, পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২০৪। Cotton Snpply Reporter তার প্রত্যেকটি সংখ্যায় বড় হরফে কাগজের মাথায় একটি ব্যানার ছাপত: 'তুলা রাজনীতি জানে না' (Cotton knows no politics)। অথচ রাজনীতি করাই ছিল এর একটা মূল কাজ। এই পত্রিকাটি ছিল ম্যাঞ্চেস্টারের তুলো বিক্রেতা ও বস্ত্রোৎপাদকদের প্রচারের মুখপত্র। ল্যাঙ্কাশায়ারে 'তুলা দুর্ভিক্ষের' সময়ে এরা বহু সংখ্যায় কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দিয়েছিল।

৩৬ Col. Sykes (২৯শে জুন ১৮৬৫), Kinnaird (২৭শে জুলাই ১৮৬৮), R. N. Fowler (৩রা আগস্ট ১৮৬৯, ৫ আগস্ট ১৮৭০), Sir W. Lawson (৩রা আগস্ট ১৮৬৯), Stephen Cave (২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭১) কর্তৃক হাউজ অব কমন্স-এ বক্তৃতা, 'Financial

Statements…reprinted from Hansard's Parliamentary' Debates(Calcutta 1872), পৃষ্ঠা ৬৩৪, ৭৯০, ৭৯৪, ৮৬৮, ৮৮৬, ৯৫৬, ৯৬৯, ৯৯১, ৯৯৭।

৩৭ B. Disraeli-র কাছে Mayo ৯ই মে ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৩, ১০০নং ; S. Northcote-এর কাছে Mayo, ১৬ই নভেম্বর ১৮৭০, May Papers, বাণ্ডিল ৪১, ৩১৫ নং।

৩৮ Mayo-র কাছে Argyll, ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৮, ৩৪ নং।

৩৯ O. T. Burne-এর কাছে R. Temple, ২৫শে জুলাই ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৬১ (নম্বরের উল্লেখ নেই)।

৪০ পরবর্তী ২৬৩, ২৮৫ পৃষ্ঠায় দেখুন, D.N.B XVIII, ২৫২ পৃষ্ঠা। Henry Hyndman-এর 'The Records of an Adventurous' Life (London 1911), পৃষ্ঠা ১৬৯, ১৭৪-৭৫।

৪১ D. Naroji-র পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পরিশিষ্ট ডি, 'Statement to the Select Committee on East India Finance, 1871', পৃষ্ঠা ১৭৩।

৪২ Home S. R. Progs. সেপ্টেম্বর ১৮৬০, স-পরিষদ গভর্ণর জেনারেলের প্রস্তাব, ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৬০। Bullen ছিলেন বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি। Home S. R. Progs. ৬নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির কাছে চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি, ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৮৬০।

৪৩ Home S. R. Progs. ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৬০, ৩৯ নং, স-পরিষদ গভর্ণর জেনারেলের প্রস্তাব। পূর্বোক্ত, ২০শে অক্টোবর ১৮৬০, কমিটির ৩৫নং রিপোর্ট।

৪৪ Fin Progs. জানুয়ারী ১৮৬৭, ভারত সরকারের ফিনান্সিয়াল সেক্রেটারির নিকট বহিঃশুল্ক সংক্রান্ত (Customs Tariff) কমিটির রিপোর্ট, ৭ই জানুয়ারি ১৮৬৭।

৪৫ পরবর্তী ২৬৬-৭১ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৪৬ Home S. R. Progs. ৭ই জুলাই ১৮৬০ ৭নং, A. Eden। বাংলা সরকারের সেক্রেটারির নিকট বোর্ড অব রেভিনিউ, ১০ই মার্চ ১৮৬০।

৪৭ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

৪৮ Charles Wood-এর নিকট Charles Trevelyan, ১৩ই জুন ১৮৬০, Trevelyan Papers.

৪৯ Charles Wood এর নিকট Charles Trevelyan, ৪ঠা মার্চ ১৮৬৩ Trevelyan Papers.

৫০ Charles Wood-এর নিকট Charles Trevelyan, ১১ই অক্টোবর ১৮৬৪, Trevelyan Papers.

৫১ Friend of India ১৪ই এপ্রিল ১৮৬৪, ২২ শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ ৬ই এপ্রিল ১৮৬৫, ১৮ই মে ১৮৬৫ দেখুন।

৫২ Fin Progs. এপ্রিল ১৮৬৫, S. R. নং ৩৫, ভারত সরকারের নিকট বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সে'র স্মারকলিপি, ১০ই এপ্রিল ১৮৬৫. পূর্বোক্ত, জুন ১৮৬৫, ২৪৪ নং, কালেক্টর অব কাষ্টমস এর নিকট ভারত সরকারের ফিনান্সিয়াল সেক্রেটারি, ২১শে জুন ১৮৬৫। ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. Desp. ১১৪ নং, ৯ই মে ১৮৬৫।

৫৩ পরবর্তী ১০৫ পৃষ্ঠায় এবং পরবর্তীতে দেখুন।

৫৪ W. Arbuthnot-এর নিকট Mayo, ১০ই জানুয়ারি ১৮৭০, Mayo Papers বাণ্ডিল ৩৫, ১৭ নং।

৫৫ Argyll-এর নিকট Mayo ১৭ই অক্টোবর ১৮৬৯, Mayo Papers বাণ্ডিল ৩৭, ২৮৫ নং।

৫৬ Argyll-এর নিকট Mayo, ১৭ই জানুয়ারী ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৫, ২০ নং।

৫৭ পূর্বোল্লেখিত স্থানে দেখুন।

৫৮ পরবর্তী ১৩৮,১৩৯ পৃষ্ঠার দেখুন।

৫৯ Mayo-র নিকট Argyll, ১১ই এপ্রিল ১৮৭১, Mayo Papers বাণ্ডিল ৪৯, ৫ নং।

৬০ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭১, Fin. Desp. ৫২ নং।

৬১ পরবর্তী ১৬৮ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৬২ Argyll এর নিকট Mayo, ৯ই নভেম্বর ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪১, ৩০০ নং।

৬৩ Blair B. Kling এর "The Blue Mutiny : Indigo Disturbancs in Bengal 1859-62 (Philadelphia, 1966) চতুর্থ অধ্যায়ের বিভিন্ন স্থানে।

৬৪ রভিন্দর কুমার-এর 'The Deccan Riots of 1875' "Journal of Asian Studies' XXIV, ৪ নং ; আগস্ট ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ৬১৩-৩৫।

৬৫ B. Kling-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থে ৯৭-৮ পৃষ্ঠা।

৬৬ আর. কুমার পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

৬৭ কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন ও ভূমি সংক্রান্ত নিয়মকানুন সম্পর্কে পরবর্তী ১৮৩- ১৮৫ পৃষ্ঠায় দেখুন ; পাটজাত দ্রব্যের উপর আমদানি শূল্ক সম্পর্কে ২১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন ; গ্যারিণ্টি দেওয়া রেল কোম্পানি সম্পর্কে, পরবর্তী ১১৬পৃষ্ঠায় দেখুন এবং D. Thorner এর "Investment in Empire" (Philadelphia 1950), পৃষ্ঠা ১১৯-১৬৭ ; সূতিবস্ত্রের উপর আমদানি শূল্ক সম্বন্ধে পরবর্তি ২০৬-২০৭ পৃষ্ঠা দেখুন এবং A. Redford এর "Manchester Merchants and Foreign Trade" (Manchester, 1956), পৃষ্ঠা ২৫ ও পরবর্তী।

৬৮ উচ্চ শূল্ক হারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের উদ্যোগে একটি সভা আহূত হয়েছিল এবং Canning এর অনুকম্পার নীতির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ ও সম্ভবত জনসাধারণকে এই সভায় আনতে বনিকদের সাহায্য করেছিল। Home (Public) consultations), ১৫ই এপ্রিল ১৮৫৯, ১০ নং, ১৮৫৯ সালের ৫ই এপ্রিলের কলকাতার দরখাস্ত (Calcutta Petition)। এই পরিচ্ছেদের শেষের দিকে Willson-এর শূল্ক নীতি আলোচিত হয়েছে।

৬৯ Home. S.R. Progs. ১লা অক্টোবর ১৮৬০, ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি H. W. J. Wood, ২৭শে আগস্ট ১৮৬০। ভারত সরকারের নিকট ম্যাঞ্চেস্টার স্মারকলিপি পাঠান হয়েছিল, Home S. R. Progs. ৭ই জুলাই ১৮৬০, ১৪ নং, ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, ১৭ই মে ১৮৬০। Home Home S. R Progs ২৭শে জুলাই ১৮৬০, ২৬নং, ফোর্ট সেণ্টজর্জ-এর সরকারের সেক্রেটারির নিকট মাদ্রাজ চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি

W. K. Crake, ৩০শে জুন ১৮৬০। পূর্বোক্ত, ১০নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট বম্বে সরকারের সেক্রেটারি, ১৪ই মে ১৮৬০।

৭০ Home S. R. Progs. মার্চ ১৮৬১, ৬নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারির H W J Wood, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬১। পরবর্তী ২১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৭১ Fin. Progs. S. R. এপ্রিল ১৮৬৫, ৩৫নং, গভর্ণর জেনারেলের নিকট বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের স্মারকলিপি, ১০ই এপ্রিল ১৮৬৫। ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব ষ্টেট, Fin Desp. ১১৪নং, ৯ই মে ১৮৬৫। Fin. Progs. S. R. জুন ১৮৬৫, ২৪৪ নং, বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বে ও ব্রিটিশ বার্মার সরকারগুলির প্রতি ভারত সরকারের ফিনান্সিয়াল সেক্রেটারি, ২১শে জুন ১৮৬৫, পরবর্তী ২১১-১২ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৭২ Fin. Progs. মার্চ ১৮৬৬, ৭৭নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি, ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬।

৭৩ Fin. Progs. S. R. ৭৩নং। বাংলা সরকারের সেক্রেটারির নিকট বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি, ২১শে নভেম্বর, ১৮৬৭। বহিঃ শুল্কের নির্ধারিত পরিমাণ ও বাজার দরের মধ্যে তফাৎ অনেকখানি—এই মর্মে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের দাবিকে বম্বে চেম্বার সমর্থন জানিয়েছিল। বস্তুত এটাই স্বাভাবিক কারণ আমেরিকার গৃহ যুদ্ধের অবসানের পর দর পড়ে গিয়েছিল এবং চেম্বার অব কমার্সগুলির অভিযোগের যথেষ্ট ভিত্তি ছিল। Fin. Progs. S. R. ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮, ৭৬ নং, বোম্বাই সরকারের সেক্রেটারির নিকট বম্বে চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি, ২২শে অক্টোবর ১৮৬৭। ১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গঠিত কমিটি এপ্রিলে এই মর্মে রিপোর্ট দেয় যে বাজার দর ও বহিঃশুল্কে। নির্ধারিত পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য এবং পুণর্মূল্যায়ন স্থগিত রাখা উচিত(Fin. Progs. S. R. ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮, ৯০ নং এবং এপ্রিল ১৮৬৮, ২৯নং)। ১৮৬৯ সালের মার্চে বহিঃ শুল্কের নিধারিত পরিমাণ সংশোধিত হয়েছিল এবং ভারত সরকার আশা করেছিল যে 'ব্যবসায় এই সুবিধাদানে সাড়া দেবে···যাতে যে অর্থ-বিষয়ক আত্ম-ত্যাগ করা হয়েছিল তা কিছু পরিমাণে কমাবে..."। (সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. Desp. ২৪০, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৯।

৭৪ পরবর্তী ২১৪-২১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৭৫ Home Rev. Progs. এপ্রিল ১৮৬৭, ৭নং ; স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারির নিকট বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি, ১৮৬৭ ; পরবর্তী ২৩২ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৭৬ B. Frere-এর "The Means of ascertaining pub'ic opinion in India" 'Journal of E. I. A, 1871', ভল্যুম ৫, পার্ট ৪, পৃষ্ঠা ১০২-৭২। W. Arbuthnot-এর কাছে Mayo, ১৫ই মার্চ ১৮৭১, Mayo-Papers, বাণ্ডিল ৪২, ৬৮ নং। Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৮, ৪৮ নং, ফোর্ট সেণ্ট জর্জের চিফ সেক্রেটারির নিকট বোর্ড অব রেভিনিউ-এর সেক্রেটারি, ২৭শে জানুয়ারি ১৮৬৮।

৭৭ Trevelyan মন্তব্য করেছিলেন যে আরও করধার্য করায় সরকারের ক্ষমতা সরকারের "সদুদ্দেশ্যের সুনামের উপর" নির্ভর করে এবং তাই তিনি আয়কর রদ করার জন্য দাবি জানিয়েছিলেন (এই আয়করকে গোড়ায় একটি স্বল্পমেয়াদী জরুরী ব্যবস্থা হিসাবেই ধরে নেওয়া হয়েছিল)। Elgin-এর নিকট Trevelyan, ১১ই এপ্রিল ১৮৬৩, Elgin Papers, I, পার্ট ২, ভল্যুম ২৩।

৭৮ Wood ভারতে আমদানিকৃত শিল্পজাত উৎপন্নের উপর শুল্ক হ্রাস ও সুতোকলের উপর সরকারি অন্তঃশুল্কের প্রস্তাব করেছিলেন এবং তিনি ভারতীয় সুতীবস্ত্রের উপর একটি অন্তঃশুল্ক বসানর কথা নিয়েও নাড়াচাড়া করেছিলেন। Elgin-এর নিকট C. Wood, ৩রা মার্চ ১৮৬২, Wood Papers, ১০, ফাইল ৬২ ; ওই একই, ২৫শে জুন ১৮৬২, পূর্বোক্ত, ফাইল ৩১০, Frere-র নিকট Wood, ২রা এপ্রিল ১৮৬৩, পূর্বোক্ত, ১২, ফাইল ১৭০। ভারতীয় আমদানি শুল্কের দ্বারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মনে হয় তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি সুতোকলগুলির উপর বিশেষ শুল্ক বসানকেই সব চেয়ে ভাল উপায় বলে বিবেচনা করেছিলেন।

৭৯ C. Wood-এর নিকট C. Trevelyan, ২৩শে মে ১৮৬৩, Trevelyan Papers।

৮০ পরবর্তী ১৮৮, ১৮৯ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৮১ পরবর্তী ২২৪, ২২৫, ২২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। Wilson-এর ব্যক্তিগত

চিঠিপত্র তাঁর মৃত্যুর ৭০ বছর পরে তাঁর কন্যা E. I. Barrington প্রকাশ করেছিলেন, 'The Servant of All' (London 1927); Wilson-কে লেখা Canning-এর চিঠিগুলি দেখুন, ৩১শে জানুয়ারি ১৮৬০; ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬০, ১৮ই মার্চ ১৮৬০, Barrington-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, II, পৃষ্ঠা ২২৩-৪, ২২৫-৭, ২৭৪-৫।

৮২ পরবর্তী ১০৮-১১২ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৮৩ Mayo-র নিকট Argyll, ৪ঠা নভেম্বর ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৭।

৮৪ Fin. Progs. Accts, ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮, ৫৭ নং গভর্ণর জেনারেলের Minute, ২০শে জানুয়ারি ১৮৬৮। H. Durand-এর নিকট Mayo, ২৪শে এপ্রিল ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৯, ১০৫ নং।

৮৫ Fin. Progs. Accts, ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮, ৫৭ নং, গভর্ণর জেনারেলের Minute, ২০শে জানুয়ারি ১৮৬৮। Argyll-এর নিকট Mayo, ৬ই এপ্রিল ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৯, ১০০ নং।

৮৬ পরবর্তী ৬৪, ৬৮ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৮৭ Argyll-এর নিকট Mayo, ৯ই নভেম্বর ১৮৭০, পূর্বোক্ত, বাণ্ডিল ৪১, ৩০০ নং।

৮৮ C. Wood-এর নিকট Elgin, ১৪ই মে ১৮৬২, Elgin Papers, সেকশন ১, পার্ট ১, Letter book ভল্যুম I, ফাইল ১৩; পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থে গোপাল কর্তৃক উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৫৩।

৮৯ ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে বৈদেশিক দপ্তরের একজন খাঁটি আণ্ডার সেক্রেটারির মনোভাবকে Salisbury এইভাবে বর্ণনা করেছিলেন; Lady Gowendolen Cecil-এর 'Life of Robert, Marquis of Salisbury' (London 1931), III, পৃষ্ঠা ২১৬, D. C. M. Platt কর্তৃক 'Finance, Trade and Politics : British Foreign Policy 1815-1914' (Oxford, 1968) বইতে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা XXI নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে আমলাতন্ত্রের সামাজিক গঠন সম্বন্ধে Platt চিত্তাকর্ষক ভিতরের খবর দিয়েছেন।

৯০ Karl Marx-এর 'Capital' (Dona Torr's edition, 1946) ভল্যুম I, পৃষ্ঠা ২১৩।

৯১ A. K. Cairncross-এর 'Home and Foreign Investment 1870-1930' (Cambridge, 1953), পৃষ্ঠা ২৪৪ ঃ Cairncross দেখেছিলেন যে Wilson-এর "মুদ্রাতত্ত্বের মধ্যে একটা আধুনিক সুর আছে।" Schumpeter-ই কেবল প্রসঙ্গত Wilson-এর কথা এই বলে উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি "সেই সব চমৎকার লোকেদের অন্যতম যাঁরা বিশ্লেষণের ইতিহাসে ভাল ফল দেখাতে পারেন নি।" J. A. Schumpeter-এর 'History of Economic Analysis' (London 1961), পৃষ্ঠা ৭২৬, Robert Link-এর 'English Theories of Economic Fluctuation 1815-1848' (New york 1959) নামক পুস্তকে Wilson-এর প্রধান অর্থনৈতিক ভাবধারা সম্পর্কে একটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ রয়েছে। Elmer Wood-এর 'English Theories of Central Banking 1819-1858' (Cambridge MSS 1939)।

৯২ W. Bagehot এর "Memoir of the Right Hon' James Wilson" (1860)। Mrs. Russel Barringtion এর 'The works and Life of Walter Bagehot' (London 1915), ভল্যুম III, পৃষ্ঠা ২১৩।

৯৩ ভারতে Sir Edward West-এর ক্রিয়াকলাপ বস্তুত অজ্ঞাত। Principles এর উপক্রমণিকায় Ricardo "খাজনার প্রকৃত তত্ত্বে" West-এর অবদানের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। D. N. B., LX, পৃষ্ঠা ৩২৯ এবং Schumpeter এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৫৮৬ দেখুন।

৯৪ 'The Economist', ৭ই এপ্রিল ১৮৬০।

৯৫ 'The Works and Life of Walter Bagehot' (London, 1915) ভল্যুম X, ৩৩৭পৃষ্ঠায় E. I. Barrington কর্তৃক উদ্ধৃত Richard Temple এর 'Men and Events of my time in India' (London 1882)।

৯৬ T. Pycroft এর নিকট C. Trevelyan, ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬০, Trevelyan Papers।

৯৭ এই আমলের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে, বিশেষত Gladston-এর অর্থ-বিষয়ক নীতিসমূহ সম্পর্কে চমৎকার ভাষ্যের জন্য আমি Schumpeter-এর কাছে ঋণী। Schumpeter, পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪০২-৫।

৯৮ পরবর্তী ৬১, ১৪৩ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৯৯ পরবর্তী ২০৭ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১০০ পরবর্তী ২০৭ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১০১ পরবর্তী ২২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১০২ Mayo-র নিকট Argyll, ৪ঠা নভেম্বর ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৭।

১০৩ তৃতীয় পরিচ্ছেদের I এবং II অংশের শেষের দিকে সামরিক ব্যয়-নীতি আলোচিত হয়েছে।

১০৪ 'Report on the Working of Indian Railways (1875)' পৃষ্ঠা ১৫, ভারতীয় শেয়ার মালিকানার আনুমানিক হিসাবটি খুব সম্ভবত অত্যন্ত মোটামুটি হিসাব, উৎস যদিও বিখ্যাত: Mayo-র কাছে লেখা এক চিঠিতে Argyll মন্তব্য করেছিলেন যে ১৮৬৯ সালে রেলপথে লগ্নির ৮০ ভাগের ১ ভাগ ভারতীয়দের হাতে ছিল, ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯, বাণ্ডিল ৪৭, ৭নং।

১০৫ Charles Wood-এর কাছে কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশনের স্মারকলিপি, ২১শে জুলাই ১৮৫৯, Watts-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১২৫। তুঙ্গভদ্রা নদী থেকে একটি খাল খনন করতে গিয়ে সেচ কোম্পানিটি মূলধন নিঃশেষ করে ফেলেছিল এবং ১৮৬৬ সাল থেকে সরকারি ঋণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। ইণ্ট ইণ্ডিয়া ইরিগেশন কোম্পানি নামে অপর কোম্পানিটি সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের (১৮৬৮) আগে পর্যন্ত অন্যটির মতই মাঝে মাঝে সরকার প্রদত্ত ঋণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ত। শেষোক্তটি গ্যারান্টিপ্রাপ্ত ছিল না। M. M. P. R. ১৮৭৩-৭৪, পৃষ্ঠা ৬২, George Chesney-র 'Indian Polity' (London 1868) পৃষ্ঠা ৪১১-১২।

১০৬ Rev. Progs, ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬১, ২৬নং, স-পরিষদ গভর্ণর জেনারেলের প্রস্তাব, ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬১।

১০৭ Fin. Progs. জুলাই ১৮৭১, ৮৩নং সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, ৪০ নং, ৬ই এপ্রিল ১৮৭০।

১০৮ H. A. Antrobus-এর মত অনুযায়ী সরকার প্রমাণ করতে চেয়েছিল

"যে চা বিক্রয়যোগ্য পণ্য হিসাবে উৎপাদন করা যেতে পারে, তারপর ব্যবসায়িক পরিসরে উৎপাদনের জন্য ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠানের হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।" 'A History of the Assam Company' (Edinburgh 1957)।

১০৯ এম. জি. রানাডের 'Iron Industy—Pioneer Attempts'(1892) ; এস. কে. সেনের 'Studies in Industrial Policy and Development' (Calcutta, 1964), পৃষ্ঠা ১০৪-১১৩।

১১০ পরবর্তী ১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১১১ W. Bagehot-এর নিকট J. Wilson, ৪ঠা জুলাই ১৮৬০, E. Barrington-এর 'The Servant of All'(London, 1927), ভল্যুম II, পৃষ্ঠা ২৫২।

১১২ ১৮৫৭ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোর্ট অব ডাইরেক্টরস-এর নিকট কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশনের স্মারকলিপি, Watts-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১১৯ ; Sir Charles Wood-এর নিকট ২৬শে জুলাই ১৮৫৯, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৫ ; ভারত সরকারের প্রতি ৩রা এপ্রিল ১৮৬০, পূর্বোক্ত, ১৩১ পৃষ্ঠা।

১১৩ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. Desp. ১১৫ নং, ১৬ই জুলাই ১৮৬৩।

১১৪ পরবর্তী ২৯৬, ২৯৭ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১১৫ Wilson-এর বাজেট বিবৃতি, L. C. Progs. (Old Series), ভল্যুম VI, ১৮৬০, Trevelyan-এর বিবৃতি, L. C. A. Progs. (New Series) ১৮৬৩, ভল্যুম II, পৃষ্ঠা ৮২ ; Home S. R. Progs. ৩১শে মার্চ ১৮৬২, ৭নং বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি W. S. Fitzwilliam-এর পক্ষ থেকে স-পরিষদ গভর্ণর জেনারেলের নিকট ২৭শে মার্চ ১৮৬২।

১১৬ 'Manchester Guardian', ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ ; ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক আহূত ভারতীয় ব্যাপার সংক্রান্ত সম্মেলনের রিপোর্টে তৈরি সূতীবস্ত্রের উপর ভারতীয় আমদানি শুল্কের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

১১৭ H. Merivale (১৮০৬-৭৪) ছিলেন কেম্বিজে রাজনৈতিক

অর্থনীতির অধ্যাপক (১৮৩৭-৪৬), উপনিবেশ সমূহের জন্য একজন স্থায়ী আণ্ডার সেক্রেটারি (১৮৪৮ থেকে) এবং 'Lectures on Colonization' (1841) পুস্তকের লেখক ; ১৮৫৯ সালে তাঁকে ইণ্ডিয়া অফিসে বদলি করা হয় ; বহু বইয়ের লেখক এবং ঔপনিবেশিকীকরণ আন্দোলনের অন্যতম নেতা Wakefield-এর (১৭৯৬-১৮৬২) তুলনায় Merivale-এর প্রতিপত্তি অনেক কম ছিল।

১১৮ Rev. Progs. জুন ১৯৬৪, ২৩নং, N. W. P.-এর সরকারের সেক্রেটারির নিকট N. W. P-এর সদর বোর্ড অব রেভিনিউ-এর সেক্রেটারি, G. M. Batten, ১৬ই মার্চ ১৮৬৪।

১১৯ Rev. Progs. ১লা ডিসেম্বর ১৮৬৩, ২নং।

১২০ Wood-এর নিকট C. Trevelyan, ৪ঠা মার্চ ১৮৬৩, Trevelyan Papers।

১২১ Elgin-এর নিকট C. Trevelyan, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩, Trevelyan Papers.

১২২ Wood-এর নিকট C. Trevelyan, ৪ঠা মার্চ ১৮৬৩, Trevelyan Papers.

১২৩ পরবর্তী ২৫১ পৃষ্ঠায় পাদটীকা ১৮০ দেখুন।

১২৪ পরবর্তী ২৬৩, ২৬৪ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১২৫ J. S. Mill-এর 'Principles of Political Economy' (1848), Ashley-র সংস্করণ V, II, ২।

১২৬ পরবর্তী ২৮১ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১২৭ পরবর্তী ২২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১২৮ James Mill-এর 'History of British India' (H.H.Wilson সম্পাদিত, ৪র্থ সংস্করণ) ভল্যুম II. পৃষ্ঠা ২৯৩, G. Myrdal-এর 'Political Element in the Development of Economic Theory' (London, 1955) বইয়ের ২৪২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। J. S. Mill-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ V, II, ৩।

১২৯ ১৭৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। Home Rev. Progs. এপ্রিল ১৮৬৭, ৭নং, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারির নিকট বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি, ২২শে মার্চ ১৮৬৭। পূর্বোক্ত, ২০নং, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট

ক্যালকাটা ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশনের মাস্টার, কমিটি ও সদস্যদের দরখাস্ত, ২২শে এপ্রিল ১৮৬৭। Home Rev. Progs. মার্চ ১৮৬৭, ৫৫নং, ভাইসরয়ের নিকট ক্যালকাটা ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশনের দরখাস্ত, ১৫ই মার্চ ১৮৬৭।

১৩০ পরবর্তী ১৪০, ১৪১ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১৩১ পরবর্তী ২৭১ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১৩২ Burtle Frere-র নিকট Mayo, ৩রা জুন ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৯, ১৫৬নং।

১৩৩ J. Strachey-র স্মারকলিপি ১৮৭৪, P. P. H. C, ১৮৭৪, কোড ৩২৬, পৃষ্ঠা ১৬-১৭।

১৩৪ পরবর্তী ২২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১৩৫ W. T. Thornton এর নিকট J. S. Mill, ২৮শে জানুয়ারি ১৮৬২, H. S. Maine-র নিকট Mill, ১লা জানুয়ারি ১৮৬৯; 'The Letters of John Stuart Mill' (H. S. R. Elliot সম্পাদিত, লণ্ডন ১৯১০), ভল্যুম I, পৃষ্ঠা ২৫৮; ভল্যুম II, পৃষ্ঠা ১৬৯।

১৩৬ L. C. A. Progs (New Series), VII, পৃষ্ঠা ৪৩২।

১৩৭ Home Rev. Progs, সেপ্টেম্বর ১৮৬২, ২৯ নং S. Laing-এর Minute, ৭ই এপ্রিল ১৮৬২। ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব ষ্টেট, Rev. Desp ১৪নং, ৯ই জুলাই ১৮৬২।

১৩৮ Dalhousie-এর নিকট Lawrence, ১৬ই জুন ১৮৫৮, R. Bosworth Smith-এর 'Life of Lord Lawrence' (London 1901) বইয়ে উদ্ধৃত, ভল্যুম ২, পৃষ্ঠা ১৯৬। তুলনা করুন T. R. Metcalf-এর 'Aftermath of the Mutiny' (Princeton, 1965), অষ্টম পরিচ্ছেদ, বইটি তদানীন্তনকালের রাজনৈতিক ভাবধারার, বিশেষত বর্ণবৈষম্যবাদী তত্ত্বগুলির একটি তথ্যপূর্ণ ও সমালোচনামূলক পর্যালোচনা। Richard Koebner এবং H. D. Schmidt-এর 'Imperialism : the Story and Significance of a Political Word : 1840-1960' (Cambridge, 1964) বই খানির ৪র্থ ও ৫ম পরিচ্ছেদও দেখুন।

১৩৯ Leslie Stephen এর 'Life of J. F. Stephen' (London, 1895) পৃষ্ঠা ২৪১; 'The Times' পত্রিকায় J. F. Stephen এর চিঠি,

১লা মার্চ ১৮৮৩, Metcalf-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩১৮। পরবর্তী ১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১৪০ পরবর্তী ২২ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১৪১ J. Strachey-র India (London, 1888) পৃষ্ঠা ৩৬০।

১৪২ পৃষ্ঠা ১৮৭৮-৭৯, LV, বেসামরিক চাকরিতে দেশীয়দের নিয়োগ সম্পর্কিত পেপার্স, ৭ পৃষ্ঠা।

১৪৩ C. Trevelyan-এর বক্তৃতা, ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সভার কার্য বিবরণী, ৭ই মার্চ, ১৮৭১, 'Journal of the E. I. A', ভল্যুম ৫, অংশ ২, ৯২ নং, পৃষ্ঠা ১০৮ ও পরবর্তী।

১৪৪ তাত্ত্বিক Richard Congreve (1818-1899) ছিলেন August Comte ও Barthelemy St. Hilaire-এর বন্ধু এবং লণ্ডনের Positivist Society-এর প্রতিষ্ঠাতা (১৮৫৫); ভারত সম্পর্কে তাঁর পুস্তিকার (বিদ্রোহের অনতিকাল পরে প্রকাশিত) প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল Bernard Porter-এর 'Critics of Empire' (Macmillan, 96)।

১৪৫ 'The Economist', ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭, XV, ১০৬২, T. R. Metcalf কর্তৃক উদ্ধৃত ৩২৭ পৃষ্ঠায়।

১৪৬ এস, ভট্টাচার্যের "Trevelyan, Wilson, Canning and the foundations of Indian financial policy", 'Bengal : Past and Present,' ভল্যুম LXXX, 1961, পৃষ্ঠা ৬১-৭৩।

১৪৭ C. Trevelyan এর Minute, ২০শে মার্চ ১৮৬০, P.P.H.C. ভল্যুম ৪৯, পৃষ্ঠা ১১২-২১।

১৪৮ J. Wilson-এর নিকট Canning, ২৪শে জুলাই ১৮৬০, E. I. B., II, ৩০১।

১৪৯ T. R. Metcalf-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থে, VI ও VII পরিচ্ছেদ।

১৫০ বি. বি. মজুমদারের পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ ; পৃষ্ঠা ৩১৮-৩৬।

১৫১ Metcalf-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৬০-৬২।

১৫২ 'হিন্দুপেট্রিয়ট', : ১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০, ১০ই এপ্রিল, ১৮৭১।

১৫৩ পরবর্তী ২৯৯, ৩০০ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১৫৪ ব্রিটিশ বুর্জোয়াদের স্বার্থ সম্পর্কে যাঁরা একরোখা ভাবে সরল সাম্রাজ্যী-

করণ করে থাকেন ত'ারা এই শেষ বিষয়টি প্রায়ই লক্ষ্য করেন না। একথা উল্লেখের গুরুত্ব আছে যে ভারত সাম্রাজ্য সম্পর্কে Karl Marx ঐ বিষয়টি এড়িয়ে যাননি এবং তিনি ব্যক্তি বিশেষরা যা লাভ করেছিলেন তার উপর জোর দিয়েছেন। "British Incomes in India", 'New york Daily Tribune'। ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭, 'On Colonialism' (Moscow, 1967)। ভারতীয় অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বিপনচন্দ্রের পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন।

১৫৫ G Paish এর 'Great Britain's investments in other lands' 'Journal of the Royal Statistical Society.' LXXIV, ১৯০৯, পৃষ্ঠা ৪৫৬-৮০ ; "Great Britains Capital investments in individual countries and foreign industries", পূর্বোক্ত LXXXIV, ১৯১১। পৃষ্ঠা ১৬৭-২০০। C. K.Hobson-এর 'The Export of Capital' (New york 1914). Leland H.Jenks-এর 'The Migration of British Capital to 1875' (New york, 1927 : আমি লণ্ডনের একটি পরবর্তী সংস্করণ [১৯৩৮] ব্যবহার করেছি)। A. K. Cairncross-এর 'Home and Foreign Investment 1870-1913' (Cambridge, 1958) H. Segal & M. Simon-এর "British Foreign Capital issues, 1865-94" 'Journal of Economic History' ডিসেম্বর ১৯৬১। পৃষ্ঠা ৫৬৭-৮১। M. Simon এর 'The pattern of new British Portfolio Foreign investment 1865-1914', A. R. Hall সম্পাদিত 'The Export of capital from Britain 1870-1914' (London, 1968), পৃষ্ঠা ১৫-৪৪। R. Nurkse-এর 'Patterns of Trade of Development'(Stockholm, 1959) ও দেখুন; ইতিহাস লিখনের পুরানো ধারায় একেবারে সঠিক প্রাসঙ্গিক অবদান না হলেও চিত্তাকর্ষক, R. Pares-এর "Economic factors in the history of the Empire" 'The historian's business and other essays' (Oxford, 1961)।

১৫৬ M. Simon এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ২৮-৩০।

১৫৭ Jenks-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ২০৭, ২২৫।

১৫৮ A. R. Hall সম্পাদিত 'The Export of Capital from Britain 1870-1914'

১৫৯ G. Paish এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ (১৯১১)।

১৬০ M. Simon-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ২৩-২৫।

১৬১ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ২৬।

১৬২ W. J. Macpherson-এর "Investment in Indian Railways 1845-1875" Ec. H. R. VIII. N. S., ১৯৫৫, পৃষ্ঠা ১৭৭-৮৬। Daniel Thorner-এর 'Investment in Empire : British Railway and Steam ShippingEnterprise inIndia 1825-49' (Philadelphia, 1950)।

১৬৩ পরিশিষ্ট দেখুন।

১৬৪ J. Gallagher & R. E. Robinson-এর "The Imperialism of Free Trade" Ec. H. R. VI. নং ১, ১৯৫৩। এই বিষয়ে সাম্প্রতিককালের অবদানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল P. Harnetty এর 'Imperialism and Free Trade : Lancashire and the Indian Cotton Duties 1859-62' Ec. H. R. ভল্যুম XVIII. N. S.১৯৬৫-৬৬ ; এবং A. E. Moore-এর 'Imperialism and Free Trade Policy in India 1853-54' Ec. H R. XVII. N. S. ১৯৬৪-৬৫।

১৬৫ P. T. Bauer-এর 'The economics of resentment . Colonialism and underdevelopment' Journal of contemporary History, ভল্যুম IV, ১নং। জানুয়ারি ১৯৫৫, পৃষ্ঠা ৫১-৭২।

১৬৬ D. K. Fieldhouse-এর 'Imperialism : on historiographical revision' Ec. H. R. ভল্যুম XIV, N. S., ২নং, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ১৮৭-২০৯ ; 'The Theory of Capitalist Imperialism' (London. 1957), পৃষ্ঠা xiii-xix, ১৮৭-৯৪। R. E. Robinson, J. A. Gallagher & A. Denny-এর 'Africa and the Victorians' (London, 1961) পৃষ্ঠা ৪৬২ ও পরবর্তী।

১৬৭ D. C. M. Platt এর 'Finance, Trade and Politics inBritish

Foreign Policy 1815-1914' (Oxford, 1914) পৃষ্ঠা ৩৬৭।

১৬৮ Simon Kuznets এর 'Economic Growth and Structure' (London, 1914), পৃষ্ঠা৫০-৫১। Kuznets যুক্তি দিয়েছেন যে, যে সমস্ত দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে সেই সব দেশ যে সম্প্রসারণশীল ও আক্রমণাত্মক ঝোঁক দেখাচ্ছে কতকগুলি "বাধাকরার ক্ষমতা-বিশিষ্ট উপাদান"-ই তার কারণ। অপরাপরের মধ্যে "মূল উপাদান অবশ্য হ'ল এমন এলাকার প্রসার যেখানে নির্দিষ্ট দেশের অর্থনৈতিক সম্পদকে বাইরের প্রাকৃতিক বা অপরাপর সম্পদের সঙ্গে যথাযথ ভাবে একত্রিত করে ব্যবহার করা যায়, তা করলে সম্ভবতঃ ইউনিট প্রতি উৎপন্ন বাড়াবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ঝুঁকি হ্রাস করবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি ঝুঁকিওয়ালা প্রক্রিয়া; প্রতিষ্ঠান বিশেষের পক্ষে এর অর্থ হতে পারে এমন দায়-দায়িত্বের মধ্যে পড়া যা পূরণ করা খুবই কঠিন এবং একটি দেশের পক্ষে (এই উন্নয়নের জন্য) বিশিষ্ট ধারায় বিশেষ দক্ষতা অর্জনের; নিজ দেশের সীমানার মধ্যে পাওয়া যায় না এমন সম্পদ সংগ্রহের প্রয়োজন হতে পারে। দ্রুত উন্নয়নশীল দেশের নেতারা দেশের সীমান্তের বাইরের কাঁচামাল বা বাজার পাওয়া নিশ্চিন্ত করার জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যবহার ক'রে এই ঝুঁকি কমানর চেষ্টা করতে পারেন।" অর্থনৈতিক উন্নতির তত্ত্ব সম্পর্কে একটি রচনায় Kuznets অবশ্য সাধারণভাবে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। নির্দিষ্টভাবে ব্রিটেন সম্পর্কে বলতে গিয়ে Platt মন্তব্য করেছেন: "বৈদেশিক কর্মনীতির সর্বোচ্চ কাজ সব সময়েই ছিল জাতীয় নিরাপত্তা, কিন্তু বাজার পাওয়া এই সেইসব বাজারে ন্যায্য ব্যবহার পাওয়া—বিশেষত ব্রিটেনের পক্ষে এমন একটা স্বার্থ ছিল যা আমাদের জাতীয় ও সাম্রাজ্যিক সীমান্তগুলি রক্ষারই কেবল নীচে ছিল এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল।" Platt পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ। "রাজনৈতিক উপাদানগুলিকে" যাঁরা বিচ্ছিন্ন-ভাবে দেখেন এ ব্যাপারটা প্রায়ই তাঁদের নজর এড়িয়ে যায়। অপর পক্ষে সাম্রাজ্যিক সম্প্রসারণের মত এমন একটা জটিল ব্যাপারকে কেবল এবং সম্পূর্ণভাবে বাজারের ও কাঁচামালের প্রয়োজন, বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির নিরিখে বিচার করাটাও সমানই নিষ্ফল প্রচেষ্টা।

১৬৯ Daniel & Alice Thorner "De-industrialiaztion in India 1881-1931" 'Land and Labour in India' (Bombay, 1962) । M. D. Morris-এর 'Toward a reinterpretation of nineteenth century Indian economic history' J. Ec. H. ২৩ (১৯৬৩), পৃষ্ঠা ৬০৬-১৮ । কে. এন. চৌধুরির 'India's international economy in the nineteenth century : historical Survey' 'Modern Asian Studies', II, ১ (১৯৫৫), পৃষ্ঠা ৩১-৫০। এম. কে. থাভরাজ এর 'Public Investment in India 1898-1914' Indian Economic Review, II, 8 (১৯৫৫) । Dr. Elizabeth Whitcombe-এর গবেষণা, এখনও অপ্রকাশিত, সম্ভবতঃ উত্তর ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে সেচের উন্নয়ন সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করবে। ঊনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে মূল্যের গতিবিধি সম্পর্কে এ. ঘোষ ও কে. মুখার্জির গবেষণা এই বইয়ের অন্যত্র উল্লেখিত হয়েছে ।

১৭০ Elgin (২৫শে জুন ১৮৬২, Wood Papers, ১০, ফাইল ৩১০) ও Frere (২রা এপ্রিল ১৮৬৩, Wood Popers ১২, ফাইল ১৭০)-এর কাছে লেখা চিঠিতে Charles Wood সুতোকলের উপর কর এবং ভারতে উৎপাদিত সূতীবস্ত্রের উপর অন্তঃশুল্ক বসাবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন ; যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে Manchester-এর দ্রব্যসামগ্রীর উপর আমদানি শুল্ক হ্রাস বা রহিতকরার সামর্থ সরকারের নেই তখন ১৮৯৫ সালে শেষপর্যন্ত সরকারী শুল্ক আরোপিত হয়েছিল ; আমাদের এখানে একথা মনে রাখা উচিত যে আবগারি শুল্ক সেই সব (মাঝারি) 'কাউন্টের' সুতোর উপর সীমাবদ্ধ ছিল যা Manchester-এ উৎপন্ন সুতোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করত। প্রত্যক্ষ কর সম্পর্কে পরবর্তী ২২২, ২২৩ পৃষ্ঠায় এবং জে. পি. নিয়োগির পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ ; সামরিক ব্যয় সম্পর্কে পরবর্তী ১১০, ১১৫ পৃষ্ঠা দেখুন। সব সময়ে "গোটা খরচটা দেওয়ার" কোনও বাধ্যবাধকতা ছাড়া ভারতে ব্রিটিশ সৈন্য রাখার সুবিধা সম্পর্কে Robinson, Gallagher and Denny-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৩ দেখুন । Issac Watts-এর 'The Origin and progress of the Cotton Supply Association'

(Manchester 1871) বইটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা সরবরাহের উপর নির্ভরতা হ্রাসের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যের মধ্যেই কাঁচা তুলা সরবরাহের উৎস সৃষ্টির জন্য Manchester এর কারবারী ও মিল মালিকদের প্রচেষ্টার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ১৮৪ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১৭১ Karl Mannheim-এর 'Essays On the Sociology of Knowledge' P. Kecskemeti (London 1952) সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৪৮। Mannheim অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে একজন বুদ্ধিজীবীর পক্ষে নিজেকে মতাদর্শগত মতিভ্রম থেকে মুক্তকরা সম্ভব এবং ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান আয়ত্ত করা সম্ভব— Schumpeter কোনও এক জায়গায় একে বলেছেন "Mannheim fire-escape (প্রজ্বলিত গৃহ থেকে নির্গমনের জন্য মানহাইমসুলভ পথ)"। যাকে বলা হয় 'সামাজিক আত্মদর্শন'-এর সমস্যা, সে সম্পর্কে Oscar Lange-এর 'Political Economy' (Warsaw, 1963), পরিচ্ছেদ VII দেখুন।

১

নূতন অর্থ-ব্যবস্থার দিকে

ভারত-সাম্রাজ্যের অর্থব্যবস্থা সম্বন্ধে নতুন করে লেখা সহজ নয়। যে সরকার ভারত-সাম্রাজ্য শাসন করত তাদের নীতি সম্বন্ধে এত কথা লেখা হয়েছে যে আর একটা চেষ্টা বাহুল্য বলে বিবেচিত হতে পারে। তবু এই বিষয়ে বিশাল ও ক্রমবর্ধমান গ্রন্থাবলীর সতর্ক পাঠকের এ কথা নজরে না পড়ে উপায় নেই যে কতকগুলি ত্রুটি রয়ে যাচ্ছে। অনুশীলনের অতি-কর্ষিত কিছু ক্ষেত্র থেকে প্রান্তিক উৎপাদন হয়তো কমে যাচ্ছে, অথচ অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যা নিয়ে কোনও অনুশীলনই বস্তুতঃ হয় নি। ব্রিটিশ ভারতে রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থার ইতিহাস কেন যথাযোগ্য মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে নি তা বোধগম্য। সব সময়ে স্পষ্ট করে প্রকাশ না করা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারণার ভিত্তিতে বিরচিত অসংখ্য খণ্ড খণ্ড প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ও প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সুসংবদ্ধভাবে অর্থ-বিষয়ক নীতিগুলির গতিপথ অনুসরণ করা শক্ত কাজ। উপরন্তু এই টুকরো জোড়ার ধাঁধায় সম্পূর্ণ ছবির কিছু টুকরো নিখোঁজ। এখন মহাবেজখানায় যেসব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অবস্থিত রাজপুরুষদের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্রের বেশিরভাগই সম্প্রতিকাল পর্যন্ত আয়ত্তের বাইরে ছিল। এই সব রাজ-পুরুষদের কালেভদ্রে প্রদত্ত ও কখনও কখনও বিভ্রান্তিমূলক বিবৃতি এবং ভারতীয় অর্থব্যবস্থার সম্পর্কে প্রায় নগণ্য পরিমাণগত উপাত্ত (data) একটা ক্ষীণ ভিত্তি যোগাত, যা বাস্তব সম্বন্ধে অনুসন্ধানের চেয়ে সরকারের ভাবমূর্তি নিয়ে যারা উদ্বিগ্ন তাদেরই সন্তোষ বিধান করত। কখনও কখনও আত্মপ্রতারণায় জটিল ত্রুটিপূর্ণ জ্ঞানের আলো-আঁধারিতে অন্ধ আক্রমণ অথবা সমর্থন—এই দুই দৃষ্টিভঙ্গিরই সহাবস্থান চলত, অবশ্য সব সময়ে শান্তিপূর্ণভাবে নয়। সাম্রাজ্য ও তার অর্থব্যবস্থার সমালোচক ও পক্ষ-সমর্থকদের উপর 'সরকারের ভাবমূর্তি কেমন হবে' এই ভাবনা যেমন বিপজ্জনক প্রভাব ফেলতে পারে, তেমনি পণ্ডিতদের বহু-ঘোষিত "প্রকৃত তথ্যানুসরণ" আর একটা বিপদের শিকার হতে পারে। এই অনুশীলনের

ক্ষেত্র অস্পষ্ট হওয়া বিপজ্জনকভাবে সহজ। ইতিহাসের তথ্য যদি একটা সরল ও সুসংবদ্ধ ছকের সঙ্গে না মেলে, গবেষণালব্ধ তথ্যাবলী যদি বিরক্তিকর ও বিভ্রান্তিকর মনে হয়, তা হলে এই অনুমানের আশ্রয় নেওয়া লোভনীয়রূপে আরামদায়ক যে ইতিহাসের প্রক্রিয়ার কোনই ধারা নেই ; যে এই প্রক্রিয়া মাঝে মাঝে আকস্মিক ঘটনায় ভরা ; এবং কখনও কখনও কোন কোন মানুষের মহৎ কাজ সম্পন্ন করার ক্ষমতা ও প্রতিভাও আকস্মিক। এই ধারণা থেকে সিদ্ধান্ত আসে যে ইতিহাসবিদদের পক্ষে কোনও প্যাটার্নের সন্ধান করাটাই একটা কর্তব্যচ্যুতি। মনে হয় এ মত সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। এতে উত্তর না দেওয়া যেসব প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে, অথবা যেসব প্রশ্ন আদৌ তোলাই হয় নি যখন সেগুলির সম্মুখীন হব তখন আবার একে পরীক্ষা করব।

ভারতে ব্রিটিশ অর্থব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করার সমস্যা সম্পর্কে এই সব নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া একশ বছর আগেও দেখা যেত। বিদ্রোহের পরের দশকে রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থার সমস্যাবলী যেভাবে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করল এর আগে কখনও তেমন করে নি। বিদ্রোহের অর্থ-বিষয়ক উত্তরফল বোধ হয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উত্তরফলের মতই গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্রোহ একটা অর্থনৈতিক সংকটকে ত্বরান্বিত করেছিল। সৈন্যবাহিনী, সামরিক পুলিস, নতুন লেভি এবং পুলিস ও সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনে পূর্তকর্মের জন্য বাৎসরিক খরচ ১৩·২ কোটি টাকা (১৮৫৬-৫৭) থেকে ১৭·২ কোটি টাকায় (১৮৫৭-৫৮) ও ২৪·৭ কোটি টাকায় (১৮৫৮-৫৯) উঠে গিয়েছিল, আর এই একই সময়ে ভারত সরকারের ঋণ ৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিদ্রোহের পর পাঁচ বছর পর্যন্ত প্রতি আর্থিক বছরে হিসাবের ঘাটতি দেখা গিয়েছিল। চ্যান্সেলার অফ এক্সচেকার Robert Lowe বলেছিলেন অর্থমন্ত্রী হওয়া চাই এমন "এক জীব যার বাজেটে একটা উদ্বৃত্ত আছে"। এটা Gladstone যুগের রাষ্ট্রনীতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—বাজেটে জমা-খরচ সমান করার জন্য ব্যগ্রতা। এই মানদণ্ডে বিচার করলে বিদ্রোহ পরবর্তীকালে ভারতের অর্থসংক্রান্ত পরিস্থিতি খারাপই ছিল। ভারতীয় রাজস্বের আয় থেকে কতকগুলি অসাধারণ খরচ হওয়ার দরুন যাকে "অর্থব্যবস্থার ভারসাম্য" বলে অভিহিত করা হত তা বরাবরই সঙ্কটজনক ছিল। বিদ্রোহের পূর্ববর্তী সময়ে সাম্রাজ্যিক সম্প্রসারণের কালপর্যায়গুলি

কিভাবে নিম্নোক্ত ঘাটতি বাজেটের কালপর্যায়গুলির সঙ্গে একেবারে প্রায় একই সময়ে পড়েছিল তা লক্ষ্য করাটা শিক্ষাপ্রদ—ঘাটতি কালপর্যায় ১৮১৪-১৯ (সেই সময় নেপাল যুদ্ধ ও মারাঠা যুদ্ধ), ১৮২৩-২৮ (প্রথম বার্মা যুদ্ধ, ও ভরতপুর অবরোধ), ১৮৩৮-৪৮ (আফগান যুদ্ধ, সিন্ধু ও গোয়ালীয়র যুদ্ধ এবং শিখ যুদ্ধ) এবং ১৮৫৩-৫৫ (দ্বিতীয় বার্মা যুদ্ধ)। বিদ্রোহের সময়ে ও পরে সামরিক ব্যয়ের অভূতপূর্ব বৃদ্ধি একটা সঙ্কটের সৃষ্টি করেছিল। "সংস্কার সম্ভব হয় কেবল একটা জরুরী অবস্থার উদ্ভব হলেই। এখন সেইরকম একটা জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, আগে আমাদেরকালে যা হয় নি এখন সেই সব সংস্কার ও পরিবর্তন সম্ভব"—এই কথা লিখেছিলেন James Wilson, যিনি বিদ্রোহ পরবর্তী অর্থসংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধানের ভার পেলেন।[১]

জনৈক পশমজাত দ্রব্য উৎপাদকের পুত্র James Wilson (১৮০৫-৬০) ষোল বছর বয়স থেকে ব্যবসায়ে ছিলেন। ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত সফলভাবে ব্যবসা চালিয়ে তিনি ব্যবসায়ী জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ওয়েস্টবারি (১৮৩৭-৫৭) ও ডেভেনপোর্ট (১৮৫৭-৫৯) থেকে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের জয়েণ্ট সেক্রেটারি (১৮৪৭-৫২) হিসাবে ভারতীয় ব্যাপার সম্পর্কে তিনি কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ সেই সময়ে তিনি ভারতে রেলপথ নির্মাণের সংগঠনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। যে সময়ে তিনি ট্রেজারির ফিনান্স সেক্রেটারি (১৮৫৩-৫৮) এবং বোর্ড অফ ট্রেডের সহ-সভাপতি (১৮৫৯) ছিলেন তখনও তিনি অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে ব্যবসায়িক ব্যাপার সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমসাময়িক অর্থনৈতিক তত্ত্বের উপর অধিকার সমন্বিত হয়েছিল। বস্তুতঃ ইংল্যাণ্ডে তাঁকে প্রধানতঃ মনে রাখা হয় লণ্ডনের প্রখ্যাত "Economist" পত্রিকার সুদক্ষ প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হিসাবে (১৮৪৩)। "অবাধবাণিজ্য আন্দোলনকে মননশীলতার মর্যাদা দেবার জন্য" Cobden-এর সমর্থনে এই পত্রিকাটি প্রকাশ করা হয়েছিল।[২] শস্য আইন "Corn-Law" সম্পর্কিত বিতর্কে অবদান ছাড়াও Wilson দেশের প্রচলিত মুদ্রা (currency) সম্পর্কেও মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি "Influence of Corn Laws" শীর্ষক একখানি পুস্তিকা (১৮৩৯) এবং "Fluctuations

of Currency" (১৮৪০) ও "Capital, Currency and Banking" (১৮৪৭) শীর্ষক প্রবন্ধাবলী লিখেছিলেন।[৩] তথাকথিত "Banking School"-এর অন্যতম হিসাবে তিনি "Economist"[৪] পত্রিকায় "Currency School"-এর সমালোচনা করেছিলেন। Wilson ১৮৪৪ সালের ব্যাঙ্ক অ্যাক্ট-এর সমালোচক ছিলেন। কিন্তু পরে সেই আইনকে তিনি তাঁর ভারতীয় কাগজের টাকা Paper Currency পরিকল্পনার নক্সা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।[৫] Sir C. Wood তাঁকে গভর্নর-জেনারেলের পরিষদে ফিনান্স মেম্বার পদ গ্রহণে রাজী করান। তিনি ১৮৫৯ সালের ২৯শে নভেম্বর ফিনান্স মেম্বার হিসাবে পরিষদে যোগ দেন। ১৮৬০ সালের ১১ই আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়। আর এই অল্পসময়ের মধ্যে তিনি ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থা ঢেলে সাজার কাজ শুরু করে দেন। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে পূর্ব-অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে সহায়ক হয়েছিল, বাজেট ব্যবস্থা সম্বন্ধে ও আয়কর সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনাগুলি ইংল্যাণ্ডের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।[৬] কেউ কেউ—তাঁদের মধ্যে Sir C. Trevelyanও ছিলেন—Wilson-কে অতিরিক্ত "তত্ত্ব-ঘেঁষা" বলে অভিযোগ করতেন; বলা হত তাঁর ভারতীয় পরিস্থিতিকে অগ্রাহ্য করার ঝোঁক ছিল।[৭] কিন্তু Wilson-এর জীবনীকার Bagehot লিখেছিলেন যে Wilson "আশঙ্কা করেছিলেন যে বেশিরভাগ সভ্য দেশে যে ধরনের প্রশাসনিক বিজ্ঞান চালু থাকে ভারতে তা অগ্রাহ্য হবার বিপদ আছে।...অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের পথে মানুষকে যদিও ধীরে সুস্থে নিয়ে যেতে হয়, তথাপি তাঁর ইচ্ছে ছিল তাঁদের (ভারতীয়দের) ঐতিহাসিক পূর্ববৃত্তান্ত থেকে উদ্ভূত চিন্তা ও মানসিকতার প্রতি যথাসম্ভব সহানুভূতিশীল বিবেচনা প্রদর্শন করা"[৮] শেষোক্ত ঝোঁকের একটা উদাহরণ হল আয়কর যে 'মনুসংহিতা'য় সূত্রায়িত প্রাচীন হিন্দু বিধানগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সে কথা প্রমাণ করার জন্য তিনি বিপুল যত্ন নিয়েছিলেন।[৯] Trevelyan-এর মন্তব্য সঠিক: Wilson "ভারতীয় অর্থসংক্রান্ত নতুন ব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপন করেন।"[১০] ভারতে তিনি সম্পূর্ণ আস্থা ভোগ করতেন।[১১] ইংল্যাণ্ডে তাঁর প্রতি আস্থার সবচেয়ে প্রত্যয়যোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে—তার মৃত্যুসংবাদ লণ্ডনে পৌঁছা মাত্র কোম্পানির কাগজের দর পড়ে গিয়েছিল।[১২]

Wilson-এর মৃত্যুর পর ছ মাসের উপর অস্থায়ী ফিনান্স মেম্বার হিসাবে

কাজ করেছিলেন Henry Bartle Frere (১৮১৫-৮৪)। হাইলেবারিতে শিক্ষিত Frere ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের একজন সুদক্ষ অফিসার ছিলেন। তিনি গভর্নর-জেনারেলের পরিষদের সদস্য (১৮৫৯-৬২) নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে বোম্বাই-এর গভর্নর হয়েছিলেন (১৮৬২-৬৭)।[১৩] মৃত্যুশয্যা থেকে Wilson Frere-কে অনুরোধ করেছিলেন "তাঁর অসমাপ্ত ব্যবস্থাবলী হাতে নিতে ও শেষপর্যন্ত চালিয়ে যেতে।"[১৪] Wilson-এর পরিকল্পনাকে Frere অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে করতেন এবং "যে-কোনও একটা মানুষের পক্ষে সেগুলিকে কার্যকর করা" অসম্ভব বলে ভাবতেন।[১৫] তিনি মনে করতেন "তাড়াহুড়ো কম করলে কাজ বেশি হত।"[১৬] "তাত্ত্বিক" পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁর আমলাসুলভ সন্দেহ ছিল এবং কঠোর পরিশ্রম ও "প্রয়োজনীয় একঘেঁয়েমি"তে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি Wood-কে লিখেছিলেন "সমস্ত মুশকিল থেকে মুক্তি পেতে হলে দরকার কেবল ভাল হিসেব-পত্র এবং শতখানেক ছোটখাট খুঁটি-নাটির সুস্থিত ও ভাল ব্যবস্থাপনা।"[১৭] কথাটা ভাল করে লক্ষ্য করা দরকার, কারণ এ ছিল একেবারে ছাঁকা সিভিল সার্ভিসসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি। ভারতীয় অভিজ্ঞতাহীন যেসব লোক পশ্চিমের ধ্যান ধারণা ও বিধি-বিধান আমদানি করতে চাইতেন তাদের সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি সন্দিগ্ধ ছিল। নতুন উদ্ভাবনের প্রতি আমলাতন্ত্রের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধই ছিল আধুনিকীকরণের বহু ধাক্কাকে পিছু হঠিয়ে দেওয়া ও অ-কার্যকর করে দেওয়ার মূলে।

Wilson-এর উত্তরাধিকারী Samuel Laing (১৮১২-৯৭) ফিনান্স মেম্বার হিসাবে অ-সফল ছিলেন না যদিও তিনি Wilson-এর সমকক্ষ ছিলেন না। বোর্ড অফ ট্রেড-এ তাঁর অভিজ্ঞতা এবং রেলপথের ব্যবস্থাপনার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা মূল্যবান ছিল। ১৮৫২-৫৭ সালে ও ১৮৫৯ সালে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্যও ছিলেন।[১৮] Laing-এর সৌভাগ্যক্রমে তাঁর প্রথম বছরে (১৮৬১-৬২) তিনি বাজেট ঘাটতি খুব কমাতে সক্ষম হয়েছিলেন; ১৮৬২-৬৩ সালের বাজেট তৈরি করার পর ১৮৬২ সালের শেষভাগে তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান, সে বছরে ১৮ লক্ষ পাউণ্ড উদ্বৃত্ত হয়েছিল। প্রধানতঃ অনেকটা বেশি আফিমরাজস্ব এবং সামরিক ফিনান্স কমিশন কর্তৃক ছাঁটাইয়ের জন্যই এটা হতে পেরেছিল। শুল্ক কমানর দরুন Laing ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিলেন।[১৯] পরে আমরা দেখতে

পাব যে Laing সেক্রেটারি অফ স্টেটের সঙ্গে একাধিকবার সংঘর্ষে এসেছিলেন।

আর একজন হাইলেবারির ছাত্র এবং বহু গ্রন্থের রচয়িতা Charles Edward Trevelyan (১৮০৭-৮৮) বোধ হয় ফিনান্স মেম্বারদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাশালী ছিলেন, যদিও অর্থ-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাঁর চেয়ে ভাল আরও অনেকে ছিলেন। লোকে বলত তাঁর অবসর-বিনোদন ছিল পার্লামেণ্ট, প্রিভি-কাউন্সিল ইত্যাদির সরকারি দলিলপত্র পড়া। Macaulay-র মতে তিনি ছিলেন "সত্যিকারের প্রতিভাবান লোক, ···পূর্ব-দ্রাঘিমার ১০০ ডিগ্রিতে···ভায়রাভাই হিসাবে এমন লোক পাওয়া খারাপ নয়।" ভারতে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করার (১৮২৬-৪০) পর তিনি ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান ও ট্রেজারির অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি হন (১৮৪০-৫৭)।[২০] ইংল্যাণ্ডে সিভিল সার্ভিসে লোক নেবার ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্তের ব্যাপারে তিনি Northcote-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মাদ্রাজের গভর্নর থাকাকালীন অর্থ-বিষয়ক ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ নিয়ে Wilson-এর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বেধেছিল। ফিনান্স মেম্বার থাকাকালীন Trevelyan-এর প্রায়ই সেক্রেটারি অফ স্টেটের সঙ্গে মতবিরোধ হত, তার ফলে একবার গোটা বাজেট ও করধার্যের প্রস্তাব সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে হয়েছিল। ১৮৬৪ "সালে ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া" অনুযোগ করেছিল যে "ব্যবসায় ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর সক্রিয় সহানুভূতি"র অভাব ছিল।[২১] ১৮৬৫ সালে Trevelyan যখন চা এবং চট সহ বিভিন্ন কাঁচামালের উপর রপ্তানিশুল্কের প্রস্তাব করলেন তখন গোটা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছিল।[২২]

শিক্ষায় আইনব্যবসায়ী W. N. Massey (১৮০৯-৮১) ১৮৫৫ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হন (Palmerston-এর দলে)।[২৩] তখন থেকেই সংসদীয় রাজনীতিতে তাঁর সামান্য ভূমিকা ছিল। ১৮৬৫ সালে তিনি ভারতে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাব যে Massey-র সময়ে (১৮৬৫-৬৮) পর পর কয়েকবার ঘাটতি হয়েছিল। তাঁকে মোটামুটিভাবে নিতান্ত মাঝারি গোছের মনে করা হত, এবং তাঁর সম্বন্ধে "অলস ও যোগাড়ে নয়" বলে ধারণা ছিল।[২৪]

তাঁর উত্তরাধিকারী ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের Richard Temple, (১৮২৬-১৯০২) অর্থমন্ত্রী হিসাবে তেমন দক্ষ ছিলেন না। ১৮৬০

সালে তিনি Wilson-এর সহকারী নিযুক্ত হয়েছিলেন। Wilson-কে তিনি "আমার গুরু বলে উল্লেখ করেছিলেন পরবর্তীকালে তিনি তাঁর কাজে দক্ষ প্রশাসক হিসাবে কৃতিত্ব লাভ করেছিলেন।[২৫] অনেকদিন ধরে তিনি ফিনান্স মেম্বার ছিলেন (১৮৬৮-৭৪)। গভর্নর-জেনারেল Mayo-র সঙ্গে তাঁর মিলমিশ হয় নি।[২৬] Mayo-র অর্থ-বিষয়ক বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা Temple সমর্থন করেন নি, আবার Temple-এর আয়করসংক্রান্ত নীতি, যা রীতিমত বিরোধিতা ও সমালোচনার উদ্রেক করেছিল, Mayo অপছন্দ করেছিলেন।[২৭] ১৮৭০ সালের জুলাইতে Mayo Argyll-কে লিখেছেন: "আমার বিশ্বাস নয় যে তিনি (Temple) কখনও পৃথিবীর চোখে সে আসন পেতে পারেন যা এইরকম একটা সাম্রাজ্যের অর্থ-বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পাওয়া উচিত" কারণ "অর্থ-বিষয়ে তাঁর সেই জ্ঞান বা ব্যবস্থা উদ্ভাবনের সেই ক্ষমতা নেই কাউন্সিলকে পরামর্শ দিতে সমর্থ হতে হলে যা অপরিহার্য...।"[২৮] Mayo-র প্রস্তাব ছিল তাঁকে বাংলার লেফটেনাণ্ট-গভর্নর করে সরিয়ে দেওয়ার।[২৯] Argyll তাঁকে মাদ্রাজের গভর্নরের পদ দিতে চেয়েছিলেন![৩০] কিন্তু Temple-এর কোনও বদলি পাওয়া গেল না; Argyll মনে করতেন এ কাজ আই-সি-এস'এর কোনও লোকের দ্বারা হবে না, ফিনান্স মেম্বারের পদ গ্রহণ করার জন্য Stafford Northcote-কে রাজী করানর চেষ্টা করে তিনি পারলেন না।[৩১] কাউন্সিল ও সংবাদপত্রে অবিরাম সমালোচনা সত্ত্বেও Temple-ই ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থার কর্তা রয়ে গেলেন।

John Strachey (১৮২৩-১৯০৭) ছিলেন Mayo-র বিশ্বস্ত অর্থ-বিষয়ক পরামর্শদাতাদের মধ্যে অন্যতম।[৩২] সাধারণ ধারণা ছিল যে Temple ও Strachey-র মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল।[৩৩] হাইলেবারিতে শিক্ষিত J. Strachey সিভিল সার্ভিসে কৃতিত্বপূর্ণ কাজের পর গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন (১৮৬৮ সালের মার্চ মাসে)।[৩৪] পরবর্তীকালে তিনি ফিনান্স মেম্বার হয়েছিলেন (১৮৭৬-৮০)।

John Strachey-র ভ্রাতা Richard Stracheyও অর্থ-বিষয়ক ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ বলে পরিগণিত হতেন![৩৫] পূর্তকর্ম বিভাগের প্রধান হিসাবে Richard Strachey-র দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণের কৃতিত্ব ছিল। ঋণ

থেকে সেচ পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা (১৮৬৮ সালের পর থেকে রূপায়িত) তাঁরই রচনা ; বাৎসরিক রাজস্ব থেকে যখন পূর্তকর্মের সমস্ত খরচ বহন করা হত তখনকার চেয়ে এইভাবে সেচের জন্য অনেক বেশি খরচ করা সম্ভব হয়েছিল। অর্থ-বিষয়ক বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনার দায়িত্বও তাঁরই ছিল। Massey-র পরিকল্পনার (১৮৬৭) ভিত্তি ছিল Richard Strachey-র দেওয়া খসড়া।[৩৬]

আমাদের আলোচ্য সময়ের শেষের দিকে বার বার ঘাটতির জন্য সরকারকে অত্যন্ত বিব্রত অবস্থায় পড়তে হত। তৎকালীন পরিস্থিতি সর্বোচ্চস্তরে সোৎসাহী নেতৃত্বের দাবি করছিল। অর্থ-বিষয়ে লর্ড Mayo এই অংশ গ্রহণ করেন। "যাচ্ছেতাই ঘাটতি"র মুখে ভারতের অর্থ-দফতরের[৩৭] অযোগ্যতা নিয়ে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন।[৩৮] "সম্মুখ সমরে নাবার জন্য" ("to take the Bull by the horns") তিনি মনস্থির করে ফেলেছিলেন।[৩৯] সাহসের সঙ্গে তিনি ছাঁটাই করার বিরক্তি উৎপাদক ও অপ্রিয় কাজে হাত দিয়েছিলেন। সরাসরি গভর্নর-জেনারেলের কাছ থেকে আসার দরুন প্রশাসনিক বিভাগ ব্যয়-হ্রাসের প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গিয়েছিল। অর্থের বিকেন্দ্রীকরণের জন্যও তিনি দায়ী ছিলেন।

নতুন ভারতীয় অর্থব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও স্রষ্টা Wilson, Laing, Trevelyan ও অন্যান্যদের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য ছিল। বিদ্রোহের পরবর্তীকালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগত উদ্ভাবন ছিল বাজেটব্যবস্থা। কিছুটা ব্রিটেনের প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে রচিত এই নতুন ব্যবস্থায় আগামী আর্থিক বছরের আয় ও ব্যয়ের একটা সম্পূর্ণ পর্যালোচনা এবং বিগত বছরের একটা পরিপূর্ণ পরীক্ষার নিশ্চয়তা হত। এই ব্যবস্থায় এই নিশ্চয়তাও সৃষ্টি হত যে প্রত্যেকটা খাতে নির্দিষ্ট বরাদ্দের বেশি ব্যয় করা যাবে না। হিসাব পরীক্ষার ও হিসাব রাখার ব্যবস্থার সঙ্গে একযোগে এই ব্যবস্থা ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেখে যাওয়া অর্থব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করেছিল। অর্থ-বিষয়ক দফতর পুনঃসংগঠিত হয়েছিল এবং এই দফতর সকল দফতরের খরচের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছিল। ফিনান্স মেম্বারের স্থানটা ছিল অনেকটা মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রীর মত, যদিও তিনি কোনও প্রতিনিধিত্বমূলক বিধানসভার কাছে দায়ী থাকতেন না ; লেজিসলেটিভ কাউন্সিল (সামান্য কয়েকজন বে-সরকারি

সদস্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও) গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা থেকে বহু দূরে ছিল, আর অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে তার ক্ষমতাও ছিল খুব সীমাবদ্ধ। সেক্রেটারি অফ স্টেট-এর ভারত সরকারের উপর অর্থ-বিষয়ে পুরো নিয়ন্ত্রণ ছিল। ১৮৫৮ সালের গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট স-পরিষদ সেক্রেটারি অফ স্টেটের হাতে অর্থ-বিষয়ক নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছিল। ইংল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স-পরিষদ সেক্রেটারি অফ স্টেট রাস টেনে ধরলেন। (যোগাযোগের প্রযুক্তিবিদ্যা এবং ক্ষমতার বণ্টন ও ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্ক—বিশেষতঃ জেলা অফিসারের ক্ষমতা হ্রাস এবং ভারত সরকারের উপর ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি বিস্তারিত অনুশীলনের যোগ্য)। ১৮৫৮ সালের আইনের বিধান অনুযায়ী তিনি পার্লামেণ্টে প্রতি বছর একটা করে অর্থ-বিষয়ক বিবৃতি দিতেন, কিন্তু তা কদাচিৎ কারও মনোযোগ আকর্ষণ করত।

Wilson-এর প্রিয় শব্দ "অর্থনৈতিক দক্ষতা"র (economical efficiency) উপর জোর ভারতে অর্থ-বিষয়ক ক্ষমতার কিছুটা কেন্দ্রীভবনও বোঝাত। ১৮৫৮-৬১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ঝোঁকটা ছিল কেন্দ্রীকরণের দিকে, এই ব্যাপারেই Trevelyan ও Wilson-এর মধ্যে সংঘর্ষ বেধেছিল। ষাটের দশকের প্রথম দিকে বিকেন্দ্রীকরণের কয়েকটি পরিকল্পনা আলোচিত হয়েছিল। Samuel Laing, W. N. Massey এবং Col. R. Strachey অনেকগুলি পরিকল্পনা দিয়েছিলেন, কিন্তু গভর্নর-জেনারেল Lawrence বিকেন্দ্রীকরণের দৃঢ় বিরোধী ছিলেন, ৮৬৭ সালে বিকেন্দ্রীকরণের সমস্ত পরিকল্পনা শিকেয় তুলে দেওয়া হয়েছিল। Mayo বিকেন্দ্রীকরণের ধারণার পুনরুজ্জীবন করেন: তাঁর বিশ্বাস ছিল অর্থব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করা হলে তাতে (ক) সর্বোচ্চ সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হবে, (খ) যতদূর সম্ভব স্থানীয় করের মারফত স্থানীয় উন্নয়নের অর্থসংস্থান করা যাবে, (গ) সর্বোচ্চ সরকারের পক্ষে এমন কতকগুলো খাতের ব্যয় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হবে যেগুলির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কেবল প্রাদেশিক সরকারগুলির দ্বারাই সম্ভব, এবং (ঘ) স্থানীয় ও মিউনিসিপ্যাল স্তরে দেশীয় লোকদের সঙ্গে প্রশাসনের দায়িত্ব ভাগ করে নিতে সরকার সমর্থ হবে, আর দেশীয় লোকেরাও এইভাবে মূল্যবান রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ পেতে পারবেন। ১৮৭১-৭২ সালে অর্থবিষয়ক ক্ষমতার

ধারাবাহিক অবতরণের (devolution) পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছিল। Mayo-র পরিকল্পনায় যদিও অনেক ত্রুটি ছিল, তবু ভারতীয় অর্থ-বিষয়ক ইতিহাসে এটি যুগান্তকারী।

এইভাবে সাংগঠনিক স্তরে "অর্থনৈতিক দক্ষতা" অর্জিত না হোক অন্ততঃ সেই চেষ্টা চলছিল; তা সত্ত্বেও সরকার স্বাচ্ছল্যে পৌঁছতে পারেন নি। বস্তুতঃ .৮৬২-৬৪, ১৮৬৫-৬৬ এবং ১৮৭০-৭২ ছাড়া আলোচ্য সময়ের আর সব আর্থিক বছরেই আয়-ব্যয়ের হিসাবে ঘাটতি দেখা গিয়েছিল। রাজস্বের দিক থেকে ভূমিরাজস্ব ও আফিমই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত, মোট রাজস্বের যথাক্রমে ২০ শতাংশেরও বেশি এবং ১৫ শতাংশ এই দুই খাত থেকে আসত। পণ্যের উপর তিনটি কর ছিলঃ লবণশুল্ক গড়ে মোট রাজস্বের প্রায় ২০ শতাংশ এ থেকে উঠত, আবগারি শুল্ক গড়ে মোট রাজস্বের ২০ ভাগের ১ ভাগ তুলত; বহিঃশুল্ক থেকে মোট রাজস্বের ৫ থেকে ৯ শতাংশ পর্যন্ত উঠত। মোট রাজস্বের বেশ একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আয়কর ও অপরাপর প্রত্যক্ষ কর থেকে উঠত। রাজস্বের এমন কতকগুলি খাত ছিল (যথা, স্ট্যাম্প, টাঁকশাল, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ, পূর্তকর্ম, কোর্ট ফি ইত্যাদি) যেগুলিকে সরকার বিশেষ সুবিধাদান সঞ্জাত এক ধরনের রাজস্ব বলে গণ্য করত। ব্যয়ের দিক থেকে সৈন্যব্যাহিনী ও পূর্তকর্মের জন্য যথাক্রমে মোট আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ও ১৫ শতাংশ খরচ হত। মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশিকে ইংল্যাণ্ডে ও ভারতে প্রশাসনিক ব্যয় হিসাবে ধরা যেত। মোট দেয় অঙ্কের এক-দশমাংশই ছিল সুদ হিসাবে দেয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি জমির সত্ত্ব সম্পর্কিত সরকারি নীতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলঃ ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে ও কর্মনীতিতে বড় বড় বিতর্ক বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে। একমাত্র যে বড় প্রশ্নটির মীমাংসা হতে বাকি ছিল তা হল অস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্প্রসারণঃ ভূমিরাজস্ব থেকে মুক্তি ও পতিত জমি বিক্রী সংক্রান্ত সমস্যাও ছিল। ১৮৬২ সালে ভূমিরাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। রায়তদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা (Col. Baird Smith-এর পরামর্শে), "নিঃশর্ত সম্পত্তি সৃষ্টির" মারফত সরকারের প্রতি আনুগত্য জাগানোর ইচ্ছা, জমিতে মূলধন বিনিয়োগ উৎসাহদানের ইচ্ছা—

এই সমস্ত ও আরও কিছ্ উদ্দেশ্য সরকারকে এই সিদ্ধান্তে উৎসাহিত করেছিল। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 'নীতি' যদিও স্বীকৃত হয়েছিল, এইরকম একটা বন্দোবস্তের অসুবিধাগ্লি নিয়ে কর্তৃপক্ষের নতুন করে চিন্তা শুর্ হয়েছিল। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে আস্থা কমতে শুর্ করেছিল। এ কথা অন্ভূত হয়েছিল যে ভূমি-রাজস্বকে চিরকালের জন্য বেঁধে দেওয়া সরকারের পক্ষে লোকসানের ব্যাপার হয়ে যাবে। কৃষিজাত সম্পদের (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যে সম্পদ সৃষ্টি করবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল) উপর কর ধার্য করার একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করা এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মারফত যে রাজস্ব হারাতে হচ্ছে তা আবার ফিরে পাওয়া সরকারের পক্ষে কঠিন হচ্ছিল। জমির দর দ্রুত বাড়া ও টাকার দর দ্রুত কমাও সরকারকে নিবৃত্ত করছিল। সরকার নিজের স্বার্থ-রক্ষায় উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। চিয়স্থায়ী বন্দোবস্তকে স্থগিত রাখা হয়েছিল এবং ১৮৮৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্প্রসারণের অভিলাষ সরকারিভাবে পরিত্যক্ত হয়েছিল।

ভূমিরাজস্বের পর আফিম ছিল রাজস্বের সবচেয়ে গ্রুত্বপূর্ণ খাত। ফসলের আকস্মিক ক্ষতি এবং বাজারের খেয়ালের দর্ন ওঠাপড়া করার একটা ঝোঁক থাকলেও আফিমরাজস্ব এই গোটা সময়টাতে ক্রমাগতই নিয়মিত-ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। চীনের বাজার থেকে একটা প্রতিযোগিতার বিপদ দেখা দিয়েছিল, কারণ ষাটের দশকে সেখানে বেশ বড় একটা স্থানীয় উৎপাদন শুর্ হয়েছিল। কিন্তু তাতে আফিমরাজস্ব সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। ভারত সরকার যদিও মালওয়া আফিমের উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল না (এই আফিম ভারতের ভিতর দিয়ে চলাচলের জন্য বোম্বাইতে শুল্ক দিত), বাংলা প্রেসিডেন্সিতে আফিম উৎপাদনের সঙ্গে সরকার ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। আফিম ব্যবসার সঙ্গে সরকারের সংযোগের বির্দ্ধে ইংল্যাণ্ডে একটা বিক্ষোভ ছিল, কিন্তু ভারত সরকার অর্থকরী আফিমরাজস্ব ছেড়ে দেবার মত অবস্থায় ছিল না এবং আফিম বিরোধী-সোসাইটির বিক্ষোভে কর্ণপাত করতেন না।

সরকারের শুল্ক-নীতি বোধ হয় ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে "শ্রম-বিভাগে"র তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—এই শ্রম-বিভাগ হল ভারত কাঁচা-মাল সরবরাহ করবে আর ইংল্যাণ্ড শিল্পোৎপাদনে উৎকর্ষতা অর্জন করবে।

শুল্ক কোনও মতে দেশীয় শিল্পের পক্ষে রক্ষাকারী (protective) চরিত্রের হবে না, এ ছিল প্রশ্নাতীত সত্য। ব্রিটিশ শিল্পোৎপাদক স্বার্থগোষ্ঠী ভারতের শুল্কনীতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখত। সেটা কেন তা বোঝা যায় একটি উদাহরণে ঃ ল্যাঙ্কাশায়ার তার কাপড় ইত্যাদি পণ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভারতে রপ্তানি করত। অর্থসংক্রান্ত কারণে ব্রিটিশ আমদানিগুলির উপর থেকে সমস্ত আমদানিশুল্ক তুলে দেওয়া যেত না, তবে তাকে যতটা সম্ভব কম করে রাখা হত। ভারতীয় কাঁচামালের উপর রপ্তানিশুল্কও নিচু স্তরে রাখা হত। ১৮৬০-৬১ সালে ভারতের মোট রপ্তানির ২৮·১ শতাংশ ছিল কাপড়ের কাঁচামাল (তুলা, চট, রেশম ও পশম); ১৮৭০ সালে এই অনুপাতে ৪৪·৩ শতাংশ পর্যন্ত উঠেছিল। ১৮৬০-৬১ সালের মোট আমদানির ৩৯·৬৩ শতাংশ ছিল সূতীবস্ত্র ; ১৮৭০-৭১ সালে সূতী বস্ত্রের অংশ দাঁড়িয়েছিল ৪৬·৮২ শতাংশ।

নিম্নতম আয়-বিশিষ্ট গোষ্ঠীর উপর লবণশুল্ক বস্তুতঃ প্রায় মাথা প্রতি কর ছিল। এই শুল্ক ছিল রাজস্বের ক্রমবর্ধমান উৎস। শুল্কের হার ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তোলা হচ্ছিল, এই বাড়ানর পক্ষে এই বলে যুক্তি দেওয়া হচ্ছিল যে দেশের অভ্যন্তরে শুল্কের বেড়া যাতে তুলে দেওয়া যায় তার জন্যই সারা ভারতে একরকম হার প্রবর্তন করা হচ্ছে। আয়কর এবং অপরাপর ধরনের প্রত্যক্ষ করের লক্ষ্য ছিলেন উচ্চতর আয়-বিশিষ্ট লোকেরা, কিন্তু তাতে আশানুরূপ রাজস্ব আদায় হত না।

ভারত শাসনের ব্যয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এর কারণ অংশত ছিল সারা ভারতে সাধারণভাবে মূল্য ও মজুরি বৃদ্ধি আর ক্রমবর্দ্ধমান প্রশাসনের চাহিদা কতকগুলি খাতে (যথা, আইন ও বিচার) বর্ধিত ব্যয় যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য খাতে ব্যয় অত্যন্ত কম ছিল। ভারতে এবং বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে ঋণের সুদ দেবার জন্য সরকারকে বিরাট খরচ করতে হত। মাঝে মাঝে হঠাৎ বেসামরিক খরচ ও ঋণভার কমানর চেষ্টা করা হত। কিন্তু এই সব প্রয়াসে তেমন একটা ফললাভ হয় নি। ইংল্যাণ্ডে যেসব খাতে খরচ করতে হবে (home charge) তাও কমান যেত না, বিশেষ করে গ্যারাণ্টিপ্রাপ্ত রেলকোম্পানিগুলিকে দেয় সুদ, ঋণের দরুন ইংল্যাণ্ডে দেয় সুদ এবং ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনীর দরুন খরচ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হত।

মোট ব্যয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল সামরিক ব্যয়। বিদ্রোহের পর স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরই সরকার সামরিক ব্যয় ছাঁটাই করতে শুরু করেছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানের মত আর কোনও অভ্যুত্থানের পুনরাবৃত্তি রোধের জন্য সর্বনিম্ন যে সংখ্যক সৈন্য রাখা তারা প্রয়োজন বোধ করছিল তার চেয়ে কমান সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ সৈন্যদের সমস্ত খরচ অর্থাৎ তাদের ভর্তি করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া, ইংল্যাণ্ড থেকে যাতায়াত, ভারতীয় সৈন্যগুলিতে জীবনযাত্রার ইউ-রোপীয় মান বজায় রাখা, অবসর গ্রহণের পর পেন্সন ইত্যাদির দরুন খরচ ভারত সরকারকেই বহন করতে হত। ভারত সরকার অভিযোগ করত যে ইংল্যাণ্ডের ওয়ার অফিস ব্রিটিশ সৈন্যদের বাবদ অতিরিক্ত খরচ দাবি করছে। কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্যদের বাবদ কার্যকর (effective) ও অ-কার্যকর (non-effective) কোনও খরচটাই কমান যেত না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যদের ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে একীভূত করার সময়ে যেসব অঙ্গীকার ভারত সরকার করে নিয়েছিল তা থেকে তাঁর সরে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। উপরন্তু ভারতের খরচে পোষা সৈন্যবাহিনী (ভারতীয় দেশীয় ফৌজ সহ) ব্রিটেনের পক্ষে এমন একটি অতিরিক্ত বাহিনী (reserve force) ছিল যাকে প্রয়োজন হলে ভারত সীমান্তের বাহিরেও নিয়োগ করা যেত। ভারতে অবস্থিত সৈন্যবাহিনী ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের এবং ভারতের বাইরে ব্রিটিশ প্রভাবের চূড়ান্ত ভিত্তি ছিল।

রাষ্ট্রীয় তহবিল ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগের দ্বারা (মোটা রকমের অনুদান সহ) যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল এবং সেচের সুযোগ-সুবিধা প্রসারিত হয়েছিল। যানবাহনের উন্নতি, রাস্তা, সেচ, ইত্যাদিতে বিনিয়োগের দরুন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে যতখানি উদ্দীপনা যোগাবে বলে আশা করা হয়েছিল বস্তুতঃ তার চেয়ে কম হচ্ছিল। পূর্ত-কর্মের কর্মনীতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উন্নয়নকে ব্যাহত করত: পূর্তকর্মের (বিশেষ করে অ-লাভজনক কাজের) খরচ যোগানর জন্য ধার করা এড়ান হত, ফলতঃ যথেষ্ট তহবিল পাওয়া যেত না; পূর্তকর্ম তহবিলের একটা অতি বিপুল অংশ সামরিক বাহিনীর সৈন্যাবাস ইত্যাদির মত অনুন্নয়ন-মূলক কাজে ব্যবহৃত হত; ভারতে রেলপথ উন্নয়নের জন্য যে শর্তে ব্রিটিশ

পুঁজি যোগাড় করা হয়েছিল তাতে গ্যারাণ্টি দেওয়া সুদের জন্য ভারতের অনেক খরচ পড়ে যেত।

মোটা দাগে যে মানচিত্র আমরা এঁকেছি তার গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিনাটি পূরণ করতে শুরু করার আগে একটু থেমে ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনে সরকারের ভূমিকার প্রশ্ন সম্বন্ধে নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেকার দীর্ঘমেয়াদী ঝোঁকগুলিকে নির্ণয় করার চেষ্টা দরকার বোধ হয়।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে বিদ্রোহের ফলস্বরূপ ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ মনোভাবে পর্বত-প্রমাণ পরিবর্তন এসেছিল। Sir George Travelyan উল্লেখ করেছিলেন যে "ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ মেজাজ" ১৮৫৭ সালের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের আগে যা ছিল এখন আর তা নেই।[৪০] ঝানু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান Sir Charles Trevelyan ১৮৬৩ সালে আক্ষেপ করেছিলেন যে "সিভিল সার্ভিসের লোকেরা" যতটা অভিপ্রেত তার চেয়ে বেশি করে "ঘরের দিকে তাকান" ঃ তার জন্য তিনি দ্রুত যোগাযোগব্যবস্থা ও লম্বা ছুটিতে ইংল্যাণ্ডে থাকার অনুমতি সংক্রান্ত নতুন নিয়মাবলীকে দায়ী করেন।[৪১] আর একজন ঝানু লোক Birtle Frere লিখেছিলেন ঃ "ইংরেজরা ভারতে সদ্য আগতই হোন বা দীর্ঘকালের বাসিন্দাই হোন— দেশীয়দের জন্য যে সহানুভূতি অনুভব করতেন তা পরিবর্তিত হয়ে ঘৃণা না হোক (অন্ততঃ) বিতৃষ্ণার সাধারণ অনুভূতিতে পরিণত হয়েছিল", এবং ইংরেজরা "এখানে থাকতে অথবা ভারত সম্পর্কে পরোয়া করতে অনিচ্ছুক (ছিলেন) এবং অ-ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিতে চাইতেন…।"[৪২] উপরন্তু বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্র হিসাবে ভারত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সে "আর ইংল্যাণ্ডের বড়লোকদের কনিষ্ঠপুত্রদের দ্রুত ধনলাভের জন্য বাঞ্ছা-কল্পতরুর নন্দনকানন ছিল না।"[৪৩]

ভারতকে "উন্নত করে তোলার" বিপুল প্রয়াসই ছিল বিদ্রোহ পরবর্তী যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে ভারতকে উন্নত করার যে-কোনও পরিকল্পনা জনমানসে আগ্রহ জাগাত এবং কখনও কখনও সরকারের সমর্থনও লাভ করত। James Wilson দাবি করেছিলেন যে ভারত একটা উন্নয়ন পর্যায়ের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। "সম্প্রতিকালে আমাদের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয়েরই দ্রুত অগ্রগতি,…… চা-বাগিচা, কয়লাখনি অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচলের সঙ্গে সংযুক্ত পাব্লিক

কোম্পানিগুলিতে ব্যাপক মূলধন বিনিয়োগ,······জনগণের উন্নততর অবস্থা, ভূমিজাত উৎপন্নের পরিমাণ ও মূল্য বৃদ্ধি, মজুরির হার বৃদ্ধি, পথে, নদীতে ও খালে যানবাহন চলাচল বৃদ্ধি······" ইত্যাদি এই ইঙ্গিত দিচ্ছে।[৪৪] বিদ্রোহের পরবর্তী দুই দশকে ভারতে ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগ অভূতপূর্ব-ভাবে বেড়েছিল।[৪৫] ১৮৬১-৬৪ সালে তুলোর তেজি বাজার, ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় কাঁচামালের বাজারের প্রসার, সুয়েজ খাল খোলা, রেলপথ ব্যবস্থা গড়ে ওঠা ইত্যাদি ভারতে, বিশেষতঃ তার পশ্চিমাংশে ব্যবসা-বাণিজ্যে একটা উদ্দীপনা যুগিয়েছিল।[৪৬] এই প্রক্রিয়ায় স্বভাবতই ব্রিটিশ বণিকদের ভূমিকাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। "ম্যাঞ্চেস্টারের সাম্রাজ্য নির্মাণ থেকে বিরত থাকা ও বিদেশে হস্তক্ষেপ করায় অনাস্থা বদল হয়ে উৎসাহী ঔপনিবেশিক ও বৈদেশিক কর্মনীতিতে নতুন করে বিশ্বাস স্থাপন" ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘটেছিল।[৪৭] ঔপনিবেশিক বাণিজ্যে এই নতুন আগ্রহের আংশিক কারণ হল অনেকগুলি দেশে শুল্কের মাধ্যমে দেশীয় শিল্প সংরক্ষণের দরুন ১৮৭০ সালের পর কিছু বৈদেশিক বাজারের সঙ্কোচন।[৪৮] অবাধনীতি (laissez faire) তখনই পরিবর্তিত হল যখন ইংল্যাণ্ডের শিল্প সংশ্লিষ্ট ও বাণিজ্যিক স্বার্থ-গুলি তাহা-ই চাইল এবং তত্ত্বে নিরুৎসুক ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় কর্মনীতির কিছু-কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অবাধনীতির সংকীর্ণ পথ থেকে প্রায়ই বিচ্যুত হত।[৪৯]

একদিকে যেমন ব্রিটিশ বাণিজ্যিক সম্প্রদায় ভারতে তাঁদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সম্পর্কে আরও সচেতন হয়ে উঠেছিল, অপরদিকে তেমন ভারতের প্রতি ব্রিটেনের "দায়িত্ব" সম্পর্কেও একটা নতুন সচেতনতা দেখা দিয়েছিল। ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কে Fawcett ও Hyndman-এর রচনা গোড়ার যুগের ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।[৫০] যে "রহস্যাবরণ" দ্বারা ভারতীয় আমলাতন্ত্র ইংরেজ জনগণকে ভারতের ব্যাপারে অজ্ঞ রাখতে চাইত Dickinson সেই ব্যবস্থার স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করেছিলেন।[৫১] অপরদিকে ১৮৫৯ সালে মেজর Wingate 'ভারতের সঙ্গে আমাদের অর্থ-বিষয়ক সম্পর্ক' (Our Financial Relations with India) শীর্ষক তাঁর সুবিদিত রচনায় স্পস্ট কথার কোনও কার্পণ্য করেন নি: ব্রিটিশ কর্মনীতি 'সে দেশের (ভারতের) লোকের কল্যাণ সম্পর্কে নিছক নিঃস্বার্থ ও হিতৈষী

মনোভাব থেকে নির্ধারিত" হয় নি।[৫২] ভারতীয় ব্যাপার ছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্যে ভারতীয় রাজস্ব ব্যয় ও "সম্পদ অপহরণ" (drain of wealth) সম্পর্কে Wingate, মেজর Evans Bell[৫৩] ও Robert Knight[৫৪] বহু তথ্য উদ্ঘাটিত করেন। Hunter ও Bartle Frere-র মত অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মকর্তারা ভারতীয় রাজস্ব ও সম্পদ অপব্যয়ের বিরুদ্ধে ভারতে যে বিক্ষোভ জাগছিল সে সম্পর্কে ব্রিটিশ জনগণ কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।[৫৫]

রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে সমসাময়িক তত্ত্ব—ইংল্যাণ্ডে যে তত্ত্ব Gladstone-এর নামের সঙ্গে জড়িত ছিল—তা অর্থনৈতিক উদারনীতিবাদের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।[৫৬] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের অর্থ-বিষয়ক নীতি নির্ধারকদের পক্ষে "কেবল রাজস্বের জন্য কর বসান" একটি প্রশ্নাতীত স্বতঃসিদ্ধ সত্য ছিল। দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার কথাই উঠত না। রাষ্ট্রীয় ব্যয় কম রাখা এবং ব্যক্তিগত মালিকানার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এমনভাবে রাজস্ব বৃদ্ধিও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। অর্থনৈতিক উদারনীতিবাদের নীতি অনুযায়ী ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগীকে (entrepreneur) কোনোপ্রকারে বাধাগ্রস্ত করা চলবে না; আর সর্বোপরি "সুষম বাজেট" চাই: ব্যয়ের চেয়ে রাজস্ব আদায় বেশি হতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় ঋণগ্রহণ যতদূর সম্ভব এড়াতে হবে। ভারতে অর্থ-বিষয়ক নীতি নির্ধারকেরা রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থার এই সব গোঁড়া নীতিকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন না।

এ কথা সুবিদিত যে অবাধনীতির (laissez faire) মতবাদ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারত সরকারের কর্মনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ভারতীয় অর্থনৈতিক বিকাশ সম্বন্ধে জনৈক নেতৃস্থানীয় প্রামাণিক বিশেষজ্ঞের মতে "বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে অবাধনীতির কর্মনীতি অনুসৃত হয়েছিল।[৫৭] সম্প্রতি এ দাবী করা হয়েছে যে "১৮৫৮ সালে কোম্পানির শাসনের অবসান অবাধনীতি-যুগের-বল্গাহীন অবাধনীতির একটা পর্যায়ের[৫৮] প্রকৃত শুরুর সূচনা করেছিল। আর একজন ইতিহাসবিদ ব্রিটিশরাজের চরিত্রায়ণ করেছেন "কেবল রাতের পাহারাওয়ালা" বলে।[৫৯] উদাহরণের সংখ্যাবৃদ্ধি করা সহজ ও নিরর্থক। 'অবাধনীতি' শব্দটি স্পষ্টতঃই একটি সুবিদিত বাঁধা-বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ যখন রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের এলাকা বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে তখন পিছন ফিরে ঊনবিংশ

শতাব্দীকে অবাধনীতি কতটা অবাধ তা একটু বাড়িয়ে দেখা বোধ হয় অস্বাভাবিক নয়। আমাদের এ-কথাও অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এ প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীদের সেই 'শিল্পবিনাশ' প্রতিপাদ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল যাতে তাঁরা বলতেন যে সরকারের উদাসীনতা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় শিল্পের ক্ষয় ত্বরান্বিত করেছিল। সে যাই হোক ভারতীয় পটভূমিকায় অবাধনীতির ধারণাকে আরও খুঁটিয়ে দেখা এবং কয়েকটি প্রশ্ন তোলা যুক্তিযুক্ত।

এ কথা সব সময়ে যথেষ্ট উপলব্ধি করা হয় না যে ভারত সরকারের কর্মনীতি—যা মূলতঃ ছিল প্রযোগসর্বস্ব (pragmatic)—তাকে কেবল 'অবাধনীতি' বা 'হস্তক্ষেপ না করার মতবাদ' বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রাষ্ট্রীয় কর্মনীতির কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অংশে অবাধনীতি থেকে সরে যাওয়া হয়েছিল। ঐ সময়টাতে অবাধ-নীতি মতবাদে বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়ে আসছিল: ব্যবহারিক বিবেচনা সিদ্ধান্ত গ্রহণের উচ্চতর স্তরগুলিতে অবাধনীতির প্রতি ঝোঁককে ও তাত্ত্বিক প্রবণতাকে কাটিয়ে অকার্যকর করে দিচ্ছিল। ভারতে অবাধ-নীতির মতবাদ থেকে পশ্চাদপসরণ এবং এর পুনর্মূল্যায়নের প্রক্রিয়ায় ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক ও শিল্পসংশ্লিষ্ট স্বার্থগুলির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

J. S. Mill-এর Political Economy বইতে অনুন্নত অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদ আছে, "কিছু-কিছু জায়গায় ও কোনও-কোনও সময়ে রাস্তা, বন্দর পোতাশ্রয়, খাল সেচব্যবস্থা, হাসপাতাল, স্কুল, কলেজ, ছাপাখানা কিছুই থাকবে না, যদি না সরকার সেগুলি প্রতিষ্ঠা করে; কারণ জনগণ হয় প্রয়োজনীয় সম্পদ সংস্থানের পক্ষে অতিশয় দরিদ্র, না হয় এগুলির উদ্দেশ্য বোঝার পক্ষে বুদ্ধিতে অত্যন্ত কম অগ্রসর, অথবা উপযুক্ত সংস্থান যোগাড়ের জন্য প্রয়ো-জনীয় যৌথ ক্রিয়াকলাপে যথেষ্ট অভ্যস্ত নয়। যেসব দেশ স্বৈরতন্ত্রে অভ্যস্ত এবং বিশেষ করে যেসব দেশে সরকার ও জনগণের মধ্যে সভ্যতার ক্ষেত্রে বিরাট তফাত, সেসব দেশ সম্পর্কেই এ কথা মোটামুটি সত্য: তেমনি সত্য সেই সব দেশ সম্পর্কে যেগুলি অপেক্ষাকৃত কর্মদ্যোগী ও অগ্রসর জাতির দ্বারা বিজিত হয়েছে এবং তার অধীনস্থ রয়েছে।"[৬০] এটা তাৎপর্য-

পূর্ণ যে অনেকের কাছে অবাধনীতি মতবাদের পূজারী বলে গণ্য J. S. Mill অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাধা দূর করার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের এক কর্মসূচীর সুপারিশ করেছিলেন। Mill এ কথাটা স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে অগ্রসর সমাজের চেয়ে পশ্চাদপদ সমাজে সরকারের কাজ অপেক্ষাকৃত ব্যাপক হবার সম্ভাবনা থাকে।[৬১] মনে হয় এসিয়ার কিছু পশ্চাদপদ জনসংখ্যার পক্ষে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক যে সরকারি ব্যবস্থাপনার অভাব বা কু-শাসন এই ধারণা তিনি অনুমোদন করতেন।[৬২] Bentham এ সত্য স্বীকার করতেন যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের "কর্মসূচী" বিভিন্ন রকম হতে পারে; ইংল্যাণ্ডে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপের সীমাবদ্ধ ধারণা একটা কম অগ্রসর দেশ, যথা Peter-এর সময়কার রাশিয়ার পক্ষে প্রযোজ্য হবে না।[৬৩] আর একজন অর্থনীতিবিদ McCulloch তোতা পাখীর মত অবাধনীতির পুনরাবৃত্তির তীব্র নিন্দা করেছিলেন।[৬৪] এসব থেকে মনে হয় যে অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ না করার মতবাদের প্রবক্তাদের সর্বাত্মকভাবে এই পথেরই পথিক বলে অনেক সময়ে যেমন ধরে নেওয়া হত আসলে তাঁরা ততখানি ছিলেন না। ভারত সরকার যদি অবাধনীতির সঙ্কীর্ণ পথ থেকে বিচ্যুত হত তা হলে অবাধনীতির প্রবক্তারা যে অস্ত্রাগার থেকে যুক্তিরূপ অস্ত্র ধার নিতেন সেখান থেকেই সরকারও যুক্তি যোগাড় করতে পারত। ভারতীয় প্রশাসন সম্পর্কে Sir John Strachey-র সুবিদিত রচনায় তিনি Mill-এর যে অনুচ্ছেদটি থেকে আমরা উদ্ধৃতি দিয়েছি, স্পষ্টতঃই অনুমোদনসূচকভাবে সেটিরই উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৬৫] সর্বময় কর্তৃত্ববাদী (authoritarian) আমলাতন্ত্রের কাছে এ বার্তাটি মনোমত ছিল।

Sir Fitzames Stephen বলেছিলেন "ভারতে ইংরেজরা হচ্ছেন এক 'যুদ্ধমান সভ্যতা'র প্রতিনিধি।"[৬৬] Sir John Strachey লিখেছিলেন এই কথাগুলি "আমরা যেসব নীতিকে কার্যকরী করি" তার পিছনকার মনোভাবের প্রকাশক। Eric Stokes উল্লেখ করেছেন যে Stephen ও Strachey প্রশাসকদের সেই নতুন প্রজন্মের নমুনাস্বরূপ ছিলেন যাঁরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সভ্যতা বিস্তারের ইভ্যানজেলিকাল ধারণার সঙ্গে সুশাসন সম্পর্কে উপোযোগিতাবাদীসুলভ প্রবল আগ্রহের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন।[৬৭] কর্তব্য সম্বন্ধে এই ধারণা James Mill-এর উপোযোগিতা-

বাদের মধ্যে নিহিত সর্বময় কর্তৃত্বের উপাদানের উপর জোর দিয়েছিল। এর ফলে শাসন দক্ষতার একটা আদর্শ তৈরি হল, যা কেবল আমলাতন্ত্রের আধিপত্য সমন্বিত রাষ্ট্রেই সম্ভব এবং ফলতঃ ভারবতর্ষকে এমন এক অতি-শাসিত দেশে পরিণত করেছিল যেখানে গোঁড়া উদারনীতিবাদী অবাধনীতি উপোযোগী বলে বিবেচিত ছিল না। Sir John Strachey বলেছিলেন "ভারত সরকারের কর্তব্যসমূহ আমাদের (অর্থাৎ ব্রিটেনের) মত দেশের একটা সরকারের কাছে যা আমরা আশা করি তার চেয়ে অনেক সুদূর-প্রসারী।"[৬৮] "আইনকানুন বিহীন নীচ জাতিদের" যাঁরা শাসক এবং 'কোনমতে কাজ চালাতেন'[৬৯] বিশ্বাসী অলস পৌত্তলিকদের যাঁরা প্রভু তাঁদের দায়িত্ব ছিল অপরিসীম। কখনও কখনও যেন তাঁদের দায়িত্ব-বোধের সঙ্গে একটা ধর্মীয় উন্মাদনাও মিশে থাকত: "ভগবান আমাদের উপর যাদের ভার দিয়েছেন সেই সব লোকেদের জন্য আমরা এবং কেবল আমরাই ভগবানের কাছে দায়ী।"[৭০] কখনও কখনও এই দায়িত্বকে অপেক্ষাকৃত ধর্মবাদ দিয়ে বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্বের ফলশ্রুতি হিসাবে বিবেচনা করা হত। Kipling তাঁর স্বদেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন: "কাঁধে নাও শ্বেতকায়দের বোঝা। বন্দর বানাও, অপরে ব্যবহার করবে; রাস্তা বানাও, অপরে চলাচল করবে; জীবন দিয়ে এসব বানাও, তারপর মড়াটা রেখে এস।"[৭১] রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যে নেতিবাচক ধারণা ছিল, "রাতের পাহারাওয়ালা মাত্র" বলে রাষ্ট্রের যে ধারণা নিন্দিত হয়েছিল, দায়িত্ববোধের এই নতুন ধারণা তার বিপরীত। ইংল্যাণ্ডে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রতি যথেষ্ট বিরূপতা ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষে "বৈজ্ঞানিক বেন্থামপন্থী প্রশাসক এবং শাসকদের সর্বময় কর্তৃত্বে বিশ্বাসী টোরি ভদ্রলোকের মধ্যে স্বাভাবিক মৈত্রী"[৭২] সম্পূর্ণ করা গিয়েছিল।

ভারতে নীতি নির্ধারণের উপর অবাধনীতি তত্ত্বের প্রভাবকে অতিরঞ্জিত করা হয়েছে। আমলাতান্ত্রিক মন আর কিছু না হোক ব্যবহারিক এবং পশ্চিমী অভিজ্ঞতা অথবা অর্থনৈতিক চিন্তা থেকে উদ্ভূত সরকারি নীতি সম্পর্কিত কিছু আদর্শের প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে সন্দেহপরায়ণ হওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা দেখতে পাব যে কতকগুলি নমুনাস্বরূপ সমস্যা সম্বন্ধে নীতি নির্ধারকদের প্রতিক্রিয়ার প্যাটার্নটি থেকে বোঝা যায় অর্থনৈতিক উদারনীতিবাদের হস্তক্ষেপ না করার নীতিকে তাঁরা খণ্ডন যদি

নাও করে থাকেন, তা হলেও প্রায়ই অগ্রাহ্য করে যেতেন। অর্থনৈতিক নীতির উৎস সন্ধানে যেতে হবে বিমূর্ত তত্ত্বের এলাকা ছাড়িয়ে, যেতে হবে স্টক আর শেয়ারের সুদ ও লভ্যাংশের, সংসদীয় লবি ও চেম্বার অব কমার্সের পার্থিব স্তরে। আলোচ্য সময়ে অবাধনীতির নামে ভারতে যে কর্মনীতি চলছিল সে কর্মনীতির গতিমুখ ছিল ভারতীয় বাজার খুলে দেওয়া, কাঁচামাল সরবরাহ উন্নত করা এবং বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করায় উৎসাহ দান—আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এমনভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগ করা যা বাণিজ্যবাদকে (mercantilism) স্মরণ করিয়ে দেয়।[৭৩]

ভারত সরকারের ক্রিয়াকলাপের ব্যাপক পরিধি যদি বিবেচনা করা যায় তা হলে নিম্নোক্ত সামান্যিকরণ করার লোভ হতে পারে: অবাধনীতি যদি ইংল্যাণ্ডের পক্ষে অলীক হয়ে থাকে, Brebner যেমন বলেছেন, তবে ভারতের পক্ষেও তা কম অলীক ছিল না।[৭৪] রাস্তা-ঘাট ইত্যাদিতে বিনিয়োগের প্যাটার্ন, রেলপথে ও সেচের কোম্পানিতে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিযুক্ত বিনিয়োগ, তুলোর মত কাঁচামাল উৎপাদনে উদ্দীপনা যোগানোর জন্য অসাধারণ ব্যবস্থাবলী; ভারতে ইউরোপীয় বসতি ও বিনিয়োগকে বাধা দিত যেসব ভূমিসংক্রান্ত আইনকানুন তার কিছু-কিছুর পরিবর্তন সাধন; ভারতে ইউরোপীয় বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে কিছু-কিছু ব্যবসা প্রকল্পে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে অর্থব্যয় ইত্যাদি—ইংরেজরা যাকে বলত ভারতে "বিবেচনা সাপেক্ষে হস্তক্ষেপের নীতি"—তারই উদাহরণ।

সরকারি ক্রিয়াকলাপের অপরাপর ক্ষেত্র—যেসব জায়গায় অর্থনৈতিক উদারনীতিবাদের অবিমিশ্র বিশুদ্ধতা বজায় ছিল—সেগুলিকেও ভুললে চলবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শুল্ক-বিষয়ক কর্মনীতিসংক্রান্ত বিতর্কে শিশু-শিল্পের সংরক্ষণ দরকার এই যুক্তিকে খণ্ডন করার জন্য অবাধনীতির মতবাদের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল।[৭৫] ভারতবর্ষ যখন পর পর দুর্ভিক্ষের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল সেই সময়ে সরকার খাদ্যশস্য চলাচলে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছিল।[৭৬] ক্রমবর্ধমান আয়কর হস্তক্ষেপ না করার এই নীতির ভিত্তিতে এড়ান হয়েছিল যে "মানুষের অবস্থা সমান করে দেওয়া রাজস্বব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপের অঙ্গ নয়।"[৭৭] অবাধনীতির মতবাদের ভিত্তিতে রচিত রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থার তত্ত্ব কতকগুলি ধরনের সামাজিক কল্যাণে

স্থায়ী খরচের (sooial overheads) খাতে সরকারি ব্যয়ের পথে বাধা হত।[৭৮] আর সরকারের "বিধিসম্মত কাজ" সম্পর্কে অনড় ধারণা কখনও কখনও শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারের আরও ইতিবাচক ভূমিকার প্রতিবন্ধক হত।[৭৯] বস্তুতপক্ষে এই সব তথ্য এত সুবিদিত যে এগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল সরকার যে যুগপৎ হস্তক্ষেপবাদী ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধবাদী কর্মনীতি অনুসরণ করে চলেছিল তার মধ্যে কোনও মৌলিক বিরোধ আছে কিনা।

মনে হয় হস্তক্ষেপের পক্ষে ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধবাদী দুইয়ের মধ্যে বিরোধটা যতটা আপাত প্রতীয়মান ততটা বাস্তব নয়। উদাহরণস্বরূপ ম্যাঞ্চেস্টারের তুলাবস্ত্র বয়ন সংশ্লিষ্ট স্বার্থগোষ্ঠী, সমগ্র স্বার্থপুঞ্জের মধ্যে মধ্যমণি বলে যারা স্বীকৃত—তাদের কথাই ধরা যাক। দেখা যাবে ম্যাঞ্চেস্টারকে তুলো সরবরাহ করার জন্য বিনা হস্তক্ষেপের নীতি থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে সরে যাওয়া উচিত বলে বিবেচিত হয়েছিল। আবার একই সঙ্গে ভারতে দেশীয় বয়নশিল্পের জন্য রক্ষামূলক শুল্কব্যবস্থা করতে অস্বীকার করার সময়ে অবাধনীতি কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। এই দুই কর্মনীতির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে তত্ত্বগত অসঙ্গতি থাকলেও দুই-ই অভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থকেই সিদ্ধ করত। বিভিন্নমুখী ভাবধারার মিশ্রণ এবং মিথষ্ক্রিয়া এবং সরকারি কর্মনীতির পরিবর্তনশীলতা জটিল একটা ছবি তুলে ধরে। 'অবাধনীতির' লেবেল সেই জটিলতাকে বুঝতে ও ধরতে মোটেই কাজে আসে না। একটা সরল লেবেলের যদি নিতান্তই দরকার হয় তা হলে বোধ হয় 'অবাধনীতির' চেয়ে 'বৈষম্যমূলক হস্তক্ষেপবাদ'ই উপযুক্ততর হবে।

J. A. Schumpeter লক্ষ্য করেছেন যে ইউরোপে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে "অর্থনৈতিক উদারনীতিবাদ" এত "শর্ত কণ্টকিত হয়ে উঠেছিল যে তার মধ্যে কখনও কখনও এর নীতিগুলিরই বিসর্জন নিহিত থাকত।"[৮০] ইংল্যাণ্ডে ঘোষিত বিনা হস্তক্ষেপ মতবাদ সত্ত্বেও দরিদ্র ত্রানব্যবস্থার আধুনিকীকরণ কারখানা ও জনস্বাস্থ্য-বিষয়ক আইনকানুন, 'মিউনিসিপ্যাল সমাজতন্ত্রের' পরীক্ষা-নিরীক্ষা, জনশিক্ষা ব্যবস্থার সংগঠন ইত্যাদির ভিতর দিয়ে সরকারি ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে অবাধ-নীতি থেকে সরে আসাটা অবশ্য ঘটেছিল সেখানে শিল্পভিত্তিক ধনতন্ত্রের

অভ্যুদয়ে সাড়া দিয়ে, আর ভারতে ঘটেছিল অনগ্রসর অর্থনীতির সমস্যাবলী ও তার "সুদক্ষ শোষণের" খাতিরে। হয়তো এ রকম যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে ভারতের অভিজ্ঞতার দরুন বৃটিশ দলনেতারা অবাধনীতিতে আস্থা হারিয়েছিলেন, অন্ততঃ সরকারি ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র প্রসারিত করে এমন কর্মনীতির প্রতি বিরূপতা হারিয়েছিলেন। ইউরোপ মহাদেশীয় (Continantal) তত্ত্ববিদদের প্রভাব ছাড়া বোধ হয় "ভারত সরকারের ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপই ইংল্যাণ্ডে যৌথতার মতবাদকে (collectivism) প্রবলতম উদ্দীপনা যুগিয়েছিল।"[৮১] সে যাই হোক এ কথা সুস্পষ্ট যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ কয়েক দশকে ইউরোপে অবাধ-নীতি অস্তাচলগামী হতে শুরু করেছিল—এমন কি সেই ইংল্যাণ্ডেও—যাকে Dicy-এর "স্বাভাবিক নিবাস" বলে গণ্য করতেন।[৮২]

জার্মান ঐতিহাসিক অর্থনীতিবিদরা যখন অবাধনীতির অনড় বিশ্বাস—বা জার্মানিতে যাকে তারা ডাকনাম দিয়েছিলেন স্মিথিয়বাদ (Smithianism)[৮৩]—তাকে আক্রমণ করছিলেন, তখন ইংল্যাণ্ডেও গোঁড়া অবাধ নীতিবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মতামত দেখা যাচ্ছিল। লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক J. E. Cairnes ১৮৭০ সালে তাঁর প্রস্তাবনা ভাষণে বলেছিলেন যে "অবাধনীতির মতবাদ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে একটা বাধা ও উৎপাত হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[৮৪] তাত্ত্বিক বিবেচনায়ও তিনি এই মতের বিরোধী ছিলেন যে "সমগ্র অর্থনীতির নির্যাস হল অবাধনীতি।"[৮৫] এই ধারণা প্রবলতর হচ্ছিল যে পশ্চিম ইউরোপের অগ্রসর দেশগুলির পক্ষে যে-সব অর্থনৈতিক নীতি প্রযোজ্য, ঐতিহাসিক বিকাশের দিক থেকে যেসব দেশ পশ্চাদপদ তাদের পক্ষে সেগুলি অনুপযোগী। Bagehot ও Leslie-র রচনায় আদিম সমাজ ও সম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে Sir Henry Maine-র গবেষণার প্রভাব অত্যন্ত লক্ষণীয়।[৮৬] Walter Bagehot বলেছিলেন ভারতবর্ষ "প্রতিহত সভ্যতাসমূহের পরিবারের" ("family of arrested civilisations") অন্যতম সদস্য।[৮৭] সমাজ ক্রমে-ক্রমে উদ্ভূত হয়েছে "একটা প্রাক্ অর্থনৈতিক স্তর থেকে যখন অর্থনীতির ধারণাটিরই অস্তিত্ব ছিল না, যেখানে অর্থনীতিবিদদের নির্দেশ সর্বনাশা।"[৮৮] Thomas Leslie মনে করতেন প্রথম দিককার অর্থনীতিবিদরা "বিমূর্ত ও অবরোহী পদ্ধতির উপর নির্ভর করে ভুল করতেন।"[৮৯] Roscher-এর[৯০] দ্বারা প্রভাবিত হয়ে

Leslie সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যেকার পার্থক্য সম্বন্ধে অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন।[৯১] এই নতুন চিন্তাধারা বোধ হয় পশ্চিমী ও অ-পশ্চিমী ঐতিহাসিক বিবর্তন ও সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতনতার ফল। একই অর্থনৈতিক নীতি সর্বকালে ও সর্বস্থানে প্রযোজ্য এ কথা ঐতিহাসিক অর্থনীতিবিদরা সরাসরি অস্বীকার করতেন এবং ফলতঃ অবাধনীতির অনড় বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য করতেন। জার্মান চিন্তাধারাকে (German School) মূলতঃ ঐ অনড় বিশ্বাসটিকে প্রবল আক্রমণ করার জন্যই মনে রাখা হয়। কিন্তু দু-জন জার্মান অর্থনীতিবিদ Friedrich List ও Karl Marx আরও অনেক এগিয়ে অর্থনৈতিক স্বার্থগুলির নিরিখে অবাধনীতির দর্শনের বিশ্লেষণের দিকে গিয়েছিলেন। ১৮৫৩ সালে Marx লিখেছিলেন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সময়ে শাসক 'স্বৈরচক্রে'র ('Oligarchy') ভারতকে উন্নত করার কোনও আগ্রহ ছিল না, আর তারা এ সত্য অগ্রাহ্য করত যে ভারতে কৃষি "অবাধ প্রতিযোগিতার, ও অবাধ স্বাধীনতার (Laissez aller) ব্রিটিশ নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হতে পারত না।[৯২] "কিন্তু শিল্পসংশ্লিষ্ট স্বার্থগুলি ভারতের বাজারের উপর যত নির্ভরশীল হয়ে পড়তে থাকল তত তারা ভারতে নতুন-নতুন উৎপাদনক্ষমতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা বোধ করতে লাগল।"[৯৩] কোম্পানির যুগে 'শাসকশ্রেণী'র "ভারতের প্রগতিতে ক্ষণস্থায়ী আগ্রহ ছিল, যেটা নিয়মের ব্যতিক্রমস্বরূপ আগ্রহ।" তাদের মত না হয়ে শিল্পসংশ্লিষ্ট ও উৎপাদক স্বার্থগুলি —Marx যাদের "যন্ত্রতন্ত্র" ("Millocracy") আখ্যা দিয়েছিলেন—তারা ভারতকে উন্নত করতে ও তার ব্যবসা অবাধ করে খুলে দিতে আগ্রহী ছিল।[৯৪] অবাধবাণিজ্যের যুক্তির যে সমালোচনা Friedrich List করেছিলেন তা সুবিদিত, আর মনে হয় ভারতীয় শিল্পরক্ষামূলক (protectionist) ব্যবস্থাকামীদের, বিশেষতঃ এম. জি. রানাডেকে,[৯৫] তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। একটা শিল্পোন্নত দেশের নিজের উপনিবেশের উপর অবাধবাণিজ্য চাপিয়ে দেবার চেষ্টা আসলে, যে মই বেয়ে তারা উঠেছে অন্যরাও যাতে তাই বেয়ে পিছনে পিছনে উঠতে না পারে তার জন্য ওই মই সরিয়ে দেওয়ার প্রয়াস। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ জাতিগুলিকে ঠেলে এগিয়ে দেবার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপবাদের পক্ষে List-এর বক্তব্য এবং জার্মানির

সরকারের শিল্পে উৎসাহদান নীতির সাফল্য প্রথম যুগের ভারতীয় জাতিয়তাবাদীদের অর্থনৈতিক চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল।

আলোচ্য সময়ের ভারতীয় অর্থ-বিষয়ক কর্মনীতিসংক্রান্ত বিতর্কে বিভিন্ন গোষ্ঠী গোপন স্বার্থান্বিত উদ্দেশ্যকে যুক্তিগ্রাহ্য করার প্রয়াসে প্রায়ই অর্থ-নৈতিক তত্ত্ববিদ অথবা রাজনৈতিক মতাদর্শবাদীদের কাছ থেকে বাঁধাবুলি ধার নিতেন। বিভিন্ন স্বার্থের জটিল মিথষ্ক্রিয়া ও ভাবধারার মিশ্রণ অনুশীলন করতে গিয়ে আমরা বহু সমস্যার সম্মুখীন হই। প্রভাবশালী স্বার্থ-সমাবেশগুলিকে ভালভাবে চেনা সহজ নয়। কিছু-কিছু স্বার্থগোষ্ঠী আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত, কাজেই তাদের সহজে চিহ্নিত করা যায় (যথা, ব্রিটেনে ও ভারতে চেম্বার অব কমার্স অথবা ম্যাঞ্চেস্টার কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন) কিন্তু অনেকগুলিই আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত ছিল না। অর্থ-বিষয়ক কর্মনীতিসংক্রান্ত ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে স্বার্থগোষ্ঠীগুলির প্রত্যক্ষ সংযোগ সব সময়ে প্রমাণ করা যায় না; কখনও কখনও এ রকম কোনও সংযোগ থাকত না, আর অভিজাত রাজপুরুষদের (Canning বা Mayo-র মত) এবং ভারতে ইংরেজ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে সহানুভূতির অভাব বহু বিলাপের কারণ হত। স্বার্থের সমপ্রকৃতি (homogeneity) ছিল এ কথা ধরে নেওয়াও সঠিক নয়, যদিও ব্যাপকতর শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে পৌঁছান ও তাঁদের বোঝানর জন্য এবং সাধারণ সমর্থন যোগাড়ের জন্য প্রত্যেক স্বার্থগোষ্ঠীই তাদের নিজস্ব অংশের স্বার্থকে "জাতীয় স্বার্থের" ছদ্মবেশ পরিয়ে হাজির করত। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা বার বার দেখতে পাব কি ভাবে ভারতীয় ভূস্বামী ও ব্যবসায়ীরাসহ উচ্চতর আয়-বিশিষ্ট গোষ্ঠীগুলি "জনগণের" উপর কর বৃদ্ধির (যথা লবণ কর) জন্য সরকারের কাছে ওকালতি করত যাতে উচ্চতর শ্রেণীগুলি করের বোঝা থেকে (বিশেষ করে আয়কর—যা অপেক্ষাকৃত উচ্চ আয়-বিশিষ্ট লোকেদের উপর পড়ে, তা থেকে) রেহাই পেতে পারে; ভারতে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নিজেদের উপর কর যাতে কমানো যায় তার জন্য কি ভাবে সরকারি ব্যয় হ্রাসের জন্য বার বার দাবি করত, অথচ ব্রিটিশ আমলা ও সেনাবাহিনীর অফিসাররা ব্যয় হ্রাসের বিরোধিতা করত এবং সাম্রাজ্য বজায় রাখার জন্য নিজেদের প্রাপ্য পুরস্কার বৃদ্ধির দাবি করত; ভারতীয় ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবী শ্রেণীগুলি কি রকম ক্ষুব্ধ ছিল যে তাদের অর্জিত আয়ের উপর এবং সম্পত্তি থেকে

(বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে জমিদারদের সম্পত্তি থেকে) অনর্জিত আয়ের উপর একই হারে কর ধার্য হত; এবং কি ভাবে আন্তঃ-প্রাদেশিক ঈর্ষা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াত। কখনও কখনও স্বার্থের তফাত ক্ষণস্থায়ী ও উপর-উপর হত, কাজেই শেষপর্যন্ত সেগুলিকে মিলিয়ে দেওয়া যেত। কিছু-কিছু প্রশ্নে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ও ব্রিটিশ আমলা হয়তো ঠিক একইভাবে দেখত না; কিন্তু সাম্রাজ্য বজায় রাখার ব্যাপারে, তার খরচ যোগানোর ব্যাপারে, অথবা শাসিত জাতির কাছ থেকে এই যোগান সংগ্রহ করার ব্যাপারে কোনও দ্বিমত ছিল না। স্বার্থের এই ধরনের তফাত এবং দাদাভাই নওরোজি যে ধরনের মৌলিক স্বার্থবিরোধের কথা বলেছিলেন— এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। নিয়ম মাফিক চাল দিতে পারলে স্বার্থগোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিরা তাদের প্রভাব অনুভূত করাতে পারত, কিন্তু দাঁড়িপাল্লা নওরোজি যে শাসিত জাতির পক্ষে বলেছিলেন তাদের বিরুদ্ধে ঝোঁকান থাকত। নীতি নির্ধারকরা একটা সীমা পর্যন্ত স্বার্থ-গোষ্ঠীগুলির চাপে সাড়া দিতেন। কতখানি সাড়া দেবেন তার মাত্রা নির্ভর করত চাপ কতখানি, ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের মনোভাব কি, সমাজে শক্তির ভারসাম্য কেমন তার উপর এবং আরও বহু উপাদানের উপর—যার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দও থাকত (যদিও শেষোক্ত উপাদানটি নিতান্ত বিরল ক্ষেত্রেই গুরুত্ব পেত)। কোন্ সীমা অবধি স্বার্থগোষ্ঠীর চাপ কার্যকরী হবে সেটা নির্ধারিত হত তৎকালীন আয়-ব্যয় পরিস্থিতিতে স্বার্থগোষ্ঠীর কাম্য সুবিধা দেওয়ার সুযোগ থাকত কি থাকত না তার দ্বারা, জনমতের উপর সিদ্ধান্তগুলির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি হবে সেই হিসাবের দ্বারা, এবং প্রথাসিদ্ধ ধারা থেকে সরকারকে অতিরিক্ত বিচ্যুত না করার আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা ইত্যাদির দ্বারা। আমাদের কাজ হল সরকার এবং স্বার্থগোষ্ঠীর এই খেলার নিয়ম-কানুন বুঝতে চেষ্টা করা।

উল্লেখিত পুস্তকাদি (References)

১ C. Wood-এর নিকট J. Wilson, ১১ই জুলাই ১৮৫৯, Barrington, II, ১৭১। 'Dictionary of National Biography', ভল্যুম XXI, পৃষ্ঠা ৫৭১-৭৩। C. E. Buckland-এর 'Dictionary

of Indian Biography' (London, 1906), পৃষ্ঠা ৪৫৬। Walter Bagehot-এর 'Literary Studies' (London, 1879), ভল্যুম I, পরিশিষ্ট। 'Lombard Street'-এর লেখক Bagehot হলেন Wilson-এর জামাই এবং Wilson-এর পরে তিনি 'Economist'-এর সম্পাদক হয়েছিলেন।

২ William D. Grampp-এর 'The Manchester School of Economics' (Stanford, 1960), পৃষ্ঠা ১৩।

৩ A. K. Cairncross-এর 'Home and Foreign Investment 1870-1913' (Cambridge, 1953), পৃষ্ঠা ২৪৭। Robert Link-এর 'English Theories of Economic Fluctuations 1815-48' (NewYork, 1959)। J. M. Keynes-এর 'Indian Currency and Finance' (London, 1913), পৃষ্ঠা ৩৮।

৪ Elmer Wood-এর 'English Theories of Central Banking 1819-1858' (Cambridge, Mass. 1939)।

৫ কাগজী মুদ্রার ব্যাপারে সেক্রেটারি অব স্টেটের সরকারি বার্তা সম্পর্কে J. Wilson-এর Minute, তাং ২৫শে ডিসেম্বর ১৮৫৯, Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৬০, Accts নং ১।

৬ Lord Canning-এর নিকট J. Wilson, ২৫শে আগস্ট ১৮৫৯, E. Barrington-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৮১-৮৩।

৭ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নীচে দেখুন।

৮ W. Bagehot-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪০০-০১।

৯ James Wilson-এর 'Financial Statement' (Calcutta, 1860). পৃষ্ঠা ৯। V. G. Kale-র 'Dawn of Modern Finance in India' (Poona, 1922), ৮৭-৮৯ পৃষ্ঠায় Wilson-এর যুক্তির সমর্থনে মনু VII, ১২৮, ১৩০ ও গৌতম X, ২৪-৩০-এর উদ্ধৃতি আছে।

১০ C. Wood-এর নিকট C. Trevelyan, W. Bagehot-কে এই চিঠির কপি পাঠানো হয়েছিল, ২রা ডিসেম্বর ১৮৬২, E. Barrington-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ II, পৃষ্ঠা ২৫৯।

১১ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ২রা ফেব্রুয়ারি ১৮৬০, ১লা মার্চ ১৮৬০, ২৩শে আগস্ট ১৮৬০। 'বেঙ্গল হারকারু' (এবং ইণ্ডিয়া গেজেট)

২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬০, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬০। 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' ২০শে ডিসেম্বর ১৮৬৩। যদিও Robert Knight-এর মতে Wilson কয়েকটি ভুল করেছিলেন ; উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় ঋণের উপর সাম্রাজ্যিক গ্যারাণ্টি দেওয়ায় তাঁর বিরোধিতা, ভারতের জন্য স্বর্ণমান মুদ্রা প্রত্যাখ্যান, সর্বপ্রকার আর্থিক অসুবিধার সর্বরোগহর হিসাবে আয়করের উপর অতিরিক্ত আস্থা। 'দা ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট' ১০ই মার্চ ১৮৭০, পৃষ্ঠা ২৩১।

১২ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ২৫শে অক্টোবর ১৮৬১।

১৩ C. E. Buckland-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৫৬।

১৪ Maj. F. Marriott-এর নিকট B. Frere, ১১ই আগস্ট ১৮৬০, Martineau-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ I, পৃষ্ঠা ৩১৯।

১৫ C. Wood-এর নিকট B. Frere, ২৩শে নভেম্বর ১৮৬০, Martineau-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ I, পৃষ্ঠা ৩১৩।

১৬ Sir G. Clark-এর নিকট B. Frere. ৯ই মে ১৮৬০ Martineau-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ I, পৃষ্ঠা ৩০৮।

১৭ C. Wood-এর নিকট B. Frere, ২৩শে নভেম্বর ১৮৬০, Martineau-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ I, পৃষ্ঠা ৩১৩।

১৮ D.N.B. ভল্যুম XXII (Supplement) পৃষ্ঠা ৯৪৮-৫০। রেলওয়ে কমিশনের সদস্য (১৮৪৫), London, Brighton and South Coast Rly-এর চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ; ট্রেজারির অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারি (১৮৬০)। ১৮৬১ সালে একটি ছোটখাট অপবাদ রটে ছিল, যখন তিনি Hamilton and Toronto Rly. Co. (Canada)-তে এক "জাল" চুক্তিতে জড়িয়ে পড়ার জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন ; অভিযোগটি সম্ভবতঃ মিথ্যা, প্রমাণিত হয় নি। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ১১ই এপ্রিল ১৮৬১।

১৯ "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" ১লা জানুয়ারি ১৮৬৩, ১৭ই এপ্রিল, ১৮৬২। Wood-এর সঙ্গে পর পর কতকগুলি বিরোধ ঘটার পর Laing পদত্যাগ করলে, তাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখাবার জন্য কলকাতায় ইংরেজ বণিকেরা একটি সভা করেছিল। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৬২।

২০ D.N.B. ভল্যুম XIX, পৃষ্ঠা ১১৩৫-৩৬। E. Hughes-এর "Sir Charles Trevelyan and civil service reform" E.H.R. ১৯৪৯, পার্ট I ও II, পৃষ্ঠা ৫৩, ২০৬। T. F. Ellis-এর নিকট T. B. Macaulay, ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৩৪। G. M. Trevelyan-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৩।

২১ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ১৪ই এপ্রিল ১৮৬৪, 'পূর্বোক্ত' ২২শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৪।

২২ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ৬ই এপ্রিল ১৮৬৫, ২৭শে এপ্রিল ১৮৬৫, ১৮ই মে ১৮৬৫।

২৩ D.N.B. ভল্যুম XIII, পৃষ্ঠা ৭। D.N.B.-তে গুরুতর ভুল আছে, এতে বলা হয়েছে ঃ "১৮৬৩ সালে যখন তিনি Mr. Samuel Laing-এর পর ভারত সরকারের অর্থ-বিষয়ক সদস্য নিযুক্ত হন তার আগে পর্যন্ত Salford এর এম. পি. ছিলেন। ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি ভারত সরকারের অর্থ-বিষয়ক সদস্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।" আসলে Laing-এর পরে ঐ পদে এসেছিলেন Trevelyan, Massey নন এবং Massey পরিষদে যোগ দিয়েছিলেন ১৮৬৫ সালে, ১৮৬৩-তে নয়।

২৪ 'দা ইংলিশম্যান' ১১ই এপ্রিল ১৮৬৬। 'দা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'ও (২৯শে মার্চ ১৮৬৬) তাঁকে "নিরাপদ" লোক বলে মনে করতেন, যিনি আদৌ প্রতিভাদীপ্ত ছিলেন না।

২৫ C. E. Buckland-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪১৮। 'Temple-এর 'The story of my life', I, পৃষ্ঠা ১৯৯।

২৬ O. T. Burne-র 'A few letters'...(Simla, 1877), পৃষ্ঠা ১৫৯ দেখুন। Burne বলেন যে Mayo "তাঁর (Temple-এর) গুণাবলীর অগভীরতা ধরতে পেরেছিলেন" এবং John Strachey ও অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারি Chapman-এর উপর বেশি নির্ভর করেছিলেন। Mayo তাঁর উইলে (তাং ১২ই অক্টোবর ১৮৬৮) এই আকাঙ্খা প্রকাশ করেছিলেন যে, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকে এমন কিছুই প্রকাশ করা উচিত নয় যা কোনও "জীবিত ব্যক্তিকে কষ্ট দিতে বা উত্যক্ত করতে পারে"। ('পূর্বোক্ত' পৃষ্ঠা ৪), Hunter-এর লেখা Mayo-র

জীবনীতে স্বাভাবিকভাবেই Mayo ও Temple-এর মধ্যেকার দুর্ভাগ্যজনক সম্পর্ক এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল।

২৭ Argyll-এর নিকট Mayo, ২২শে মার্চ ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৫, ৮১ নং।

২৮ Argyll-এর নিকট Mayo, ১৪ই জুলাই ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪০, ২০২ নং।

২৯ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

৩০ Mayo-র নিকট Argyll, ১লা নভেম্বর ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৯, ১৯ নং।

৩১ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

৩২ Argyll-এর নিকট Mayo, ১৪ই জুলাই ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪০, ২০২ নং।

৩৩ 'দা ইংলিশম্যান' ৬ই জুলাই ১৮৭০।

৩৪ C. E. Buckland-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪০৭।

৩৫ Col. R. Strachey ১৮৩৬ সালে বোম্বাই ইঞ্জিনিয়ার্স-এ যোগ দিয়েছিলেন; পূর্তকর্ম দপ্তরের সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়েছিলেন (১৮৬২); সেচ-এর ইনস্পেক্টর-জেনারেল নিযুক্ত হয়েছিলেন (১৮৬৬)। C. E. Buckland-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৪০৭।

৩৬ Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬৭, Accts. ২৩ নং; Col. R. Strachey-র নোট, ১৭ই আগস্ট ১৮৬৭; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অংশের উপরে দেখুন।

৩৭ B. Frere-র নিকট Mayo, ৬ই ডিসেম্বর ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৭, ৩৪৫ নং।

৩৮ W. Gray-র নিকট Mayo, ২০শে আগস্ট ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৬, ২০৫ নং।

৩৯ Viscount Halifax-এর নিকট Mayo, ৪ঠা অক্টোবর ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৭, ২৭০ নং।

৪০ Sir G. Trevelyan-এর 'The Competition Wallah' (London, 1895 : প্রথম সংস্করণ ১৮৬৪), পৃষ্ঠা ২৩৮।

৪১ Fin. Progs. মার্চ ১৮৬৪, ছুটি ও পেনসন, ৩১ নং ; Sir C. E. Trevelyan-এর Minute, ২৮শে অক্টোবর ১৮৬৩।

৪২ Sir C. Wood-এর নিকট B. Frere ১০ই এপ্রিল ১৮৬১। সমগ্র চিঠিটিই সবিশেষ আগ্রহোদ্দীপক। Martineau-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, ভল্যুম I, পৃষ্ঠা ৩৩৬-৪১।

৪৩ T. J. Hovell-Thurlow-এর 'The Company and the Crown' (London, 1860), পৃষ্ঠা ২৩৯।

৪৪ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ১৪৪ নং, ২৯শে জুন ১৮৬০। এই সরকারি বার্তাটি প্রায় নিশ্চিতরূপেই James Wilson নিজেই রচনা করেছিলেন ; খসড়াটির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠাতেই তাঁর স্বাক্ষরের আদ্যাক্ষর রয়েছে।

৪৫ L. H. Jenks-এর 'Migration of British Capital to 1875' (New York, 1927), George Paish-এর "Great Britain's Capital Investment in other lands", 'Journal of the Royal Statistical Society' ভল্যুম LXXII, সেপ্টেম্বর ১৯০৯, পৃষ্ঠা ৪৬৫-৮০, এবং "Great Britain's Capital Investments in individual colonial and foreign countries" J.R.S.S. ভল্যুম LXXIV, জানুয়ারি ১৯১১, পৃষ্ঠা ১৬৭-৮৭।

৪৬ চতুর্থ পরিচ্ছেদের নীচে দেখুন। D. E. Wacha-এর 'A Financial Chapter in the history of the Bombay City' (Bombay, 1910), পৃষ্ঠা ১-২৬। 'Report of the Royal Commission on the Old Bank of Bombay' (Bombay, 1869), পৃষ্ঠা ৮-১২।

৪৭ G. B. Hertz-এর 'The Manchester Politician 1750-1910' (London, 1912), পৃষ্ঠা ৭৫।

৪৮ পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা ৭৯।

৪৯ C. R. Fay-র 'Imperial Economy and its place in the formation of Economic Doctrine 1600-1900' (Oxford, 1934), পৃষ্ঠা ১৭৭। সব্যসাচী ভট্টাচার্যের "Laissez faire in India" 'The Indian Economic Social History Review', ভল্যুম II, ১ নং, জানুয়ারি ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ১-২২।

৫০ Henry Fawcett-এর 'Indian Finance' (London, 1880),

H. M. Hyndman-এর 'The Bankruptcy of India' (London, 1886)।

৫১ J. Dickinson-এর 'India: its Government under a bureaucracy' (London, 1853)। তিনি ছিলেন ইণ্ডিয়া রিফর্ম সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, এই সোসাইটি 'ইণ্ডিয়ান রিফর্ম ট্র্যাক্টস্' প্রকাশ করেছিলেন। E. Bell (সম্পাদক)-এর 'Last Counsels of an unknown counsellor, John Dickinson (London, 1877), পৃষ্ঠা ১৩-৪।

৫২ Major Wingate-এর 'Our Financial Relations with India' (London, 1859)।

৫৩ Major E. Bell-এর "Trust as the basis of Imperial Policy", 'Journal of the East India Association' ভল্যুম ৬, পৃষ্ঠা ১৪৫-৭৫। ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় দলিলটি পঠিত হয়েছিল, ১৮ই জুন ১৮৭২।

৫৪ R. Knight-এর 'India: a review of England's financial relation therewith' (London, 1868)। 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট' ও 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন Knight।

৫৫ W. W. Hunter-এর 'Some Aspects of Indian Finance', ১৮৭১ সালের (১৮৮০ ?) ১২ই ডিসেম্বর তারিখে বার্মিংহাম চেম্বার অফ কমার্সে বক্তৃতা।

৫৬ C. R. Fay-এর 'Great Britain from Adam Smith to the Present Day' (London, 1932), পৃষ্ঠা ৭৪-৭৮। J. A. Schumpeter-এর 'History of Economic Analysis' (New York, 1954), পৃষ্ঠা ৪০২-০৫।

৫৭ D. R. Gadgil-এর 'The Industrial Evolution of India' (O.U.P. 1945), পৃষ্ঠা ২০৫। "আগেকার সমগ্র আমলে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত) রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একটি অবিমিশ্র অবাধনীতি", পৃষ্ঠা ৩২৩।

৫৮ B. B. Misra-এর 'The Indian Middle Classes: their growth in modern times' (London, 1961), পৃষ্ঠা ২১৪, ৩৫৯।

৫৯ Morris D. Morris-এর "Towarda a reinterpretation of

nineteenth century Indian economic history', 'Journal of Economic History', ভল্যুম XXIII, 1963। "ব্রিটিশরাজ নিজেকে রাতের প্রহরীর নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় দেখেছিলেন" (পৃষ্ঠা ৬১৫), তিনি বারংবার "রাষ্ট্রের রাতের প্রহরীর নীতির" কথা (পৃষ্ঠা ৬১৬) এবং "সরকারের রাতের প্রহরীসুলভ লক্ষ্যের" কথা বলেছেন (পৃষ্ঠা ৬১১)।

৬০ J. S. Mill-এর 'Principles of Political Economy' ; ১৮৪৮ সালে প্রথম প্রকাশিত (Londan, 1902), বুক V, পৃষ্ঠা ৫৯০-৯১। এ কথা আমাদের অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে Mill একটি পশ্চাদপদ অর্থনীতির ব্যতিক্রমমূলক বিষয় নিয়েই শুধু আলোচনা করেছিলেন ; "তিনি চিরায়ত অর্থনীতির সামান্য পরিবর্তন করেছিলেন, কিন্তু তিনি এই বিশ্বাস থেকে সরে যান নি যে অর্থনৈতিক ব্যাপারে সরকারি তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের তুলনায় ব্যক্তিগত মালিকানার প্রতিষ্ঠান অধিকতর বাঞ্ছনীয়।" George D. Bearce-র 'British Attitudes towards India 1784-1858' (O.U.P. 1961), পৃষ্ঠা ২৮৬। Myrdal-এর মতে Mill অর্থনৈতিক উদারনীতিতে একটি সঙ্কটের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। Gunnar Myrdal-এর 'The Political Element in the Development of Economic Theory' (Cambridge, Mass. 1961), পৃষ্ঠা ১২৭ ও পরবর্তী।

৬১ J. S. Mill-এর 'Representative Government' প্রথম প্রকাশ ১৮৬১ সালে (London, 1912), পৃষ্ঠা ১৯০-২১১।

৬২ Joseph J. Spengler-এর "John Stuart Mill on Economic Development"। Bert F. Hoselitz (সম্পাদক)-এর Theories of Economic Growth (1960), পৃষ্ঠা ১৪৪ ও বিভিন্ন স্থানে।

৬৩ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ব্যাপারে Bentham ও McCulloch-এর ধারণা সম্পর্কে আলোচনার জন্য Lionel Robbins-এর 'The theory of Economic Policy in English Classical Political Economy' (London, 1961), পৃষ্ঠা ৩৯ ও পরবর্তী দেখুন।

৬৪ "কিছু-কিছু ব্যাপারে 'অবাধনীতি'র নীতির উপরে নিরাপদে নির্ভর করা যেতে পারে, কিন্তু অন্য অনেক বেশি ক্ষেত্রে তা প্রয়োগের সম্পূর্ণ

অযোগ্য, আর সব ব্যাপারে এর কাছে আবেদন করা রাষ্ট্রবিদ বা দার্শনিকের কর্মনীতির চেয়ে তোতাপাখীর (কর্মনীতির) স্বাদই বেশি দেয়।" 'Treatise on the Succession to Property Vacant by Death' (1848), ১৫৬ পৃষ্ঠা, Robbins-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, ৩৯ পৃষ্ঠা।

৬৫ John Strachey-র 'India : its administration and progress' (London, 1911), পৃষ্ঠা ২০৯।

৬৬ 'দা টাইমসের' নিকট Sir J. F. Stephen-এর চিঠি, ১লা মার্চ ১৮৮৩, J. Strachey-র 'India : its administration and progress' (London, 1911), ৫৫৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

৬৭ Eric Stokes-এর 'The English Utilitarians and India' (Oxford, 1959)। চতুর্থ পরিচ্ছেদ ও অন্যান্য স্থানে।

৬৮ J. Strachey-র পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২০৯।

৬৯ Rudyard Kipling-এর "Recessional" এবং "The Ethen"। 'Collected Verse of Kipling' (London, 1912), পৃষ্ঠা ৩২৫, ৪২২।

৭০ Anon, 'How We Tax India' (London, 1857), পৃষ্ঠা ৩৭।

৭১ R. Kipling-এর 'The Whiteman's Burden' (1899), পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩২০। Mr. T. S. Eliot Kipling সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ রচনায় উল্লেখ করেছিলেন যে কিপলিং "এমন একটা জিনিস সম্বন্ধে সচেতনতা সঞ্চারের উদ্দেশ্য নিয়ে এগোচ্ছিলেন যে সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল যে বেশিরভাগ লোকই তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবহিত নন। এ সচেতনতা নিঃসন্দেহে আড়ম্বর সম্পর্কে, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি করে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা।" 'A choice of Kipling's Verse' (London, 1944), পৃষ্ঠা ২৫।

৭২ G. M. Young-এর 'Victorian England : Portrait of an Age' (London, 1960), পৃষ্ঠা ৫৪।

৭৩ Frederick Clairmonte-র 'Economic Liberalism and Underdevelopment' (Bombay, 1960), পৃষ্ঠা ১২৬। Eli F.

Heckscher-এর 'Mercantilism', E. F. Soderlund-এর সংস্করণ (London, 1955), ভল্যুম II, পৃষ্ঠা ৩৩৮। "মার্কেনটিলিজম-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল উপনিবেশ ও রাজার দেশের মধ্যে বাণিজ্যের একটা নিয়ন্ত্রিত সম্পর্ক এমনভাবে তৈরি যাতে করে বাণিজ্যের শর্ত শেষোক্তর অনুকূলে এবং পূর্বোক্তর বিরুদ্ধে যায়…। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ বাণিজ্যের মারফত শোষণের এই বৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তি করে… ।" Maurice Dobb, 'Political Economy and Capitalism' (London, 1960), পৃষ্ঠা ২২৯।

৭৪ J. B. Brebner-এর "Laissez faire and State interventionism in Nineteenth Century Britain"। 'Journal of Economic History', ১৯৪৮, ভল্যুম VII, পৃষ্ঠা ২৯। Brebner দেখিয়েছেন যে, ইংল্যাণ্ডের নতুন শিল্পোদ্যোগীরা রাষ্ট্রের কাছ থেকে নতুন নতুন স্বাধীনতা ও সেই সঙ্গে নতুন নতুন সাহায্য লাভ করেছিল। অবাধনীতি ছিল "একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কল্পকাহিনী" অথবা "মুষ্টিমেয় ভূস্বামী শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক যুদ্ধে নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত রণধ্বনি।"

৭৫ R. C. Dutt-এর চিরায়ত রচনা 'Economic History of India in the Victorian Age' (London, 1903), মাঝে-মাঝে বাক্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হওয়া সত্ত্বেও শুল্কনীতির খুবই সামগ্রিক বিশ্লেষণ দিয়েছে।

৭৬ B. M. Bhatia-র 'Famines in India' (Bombay, 1936), পৃষ্ঠা ১০৫-০৮, ১৮২-৮৩ দেখুন।

৭৭ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে James Wilson-এর বক্তৃতা, ১৪ই এপ্রিল ১৮৬০। Legislative Council Proceeding, ১৮৬০। (পুরানো সিরিজ, ভল্যুম VI) পৃষ্ঠা ৩৭৬।

৭৮ M. D. Morris-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৬১৫-১৬। তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখুন।

৭৯ S. K. Sen-এর 'Studies in Industrial Policy and Development in India' (Calcutta, 1964), "অবাধনীতি শিল্প প্রতিষ্ঠানে জনসাধারণের অর্থলগ্নিকে বাধা দিয়েছে…" (পৃষ্ঠা ১৫৮), পরিচ্ছেদ VIII ও অন্যান্য স্থানে।

৮০ J. A, Schumpeter-এর 'History of Economic Analysis' (New York, 1959), পৃষ্ঠা ৭৬১।

৮১ Leland H. Jenks-এর 'The Migration of British Capital' (London, 1938)।

৮২ A. V. Dicey-র 'Lectures on the relation between Law and Public Opinion in England during the Nineteenth Century' (London, 1962), পৃষ্ঠা ১৭৫।

৮৩ "রাতের প্রহরী" রাষ্ট্র নিয়ে সরস মন্তব্যের জন্য জার্মানির লোকেরা দায়ী নন। Lassalle-র লেখায় রাতের প্রহরীর সাদৃশ্য দেখা যায় এবং Carlyle-ই অবাধনীতির ধারণাটিকে 'অরাজকতা যোগ কনস্টেবল' এই কথা বলে উপহাস করেছিলেন। তুলনা করুন Robbins-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩৪।

৮৪ J. E. Cairnes-এর 'Essays in Political Economy : theoritical and applied' (London, 1873)। "রাজনৈতিক অর্থনীতি অবাধ-নীতি" শীর্ষক বক্তৃতা, পৃষ্ঠা ২৫২।

৮৫ 'পূর্বোক্ত', পৃষ্ঠা ১৮৮। আয়ারল্যাণ্ডে ভূমিসম্পর্কের উপর আইনের ক্ষমতা বলে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বিনা হস্তক্ষেপের ভিত্তিতে রচিত মেকি বৈজ্ঞানিক যুক্তিগুলিকে Cairnes নিন্দা করেছিলেন। 'পূর্বোক্ত' পৃষ্ঠা ২০২, "রাজনৈতিক অর্থনীতি ও জমি" সম্পর্কে প্রবন্ধ ('Fortnightly Review', জানুয়ারি ১৮৭০)। Robert Knight-এর পত্রিকা 'The Indian Economist' (জুলাই ১৮৭৪)-এ এই প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল।

৮৬ তাঁরা উভয়েই Maine-র নিকট তাঁদের অগাধ ঋণের কথা স্বীকার করেছেন। W. Bagehot-এর 'Physics and Politics or thought on the application of the principles of natural selection and inheritance to political Society' (London, 1872), পৃষ্ঠা ১২, ২২। T. E. C. Leslie-র 'Essays in Political Economy' (Dublin, 1888), পৃষ্ঠা ৯৩। Leslie-র মতে 'Ancient Law and Village Communities in East and West' সম্পর্কে Maine-র গবেষণা অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Leslie Dublin-এর Trinity College-এ Maine-এর বক্তৃতাবলী শুনেছিলেন।

৮৭ Walter Bagehot-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৫৪।

৮৮ 'পূর্বোক্ত', পৃষ্ঠা ১১।

৮৯ T. E. C. Leslie-র পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৮৯।

৯০ 'পূর্বোক্ত', পৃষ্ঠা ১৭৫, তুলনা করুন "জার্মান রাজনৈতিক অর্থনীতির ইতিহাস" (১৮৭৫ সালের ১লা জুলাইয়ের 'Fortnightly Review' থেকে পুনর্মুদ্রিত)।

৯১ 'পূর্বোক্ত', পৃষ্ঠা ৮৩।

৯২ K. Marx-এর 'British Rule in India', New York Daily Tribune, ২৭শে জুন ১৮৫৩। "The First Indian War of Independence" (Moscow, তারিখ নেই), পৃষ্ঠা ১৭।

৯৩ K. Marx-এর "East India Compny's history and its results", New York Daily Tribune, ১১ই জুলাই ১৮৬৩। পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩০।

৯৪ K. Marx-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩৪, ৩৬।

৯৫ P. J. Jagirdar-এর 'Studies in the Social Thought of M. G. Ranade', পৃষ্ঠা ১২৩।

২

অর্থব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের কাঠামো

ভারত সরকারের অর্থ-বিষয়ক প্রশাসন ব্যবস্থাটিকে যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিতে দাঁড় করানর এবং বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানগত নতুন প্রথা প্রবর্তনের কৃতিত্ব ছিল মুষ্টিমেয় লোকের। বিদ্রোহের পরবর্তী দশকে এঁরা এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিদ্রোহের ফলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক সঙ্কট যে ধাক্কা দিয়েছিল তা থেকেই এই কাজের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। আর ১৮৫৮ সালের ক্ষমতা হস্তান্তর কাঠামোগত পরিবর্তন আনার সুযোগও করে দিয়েছিল। এই সব পরিবর্তন সম্বন্ধে অনুশীলন করতে হলে এবং উদীয়মান ব্যবস্থাটিকে বুঝতে হলে পার্লামেণ্টের আইন বা ভারত সরকারের নিয়ম-কানুন পড়াই যথেষ্ট নয়। অর্থ-বিষয়ক ক্ষমতা আসলে কি ভাবে প্রযুক্ত হত তা বুঝতে হলে যন্ত্রটি বাস্তবে কি ভাবে চলত তা কিছুটা বিস্তৃত-ভাবে পরীক্ষা করা দরকার।

আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুশীলন করব : ১ নং অংশে ভারতের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি অব স্টেটের ক্ষমতা, ২নং অংশে ভারতের অর্থমন্ত্রীর (অথবা তৎকালে তিনি যে নামে অভিহিত হতেন সেই ফিনান্স মেম্বারের) কাজকর্ম। এ থেকেই আসে (৩নং অংশে) অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে আইন প্রণয়ন সংস্থা সম্পর্কে কার্যনির্বাহী সংগঠন অর্থাৎ স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল যে মনোভাব অবলম্বন করতেন সেগুলিকে পরীক্ষা করা। (৪নং) অর্থ দফতর এবং (৫নং) বাজেট ব্যবস্থা অর্থ-বিষয়ক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের একটা বিস্তৃত বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। (৬নং) কেন্দ্র থেকে প্রাদেশিক সরকারগুলি পর্যন্ত অর্থ-বিষয়ক ক্ষমতার ধারাবাহিক অবতরণের নীতির বিশ্লেষণ দিয়েই বিদ্রোহের পরবর্তী পুনর্গঠনের পর্যায়ে অর্থ-বিষয়ক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিবর্তন সম্পর্কিত আমাদের অনুশীলন শেষ হবে।

॥ ১ ॥

১৮৫৮ সালের গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারগুলির পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার স-পরিষদ সেক্রেটারি অব স্টেটের হাতে কেন্দ্রীভূত করেছিল। এই আইন সেক্রেটারি অব স্টেটকে ভারত সরকারের উপর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে সক্ষম করেছিল। Mayo-র কাছে লিখিত এক ব্যক্তিগত পত্রে Argyll বলেছিলেন "অর্থব্যবস্থা একটি ব্যাপক বিষয়, আর অন্য সকল বিষয়ের প্রবেশদ্বারও বটে।"[১] ১৮৫৮ সালের গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের XLI ধারায় আছে: "ভারতের রাজস্বের ব্যয় ভারতে এবং অন্যত্র স-পরিষদ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এই রাজস্বের কোনও অংশ অথবা এই আইনের বলে স-পরিষদ সেক্রেটারি অব স্টেটের আয়ত্তে আসা অন্য কোনও সম্পত্তি পরিষদের সভায় অধিকাংশের ভোট ছাড়া কোনও বরাদ্দ বা খরচ করা যাবে না।" উপরন্তু এই আইনের ৫৩-তম অংশে বিহিত হয়েছিল যে, শেষ যে আর্থিক বৎসর সমাপ্ত হয়েছে তার আগের বছরের আয় ও ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণসহ একটি হিসাব এবং বিগত আর্থিক বৎসরের শেষতম অনুমিত হিসাব (estimates) পার্লামেণ্টের কাছে পেশ করতে হবে। ভারতের রাজস্ব থেকে যেসব ঋণ ও দায়-দায়িত্ব পরিশোধ করতে হবে তারও একটা আনুমানিক হিসাব পার্লামেণ্টের কাছে পেশ করা সেক্রেটারি অব স্টেটের দায়িত্ব ছিল।[২]

ইণ্ডিয়া অফিসের পক্ষ থেকে কঠোর নিয়ন্ত্রণের ঐতিহ্য বোধ হয় অংশতঃ এই আকস্মিক কারণে সৃষ্টি হয়েছিল যে প্রথম সেক্রেটারি অব স্টেট হয়েছিলেন Sir Charles Wood, যাঁর সম্পর্কে এক অত্যন্ত গোপন পত্রে Dalhousie "দুর্দমনীয় ও অনধিকার চর্চাকারী"[৩] বলে উল্লেখ করেছিলেন। ১৮৫৮ সালের নতুন আইনে প্রাপ্ত অর্থ-বিষয়ক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং তা বারংবার প্রয়োগ করতেন। স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেলের পক্ষ থেকে সেক্রেটারি অব স্টেটকে অবহিত রাখার এবং খরচের হিসাব ও অনুমিত হিসাব ইণ্ডিয়া অফিসের কাছে পরীক্ষার জন্য পাঠানোর কোনও ত্রুটি হলে তীব্রভাবে তিরস্কার করা হত। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৬০ সালের ২৬শে মার্চের সরকারি পত্রে

Wood এ বিষয়ে নজর আকর্ষণ করেছিলেন যে, "আপনার সরকার আমার কাছে যেসব খবরাখবর পাঠিয়েছেন তা এ দেশে প্রকাশ্য সংবাদপত্রের সম্পাদকদের ও বে-সরকারি ব্যক্তিদের কাছে যেসব খবর এসেছে তার তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়া। ···সরকারের তরফে এ এমন একটা ত্রুটি যা ভবিষ্যতে আদৌ ঘটতে দেওয়া যেতে পারে না।"[৪] ১৮৬০ সালের ১২ই জানুয়ারি এবং ২৬শে মের অর্থ-বিষয়ক সরকারি পত্রেও অনুরূপ অভিযোগ করা হয়েছিল।[৫] প্রথম ফিনান্স মেম্বার James Wilson ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মারফত Wood-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করতেন এবং Canning সেক্রেটারি অব স্টেটকে কথা দিয়েছিলেন যে তাঁর পূর্বানুমতি ছাড়া অর্থ-বিষয়ক প্রস্তাব "হঠাৎ আইনগত ব্যবস্থা-বিধি হয়ে উঠবে না।"[৬] অর্থ-বিষয়ক অনুমিত হিসাবপত্র ইণ্ডিয়া অফিসে না পাঠাতে পারার দরুন এবং সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে প্রেরিত অনুমিত হিসাব থেকে পৃথক অনুমিত হিসাব ক্যালকাটা গেজেটে প্রকাশ করার দরুন Wilson-এর উত্তরাধিকারী Samuel Laing-কে তীব্র তিরস্কারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।[৭] সেক্রেটারি অব স্টেট নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে সেক্রেটারি অব স্টেটকে আগে না জানিয়ে ভারত সরকার পার্লামেণ্টের জন্য প্রস্তুত হিসাব ও অনুমিত হিসাবে কোনও পরিবর্তন করতে পারবে না।[৮]

ইংল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেক্রেটারি অব স্টেট আরও রাস টেনে ধরলেন। ১৮৬৪ সালের ১৭ই মার্চে ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া বেতন বৃদ্ধি ও নতুন পদ সৃষ্টি নিষিদ্ধ করে সেক্রেটারি অব স্টেটের পত্রে মন্তব্য করা হয়েছিল "ভারত সরকার ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে যোগাযোগের প্রবর্ধিত দ্রুততার দরুন এখন এই ধরনের অনুমোদন না নিয়ে কাজ চালানোর কারণ আগের তুলনায় আরও কমে গিয়েছে।"[৯] স পরিষদ গভর্নর-জেনারেল দাবি করেন যে এই নতুন নিয়ম (ভারত সরকারকে নতুন পদ সৃষ্টি বা বেতন বৃদ্ধি করতে নিষেধ করে) আইনের দ্বারা নতুন পদ সৃষ্টিও নিষিদ্ধ করবে এবং ফলতঃ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট-এ বৃটিশ-ভারত সরকারকে বিধান প্রণয়নের যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা বে-আইনীভাবে খর্ব করবে।[১০] সেক্রেটারি অব স্টেট সঠিকভাবেই দেখিয়ে দেন যে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট-এর ২২নং ধারা, গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের যেসব ধারায় (২১নং ও ২২নং Vic. C.

১০৬) সেক্রেটারি অব স্টেটকে পুরো অর্থ-বিষয়ক নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয়েছে সেগুলিকে খর্ব করতে পারে এমন আইন প্রণয়ন থেকে ভারতীয় আইন প্রণয়ন সংস্থাকে বিরত থাকতে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে। "এই নিষেধ স্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে যে স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেলকে আইন প্রণয়নের যেসব ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা ব্যাপক হলেও রাজস্বের উপর ক্ষমতার ক্ষেত্রে তা ইংল্যাণ্ডের (হোম) নিয়ন্ত্রণের অধীনেই প্রযুক্ত হবে বলে মনে করা হয়েছে।"[১১] ভারত সরকার আশঙ্কা করেছিল যে আগে অনুমোদন নেওয়ার জন্য যে দেরি হবে তাতে জনস্বার্থের ক্ষতি হবে। কিন্তু সেক্রেটারি অব স্টেট মনে করেছিলেন যে ভারত সরকার যদি ব্যয়সংক্রান্ত কোনও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করে ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের পক্ষে তার অনুমো৷ ন প্রত্যাখ্যান করা কঠিন হবে কারণ তা করলে ভারত সরকারের কাজকর্মকে তিরস্কৃত করা হচ্ছে বলে মনে হবে।[১২] যাই হোক, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি—মাটির উপর দিয়ে টেলিগ্রাফের তার টানা (১৮৬৮), সুয়েজ খাল (১৮৬৯), সমুদ্রের তলা দিয়ে টেলিগ্রাফের তার (১৮৭০) —এসব ভারতীয় অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারের উপর সেক্রেটারি অব স্টেটের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ়তর করেছিল। Mayo ও Argyll প্রায়ই টেলিগ্রামের সাহায্যে পরস্পর যোগাযোগ রাখতেন।[১৩]

তত্ত্বগতভাবে অর্থ-বিয়য়ক তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যদিও স-পরিষদ সেক্রেটারি অব স্টেটকে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কাউন্সিল ও পার্লামেণ্ট অর্থ-বিষয়ক কর্মনীতিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করছিল না। ১৮৫৮ সালের গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট কতকগুলি ক্ষেত্রে কাউন্সিলকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা সেক্রেটারি অব স্টেটকে দিয়েছিল, কিন্তু সম্পত্তি থেকে রাজস্ব গ্রহণ ও বরাদ্দ অর্থের বদলে ঋণপত্র দেওয়া, ঠিকা বিলি, বেতনের পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এ ক্ষমতা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। ১৮৬৯ সালে Sir C. Wood-এর উত্তরাধিকারী Lord Cranborne কাউন্সিলের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে ব্যয়ের উপর ক্ষমতা থাকার দরুন কাউন্সিল সেক্রেটারি অব স্টেটের বিরুদ্ধে সাধারণ কর্মনীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করতে পারে।[১৪] কাউন্সিলের ক্ষমতাসীমা যদিও নতুন করে নির্ধারিত করা হল না তবে ১৮৬৯ সালের আইন (৩২ ও ৩৩ Vic. C. ৯৭) ইণ্ডিয়া

কাউন্সিলে শূন্যপদ পূরণের ক্ষমতা সেক্রেটারি অব স্টেটকে দিয়ে তাঁর হাত শক্ত করেছিল। কাউন্সিল সভ্যপদের মেয়াদ—"যতদিন ঠিকমত কাজ করবে ততদিন" (during good behaviour) এই নিয়মের বদলে—কমিয়ে ১০ বছর করা হয়। Sir C. Wood-এর মতে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল "একটা দেশের সরকারের জন্য এ যাবৎকাল যত যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে জবড়জং।"[১৫] Wood-এর ভাষায় "সারা ভারত সম্বন্ধে জ্ঞানের সারাৎসার" নিয়ে কাউন্সিল সেক্রেটারি অব স্টেটকে সাহায্য করবে বলে আশা করা হত।[১৬] কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত বে-সামরিক ও সামরিক চাকুরেদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও তাঁদের ভাব-ভাবনা দ্রুত সেকেলে হয়ে যেত।[১৭] ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকেদের কাউন্সিলে আনার জন্য একবার প্রস্তাব করা হয়েছিল যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কিছু লোককে এবং "সরাসরি জেলাগুলি থেকে" কিছু প্রশাসনিক অফিসারকে নেওয়া হোক, কিন্তু সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নি।[১৮] কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্যই ভারতীয় অর্থব্যবস্থার কাজ-কর্মের জটিল খুঁটিনাটি বুঝতে পারতেন না, ইণ্ডিয়া অফিসের অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারিই মনে হয় অর্থ-বিষয়ক ব্যাপারে সেক্রেটারি অব স্টেটের প্রধান পরামর্শদাতা হতেন। তবে সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে দায়িত্ব এড়ানোর উপায় হিসাবে কাউন্সিলের উপযোগিতা ছিল। John Lawrence-কে Northcote লিখেছিলেন যে সেক্রেটারি অব স্টেট প্রায়ই "কাউন্সিলের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছেন। আমার প্রায়ই মনে হয় উনি যেন আদমের মত, নিজের দোষ ইভের ঘাড়ে চাপাতে প্রস্তুত। 'কাউন্সিল আমাকে দিল তাই আমি খেলাম'।"[১৯]

১৮৫৮ সালের গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের বিধান অনুযায়ী সেক্রেটারি অব স্টেট প্রতি বছর পার্লামেণ্টের কাছে অর্থ-বিষয়ক বিবৃতি পেশ করতেন, কিন্তু প্রায়শঃই অধিবেশনের শেষের দিকে প্রদত্ত এই বিবৃতি সামান্যই মনোযোগ আকর্ষণ করত, কম পার্লামেণ্ট সদস্যই ওয়াকিবহাল সমালোচনা হাজির করতে পারতেন.[২০] এ কথা সাধারণভাবে বিদিত ছিল এবং ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রায়ই ভারতীয় ব্যাপারগুলি সম্পর্কে অবহেলার উপর সমালোচনামূলক মন্তব্য প্রকাশিত হত।[২১] যদিও ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় ব্যাপার সাধারণতঃ তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করত না (বিদ্রোহের মত সঙ্কটের সময়গুলিতে ছাড়া), পার্লামেণ্টে কিছু-কিছু গোষ্ঠী ছিল যারা-

যারা ভারতীয় অর্থনৈতিক ও অর্থ-বিষয়ক কর্মনীতিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখাত। পার্লামেন্টের তথাকথিত "তুলা-ওয়ালাদের এম. পি."গুলি ছিলেন যাঁরা ভারত থেকে তুলা সরবরাহ উন্নত করার জন্য সেক্রেটারি অব স্টেটের মারফত ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলে। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলো সরবরাহ বন্ধ হবার দরুন ল্যাঙ্কাশায়ারে যখন তুলোর অপ্রাতুল্য হয়েছিল (১৮৬০-৬৪) সেই সময়ে এই গোষ্ঠী বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল।[২২] কিছু এম. পি. ছিলেন আফিম বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত; তাঁরা কর্তৃপক্ষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতেন এবং আফিম ব্যবসায় ছেড়ে দেওয়ার জন্য তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করতেন (আফিম ব্যবসায় ছিল ভূমি-রাজস্বের পরেই রাজস্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস)।[২৩] এ কথা সুবিদিত যে ব্যবসায়ী স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী একটা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ভারত সরকারের শুল্কনীতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখত।[২৪]

কোম্পানির আমলে ভারতীয় ব্যাপারগুলি নিয়ে কিছুকাল পরে-পরে পর্যালোচনা হত। ১৮৭০ সালে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার এই রকম একটা পর্যালোচনা প্রস্তাবিত হয়েছিল। এই ব্যাপার নিয়ে গভর্নর-জেনারেল ও সেক্রেটারি অব স্টেটের মধ্যে পত্রালাপ বিশেষ আগ্রহোদ্দীপক, কারণ এ থেকে বোঝা যায় যে পার্লামেন্ট দ্বারা এমন পর্যালোচনায় Argyll বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না, আর Mayo তো সুস্পষ্টভাবে পার্লামেন্টের তদন্তের বিরুদ্ধে ছিলেন। Mayo আশঙ্কা করেছিলেন যে ভারতীয় অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে প্রস্তাবিত সিলেক্ট কমিটি নিয়োগ ভারতের দেশীয় লোকেদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি করবে যে ভারত সরকারের উপর সম্রাটের ও ইংল্যাণ্ডের সরকারের আস্থা নেই। তিনি বলেছিলেন "প্রাচীন অনেক ভুল ধারণা ও আধুনিক অনেক ভুলের পক্ষে ওকালতিপ্রসূত—অজ্ঞতা ও বিদ্বেষপ্রসূত—অভিযোগ জোগাড় করবার জন্য লণ্ডনে একটা ডাকবাক্স খুলে" কিছু লাভ হবে না।[২৫] Mayo মনে করেছিলেন এম. পি.'দের এই তদন্ত নিষ্ফল হবে কারণ ভারতের সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁরা রীতিমত অজ্ঞ "লণ্ডনে এখন কল্প-বিলাসী ভারতীয় রাজনীতিবিদ ও পুরানো 'কোই হ্যায়'র (Qui Hyes) গিজগিজ করছে—এরা কেবল বিশ-পঁচিশ বছর আগেকার ভারতকে চেনে—এদের প্রত্যেকের মাথায় এমন সব ধারণা আছে যা বহু বছর

হল বাতিল হয়ে গিয়েছে। সেইগুলিকে আবার তুলে ধরা হবে।"[২৬] তদন্তের পরিসর সীমাবদ্ধ রাখার জন্য তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন। Argyll-কে তিনি লিখেছিলেন ঃ "এর (পার্লামেণ্টের সিলেক্ট কমিটির) যদি কিছু ফল হয় সে ফল ভাল হবে না। ···আশাকরি নির্দিষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যার মধ্যে এই তদন্তকে সীমাবদ্ধ করতে আপনি সক্ষম হবেন।"[২৭] Mayo ভয় পেয়েছিলেন যে ভারত সরকার আত্মপক্ষ সমর্থনে অক্ষম হবে, বিশেষ করে তার অর্থ-বিষয়ক সংস্কারগুলি চালু করতে পারে নি বলে।[২৮] সিলেক্ট কমিটির কার্যকলাপ দেখে ফিনান্স মেম্বার Temple এই সিদ্ধান্তে আসেন যে তার কিছু-কিছু নেতৃস্থানীয় সদস্য বিশেষ করে অধ্যাপক H. Fawcett ভারত সরকারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন।[২৯] সেক্রেটারি অব স্টেট উল্লেখ করেছিলেন যে সিলেক্ট কমিটি যদিও "একটা আপদ" তবু তার কিছু কার্যকারিতাও ছিল। তিনি Mayo-কে লিখেছিলেন "আপনি যে পার্লামেণ্টারি কমিটিতে আপত্তি করেছেন তাতে আমি অবাক হই নি। ভারত সরকার এসব বরাবরই অপছন্দ করেছে, আর সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি জানেন যে আগেকার কালে প্রত্যেকটি সনদের (Charter Act) নবীকরণের সময়ে এই রকম তদন্ত সাধারণতঃ করা হত—আর এটা অস্বাভাবিক নয় যে নতুন রাজত্বে পার্লামেণ্টও ভারতীয় ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হবার জন্য অনুরূপ মনোনিবেশের সুযোগ গ্রহণ করবে। এই রকম একটা কমিটি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সকলের কাছেই একটা আপদ।"[৩০] মনে হয় গভর্নর-জেনারেল, সেক্রেটারি অব স্টেট ও ফিনান্স মেম্বার—কেউ-ই পার্লামেণ্টারি তদন্ত কমিটি সম্বন্ধে তেমন উৎসাহী ছিলেন না। Mayo, Disraeli-র কাছে লিখিত তাঁর চিঠিতে, যাঁদের ইংরেজ "ভারতীয় বিক্ষোভবিলাসী" বলে অভিহিত করেছিলেন ভারত সরকার তাঁদের সম্পর্কে আশঙ্কিত ছিল। এই সব বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ছিলেন "র‍্যাডিকালরা —(যাঁদের) ভারত সরকারের প্রতি বৈরিভাবাপন্ন প্রস্তাব সমর্থনের সহজাত প্রবণতা ছিল।"[৩১] মনে হয় পার্লামেণ্টের হস্তক্ষেপ কেবল একটা আপদই ছিল না, সাম্রাজ্যের অভিভাবকদের মধ্যে এটা একটা বিপন্ন মনোভাবেরও জন্ম দিয়েছিল।

॥ ২ ॥

এখন ভারতে চালু ব্যবস্থাটির দিকে নজর দেওয়া যাক। গভর্নর-জেনারেলের পরিষদে ফিনান্স মেম্বারই ছিলেন বিদ্রোহ-পরবর্তী অর্থ-বিষয়ক মূল খুঁটি। গভর্নর-জেনারেলের কার্যনির্বাহী পরিষদে James Wilson-এর অন্তর্ভুক্তির আগে বিশেষভাবে অর্থ দফতরের ভারপ্রাপ্ত কোনও সদস্যই ছিলেন না। ১৮৫০-এর দশকে যে ব্যবস্থা চালু ছিল সে বিষয়ে বিবেচনা করে Richard Temple লিখেছিলেন : "বর্তমানে গভর্নর-জেনারেল ও তাঁর পরিষদের মধ্যে যে কর্মবিভাগ চালু আছে, যার ফলে ভারত সরকার খানিকটা ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রীসভার কায়দায় কাজ করে, সেকালে তার সামান্যই ছিল অথবা কিছুই ছিল না (Temple ১৮৬০ সালে লিখেছিলেন)। ...অর্থসংক্রান্ত বিষয় তখন সরকারের কোনও বিশেষ সদস্যের ব্যাপার ছিল না, সমভাবে সকলেরই ব্যাপার ছিল।"[৩২] Charles Wood যখন James Wilson-কে গভর্নর-জেনারেলের পরিষদে একটি শূন্যপদ পূরণের জন্য ভারতে যেতে বলেছিলেন তখন তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে তাঁর মর্যাদা "ভারতীয় চান্সেলার অব এক্সচেকার-এর মত হবে।"[৩৩] সরকারি-ভাবে তাঁর পদকে গভর্নর-জেনারেল পরিষদে "চতুর্থ সাধারণ সদস্য" বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। সাধারণভাবে তিনি ফিনান্স মেম্বার বলে পরিচিত ছিলেন এবং 'ল মেম্বার' (আইনের ভারপ্রাপ্ত সদস্য) ও 'মিলিটারি মেম্বার'-এর (সামরিক বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত সদস্য) সঙ্গে একযোগে তিনিও আমলাতান্ত্রিক পিরামিডের চূড়াতেই স্থান পেতেন।

Canning-এর নির্দেশে গভর্নর-জেনারেলের কার্যনির্বাহী পরিষদে কর্ম-বিভাগের দফতরভিত্তিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল;[৩৪] ১৮৬০ সালের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্টের ১নং ধারা অনুযায়ী পরিষদের কাজ চালানোর নিয়মাবলী প্রণয়নের অধিকার গভর্নর-জেনারেলকে দেওয়া হয়েছিল। ফিনান্স মেম্বার নিয়োগ ছিল প্রত্যেক সদস্যের দায়িত্ব বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা ও ভাগ করার দিকে একটি পদক্ষেপ। অর্থব্যবস্থার কাজকর্মের সব রকম খুঁটিনাটি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হবার দরুন ফিনান্স মেম্বার অপরাপর সদস্যদের—অর্থাৎ আর্থিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ সদস্যদের চালিত করার বিশেষ সুযোগ ছিল। বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড থেকে যেসব ফিনান্স মেম্বারকে পাঠানো

হত (যথা James ও Samuel Laing) তাঁরা গভর্নর-জেনারেলের পরিষদে সিভিল সার্ভিসের মধ্যে থেকে পদোন্নতির ফলে নিয়োজিত সদস্যদের চেয়ে বেশি আস্থাভাজন হতেন। ১৮৭০ সালে সেক্রেটারি অব স্টেট Argyll লিখেছিলেন "ইংল্যাণ্ড থেকে জনপরিচিতি সম্পন্ন একজন লোককে যদি পাওয়া যায় তা হলে এই পদে (ফিনান্স মেম্বারের পদে) তাঁকে দিতে পারলে অনেকগুলি সুবিধা আছে। কোনও সিভিল সার্ভিসের লোকই অপরাপর সিভিলিয়ানদের ঈর্ষা থেকে মুক্তি পাবেন না, আর ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয় সম্প্রদায়েরই ইংল্যাণ্ড থেকে আগত লোককে ভারতীয় সিভিল সার্ভেণ্টের চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করার সম্ভাবনা।"[৩৫] James Wilson-এর উজ্জ্বল সাফল্য এই ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে ইংল্যাণ্ড থেকে যাঁদের পাঠানো হয়, বিশেষ করে Wilson-এর মত ইংল্যাণ্ডের অর্থবিভাগের (Treasury) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কাউকে যদি পাওয়া যায়, তা হলে তাঁরা বেশি কার্যকর হতে পারেন। "হোম অথরিটিজ" (ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ) মনে করতেন যে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার যা প্রয়োজন তা হল "ইংল্যাণ্ডের কোষাগারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভারতীয় অর্থব্যবস্থাকে দেখার মত তাজা চোখ···।"[৩৬] ভারতবর্ষে অবশ্য গভর্নর-জেনারেলের কার্যনির্বাহী পরিষদের মত একটি লোভনীয় পদে ইংল্যাণ্ড থেকে আসা "বহিরাগতদের" বিপক্ষে একটা স্পষ্ট মত চালু ছিল। যথা, Sir Bartle Frere মনে করতেন যে ইংল্যাণ্ড থেকে অর্থমন্ত্রী "আমদানি করার চেষ্টা নিরর্থক" কারণ "মোট ফল খরচের উপযুক্ত নয়।" "যিনিই আসুন তাঁকেই রোমান কনসালের মত একটা বছরের মধ্যে নিজের নামকে বিখ্যাত করে তুলতে হবে, অথবা বড়জোর দুই বা তিন বছরের মধ্যে ; আর তিনি তাঁর পূর্বসূরীর কর্মনীতি সৎভাবে কার্যকর করা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন না।"[৩৭] Bartle Frere Sir C. Wood-কে লিখেছিলেন "অর্থ-বিষয়ক রাষ্ট্রবিদগিরির যাদুর" জন্য ভারতের ইংল্যাণ্ডের ট্রেজারির দিকে তাকানোর দরকার নেই। ভারতীয় সিভিলিয়ান গোষ্ঠীর মত ছিল Bartle Frere-র মতই ঃ ভারতীয় অর্থ দফতরের যা প্রয়োজন তা হল কঠোর পরিশ্রম এবং "অধিকতর ভালভাবে একঘেঁয়ে কাজগুলি করা শতখানেক ছোটখাট খুঁটিনাটির ব্যাপারে ভাল ব্যবস্থাপনা।"[৩৮] এই ছিল ভারতের সিভিলিয়ান দলের মত। শিক্ষিত ভারতীয় মতের প্রতিফলিত করে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সিভিলিয়ান দলকে নিন্দা করে বলেছিল, "অর্থমন্ত্রী

পদের জন্য আমরা একজন রাষ্ট্রবিদ চাই, প্রশাসক মাত্র চাই নে, আর ভারতীয় সিভিলিয়ানরা যতই দক্ষ হন তাঁরা সকলেই কিন্তু রাষ্ট্রবিদ নন।"[৩৯] ভারতের অর্থ-বিষয়ক ব্যাপারের দায়িত্ব সিভিলিয়ানদের উপর দেবার ব্যবস্থার প্রবর্তন নিয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' দুঃখ প্রকাশ করেছিল, কারণ সিভিলিয়ানরা বুদ্ধিমান নন এবং প্রগতিশীল নন (ইংরেজিতে লিখেছিল, improgressive!), আর টাটকা ইংরেজ ভাবধারার স্বাস্থ্যকর প্রভাব ছাড়া তাঁরা (অর্থ-বিষয়ক) এই কঠিন সমস্যাগুলির সফল মোকাবিলা করতে অক্ষম।"[৪০] সে যাই হোক, ইংল্যাণ্ডের উপযুক্ত অর্থ-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ (যথা S. Laing) ও রাষ্ট্রবিদ্ (J. Wilson)[৪১] এই কাজের জন্য পাওয়া যেহেতু কঠিন ছিল সেহেতু ইংল্যাণ্ডে (যথা Sir C. Trevelyan) অথবা ভারতে (যথা Sir R. Temple) অর্থ-বিষয়ক অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন এমন সিভিলিয়ানদের দিয়েই গভর্নর-জেনারেলের পরিষদের শূন্য পদ পূরণ করতে হত।

আমরা যে সময়টা নিয়ে অনুশীলন করছি তখন যে ব্যবস্থাটা প্রবর্তন করা হয়েছিল তা কিছু-কিছু দিক থেকে ইংল্যাণ্ডের মন্ত্রীসভার ব্যবস্থার মত। হাউজ অব কমন্স-এ প্রথম ভারতীয় ফিনান্স মেম্বারের নিয়োগ ঘোষণা করে Sir Charles Wood বলেছিলেন যে ফিনান্স মেম্বার "গভর্নর-জেনারেলের বিকল্প সত্তা হবেন না, তিনি একাই সে দেশের অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারের দায়িত্ব বহন করবেন না। তিনি অর্থ-বিষয়ক বিভাগের ভার নিয়ে গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য হবেন; কিন্তু তাঁর কাজের জন্য গভর্নর-জেনারেল ও তাঁর পরিষদ দায়িত্বশীল থাকবেন, কারণ ওঁদের অনুমোদন ও সম্মতি ছাড়া তিনি কিছুই করতে পারবেন না।"[৪২] স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেলের কাছে প্রেরিত বার্তায় সেক্রেটারি অব স্টেট ফিনান্স মেম্বারের অবস্থান ও তাঁর দায়িত্বের সীমা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দেন। কাউন্সিলের এই চতুর্থ সাধারণ সদস্যকে যে ভার দেওয়া হয়েছিল তা হল "অর্থ-বিষয়ক ব্যবস্থাবলীর প্রস্তাব করার কর্তব্য—সেগুলিকে তিনি আপনার (অর্থাৎ গভর্নর-জেনারেলের) বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য সুপারিশ করবেন। ...Mr. Wilson সেই একই ক্ষমতা ভোগ করবেন যা আপনার পরিষদের যে-কোনও অন্য সদস্য করেন, তা সত্ত্বেও আপনার সরকার থেকে যেসব ব্যবস্থার উদ্ভব হবে তার জন্য আপনিই দায়িত্বশীল থাকবেন।"[৪৩]

ফিনান্স মেম্বার যে অর্থসংক্রান্ত বিবৃতি বা বাজেট ভাষণ দেবেন তাকে অবশ্যই সমগ্র সরকারের নীতি হতে হবে। "এ অবশ্য অসম্ভব যে আপনার কাউন্সিলের (ফিনান্স) মেম্বারের কাছ থেকে যা কিছু আসবে আপনার সরকারকে তার সব কিছুর জন্য দায়ী করা যাবে," কিন্তু অর্থ-বিষয়ক বিবৃতিতে মূলতঃ সমগ্র সরকারের মতামতকেই প্রতিফলিত করতে হবে এবং ফিনান্স মেম্বার কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি ও প্রস্তাবগুলির জন্য ভারত সরকারই দায়িত্বশীল থাকবে, কারণ "তিনি (ফিনান্স মেম্বার) এই সমস্ত বিষয়ে সরকারের অঙ্গ হিসাবে কথা বলেন ও কাজ করেন।"[৪৪]

মন্ত্রীসভার নীতি (Cabinet principle) অনুযায়ী পরিষদের সদস্যরা "মন্ত্রীসভার গোপন তথ্য" ফাঁস করতে পারতেন না এবং পরিষদে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে এমন বিষয়ে মতানৈক্য প্রকাশ্যে আলোচনা করতে পারতেন না। একবার সামরিক বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত সদস্য Sir William Mansfield-এর একটি প্রকাশ্য বিবৃতিতে ১৮৬৮-৬৯ সালের বাজেট সম্বন্ধে পরিষদে গুরুতর মতানৈক্য প্রকাশিত হয়ে পড়ায় Mayo তাঁকে গোপনে ভর্ৎসনা করেন।[৪৫] পরিষদের সদস্যরা "বন্ধ ঘরে যা নিশ্চিতভাবে প্রত্যাখ্যান করেন ও বিরোধিতা করেন প্রকাশ্যে তাই সমর্থন করতে বাধ্য।"[৪৬] এ নিয়ে Mansfield অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু পরিষদের ভিতরকার আলোচনা প্রকাশ্যে নিয়ে আসা উচিত নয় এই নীতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদে যে সমস্ত অর্থ-বিষয়ক ব্যবস্থার তিনি বিরোধিতা করেছিলেন লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে তার পক্ষেই তিনি ভোট দিয়েছিলেন।[৪৭] কার্য-নির্বাহী পরিষদে ঐক্যমত আকাঙ্খিত বলে মনে করা হত এবং প্রায় সব সময়েই ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত করা হত। সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে প্রেরিত বার্তাগুলিতে (despatch) পরিষদের সকল সদস্যকে স্বাক্ষর করতে হত; যদি কোনও সদস্যের দ্বিমত থাকত তা হলে কার্যবিবরণীতে একটা দ্বিমতসূচক বিবৃতি (minute of dissent) সংযুক্ত করেই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হত। এই পটভূমিকায় "এই লোকগুলো যাকে বলে তাদের মত লিপিবদ্ধ করা" তার জন্য প্রবল আসক্তি, যাতে Mayo-র ধৈর্যচ্যুতি হত সেটা বোধগম্য।[৪৮] কার্যবিবরণী লেখার অভ্যাসটা বোধ হয় প্রাক্-বিদ্রোহ কালের অবশেষ; তখন সরকারের সর্বোচ্চ কর্তাদের মধ্যে আলোচনা হত কার্য-বিবরণী ও নোটের মারফত; কালো বাক্সে ভর্তি হয়ে এগুলি এক সদস্য থেকে

অপর সদস্যের হাতে মন্থরগতিতে সঞ্চালিত হত এবং কোনও সিদ্ধান্ত নেবার আগে ভাল করে দেখা হত ও মন্তব্য করা হত।[৪৯] এক সময়ে সেক্রেটারি অব স্টেট Northcote প্রস্তাব করেছিলেন যে পরিষদে মতবিরোধ থেকে উদ্ভূত সমস্যা এড়ানর জন্য পরিষদের তুলনায় গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা বাড়ানো উচিত। গভর্নর-জেনারেল John Lawrence-কে এক ব্যক্তিগত চিঠিতে Northcote লিখেছিলেন : "গভর্নর-জেনারেলকে অধিকতর স্বাধীনতা দিতে এবং তাঁকে তাঁর নিজের কাউন্সিলের সদস্যদের মনোনীত করতে দিতে, যখন উপযুক্ত মনে করবেন তখন ওঁদের মত অগ্রাহ্য করার সুযোগ দিতে এবং বার্তাগুলি (despatches) তাঁকেই (গোটা কাউন্সিল নয়) সই করতে দিতে আমি অত্যন্ত আগ্রহশীল।[৫০] তবে Northcote এ ধারণা অল্পদিনের মধ্যেই ছেড়ে দিয়েছিলেন কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে হাউজ অব কমন্স-এ চালু মত গভর্নর-জেনারেলকে এই সব ক্ষমতা দেবার বিপক্ষে।[৫১]

॥ ৩ ॥

১৮৫৩ সালের অ্যাক্ট অনুযায়ী (১৬ ও ১৭ Vic. C. ৯৫) লেজিসলেটিভ কাউন্সিল যেভাবে তার কাজকর্ম পরিচালনা করত আপাতদৃষ্টিতে তার সঙ্গে গণতান্ত্রিক সংসদীয় আচার-আচরণের সঙ্গে আপাতঃ সাদৃশ্য ছিল।[৫২] সমস্ত ব্যাপারে কাউন্সিলের সদস্যদের ভোটের অধিকার ছিল, শুধু তাই নয়, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কার্যবিবরণী জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা হত এবং সেগুলি ছাপাও হত। বিদ্রোহ থেকে উদ্ভূত আর্থিক সঙ্কটকে কাটিয়ে ওঠার জন্য যেসব নানাবিধ কর সংগ্রহের মতলব করা হয়েছিল গভর্নর-জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলকে সেসব লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সামনে রাখতে হয়েছিল। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অভিজ্ঞ সরকারি সদস্যরা গভর্নর-জেনারেল ও তাঁর সমালোচনা করা ও প্রভাবিত করার মত ক্ষমতা রাখতেন তা স্পষ্ট বোঝা যায় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ১৮৫৯-৬০ সালের কার্যবিবরণী থেকে—যখন আয়কর সম্বন্ধে নানাবিধ প্রস্তাব আলোচিত হচ্ছিল।[৫৩] লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কাছে প্রথম বাজেট

পেশ হয় James Wilson কর্তৃক ১৮৬০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি। এই ঘটনা এবং Bartle Frere-র কথায় "কর বসানোর প্রয়োজনীয়তা, কাউন্সিলের কার্যধারার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল।"[৫৪] লেজিসলেটিভ কাউন্সিল কি ভূমিকা নিত সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত ছিল। Sir Charles Wood-এর মতে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এমন একটা স্থান অধিকার করেছিল যা তার পাওনা নয়। এটা প্রকাশ্য বিতর্কের একটা মঞ্চ হয়ে উঠেছিল এবং কার্যনির্বাহের ব্যাপারে খোঁজখবর করার দিকে এর অতিরিক্ত ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল।[৫৫] এর ভিন্ন মতাবলম্বীও ছিলেন যাঁরা মনে করতেন লেজিসলেটিভ কাউন্সিল লাভজনক কাজ করছে। উদাহরণস্বরূপ Bartle Frere Wood-কে লিখেছিলেন "Lord Dalhousie কাউন্সিলকে আলোচনা, বিতর্ক ও বিবেচনা করার পরিষদের (deliberative assembly) রূপ দিয়েছিলেন, আর ১৮৭৫ সালের বিদ্রোহ নতুন কর ধার্য করা প্রয়োজনীয় করে তুলল। ফল হয়তো ভারতশাসন আরও ঝামেলার ব্যাপার হবে, কিন্তু ফল যাই হোক আমার বিশ্বাস পিছু হঠা অসম্ভব হবে, আর আইন পাসের আগে এখন যে ধরনের আলাপ-আলোচনা হয় সেসব ছাড়াই কর ধার্যের···বিশেষ বিপদ আছে।"[৫৬] Sir Charles Wood অবশ্য এ কথা উল্লেখ করেন যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে (১৮৫৩ সালের আইন অনুযায়ী) কোনও ভারতীয় প্রতিনিধিত্ব নেই: "ইংরেজ বসবাসকারীদের (settlers) দ্বারা অধীনস্থ ভারতীয়দের জন্য আইন প্রণয়ন করার সম্ভাবনায় আমি আদৌ স্বচ্ছন্দ বোধ করছি নে···।"[৫৭]

১৮৬১ সালের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট (২৪ ও ২৫ Vic. C. ৬৭) লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটাল। বেসরকারি প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকল; আইনগত ব্যবস্থা না থাকলেও বেসরকারি সদস্যদের মধ্যে ভারতীয়দের নেওয়া হবে বলে হাউজ অব কমন্স-এ একটা আশ্বাস দেওয়া হল।[৫৮] রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বা ঋণ সংক্রান্ত কোনও ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হলে গভর্নর-জেনারেলের অনুমোদনের প্রয়োজন হত (১৯ নং ধারা)। কানুনের দিক থেকে অবশ্য বাজেট আলোচনার কোনও সুযোগ ছিল না, কারণ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের ক্ষমতা একান্তভাবে আইন প্রণয়নেই সীমিত ছিল (অবশ্য কোনও খসড়া আইন উপস্থিত করার প্রস্তাব বিবেচনার জন্য অনুমোদন দান সহ)। তবে ১৮৬১ থেকে ১৮৭২ সালের মধ্যে প্রতি

বৎসর লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে অর্থ-বিষয়ক বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল কারণ প্রতি বৎসরেই নতুন অর্থ-বিষয়ক আইনের দরকার হত। কাজেই নতুন কর ধার্যের আইনের প্রস্তাব কাউন্সিলে অর্থ-বিষয়ক পর্যালোচনার অথবা বাজেট বিবৃতির এবং একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনার উপলক্ষ্য হত। যখন কোনও অর্থ-বিষয়ক আইনের প্রয়োজন হয় নি (যথা ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৬ সালের মধ্যে) তখন কাউন্সিলে অর্থ-বিষয়ক বিবৃতি দেবার বদলে গভর্নমেণ্ট সেটা ভারতের 'গেজেটে' প্রকাশ করত। ১৮৯২ সালের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট (৫৫, ৫৬ Vic. C. ৬৪) পাস হবার আগে পর্যন্ত লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য দ্বারা কোনই বাৎসরিক অর্থ-বিষয়ক বিবৃতি আলোচনা করার ও প্রশ্ন করার অধিকার ছিল না।[৫৯]

ভারতীয় জনগণের একমাত্র সোচ্চার ও সরব অংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী এমন একটা ব্যবস্থা দাবি করেছিলেন যাতে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের মারফত জনসাধারণের অর্থের উপর কিছু পরিমাণে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করা যায়। সুপরিচিত দেশীয় সংবাদপত্রগুলি এবং ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মত সংস্থাগুলি তৎকালীন ব্যবস্থা Sir Charles Trevelyan-এর ভাষায় যা কেবল "জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার চেহারার একটা সযত্ন অনুকরণ ছিল", কিন্তু ভারতীয় জনগণের "প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব"[৬০] ব্যতিরেকে—সেই ব্যবস্থা সম্বন্ধে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিল (তা আমরা পরে দেখতে পাব।[৬১] ভারত সরকার অবশ্য দক্ষ প্রশাসনের জন্য তৎকালীন ব্যবস্থাকেই সন্তোষজনক মনে করত। ১৮৬৭ সালে স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল সেক্রেটারি অব স্টেটকে লিখেছিলেন: "বাৎসরিক বাজেট প্রবর্তনের পর থেকে যে ব্যবস্থা ক্রমশঃ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে তা সাধারণ বুদ্ধি, সুবিধা ও দেশের পরিস্থিতি থেকে নির্দেশিত।"[৬২] লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ছিল অভিজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তা, বে-সামরিক লোক, ব্যবসায় নিযুক্ত ইউরোপীয় এবং ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব-কারী কিছু মনোনীত সদস্যকে নিয়ে গঠিত। সরকারি দায়িত্বে তাঁদের কাছে প্রস্তাব উত্থাপিত হত এবং এইভাবে রাজস্ব সংগ্রহের যে সত্যিই প্রয়োজন আছে সরকারের তরফ থেকে সে আশ্বাস দেওয়া হত। লেজিসলেটিভ কাউন্সিলকে বলা হত সংক্ষিপ্ত একটা আলোচনার ভিত্তিতে ওই প্রস্তাবগুলি পাস করতে। ভারত সরকার মনে করত তৎকালীন

পরিস্থিতিতে আইন প্রণয়ন সংস্থার অনুমোদন আদায়ের এইটিই ছিল সবচেয়ে সুদক্ষ কায়দা। "বাজেট ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত অর্থ-বিষয়ক বন্দোবস্তের জন্য প্রয়োজনীয় আইনকানুনকে যদি (লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের) কার্য পরিচালনার নিয়ম-কানুনের অধীন করা যায় তো সাধারণতঃ" ভারত সরকারকেই "সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় ফেলা হবে।" ভারতের মতো আয়তনের একটি দেশে যে দেরি অনিবার্য তার উপর "আমাদের রাজস্বসংক্রান্ত আইন প্রণয়নকে যদি সাধারণ আইন প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত সমস্ত নিয়ম মেনে চলার প্রয়োজনে আরও দেরি করিয়ে দেওয়া হয় তা হলে নতুন নতুন খাতে ধার্য করগুলি যতদিনে সেই অর্থসংগ্রহ করে উঠতে পারবে তা প্রায়ই কয়েক মাস পিছিয়ে যাবে এবং এর ফল বস্তুতঃ বাৎসরিক বাজেট ব্যবস্থার পক্ষে মারাত্মক হবে।"[৬৩] দেশীয় সংবাদপত্র ও সংস্থাগুলি "রাজনৈতিক" অধিকারের কথা তুলেছিল। আমলাতান্ত্রিক মনের কাছে ব্যাপারটা ছিল কেবল "প্রসাসনিক" সুবিধার।

॥ ৪ ॥

১৮৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত অর্থ বিভাগের (Finance Department) প্রধান ছিলেন প্রথম দিকে ভারত সরকারের মুখ্য অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারি। গোড়ার দিকে এই বিভাগের যে কাজকর্ম করা হত তার বেশিরভাগ ছিল অর্থের বাঁটোয়ারা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত। এদিকে রাজস্ব সংগ্রহ শাখায় অনেক অর্থ-বিষয়ক ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র দফতরে (Home Department) দায়িত্ব ছিল। ১৮৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে Sir Charles Wood চালু ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অসন্তোষ গভর্নর-জেনারেলের কাছে প্রকাশ করেছিলেন: "রাজস্বের ব্যাপারে অর্থাৎ তার পরিমাণ নির্ধারণ ও আদায় যতটা ভারত সরকার কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তা করা হয় ও গভর্নর-জেনারেলের কাছে উপস্থাপিত হয় একজন সেক্রেটারির (অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র দফতরের সেক্রেটারি) দ্বারা, এদিকে অর্থ-বিষয়ক দফতর—যার উপর আদায়ীকৃত সমগ্র রাজস্ব এবং নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের ভার—তার ব্যাপারটা পরিচালিত হয় ও গভর্নর-জেনারেলের কাছে উপস্থাপিত হয় আর একজন (অর্থাৎ অর্থ-বিষয়ক)

সেক্রেটারির দ্বারা।"[৬৪] সেক্রেটারি অব স্টেট মন্তব্য করেন যে এই ব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন ব্যবস্থার তুল্য কার্যোপযোগী নয়। ইংল্যাণ্ডের ব্যবস্থা হল যে বিভাগ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে তাকেই ব্যয় নির্ধারণের উপায়-উপকরণও যোগাতে হবে। ১৮৫৯ সালে James Wilson যখন অর্থ বিভাগের ভার নিলেন তখন Canning ও তাঁর কাউন্সিল এবং সেক্রেটারি অব স্টেট, স্বরাষ্ট্র ও অর্থ বিভাগ[৬৫] একত্র করার পরিকল্পনা আলোচনা করছিলেন। Canning ও তাঁর কাউন্সিল যে 'দফতর ব্যবস্থা' (portfolio system) প্রবর্তিত করেছিলেন তাতে স্বাভাবিকভাবেই কাজকর্মের আরও নিয়মসম্মত বণ্টন হয়েছিল এবং অর্থসংক্রান্ত কাজকর্ম Wilson-এর বিভাগে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ১৮৬১ সালের মার্চ মাসে স্ট্যাম্প ও বহিঃশুল্কের সঙ্গে জড়িত সমস্ত কাজকর্ম স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে অর্থ বিভাগে স্থানান্তরিত হয়।[৬৬] একটা স্বল্প সময় ছাড়া (১৮৬২ সালের মার্চ মাস থেকে ১৮৬৩ সালের অক্টোবর যখন প্রশাসনিক সুবিধার জন্য স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারিকে এই সব শাখা নিয়ন্ত্রণ করতে দেওয়া হয়েছিল),[৬৭] রাজস্বের এই শাখাগুলি অর্থ বিভাগের নিয়ন্ত্রণে ছিল।[৬৮] ১৮৬৩ সালের অক্টোবরে লবণ, আফিম ও আবগারি বিভাগগুলিও স্বরাষ্ট্র থেকে অর্থ বিভাগে স্থানান্তরিত হয়।[৬৯] এইভাবে রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ, আদায় ও বণ্টনকে একই নিয়ন্ত্রণের অধীনে আনার যে লক্ষ্য Sir Charles Wood-এর ছিল তা বহুল পরিমাণে সাধিত হয়।

ব্যয়ের ব্যাপারে অর্থ বিভাগ অপরাপর বিভাগের উপর দৃঢ় নিয়ন্ত্রণ চালু রাখত। সামরিক বিভাগের ব্যয় বিদ্রোহোত্তর ছাঁটাইয়ের সময় সামরিক অর্থ-বিষয়ক কমিশনের (১৮৫৯ সালের জুনে নিয়োজিত) তত্ত্বাবধানে ছিল। পরে এই কমিশনকে সামরিক অর্থ বিভাগে (১৮৬০ সালের জুলাই) রূপান্তরিত করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তুলে দেওয়া হয় (১৮৬৪ সালের এপ্রিল)।[৭০] সশস্ত্র ফৌজ কমিয়ে ব্যয়সংক্ষেপ করার কাজটি এই বিভাগ করেছিল, কিন্তু সামরিক বিভাগের একটা আলাদা অডিট ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া দরকার ছিল না।[৭১] তাই এই দফতর তুলে দিয়ে সামরিক বিভাগের একজন অ্যাকাউণ্টেণ্ট-জেনারেল (সামরিক ব্যয়ের কণ্ট্রোলার-জেনারেল বলে সচরাচর পরিচিত) নিয়োজিত হয়েছিলেন।[৭২] কণ্ট্রোলার-জেনারেল সেনাবিভাগের ব্যয়ের অনুমিত হিসাব তৈরির তত্ত্বাবধান করতেন, এই হিসাব শেষ পর্যন্ত অর্থ বিভাগের কাছে পেশ করা হত, স্থায়ী অনুমোদিত

ব্যয়ে কোনও হস্তক্ষেপ করা হত না, কিন্তু সাময়িক সম্ভাব্য ব্যয়কে কঠোরভাবে খুঁটিয়ে দেখা হত এবং পূর্বানুমোদন ছাড়া সামরিক বিভাগের আলোচ্য বছরের ব্যয় বৃদ্ধি করা যেত না।[৭৩] আইন প্রণয়ন, পুলিস, রাজস্ব, নৌসংক্রান্ত, শিক্ষা, যাজকীয়, ডাক এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগের অপরাপর শাখার অর্থ বণ্টন অর্থ বিভাগ পরীক্ষা করে দেখত।[৭৪] এই সব বিভাগ এবং প্রশাসনের অপরাপর শাখায় বেতন হার সংশোধন ও নতুন পদ সৃষ্টির সমস্ত প্রস্তাব অর্থ বিভাগে পেশ করা হত এবং সেই বিভাগের মারফত সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে পাঠানো হত।[৭৫] ১৮৫৪ সালে Dalhousie পূর্ত বিভাগের পত্তন করেছিলেন, সেখানে অর্থ-বিষয়ক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিশেষভাবে বিস্তারিত ছিল। বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচ করা যেত না এবং এক খাত থেকে অপর খাতে তহবিল স্থানান্তর করাও সাধারণতঃ অনুমোদিত হত না। একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের উপর হলে বে-সামরিক পূর্তকর্ম ও সেচের কাজ প্রেসিডেন্সি পূর্ত বিভাগগুলি হাতে নিতে পারত না যদি কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগ ও অর্থ বিভাগের কাছে পেশ করা বাজেটের অনুমিত হিসাবের ভিত্তিতে তার পূর্বানুমোদন না থাকত। কর্তৃপক্ষকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সচেতন করার জন্য Florence Nightingale-এর প্রয়াসের অন্যতম ফল হিসাবে ষাটের দশকে যেসব সামরিক সেনানিবাস নির্মাণকর্ম শুরু হয়েছিল সেগুলি অর্থ বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে সামরিক পূর্ত বিভাগ কর্তৃক হাতে নেওয়া হয়েছিল। একমাত্র রেলপথ নির্মাণের ক্ষেত্রেই অর্থ বিভাগের কর্তৃত্ব শিথিল ছিল, রেল কোম্পানিগুলির সঙ্গে যৌথ পরামর্শ ব্যবস্থার ভিত্তিতে খরচ কমানর প্রয়াস সফল হয় নি।[৭৬] পূর্ত, স্বরাষ্ট্র ও সামরিক—এই তিনটি বিভাগ ছাড়াও এই সূত্রে রাজস্ব, কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগেরও উল্লেখ করা উচিত। শেষোক্ত বিভাগটি ১৮৭১ সালের জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কৃষি, খনিজ সম্পদ কাজে লাগান এবং "শিল্পসংক্রান্ত জ্ঞানের প্রসার" উৎসাহিত করার জন্য।[৭৭] ভূমি রাজস্ব, জরীপ ও বন্দোবস্ত, কৃষিসংক্রান্ত ও শিল্পসংক্রান্ত পরিসংখ্যান, বন ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলিকে এই বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল; ১৮৭২ সালের পর কিছু কিছু রাজস্ব শাখাকেও এই বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

নানা ধরনের কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য অর্থ বিভাগের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন হত। এটা সহজে পাওয়া যেত না। ১৮৫৭

সালে সিভিল সার্ভিসে একটি পৃথক অর্থ-বিষয়ক শাখা খোলা হল ; এই শাখায় কেবল সেই চুক্তিবদ্ধ (covenanted) অফিসারদেরই নিয়োগ করা হত যাঁরা হিসাব-রক্ষা, কোষাগারের ব্যবস্থাপনা এবং ভারতে রাজস্ব ব্যবস্থার নীতি-বিষয়ক একটা পরীক্ষায় পাস করতে পারতেন। তরুণদের অর্থ বিভাগের কাজে শিক্ষিত করার জন্য ১৮৬২ সালের মে মাসে এক শ্রেণীর শিক্ষানবীশ অফিসারের সৃষ্টি করা হল, সেই সঙ্গে ফিনান্স মেম্বার S. Laying ঘোষণা করলেন যে চুক্তিবদ্ধ ও চুক্তিবদ্ধ নয় (uncovenanted) এমন চাকুরেদের তফাত তুলে দেওয়া হবে এবং পদোন্নতি কেবল যোগ্যতার ভিত্তিতে হবে।[৭৮]

ভারতে তরুণ অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা ব্যর্থ হল। ভারতীয় অর্থ বিভাগের চাকরিতে নিয়োগের জন্য সিভিল সার্ভিস কমিশনের সাহায্যে, হিসাবে দক্ষ তরুণদের ভর্তি করার জন্য সেক্রেটারি অব স্টেটকে অনুরোধ করা হল।[৭৯] সেক্রেটারি অব স্টেট দেখলেন যথেষ্ট শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অথচ ভারতে যেতে ইচ্ছুক লোক যোগাড় করা মুশকিল, তাই তিনি গভর্নর-জেনারেলকে ভারত থেকে উপযুক্ত গুণসম্পন্ন লোক যোগাড়ের চেষ্টা করতে বললেন।[৮০] Mr. Foster নামক ব্রিটিশ কোষাগারের একজন কর্মকর্তা বিশেষ ভার নিয়ে অর্থ বিভাগের পরামর্শদাতা হিসাবে ভারতে এলেন। তিনি মন্তব্য করলেন যে কোষাগারের উচ্চ বেতন ইংল্যাণ্ডে সরকারি কাজে যোগ দিতে সেরা লোকদের আকর্ষণ করে, কিন্তু ভারতে বেতনের নিম্নহার যথেষ্ট আকর্ষণীয় হয় না : "অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রারম্ভিক বেতন এত নীচে নির্ধারিত করার কৃপণ নীতি, ব্যবসায়ীদের অফিসে যাদের চাকরি মেলে না ও সরকারি পেন্সনভোগী হিসাবে ছাড়া জীবিকানির্বাহে অক্ষম লোকগুলিই কেবল সরকারি অর্থ বিভাগে চাকুরিতে আসে।"[৮১] Sir Charles Trevelyan (ইংল্যাণ্ডে বিখ্যাত Trevelyan-Northcote সংস্কারের পর থেকে যিনি সার্ভিসে লোক নিয়োগের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসাবে গণ্য হতেন) বেতন হার সংশোধনে অনিচ্ছুক ছিলেন ; সরকারের আর্থিক অবস্থা সব সময়ে ঘাটতির কিনারায় থাকত—তাই অর্থ বিভাগের বেতন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি চলত না।[৮২]

অর্থ বিভাগের উন্নতিসাধনের জন্য এ প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল যে অধিকতর সংখ্যায় চুক্তিবদ্ধ (covenanted) অফিসারদের নিয়োগ করা হোক।[৮৩]

১৮৬২ সাল থেকে এ বিভাগে মাত্র দু-জন চুক্তিবদ্ধ অফিসার ছিলেন—ফিনান্স সেক্রেটারি ও অ্যাকাউন্টেন্ট-জেনারেল—কাজেই অনেক দায়িত্বশীল পদ চুক্তিবদ্ধ নন এমন অফিসারদের দেওয়া হয়েছিল। অর্থ বিভাগে উন্নতি করার ও উচ্চ বেতনের সুযোগ চাকরির অপরাপর বিভাগের চেয়ে কম ছিল- কাজেই অল্পসংখ্যক লোকই অর্থ বিভাগে আসতে চাইতেন।[৮৪] ১৮৬৫ সালে অর্থ বিভাগীয় সেক্রেটারি মন্তব্য করেছিলেন যে এই বিভাগের দক্ষতার অভাবের অন্যতম কারণ এই যে উচ্চতর পদগুলি চুক্তিবদ্ধ নয় এমন অফিসার-দের দখলে ছিল, তাঁরা যখন পদোন্নতি লাভ করে উচ্চ পদে পৌঁছতেন তখন "শেখার পক্ষে অতিরিক্ত বুড়ো" হয়ে যেতেন এবং অধস্তন পদে বহুদিন কাজ করার দরুন "যথাযথ প্রভাব বিস্তারে অক্ষম হয়ে যেতেন।"[৮৫] Sir Charles Travelyan কিন্তু রাজি হলেন না। তিনি দেখিয়ে দিলেন যে ১৮৬২ সালের আগে যখন এ বিভাগে বেশ কিছু চুক্তিবদ্ধ অফিসার ছিলেন তখনও দক্ষতা কিছু বেশি ছিল না। তাঁর মতে চুক্তিবদ্ধ নয় এমন অফিসারদের শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব ছিল। আর তাঁরা (চুক্তিবদ্ধ অফিসারদের মত অন্য বিভাগে চলে না গিয়ে) অর্থ বিভাগে রয়ে যেতেন সেখানে তাঁদের পদোন্নতির সম্ভাবনা অন্যান্য বিভাগেয় চেয়ে বেশি থাকত বলে। সে যাই হোক, অর্থ বিভাগে অনেক চুক্তিবদ্ধ অফিসার নিয়োগ সরকারের সাধ্যের বাইরে ছিল।[৮৬]

অর্থ বিভাগে দক্ষতার অভাবের মূল কারণ ছিল এই যে অধস্তন পদে নিয়োজিত লোকেরা যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন না এবং কম বেতন পেতেন, সিভিল সার্ভিস থেকে আসা অফিসারদের যদিও শিক্ষাগত পটভূমি মোটামুটি ভালই ছিল, কিন্তু অর্থ-বিষয়ক ব্যবস্থাপনায় তাঁরা বিশেষভাবে শিক্ষিত ছিলেন না। অর্থ বিভাগে উন্নতির সম্ভাবনা ব্রিটিশ কোষাগারে যে ধরনের লোকেরা কাজ করতেন তাঁদের মত কর্মীদের পক্ষে যথেষ্ট আকর্ষণীয় ছিল না। এমন কি ১৮৬৯ সালে অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড থেকে Wilson-এর আগমনের দশ বছর পরেও এ বিভাগে "দক্ষ অফিসারের অভাব" থেকে গিয়েছিল।[৮৭] অর্থ বিভাগীয় চাকরিকে সামরিক বা প্রশাসনিক বিভাগীয় চাকরির মত সমান দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা খুবই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল।

॥ ৫ ॥

বিদ্রোহোত্তর কালে যেসব প্রতিষ্ঠানগত সংস্কার প্রবর্তিত হয়েছিল তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল বাজেট ব্যবস্থা। সাম্রাজ্যবাদের আয় ও ব্যয়ের বাৎসরিক বাজেটের অভাবে ১৮৬০-৬১ সালের আর্থিক বছর পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে খরচ ও ভবিষ্যত প্রয়োজন নির্ধারিত করতে হত এক জটিল পদ্ধতির মারফত। সে ছিল আর্থিক বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে তৈরি 'প্রত্যাশিত অনুমিত হিসাব' (Anticipation Estimates), 'কাঁচা অনুমিত হিসাব' (Sketch Estimates) এবং 'পাকা অনুমিত হিসাব' (Regular Estimates)।[৮৮] আর্থিক বছর শুরুর আড়াই মাস আগে সর্বোচ্চ সরকারের কাছে 'প্রত্যাশিত অনুমিত হিসাব' উপস্থাপিত করতেন স্থানীয় হিসাব-রক্ষকরা (Local Accountants)। এই হিসাবের মধ্যে তুলনার জন্য দুটি পাশাপাশি স্তম্ভে বিগত দুই বছরের আয় ও ব্যয় দেওয়া থাকত। আর্থিক বছরের চার মাস গত হলে তৎকালীন সংশোধন সহ 'কাঁচা অনুমিত হিসাব' স্থানীয় হিসাব-রক্ষকদের কাছ থেকে পাওনা হত। তিন মাস পরে যে 'পাকা অনুমিত হিসাব' পেশ করা হত তাতে বছরের প্রথম ছ মাসের আয় ও ব্যয়ের হিসাব (ইতিমধ্যে তা জানা হয়ে যেত) এবং বার্ষিক আর্থিক বছরের অনুরূপ অনুমিত অঙ্ক দেওয়া থাকত। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সি বা প্রদেশের স্থানীয় হিসাব-রক্ষক বে-সামরিক, সামরিক, পূর্ত প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগের অর্থের বিলি-বণ্টনকারী অফিসারদের আর্থিক প্রয়োজন সম্পর্কে মাসিক বা সাপ্তাহিক রিটার্ন পেতেন। ভারত সরকার স্থানীয় হিসাব-রক্ষকদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত, কাঁচা ও পাকা অনুমিত হিসাব ছাড়াও হাতে থাকা নগদ টাকার মাসিক রিটার্ন পেতেন। তহবিল বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনের পরিমাণ বুঝতে ভারত সরকারের ফিনান্স সেক্রেটারিকে অনুমিত বা প্রকৃত আয় ও ব্যয়ের তুলনা করতে হত। প্রকৃত খরচ সম্বন্ধে হিসাব-পরীক্ষক বিভাগ বিস্তারিত হিসাব-পরীক্ষা করত। ব্যয়কে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হত—স্থির খরচ (যথা রাষ্ট্রীয় ঋণের সুদ, বে-সামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বেতন, সামরিক খরচ, ইত্যাদি) এবং পরিবর্তন সাপেক্ষ অস্থায়ী খরচ (যথা মালপত্রের (stores) খরচ, বাট্টা, নানারকম সম্ভাব্য খরচ (contingencies), ইত্যাদি)। সাধারণতঃ স্থির খরচ জাতীয় কোনও খরচ নির্দিষ্ট অনুমোদন ছাড়া কোনও বিভাগ করতে পারত না। পরিবর্তন সাপেক্ষ খরচ কেবল

প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-কানুন কড়াভাবে প্রয়োগ করে অথবা নির্দিষ্ট অনুমোদন নিয়েই করা যেত। অনুমিত হিসাবে খরচের যে মোট পরিমাণ ধরা হত বিভাগীয় অফিসাররা মোট ব্যয় তার মধ্যেই সীমিত রাখতে বাধ্য থাকতেন। এমন কি সেই সীমার মধ্যেও এক বিষয়ে নির্দিষ্ট বরাদ্দ অপর কোনও বিষয়ের ঘাটতি পূরণের জন্য নিয়োগ করারও অতি সামান্যই সুযোগ দেওয়া হত।

এই জটিল ও অদ্ভুত অর্থব্যবস্থার সঙ্গে James Wilson-এর নিজেকে পরিচিত করতে হয়েছিল। Walter Bagehot-কে উইলসন লিখেছিলেন: "ভারতীয় রাজস্ব বিভাগ এক বিশাল যন্ত্র, জটিলতা, বৈচিত্র্য এবং যেসব জায়গায় কাজ হয় তাদের মধ্যে দূরত্বের দিক থেকে এর তুলনায় ইংল্যাণ্ডের কোষাগার কিছুই না।"[৯০] এই জটিল যন্ত্রকে গোছানো ছিল তাঁর প্রধান কাজ। ১৮৬০ সালের ৭ই এপ্রিল ভারত সরকার বাজেট ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করল। এর আগে ১৮৬০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি James Wilson লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সামনে মোটামুটি অনুমিত হিসাবের ভিত্তিতে একটি বাজেট বিবৃতি পেশ করেন। Wilson-কে ভারতে বাজেট ব্যবস্থার জনক হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। তবে ১৮৫৯ সালের মে মাসে ভারতের জন্য বাজেট ব্যবস্থার পরিকল্পনা রচনা করে Sir Charles Trevelyan, Wilson-এর পূর্বসূরীর কাজ করেছিলেন।[৯১]

১৮৬০ সালের ৭ই এপ্রিলের প্রস্তাবে ইংল্যাণ্ডের ব্যবস্থার যত কাছাকাছি সম্ভব একটা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা ভাবা হয়েছিল। এই ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হল: "প্রত্যেক সরকারি বছর শুরু হবার আগে সামনের বছরের জন্য সাম্রাজ্যের প্রত্যাশিত আয় ও প্রস্তাবিত ব্যয়ের সতর্ক অনুমিত হিসাব সর্বোচ্চ সরকারকে করতে হবে। আর যেসব নানাবিধ কর্মসম্পাদন করতে হবে সেগুলিকে অর্থসংস্থানের ভিত্তিতে বিচার করে, প্রস্তাবিত ব্যয়ের সঙ্গে অতীতের তুলনা করে, বিভিন্ন কার্যনির্বাহী সরকার (Executive Governments) ও বিভাগীয় প্রধানদের সুপারিশ খতিয়ে দেখে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি কাজের সকল শাখায় এবং প্রত্যেক শাখার মধ্যে বিভিন্ন খাতে নির্দিষ্ট তহবিল বরাদ্দ করবে ও খরচ করার অধিকার দেবে। অর্থ বরাদ্দের উপরোক্ত আইন (Act of Appropriation) অনুযায়ী বরাদ্দ অর্থ যথাযথ খাতে ব্যয়ের ভার বিভিন্ন কার্যনির্বাহী সরকার ও বিভাগকে দেওয়া হবে।"[৯২]

তৎকালে চালু ব্যবস্থার তুলনায় এ ব্যবস্থার সুবিধাগুলিকে প্রস্তাবে উল্লেখ

করা হয়েছিল। প্রথমতঃ, আগামী আর্থিক বৎসরের প্রত্যাশিত আয় ও প্রয়োজনীয় ব্যয়ের সম্পূর্ণ পর্যালোচনা এই ব্যবস্থায় নিশ্চিত হত : "বছর শুরুর আগে যখন পর্যালোচনা হয় তখন ব্যাপারটা ভবিষ্যদৃষ্টির, অভিজ্ঞতার নয়, পরিকল্পনাগুলি তখনও সম্পাদিত ঘটনায় (fait accompli) পরিণত হয় নি, পর্যালোচনাকারী কর্তৃপক্ষই সেগুলির বিচারক।"

দ্বিতীয় নতুন ব্যবস্থার আমলে ব্যয়কে মাঝে-মাঝে খতিয়ে দেখা হত, সেই ব্যয়নির্বাহের উপায় উপকরণের বিচার করা হত প্রত্যাশিত ব্যয়ের সঙ্গে তুলনা করে। এর দ্বারা ভবিষ্যত খরচ ও আয়ের ভারসাম্য আরও ভাল করে রাখা যেত। উপরন্তু এই নতুন ব্যবস্থা নিয়মিত হিসাব-পরীক্ষা ও হিসাব রাখার ব্যবস্থার ভিত্তি পত্তন করেছিল। প্রত্যেক কার্যনির্বাহী সরকার ও প্রত্যেক বিভাগের জন্য ভারত সরকারের বাজেটে অনুমোদিত অঙ্ক জমা হত এবং অপরপক্ষে খরচের খাতায় অর্থ বিভাগ কর্তৃক যে অঙ্ক প্রকৃতপক্ষে খরচা হল তা হিসেবে দেখান হত। এইভাবে এই ব্যবস্থা সাধারণভাবে 'অর্থনৈতিক কার্যকরতা' বাড়াত।[৯৩]

নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন যেহেতু একদমেই করে ফেলা অসম্ভব ছিল, ঠিক হল ১৮৬০-৬১ সালের আর্থিক বছরে তা অংশতঃ প্রবর্তিত হবে (উপস্থিত সংগঠন ও পদ্ধতিকে সাময়িকভাবে বজায় রেখে), যাতে ১৮৬১-৬২ সালের মধ্যে পুরোপুরি চালু করা যায়। Wilson-এর জীবিতকালের মধ্যে বাজেট ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক অর্থ-বিষয়ক সংস্কারই পুরো করা যায় নি (যথা একটি কেন্দ্রীয় রেভিনিউ বোর্ড প্রতিষ্ঠা, ভারত সরকারের হিসাব-পরীক্ষা বিভাগের পুনঃসংগঠন, প্রত্যাশিত খসড়া ও নিয়মিত অনুমিত হিসাব ফর্মের বদলে নূতন বাজেট ফর্ম তৈরি করা ইত্যাদি)।[৯৭] বাজেট ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য প্রশাসনিক বহিরঙ্গ গড়ে তোলার কাজটা Wilson-এর উত্তরাধিকারী Laing ও Trevelyan-এর জন্য রয়ে গিয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডের হিসাব-রক্ষা ও হিসাব-পরীক্ষা ব্যবস্থাকে ভারতীয় পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার একটা বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনার জন্য একটা কমিটি নিয়োজিত হয়েছিল। তার সদস্য ছিলেন E. Drummond (ভারতের অ্যাকাউণ্টেণ্ট-জেনারেল), C. H. Lushington (ভারত সরকারের অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারি) ও Richard Temple (সিভিল সার্ভিস থেকে Wilson-এর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতার দরুন কমিটিতে

বিশেষভাবে নিয়োজিত)।[৯৫] কমিটি সুপারিশ করল যে অর্থ-বিষয়ক কাজকর্ম দুটি বিভাগের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হোক—হিসাব-রক্ষা ও হিসাব-পরীক্ষা বিভাগ, আর স্পষ্টভাবে পৃথক দুই শ্রেণীর অফিসারকে দিয়ে কাজ চালানো হোক; এক শ্রেণী শুধুই টাকার বিলি-বণ্টনের উপর তদারক করবেন; আর এক শ্রেণী শুধুই হিসাব রাখার তদারক করবেন; ভারতের অ্যাকাউণ্টেণ্ট-জেনারেল যিনি তিনি অডিটর-জেনারেলও হবেন, তাতে অর্থ-বিষয়ক কাজের দুই পক্ষকে একত্রিত করা হবে।[৯৬] ১৮৬০ সালের বাজেট কমিটি একটি মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন সংস্কার প্রবর্তিত করল, সে হল বাজেটে অর্থ গ্রহণের হিসাব-পরীক্ষার (appropriation audit) পদ্ধতি। ১৮৬০ সালের আগে ভারতে প্রচলিত ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি ছিল প্রত্যেক খাতে সারা বছরের নির্দিষ্ট মঞ্জুরির অনুমিত বাজেটের অভাব। ১৮৬০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারিতে প্রথম বাজেট বিবৃতি দ্বারা Wilson যে বাজেট ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন তার দ্বারা পুরাতন ব্যবস্থাকে বদলে তিনি এই ত্রুটি দূর করলেন। কিন্তু প্রত্যাশিত ব্যয়ের (অর্থাৎ বাজেটের) বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে অনুমিত ব্যয়ের সঙ্গে প্রকৃত ব্যয়ের তুলনার একটা কায়দা বের করার দরকার ছিল যাতে ব্যয় অনুমিত হিসাবকে ছাড়িয়ে না যায় এবং কাজের প্রত্যেক বিভাগের জন্য বরাদ্দ অন্য উদ্দেশ্যে খরচ না হয়। যাতে ব্যয়ের অগ্রগতি (কাজের প্রতিটি বিভাগে এবং সামগ্রিকভাবে) মাসে মাসে নির্ধারিত করা যায় তার জন্য ইংল্যাণ্ডের ব্যবস্থার ধাঁচে বাজেটে অর্থ বরাদ্দের ভিত্তিতে হিসাব-পরীক্ষা প্রবর্তিত হল।[৯৭] ভারত সরকার বাজেট কমিটির প্রস্তাব গ্রহণ করল এবং নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী ভারতের অ্যাকাউণ্টেণ্ট ও অডিটর-জেনারেল তাঁর অধস্তন হিসাব-রক্ষক ও হিসাব-পরীক্ষকদের কাছ থেকে কাজের প্রতিটি খাতে ব্যয়ের একটা মাসিক সংক্ষিপ্তসার পেতেন এবং অর্থ বরাদ্দের চূড়ান্ত হিসাব-পরীক্ষার পর তা সারা ভারতের ব্যয়ের মাসিক রিপোর্টরূপে অর্থ-বিষয়ক বিভাগে পাঠানো হত।[৯৮]

বাজেট কমিটি প্রস্তাব করল যে নির্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ দফাওয়ারি রূপে এই-ভাবে করা হবে:

(১) প্রশাসনিক বিভাগ (class of service)

(২) প্রতি বিভাগের খরচের বিভিন্ন খাত।

(৩) প্রতি বিভাগের প্রতি শাখায় খরচের বিভিন্ন খাত।

কাজের প্রতিটি শাখায় বিভিন্ন খাতের খুঁটিনাটিতে অর্থ বরাদ্দ (appropriation) ব্যবস্থা প্রসারিত করার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে সেক্রেটারি অব স্টেট সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেছিলেন যে অপ্রধান ব্যয়ের খাতগুলিতে ব্যয় সম্বন্ধে কিছু স্বাধীনতার অবকাশ দেওয়া যেতে পারে।[৯৯] সেক্রেটারি অব স্টেটের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ উপরোক্ত প্রথম দুটি ক্ষেত্রের (অর্থাৎ প্রশাসনিক বিভাগ এবং প্রত্যেক বিভাগে খরচের বিভিন্ন খাতের) মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হল, খুঁটিনাটি বিষয়ে ভাগের মধ্যে আর যাওয়া হল না।[১০০] বাজেট কমিটি যে বাজেট ও অনুমিত হিসাবের ফর্ম তৈরি করল তা এই নীতি অনুযায়ীই হল।[১০১]

আপাতদৃষ্টিতে সামান্য গুরুত্ব থাকলেও একটি প্রশ্ন আলোচ্য সময়ে অনেকখানি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, সে হল আর্থিক বৎসর কখন থেকে শুরু হওয়া উচিত ? ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত আর্থিক বছর ১লা মে থেকে শুরু হত।[১০২] কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে ভারতে এ রকম একটা অনুভূতি আছে "যে বৃটিশ পার্লামেন্টের কোনো হাউজেই এই বিশাল সাম্রাজ্যের গুরুত্বের অনুপাতে আগ্রহের উদ্রেক করে না।" কারণ ভারতীয় হিসাবপত্র বৃটিশ পার্লামেন্টের অধিবেশনের একেবারে শেষের দিকে পেশ করা হয়।[১০৩] সেই কারণে আর্থিক বছরকে এগিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করা হল যাতে অধিবেশনের গোড়ার দিকে তা পার্লামেন্টের হাতে থাকে। ভারতীয় হিসাবপত্র সম্পর্কিত তদন্ত কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী (১৮৬৪ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর) ১৮৬৬-৬৭ থেকে আর্থিক বছর ১লা এপ্রিল থেকে শুরু হল।[১০৪] এ প্রস্তাব বিবেচনা করা হয়েছিল যে আর্থিক বছর আরও আগে থেকে—সম্ভব হলে ১লা জানুয়ারি থেকে শুরু করা যায় কি না,[১০৫] কিন্তু ভারতের ফসল কাটার মরশুমগুলির কথা ভেবে (রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল) এটা অসুবিধাজনক বিবেচিত হল।[১০৬]

Wilson-ও বাজেট কমিটির প্রয়াসের কল্যাণে বাৎসরিক বাজেট ব্যবস্থা কোনো গোলযোগ ছাড়াই প্রবর্তিত হয়েছিল। তবে বাজেট অনুমোদনগুলির মধ্যে ব্যয়কে সীমিত রাখা এবং ভবিষ্যত ব্যয়ের সঠিক অনুমিত হিসাব তৈরি করা কঠিন কাজ ছিল। গোড়ার দিকে হিসাব-রক্ষক ও হিসাব-পরীক্ষকদের দ্বারা তৈরি স্থানীয় অনুমিত হিসাবগুলি প্রকৃত ব্যয় থেকে অনেক তফাত হয়ে যেত।[১০৭] অধস্তন সরকারগুলি তাদের ভবিষ্যত প্রয়োজনীয় তহবিলের

অনুমিত হিসাব সময় মত দেবার ব্যাপারে প্রায়ই গাফিলতি করত, ফলে ভারত সরকারের অর্থ বিভাগ কর্তৃক তৈরি করা অনুমিত হিসাব কিছুটা আন্দাজি হয়ে যেত।[১০৮] অনুমিত হিসাব ছাপিয়ে খরচ সর্বত্র বারণ করা হত এবং সাধারণতঃ বরাদ্দ ছাড়িয়ে যাওয়া হত না।[১০৯] সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থা এবং জনসেবার (public service) ন্যায্য চাহিদা অনুযায়ী"[১১০] বাজেট বরাদ্দের বেশি তহবিল মঞ্জুর করার কোনও আবেদন সাধারণতঃ গ্রহণ করা হত না। বিভিন্ন খাতে যেসব অর্থ মঞ্জুর করা হত তা যদি আর্থিক বছরের শেষে খরচ না হত তা হলে তা বাতিল বলে ধরে নেওয়া হত।[১১১]

ভারতীয় হিসাবপত্র সম্বন্ধে তদন্ত কমিশন ১৮৬৪ সালে হিসাব-রক্ষা ব্যবস্থার খুঁটিনাটি ব্যাপারেও উন্নতিবিধান করল। এই কমিশনের সদস্য ছিলেন Foster ও Whiffen—প্রথম জন ইংল্যাণ্ডের সহকারী পেমাস্টার-জেনারেল এবং দ্বিতীয় জন সমর বিভাগের ডেপুটি অ্যাকাউণ্টেণ্ট-জেনারেল- ভারতের পুরানো হিসাব-রক্ষা ব্যবস্থা ছিল "ব্যবসায়িক অর্থে সরকারের লাভ ক্ষতি" নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে "হিসাব রাখার ব্যবসায়িক ব্যবস্থার ভিত্তিতে" প্রতিষ্ঠিত।[১১২] এই ব্যবস্থার উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্য Sir Charles Trevelyan কিছু ইংরেজ কর্মকর্তাদের সাহায্য পাবার জন্য সেক্রেটারি অব স্টেটকে অনুরোধ করলেন। Mr. Gladstone এবং Sir Charles Lewis-এর সঙ্গে পরামর্শ করে Trevelyan, Foster ও Whiffen-কে বলেছিলেন।[১১৩] ভারতে এসে Foster ও Whiffen (১৮৬৪-৬৫) ইংল্যাণ্ডের ছাঁচে হিসাব-পত্রকে ঢেলে সাজাবার জন্য অনেকগুলি পরামর্শ দেন: অর্থ-বিষয়ক প্রশাসনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁদের পরামর্শ অর্থ বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি করল।[১১৪]

আলোচ্য সময়ে বাজেট ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং হিসাব-পরীক্ষা ও হিসাব-রক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজা এক নতুন অর্থব্যবস্থার জন্য বহিরঙ্গ (infra-structure) সৃষ্টি করল। এই নতুন ব্যবস্থার স্রষ্টাদের প্রতি Mayo-র উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে দ্বিমত হবার কোনও কারণ নেই। তিনি বলেছিলেন "আমাদের অর্থ-বিষয়ক ব্যাপার পরিচালনা করার ভার যে লোকেদের দেওয়া হয়েছিল তাঁরা একটা ভাল হলেও অত্যন্ত জটিল ব্যবস্থাকে অত্যন্ত এলোমেলো অবস্থার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার অত্যন্ত শ্রমসাধ্য

কর্তব্যসম্পাদনে ব্যাপৃত ছিলেন। শূন্য থেকে শুরু করে একটা অর্থ-বিষয়ক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়েছিল।[১১৫] অবস্থা যা ছিল সে তুলনায় তাঁরা চমৎকার সাফল্য লাভ করেছিলেন।

৬॥

আলোচ্য সময়ে কেন্দ্রীয় বা সর্বোচ্চ সরকারের সঙ্গে স্থানীয় বা অধস্তন সরকারগুলির সম্পর্কের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। ১৮৫৮-৬১ সালের মধ্যে ঝোঁকটা ছিল অর্থ-বিষয়ক নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীকরণ। ১৮৬২ ও ১৮৬৮ সালের মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণের ধারণা প্রাধান্য পায় এবং অনেকগুলি পরিকল্পনা তৈরি হয়, যদিও এই পরিকল্পনার কোনোটিই সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বলে গণ্য হয় না। তৃতীয় পর্যায়ে ১৮৬৯ থেকে ১৮৭২ সালের মধ্যে Mayo অর্থব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ করেন। তাঁকে সুযোগ্য সাহায্য করেন John Strachey।

বিদ্রোহের সময়ে ভারতের সর্বোচ্চ সরকারের তুলনায় প্রাদেশিক সরকারগুলির (বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গভর্নর সহ) অধস্তন অবস্থান সুস্পষ্ট ছিল। পার্লামেন্টের আইন করে 'স্থানীয়' অথবা প্রাদেশিক সরকারগুলিকে স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেলের পূর্বানুমোদন ছাড়া নতুন পদ সৃষ্টি অথবা বেতন বা গ্র্যাচুইটি মঞ্জুর করা থেকে বিরত করা হয়েছিল।[১১৬] এই নীতি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া স্থায়ী অফিস ইত্যাদির কর্মীদের সংখ্যা, পদের শ্রেণী অথবা বেতন কোনও পরিবর্তন করা চলবে না।[১১৭] তবু Wilson যখন ভারতে এলেন তখন তিনি দেখলেন "সর্বোচ্চ ও অধস্তন সরকারগুলির মধ্যেকার অস্পষ্ট সম্পর্ক—শেষোক্তরা সব সময়ে অনধিকার প্রবেশ করতে চাইছে ও পূর্বোক্ত নিজেরটা ধরে রাখার চেষ্টা করছে"—অর্থ-বিষয়ক প্রশাসনকে জটিল করে রেখেছিল।[১১৮] প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্ক অসন্তোষজনক ছিল কারণ শেষোক্তকে ব্যয়ের প্রত্যেক শাখার ক্ষুদ্রতম খুঁটিনাটিকেও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনো বাজেট ব্যবস্থা যেহেতু ছিল না এবং হিসাব-পরীক্ষা ও হিসাব-রক্ষার ব্যবস্থা দুর্বল ছিল, স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল অর্থ-বিষয়ক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা কার্যকরভাবে প্রয়োগ

করতে পারতেন না। প্রাদেশিক সরকারগুলির অর্থ-বিষয়ক ক্ষমতার পরিসর ও সীমা অনির্দিষ্ট ছিল। ভারত সরকার এমন এক কর্তব্যভারে বিব্রত ছিল যা দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করার ব্যবস্থা তার ছিল না, আর অর্থ-বিষয়ক দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত থাকার দরুন প্রাদেশিক সরকারগুলির ব্যয়সঙ্কোচ করার কোনো উদ্দীপনা ছিল না।

James Wilson-এর লক্ষ্য ছিল কেন্দ্রীয় অথবা সর্বোচ্চ সরকারের অর্থ-বিষয়ক নিয়ন্ত্রণকে কার্যকর করা। ১৮৬০ সালের গোড়ার দিকে প্রবর্তিত বাজেট ব্যবস্থা এই নিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছিল যে (কাজের প্রত্যেক শাখার জন্য এবং প্রত্যেক শাখার মধ্যে প্রতিটি বিস্তারিত খাতের জন্য) নির্দিষ্ট মঞ্জুরি নিতে হবে এবং স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেলের পূর্বানুমোদন ছাড়া স্থানীয় সরকারগুলি মঞ্জুরিকৃত অঙ্ককে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। এই নীতিকে বাজেট কমিটি আরও বিস্তারিত করল। অর্থ বরাদ্দের (appropriation) হিসাব-পরীক্ষার পদ্ধতি এবং হিসাব-রক্ষার নতুন ব্যবস্থা ব্যয়ের উপর সর্বোচ্চ সরকারের নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করল। বেতনের হার পরিবর্তন অথবা স্থায়ী অফিস ইত্যাদিতে নতুন সংযোজন থেকে প্রাদেশিক সরকারকে বিরত রাখার নিয়মাবলী পুনর্ঘোষিত হল। একটা বিভাগের মধ্যে খরচের বণ্টনে সামান্য পরিবর্তনের অনুমতি দেওয়া হল যদি অবশ্য সর্বোচ্চ সরকারের কাছে সে বিষয়ে দ্রুত রিপোর্ট পাঠানো হয়।[১১৯] ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্টে বোম্বাই ও মাদ্রাজের সরকারদের আইন প্রণয়নের অধিকার তুলে নেওয়া হয়েছিল, ১৮৬১ সালের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্টে সে অধিকার তাদের আবার ফিরিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু গভর্নর-জেনারেলের পূর্বানুমোদন ছাড়া ভারতের সরকারি ঋণ, বহিঃশুল্ক ও সর্বোচ্চ সরকার কর্তৃক ধার্য অপর কোনও কর অথবা প্রচলিত মুদ্রা, বিল, নোট প্রভৃতি সম্পর্কিত কোনও আইন পাস করার বা বিবেচনা করার ক্ষমতা থেকে প্রাদেশিক আইন প্রণয়ন সংস্থাগুলিকে বঞ্চিত রাখা হল।[১২০] এইভাবে Wilson কর্তৃক সৃষ্ট অর্থ-বিষয়ক কায়দা-কানুনে সজ্জিত হয়ে ভারত সরকার অর্থ-বিষয়ক ব্যাপারে অধস্তন সরকারগুলিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করল। ভারত সরকার প্রকাশ্যে অর্থ-বিষয়ক কেন্দ্রীকরণের নীতিতে আবদ্ধ ছিল না। কিন্তু অর্থ-বিষয়ক নিয়ন্ত্রণ শক্ত করাকে অধস্তন সরকারগুলি, যারা বোধ হয় এই প্রথম কড়া ও সুদক্ষ কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের

পুরো ধাক্কা অনুভব করল—তারা সেভাবেই ব্যাখ্যা করেছিল। James Wilson-কে "কেন্দ্রীকরণের মূর্তিমান দূত" বলে গণ্য করা হল।[১২১]

মাদ্রাজের গভর্নর Sir Charles Trevelyan কেন্দ্রীকরণ নীতির দৃঢ় বিরোধী ছিলেন। Trevelyan মনে করতেন প্রশাসনিক সুবিধার দিক থেকে অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ অবাঞ্ছনীয়। ১৮৫৩ সালে ভারতীয় ব্যাপারে নিয়োজিত সিলেক্ট কমিটির (Select Committee on Indian Territories) সামনে প্রদত্ত সাক্ষ্যে অর্থ-বিষয়ক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সাধারণ তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে অধস্তন প্রেসিডেন্সিগুলিকে যুক্তিযুক্ত স্বাধীনতা ও নিজেদের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের সুযোগ দেবার পক্ষে Trevelyan বলেছিলেন। ১৮৫৯ সালে Trevelyan প্রাদেশিক সরকারগুলিকে নিজেদের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের কিছুটা স্বাধীনতা দেবার কথা আবার বলেন; যদিও বাজেট বরাদ্দ ছাপিয়ে যাওয়া উচিত নয় এ কথা তিনি স্বীকার করেন। তিনি খুঁটিনাটির নির্দিষ্ট মঞ্জুরিরও বিপক্ষে ছিলেন কারণ এই রকম মঞ্জুরি অধস্তন সরকারগুলিকে "কোনও ব্যয়ের প্রয়োজন হলেই তা যত তুচ্ছই হোক—তার জন্য প্রত্যেক সময়ে কলকাতার কাছে একটা করে পৃথক আবেদন করার অপমানজনক বাধ্যবাধকতার..." সম্মুখীন করত।[১২২] ১৮৬০ সালের ১২ই মে তাঁর কার্যবিবরণীতে ভারতীয় রাজস্ব ব্যবস্থার বৈচিত্র্য এবং একটা কেন্দ্র থেকে দূর দূর অঞ্চলগুলিকে শাসন করার অসম্ভবতা সম্পর্কে উল্লেখ করার পর তিনি নিজের মতামত নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করেন: "এটা সংহতিসাধন নয়, বরং পরস্পরবিরোধী কাজকর্মকে সুব্যবস্থার অতীত একটা স্তূপে জড়ো করা। মাথা জাম হয়ে যায় আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অচল হয়ে পড়ে।"[১২৩]

এই আপত্তিগুলি ছিল প্রশাসনিক সুবিধার যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। Trevelyan আরও এগিয়ে গিয়ে সাংবিধানিক দিকটি সম্বন্ধেও প্রশ্ন তুললেন। ব্রিটিশ ভারতের সংবিধানে কি এটা উচিত যে, প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল স্থানীয় সরকারগুলির সঙ্গে আগে কোনও পরামর্শ না করে একটা প্রস্তাবের মারফত হঠাৎ এই রকম একটা আঙ্গিক পরিবর্তন জারি করবেন?" যখন সেক্রেটারি অব স্টেট প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিকে একটা আইন প্রণয়নকারী পরিষদ দেবার এবং নিজের কাজের ব্যবস্থাপনা নিজের উপর ছেড়ে দেবার সরকারি ইচ্ছা ঘোষণা করেছেন তখন Wilson

কর্তৃক এমন মাত্রায় কেন্দ্রীকরণ প্রবর্তিত হচ্ছে যা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রাদেশিক সরকারগুলির নির্ভরতা বাড়িয়ে দেবে। কারণ অর্থ-বিষয়ক কেন্দ্রীকরণের মানে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সমস্ত কার্যকর কর্তৃত্বের কেন্দ্রীভবন ঃ "কারণ অর্থ যেহেতু সরকারের উপাদানগুলির মধ্যে প্রবলতম তা স্বভাবতঃ অন্য সমস্তকে গ্রাস করে ও ঢেলে সাজে······ইঙ্গ-ভারতীয় সরকারগুলির সংবিধানের মহৎ প্রশ্নটিকে অর্থ-বিষয়ক ব্যবস্থাপনার একটা নামহীন ঘটনা হিসাবে নগণ্যভাবে মিটিয়ে দেওয়া কিছুতেই চলতে পারে না।"[১২৪]

Sir Charles Trevelyan যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন তা রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু তাঁর যুক্তি উপস্থিত করার ভঙ্গি, সরকারের গোপনীয় কাগজপত্রের প্রকাশ, তাঁর "বিদ্রোহ" থেকে উদ্ভূত শোরগোল তাঁকে মুশকিলে ফেলে দিল। ব্যাপারটাকে সঙ্কীর্ণ ঈর্ষার প্রকাশ বলে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। গভর্নর-জেনারেল "খণ্ড-ভিত্তিক নীতি ও দাবি"কে প্রত্যাখ্যান করলেন। Lord Canning, James Wilson-এর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হলেন ঃ "ভারতবর্ষের সমস্ত অর্থব্যবস্থাকে একটা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে আনার বিষয়ে আপনি যা কিছু বলেছেন তার সঙ্গে আমি একমত।"[১২৫] .... "আমাদের নিজের অভ্রান্ততা বলব না—কিন্তু প্রশ্নাতীত-তাকে যতদূর সম্ভব তুলে ধরতে" তিনি কৃতসংকল্প ছিলেন।[১২৬] Trevelyan-এর ক্রিয়াকলাপে, বিশেষতঃ সরকারি কার্য-বিবরণী প্রকাশ করাকে Sir Charles Wood "সম্পূর্ণ অন্তর্ঘাতমূলক" বলে নিন্দা করেছিলেন।[১২৭] Trevelyan-কে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে সাময়িকভাবে এ বিতর্কের উপর যবনিকাপাত করা হয়েছিল।

গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলে Wilson-এর উত্তরাধিকারী ফিনান্স মেম্বার Samuel Laing ১৮৬১ সালে অর্থ-বিষয়ক বিকেন্দ্রীকরণের একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন। সাম্রাজ্যের সকল অংশে পূর্তকর্ম করার প্রয়োজনীয়তা এবং পূর্তকর্ম সংক্রান্ত ব্যয়ের খুঁটিনাটিতে অত্যধিক কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ এড়ানোর বাঞ্ছনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে। পূর্তকর্ম বিভাগে ভারত সরকারের সেক্রেটারি "দেশের অর্থাদির প্রাদেশিকীকরণের" সুপারিশ করেছিলেন, আর Laing এই উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনার ছক দিয়ে প্রাদেশিক সরকারগুলির একটা গোপনীয় সার্কুলার পাঠিয়েছিলেন।[১২৮]

Laing উল্লেখ করেন যে পূর্তকর্মের উন্নতি ছাড়াও বিকেন্দ্রীকরণের আরও অন্যান্য সুবিধা হবে: প্রাদেশিক সরকারগুলি তাদের নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যয়খাতগুলিতে ব্যয়সঙ্কোচের একটা উদ্দীপক পাবে এবং এর দ্বারা "স্থানীয় স্বাবলম্বনের মনোভাব জাগ্রত করায়" সাহায্য হবে। ১৮৬১ সালের মার্চ মাসে ১৮৬০-৬১ সালের নিয়মিত অনুমিত হিসাব থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে ভারত সরকার তার আয়ের উপর প্রায় ৬ কোটি টাকা ব্যয় করছে।[১২৯] একমাত্র সমাধান ছিল অবিলম্বে লবণ শুল্ক বৃদ্ধি করা এবং পূর্তকর্মের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকে মঞ্জুর করা ব্যয় হ্রাস করা। এই ব্যয় হ্রাস পূর্তকর্ম বিভাগের কাজের গুরুতর ক্ষতি করত। কাজেই স্থানীয় কর ধার্যের কিছু-কিছু ক্ষেত্র প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে ছেড়ে দেবার প্রস্তাব হল, যাতে সেইগুলির সাহায্যে স্থানীয় রাজস্ব আদায় করে তারা পূর্তকর্মের জন্য কেন্দ্রীয় মজুরির ঘাটতি মেটাতে পারে। অতএব Laing-এর প্রস্তাবের পিছনে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সর্বোচ্চ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসংস্থানের উপর পূর্তকর্মের মোটা খরচের চাপ কমানো এবং এই বোঝার কিছুটা প্রাদেশিক সরকারগুলির কাছে হস্তান্তর করা। প্রাদেশিক সরকারগুলি যদিও নতুন প্রাদেশিক করের মারফত অর্থসংগ্রহের কায়দা বের করার দিক থেকে বেশ অসুবিধা বোধ করছিল, তথাপি Laing-এর পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি।[১৩০] কিন্তু এ পরিকল্পনা সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী করা হয় নি: ১৮৬১ সালের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রাদেশিক লেজিসলেটিভ কাউন্সিলগুলি তৈরি হওয়া পর্যন্ত ভারত সরকার অপেক্ষা করায় ঠিক করল। ১৮৬২ ৬৩ সালে ব্যয়ের তুলনায় উদ্বৃত্ত আয় হল ১.৮ কোটি টাকা, পরের বছরেও অল্প কিছু উদ্বৃত্ত হল। কিছু-কিছু খরচ প্রাদেশিক সরকারের হাতে হস্তান্তর করার প্রশ্নটিও সাময়িকভাবে ধামাচাপা পড়ল।

১৮৬৬ সালে ফিনান্স মেম্বার W. N. Massey এই পরিকল্পনাকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। ১৮৬৬-৬৭ সালে ভারত সরকারের ব্যয় আয়ের চেয়ে ২.৫ কোটি টাকা বাড়তি হল, তার পরের দু বছরে অর্থ ঘাটতির পরিমাণ হল ১.৬ কোটি টাকা এবং ৪.১৪ কোটি টাকা। এই সঙ্কটে সরকার আবার বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনাকে পুনরুজ্জীবিত করল যাতে এই আর্থিক বোঝা প্রাদেশিক সরকারগুলি সর্বোচ্চ সরকারের সঙ্গে ভাগ করে

নিতে পারে। দুটো পরিকল্পনা তৈরি করা হল। ১৮৬৬ সালে W. N. Massey কর্তৃক রচিত পরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হল যে প্রাদেশিক সরকারগুলি কতকগুলি খরচের খাত হাতে নিয়ে নেবে (তখনও পর্যন্ত সেগুলি সামাজিক রাজস্ব থেকে মেটানো হত), আর স্থানীয় করের ভিত্তিতে রাজস্ব বাড়বে, তার কায়দা তারা নিজেরাই ঠিক করবে। ১৮৬৭ সালে Col. R. Strachey-র পরামর্শের ভিত্তিতে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কেবল কতকগুলি খরচের খাত নয় কতকগুলি রাজস্ব আদায়ের খাতও প্রদেশের হাতে হস্তান্তরের ভিত্তিতে রচিত ছিল।

প্রথম পরিকল্পনাটি কেবল কতকগুলি খরচের খাত (যথা, শিক্ষা, পুলিস, জেল, পূর্তকর্ম) থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় এবং সেইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের খরচ ১·২ কোটি টাকা কমানো।[১৩১] বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্নর Sir Cecil Beadon উল্লেখ করেন যে স্থানীয় উন্নয়নের জন্য স্থানীয় কর ধার্য বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সাম্রাজ্যিক অর্থসংস্থানের উপর চাপ কমানোর জন্য স্থানীয় কর রাজ্যসরকারগুলির পছন্দ না হবার সম্ভাবনা।[১৩২] বোম্বাই থেকে Sir Bartle Frere তাঁর সোজাসুজি কায়দায় Massey-কে লিখলেন যে খরচের খাত হস্তান্তর করায় তাঁর আপত্তি নেই যদি রাজস্বের খাতও হস্তান্তর করা হয়। "কিন্তু ব্যাপারটা রীতিমত অন্যরকম হয়ে যায় যখন খরচ মেটানোর জন্য সাম্রাজ্যিক করের কোনও ভাগ না দিয়ে বরং এতদিন স্থানীয় উদ্দেশ্যে যে খরচ হচ্ছিল তা সাম্রাজ্যিক উদ্দেশ্যে খরচ করার একটা হুকুমসহ দায় হস্তান্তর করা হয়।"[১৩৩] উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সমূহের লেফটেনাণ্ট গভর্নর E. Drummond এবং মাদ্রাজের গভর্নর W. T. Denison বলেন যে Massey পরিকল্পনা ভারতীয় পরিস্থিতিতে বিচার না করে স্থানীয় অর্থসংস্থান সম্বন্ধে ইংল্যাণ্ডের ব্যবস্থা আমদানি করতে চায়।[১৩৪] পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ সমূহের সরকার ছাড়া আর সমস্ত স্থানীয় সরকারই এ পর্যন্ত সাম্রাজ্যিক রাজস্ব থেকে প্রদত্ত খরচ মেটানোর জন্য—স্থানীয় কর বসাতে অনিচ্ছুক ছিল। স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে স্বীকার করেন যে খরচ মেটানোর উপায় হস্তান্তর ব্যতীত খরচ হস্তান্তর সম্পর্কে "আরও কড়া শব্দ ব্যবহার না করে বলা যায় প্রায় সার্বজনীন দ্বিধা" ছিল।[১৩৫] কাজেই Massey পরিকল্পনা প্রত্যাহৃত হল এবং পরের বছর সরকার আর একটা পরিকল্পনা উপস্থিত করল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাটির উদ্যোক্তা ছিলেন পূর্তকর্ম বিভাগের Col. R. Strachey। Massey বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনাটির প্রস্তাব করেছিলেন কেবল সর্বোচ্চ সরকারের উপর থেকে কিছু ভার কমানোর উপায় হিসাবে।[১৩৬] সাম্রাজ্যিক রাজস্ব থেকে ভারত সরকার খরচ মেটাতে সক্ষম কিনা সে কথা নিরপেক্ষভাবেই বিকেন্দ্রীকরণ বাঞ্ছনীয় কেন তার কারণগুলি Strachey উল্লেখ করেন। (ক) প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যেকার অর্থ-বিষয়ক সম্পর্ক প্রথমোক্তর পক্ষে নৈতিক দিক থেকে নিরুৎসাহোদ্দীপক। "সরকারি আয়ের বণ্টন অনেকটা কামড়াকামড়ির পর্যায়ে নেবে যায় যাতে সব চাইতে হিংস্রদেরই সুবিধা হয়, যুক্তির প্রতি মনোযোগ সামান্যই থাকে।"[১৩৭] স্থানীয় সরকারগুলি সাম্রাজ্যিক রাজস্বের যতটা সম্ভব বেশি ভাগ পাবার জন্য হল্লা করে, সাম্রাজ্যিক রাজস্ব বাড়ানোর ব্যাপারে তাদের কোনও আগ্রহ থাকে না এবং প্রাদেশিক স্তরেও ব্যয়-সঙ্কোচ করার কোনও উদ্দীপক থাকে না। অর্থব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ তাদের মধ্যে একটা দায়িত্ববোধ জাগ্রত করবে কারণ কতকগুলি নির্দিষ্ট খরচ মেটাবার উদ্দেশ্যে রাজস্ব আদায়ের জন্য তারা দায়িত্বশীল থাকবে। (খ) প্রাদেশিক ও সর্বোচ্চ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে সুসমঞ্জস সম্পর্কের কিছুটা বিকেন্দ্রীকরণ বাঞ্ছনীয়। প্রাদেশিক সরকারের খরচের খুঁটিনাটিতে সর্বোচ্চ সরকারের অনবরত হস্তক্ষেপ এবং এই হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে স্থানীয় সরকারগুলির বিরক্তির সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়।[১৩৮] পূর্তকর্ম বিভাগ, যেখানে Strachey কাজ করতেন সেখানে এইরকম ঘটনা অনবরতই ঘটত।[১৩৯] (গ) শেষতঃ, ভারত সরকারকে যেসব বিভাগে কাজকর্ম করতে হত গত দশ পনের বছরে তার কর্মক্ষেত্রের যে অসাধারণ বৃদ্ধি ঘটেছে তার দিকে Strachey দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সরকারের ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রের প্রসার এবং রাজস্ব ও ব্যয়ের বিপুল বৃদ্ধি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের পুরনো ব্যবস্থাটি অচল করে দিয়েছে।

Strachey লিখেছিলেন "আমার মনে হয় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অর্থ-বিষয়ক ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার মত করতে হবে, যদিও স্থানীয় প্রশাসনের অর্থ-বিষয়ক ব্যাপারের উপর সাধারণ ধরনের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বজায় রাখতে হবে……।"[১৪০] Strachey প্রস্তাব করেন প্রথমে কতকগুলি খাতের (আইন, বিচার, পুলিস,

শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, স্টেশনারি ও ছাপা) খরচ এবং সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যিক রাজস্বের একটা ভাগও প্রাদেশিক সরকারগুলির কাছে হস্তান্তর করা হোক।[১৪১] হস্তান্তরিত খাতগুলির খরচ মেটানোর জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিই একান্তভাবে দায়িত্বশীল থাকবে; এই উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক কর বসিয়ে বাড়তি রাজস্ব আদায় করা যেতে পারে। আশা করা হয় যে হস্তান্তরিত খাতগুলির দরুন বর্ধিত ব্যয় ভবিষ্যতে হস্তান্তরিত রাজস্ব খাতগুলি থেকে ও তার সঙ্গে অতিরিক্ত প্রাদেশিক কর বসিয়ে রাজস্ব বৃদ্ধির দ্বারা মেটানো হবে। Massey উল্লেখ করেন হস্তান্তরিত খরচ ও রাজস্বের পরিমাণ প্রায় সমান হবে।[১৪২] Massey-র আগেকার পরিকল্পনা (রাজস্বের কোনও অংশে হস্তান্তর না করে খরচের খাত হস্তান্তর করা) সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারগুলি অদৌ উৎসাহিত ছিল না, এবারকার পরিকল্পনার ওই দিকগুলি তাদেরও পক্ষে নিয়ে এল। মাদ্রাজ সরকার ছাড়া আর সব স্থানীয় সরকারগুলিই বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনাকে স্বাগত জানাল।[১৪৩] মনে হল যেন বহু আলোচিত অর্থব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ শীগগিরই কার্যকর করা হবে।

কিন্তু গভর্নর-জেনারেল, তার পরিষদের সামরিক ভারপ্রাপ্ত সদস্য, মাদ্রাজের গভর্নর এবং আরও কয়েকজন বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনার দৃঢ় বিরোধিতা করেন। তাঁদের আপত্তিগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) এই আশঙ্কা করা হয় যে ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণ "বিরক্তিকর" হলেও প্রয়োজনীয় ছিল; বিকেন্দ্রীকরণ তাকে দুর্বল করবে। মেজর জেনারেল Sir H. M. Durand মনে করেছিলেন যে বর্তমান ব্যবস্থা যতই বিরক্তিকর হোক খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার চেয়ে তা বাঞ্ছনীয়।[১৪৪] (খ) এই পরিকল্পনায় আর একটি আপত্তি ছিল এই যে এই পরিকল্পনা ভারতে পুঁজি বিনিয়োগে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের আস্থা শিথিল করে দেবে। সাম্রাজ্যের উন্নয়নের জন্য ব্রিটিশ পুঁজি আর পাওয়া যাবে না।[১৪৫] মাদ্রাজের গভর্নর মার্শিসটুনের Lord Napier উল্লেখ করেন যে ইংল্যাণ্ডের টাকার বাজারে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি কিছুটা আস্থা আছে যা ফ্রান্স অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সমান—অর্থব্যবস্থাকে ফেডারেল করে ফেললে এই আস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।[১৪৬] (গ) আশঙ্কা করা হয়েছিল যে প্রাদেশিক সরকারগুলি সাম্রাজ্যের সামগ্রিক স্বার্থগুলিকে অগ্রাহ্য করতে পারে।

একটা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃঢ় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ছিল, যে সরকার একটা গোটা সাম্রাজ্যের অর্থসংক্রান্ত সম্পদগুলির বিলি-বণ্টন করবে এবং "একটা প্রাদেশিক রেভেনিউ বোর্ডের ছিমছাম হিসাবের চেয়ে উচ্চতর কোনও উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত" হবে।[১৪৭] বিকেন্দ্রীকরণ হলে কি হবে Lawrence তার একটা অন্ধকারময় ছবি তুলে ধরেছিলেন: "প্রত্যেক স্থানীয় সরকার ও প্রশাসন নিজ নিজ গতিধারা অনুযায়ী চলবে, আর একের সঙ্গে অপরের ব্যবস্থার তফাত বছরে বছরে বেড়ে চলবে।"[১৪৮] সর্বোচ্চ সরকার যদি অর্থ-বিষয়ক নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেয় তা হলে সে আরও অনেক কিছুর উপর নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিচ্ছে। প্রায় প্রত্যেক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বাস্তবে রূপায়িত করার সময়েই তার সঙ্গে অর্থ-বিষয়ক ব্যাপার বিজড়িত থাকে; প্রাদেশিক সরকারকে যদি তার জন্য কেন্দ্রীয় অনুমোদন না নিতে হয় তা হলে সে প্রশ্ন তারা আদৌ কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে আনবে না। (ঘ) শেষতঃ এই পরিকল্পনার সমালোচকেরা এ কথা তুলে ধরেন যে ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমলে অর্থব্যবস্থাকে ফেডারেল করে ফেলাটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল অর্থব্যবস্থা থেকে রীতিমত পৃথক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেমন প্রাদেশিক সরকারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার মত গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা আছে ভারতের তা নেই।[১৪৯] কেন্দ্রীয় সরকার কি প্রাদেশিক সরকার, কার কর্তৃত্বাধীনে কর সংগৃহীত হল করদাতাদের কাছে তাতে তফাত বিশেষ নেই। মাদ্রাজের বোর্ড অব রেভিনিউ বেশ সরস-ভাবে লিখেছিলেন এ কথা মনে করা ভুল: "যে একটা করকে 'সাম্রাজ্যিকে'র বদলে 'স্থানীয়' নাম দিলেই সেটা লোকের চোখে কর বলে কম মনে হবে অথবা তাতে সে গ্রহণযোগ্যতার বা সংগ্রহের সুবিধার একটা আশ্চর্য মাত্রায় ভূষিত হবে।"[১৫০]

এই সব যুক্তিতে অর্থব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ প্রত্যাখ্যাত হল। মাদ্রাজের গভর্নরের এবং গভর্নর-জেনারেলের পরিষদের সামরিক ভারপ্রাপ্ত সদস্যের মতামত অগ্রাহ্য করা গেল না, যদিও স্থানীয় সরকারগুলির অধিকাংশ এই পরিকল্পনার পক্ষে ছিল তবু গভর্নর-জেনারেল Strachey ও Massey কর্তৃক বিরচিত এই পরিকল্পনা কার্যকর করবেন না বলে মনস্থির করে ফেললেন। গভর্নর-জেনারেল Lawrence (তিনি বোধ হয় বিদ্রোহের অভিজ্ঞতায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন) এমন কি স্বল্পমাত্রায়ও

বিকেন্দ্রীকরণ দ্বারা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে দুর্বল করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ১৮৭০ সালে Mayo-র আগে এই ব্যাপারে আর কিছুই করা হল না।

১৮৭০ সালে Sir S. Fitzgerald-কে Mayo লিখছেন: "আমি আশা করি যে অর্থব্যবস্থার 'বিকেন্দ্রীকরণ' ওই কুৎসিত শব্দটা এবার অদৃশ্য হবে।"[১৫১] এ কেবল বিদঘুটে শব্দটির প্রতি বিরাগ। অর্থব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের নীতি Mayo পুরো স্বীকার করতেন, কিন্তু "স্থানীয় অর্থ-ব্যবস্থা" শব্দটিকে তিনি বেশি পছন্দ করতেন কারণ তাঁর যেন মনে হত যে "বিকেন্দ্রীকরণ" শব্দটির মধ্যে নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হওয়ার গন্ধ আছে। ১৮৭১ সালে তাঁর স্থানীয় অর্থব্যবস্থা সংক্রান্ত ব্যবস্থাবলী রূপায়িত হওয়ার পর তিনি লিখলেন "আমরা এ কথা স্বীকার করি নে যে আমরা অর্থ-ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ করেছি বা সুদক্ষ নিয়ন্ত্রণের এক কণাও বর্জন করেছি।......"[১৫২]

ভারতে আসার অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই Mayo এ কথা বুঝেছিলেন যে নিতান্ত স্থানীয় ব্যাপারে সর্বোচ্চ সরকারের অত্যধিক হস্তক্ষেপ চলছিল।[১৫৩] অপরপক্ষে প্রাদেশিক সরকারগুলি, বিশেষ করে বঙ্গের সরকার "নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অতিরিক্ত অধৈর্য" এবং "দুঃখের বিষয় যে সঙ্ঘর্ষের দিকে ঝোঁক" দেখাচ্ছিল।[১৫৪] প্রাদেশিক সরকারগুলির কর্মকর্তারা "ইংল্যাণ্ডে তাঁদের বন্ধুদের চিঠি লেখেন এবং ক্লাবে গর্জান"।[১৫৫] প্রাদেশিক সরকার ও সর্বোচ্চ সরকারের মধ্যেকার সম্পর্ক আদৌ মোলায়েম ছিল না। "খিটিমিটি কমানো ও অপেক্ষাকৃত সুমনোভাব সৃষ্টির জন্য" প্রাদেশিক সরকারগুলিকে "বৃহত্তর দায়িত্ব (দেওয়ায়) এবং চিঠিপত্র লেখালেখি কমানোর" জন্য একটা পরিকল্পনা তৈরি করা নিতান্তই দরকার।[১৫৬]

Mayo বিশ্বাস করতেন যে এইরকম একটা পরিকল্পনা রাজস্বের দিক থেকেও সুবিধাজনক হবে। প্রাদেশিক সরকারগুলি স্থির করবে কি করে "এই সব লোকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা সবচেয়ে সহজে মেটানো যায়"।[১৫৭] অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতার ধারাবাহিক অবতরণে Napier-কে রাজী করার চেষ্টায় তাঁর কাছে লেখা এক চিঠিতে Mayo বলেছিলেন "প্রত্যেকেই দেখছেন যে আমাদের দৈনিক ক্রমবর্ধমান চাহিদার দরুন বর্ধিত কর ধার্যের প্রয়োজন এবং সাম্রাজ্যিক (imperial) রূপে আসার চেয়ে সেটা বরং বর্ধিত স্বাধীনতা ও

দায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থানীয় কররূপে আসাই ভাল।”[১৫৮] উপরন্তু স্থানীয় অর্থসংস্থান ব্যবস্থা মিতব্যয়িতাকেও উৎসাহিত করবে। Mayo-র ইচ্ছা ছিল স্থানীয় সরকারের পক্ষে তাদের বাজেট প্রকাশ করা এবং সর্বোচ্চ সরকারের কাছে ও সেই সঙ্গে প্রাদেশিক লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের (যেখানে যেখানে তৈরি হয়েছিল) কাছে বাৎসরিক অর্থ-বিষয়ক বিবৃতি পেশ করা বাধ্যতামূলক করার।[১৫৯] Mayo Fitzgerald-কে লিখেছিলেন "আমার মনে হয় স্থানীয় বাজেট সম্পর্কে অবশ্যম্ভাবী প্রচার এবং লোকেরা তাঁদের নিজেদের টাকাই খরচ করছেন এই অনুভূতি, গভর্নর-জেনারেল যতটা রাস টানতে পারতেন তার চেয়ে ঢের কড়াভাবে রাস টানবে।”[১৬০] কতকগুলি বিভাগে, যেমন রাস্তা, ছোটখাট ইমারত ও জেল নির্মাণ, শিক্ষা, পুলিস প্রভৃতি খাতে অনেক বাজে খরচ হত যা স্থানীয় সরকার ছাড়া অন্য কোনও কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না।

রাজনৈতিক নিরিখেও স্থানীয় অর্থব্যবস্থা একটা কেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থার চেয়ে বেশি বাঞ্ছনীয় ছিল। “এই দেশের সরকারে আমাদের সঙ্গে আরও অনেক দেশীয় লোককে সংশ্লিষ্ট আমাদের করতেই হবে। এ কাজটা আমরা অত্যন্ত অবহেলা করেছি······। এ কেবল কালের গতিতেই হতে পারে; আর অপরাপর দেশেও যেমন সাধারণভাবে মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রগতি থেকেই স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতার বিকাশকে টানা যায়, তেমনি আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষেও আমরা আমাদের প্রশাসনে দেশীয়দের শ্রেষ্ঠ সাহায্য পাব······শোরগোল না করে যতজনকে সম্ভব স্থানীয় দায়িত্ব অর্পণ করে এবং তাদের নিজেদের জেলার ব্যাপারের ব্যবস্থাপনা করতে শিখিয়ে।······”[১৬১] Mayo-র ইচ্ছা ছিল “দেশীয় মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানসমূহ”[১৬২] সৃষ্টি করার এবং "স্থানীয় তহবিলের ব্যবস্থাপনায় (ভারতীয়দের) বৃহত্তর অংশগ্রহণের”[১৬৩] সুযোগ দেবার। নতুন ধাঁচের মিউনিসিপ্যাল সরকার সৃষ্টি সময়সাপেক্ষ; অবিলম্বে যা করা যেত তা হল সর্বভারতীয় বাজেট যেভাবে সর্বভারতীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে পেশ করা হত সেইভাবে প্রাদেশিক আইন প্রণয়ন সংস্থায় (যেখানে ছিল) বাৎসরিক অর্থ-বিষয়ক বিবৃতি পেশ করার ব্যবস্থা করা।[১৬৪]

এই সব ভাবধারা মৌলিকত্বের দিক থেকে এমন কিছু অভিনব ছিল না; অর্থব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা Laing, Strachey, Massey ও

আরও অনেকের দ্বারা উল্লেখিত হয়েছিল। কিন্তু অন্যরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলেন Mayo সেখানে সফল হলেন। Mayo জানতেন, "প্রাদেশিক ঈর্ষা ও সঙ্কীর্ণচিত্ততা" সংস্কারের পথে বাধা হয়েছিল।[১৬৫] সমস্ত সরকারের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের স্বপক্ষে আনার জন্য তিনি সবিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন, তিনি চিঠির পর চিঠি লিখতেন। তাঁর তরফ থেকে নিয়মিত বোঝানো ও চাপের ফলে সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে গেল। মার্শিসট্টনের Lord Napier, Sir S. Fitzgerald, Sir W. Muir, Sir B. Frere ও W. Arbuthnot-এর কাছে লেখা তার চিঠিপত্রের অধিকাংশে বিকেন্দ্রীকরণের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা ছিল। (তা থেকে অংশবিশেষ উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে)। Mayo তাঁর পরিষদের ফিনান্স মেম্বার Sir R. Temple-এর কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পান নি। Temple ১৮৬৮ সালে একটা পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন, তাতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের খুঁটিনাটির উপর সর্বোচ্চ সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর সরকারগুলিকে অত্যন্ত সীমিত একটু স্বাধীনতা দেবার কথা ভাবা হয়েছিল।[১৬৬] Mayo Argyll-এর কাছে মন খুলে লিখেছিলেন যে Temple পরিকল্পনায় প্রকৃতপক্ষে "বাস্তবের চেয়ে নামেই কিছু বদল হবে"।[১৬৭] Temple-এর পরামর্শগুলিকে কার্যকর করতে Mayo অনিচ্ছুক ছিলেন, সাময়িকভাবে ব্যাপারটাকে তিনি ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিলেন। ১৮৭০ সালে Mayo তাঁর নিজের পরিকল্পনা তৈরি করেন এবং পরিষদে Temple-এর "যথেষ্ট বিরোধিতা" সত্ত্বেও সামান্য অদলবদলের পর এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল।[১৬৮]

১৮৭০ সালের কার্য-বিবরণীতে বর্ণিত Mayo-র পরিকল্পনার বিস্তারিত ব্যবস্থাবলী ১৮৭০ সালের আগস্ট মাসে প্রাদেশিক সরকারগুলির কাছে ফিনান্স সেক্রেটারির সার্কুলারে দেওয়া হয়েছিল এবং ১৮৭০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক সেটিকে চূড়ান্ত করা হয়েছিল এবং একটি প্রস্তাব পাস করা হয়েছিল।[১৬৯] এই পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল নিম্নরূপঃ প্রশাসনের কতকগুলি বিভাগ প্রাদেশিক সরকারের কাছে হস্তান্তরিত করা হয়েছিল; জেল, পুলিস, রেজিস্ট্রেশন, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা (জনস্বাস্থ্য দফতর ছাড়া), ছাপা, রাস্তা, বে-সামরিক নির্মাণ এবং পাঁচমিশলী উন্নয়ন। প্রাদেশিক সরকার-

গুলিকে নিম্নোক্ত উৎস থেকে এই সব শাখার খরচ মেটাতে হবে : (ক) এই সব খাতে বিভাগীয় আয়, (খ) বাৎসরিক সাম্রাজ্যিক রাজস্ব থেকে এই সমস্ত প্রাদেশিক কাজের জন্য এককালীন বাঁধা অঙ্কের একটা স্থায়ী বরাদ্দ, (গ) আর কোনও ঘাটতি হলে স্থানীয় কর ধার্য।[১৭০] সাম্রাজ্যিক বাজেটে "প্রাদেশিক দফা" (provincial services) বলে উল্লেখিত এই বরাদ্দ প্রাদেশিক সরকাগুলির আয়ত্তে থাকবে এবং এগুলি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় হবে। প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর কিছু-কিছু শর্তও আরোপিত হল। এইরকম একগোছা শর্তের লক্ষ্য ছিল তহবিলের অন্যায় ব্যবহার এবং বাজে খরচ ঠেকানোর জন্য হিসাবপত্র ও অনুমিত হিসাব প্রকাশ ও পরীক্ষা নিশ্চিত করা। প্রাদেশিক সরকারগুলির দায়িত্ব রইল প্রাদেশিক গেজেটে তাদের বার্ষিক অনুমিত হিসাব ও হিসাবপত্র প্রকাশ করার এবং লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে যেভাবে সাম্রাজ্যিক বাজেট পেশ হয় সেইভাবে প্রাদেশিক আইন সংসদগুলিতে (যেখানে যেখানে ছিল) একটা অর্থ-বিষয়ক বিবৃতি পেশ করার। প্রাদেশিক সরকারগুলির তরফ থেকে ভারত সরকারের কাছে তাদের বাৎসরিক অনুমিত হিসাব ও হিসাবপত্র পেশ করা হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। আর একগোছা শর্তের মারফত সর্বোচ্চ সরকারের হাতে সাধারণ অর্থ-বিষয়ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল। যে-কোনও গ্রেডের অফিসারদের বেতন হারে কোনও পরিবর্তন, ২৫০ টাকার বেশি বেতনের কোনও পদ সৃষ্টি, ভারত সরকারের চাকুরির ছুটি ও ভাতা সংক্রান্ত নিয়ম পরিবর্তন, এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারে টাকা খাটানো প্রভৃতি যার সঙ্গে জড়িত তেমন সব প্রশ্নে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে সর্ব্বোচ্চ সরকারের কাছ থেকে অবশ্যই আগে অনুমতি নিতে বলে ব্যবস্থা করা হল। ভারত সরকারের সাধারণ নীতিগুলি থেকে প্রাদেশিক সরকারগুলির কোনও বিচ্যুতি হলে অথবা কোনও শর্ত লঙ্ঘিত হলে যাতে সংশোধন করা যায় তার জন্য হস্তান্তরিত শাখাগুলির প্রশাসনে এবং হস্তান্তরিত তহবিলের বিলি-বণ্টনে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেলের হাতে সংরক্ষিত রইল। প্রাদেশিক সরকারগুলি এই চুক্তিতে মত দিল যদিও সাম্রাজ্যিক রাজস্ব থেকে বরাদ্দের পরিমাণ কম হওয়ায় এবং তা স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট হওয়ায় কিছু আশঙ্কাও রইল।[১৭১]

১৮৭১-৭২ সাল থেকে বিকেন্দ্রীকৃত অর্থব্যবস্থার এই পরিকল্পনা

চালু করা হল। পরবর্তী কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় Mayo কর্তৃক প্রবর্তিত এই ব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর ত্রুটি উদ্ঘাটিত হল।

(১) হস্তান্তরিত প্রাদেশিক খাতগুলির খরচ মেটানোর জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বাঁধাঅঙ্কে অর্থ মঞ্জুর করা হল। কিন্তু এই হস্তান্তরিত বিভাগগুলিতে, বিশেষতঃ শিক্ষা, রাস্তা, পুলিস ও জনগণের উন্নতি-বিধান বিভাগগুলিতে খরচ যেহেতু বাড়তে লাগল প্রাদেশিক সরকারগুলির পক্ষে সে খরচ মেটানো ক্রমেই আরও কঠিন হতে লাগল। বিকেন্দ্রীকরণ কেন্দ্রীয় সরকারকে খরচ কমাতে সমর্থ করল, কিন্তু প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর স্থানীয় করের মারফত বাড়তি রাজস্ব তোলার কঠিন কাজটা চাপিয়ে দিল। Mayo-র বিশ্বাস ছিল যে "লোকে যদি দেখে যে তাদের নিজেদের উপকারের জন্য এবং কেবল নিজেদের উপকারের জন্যই বাড়তি টাকার অঙ্ক ছাপান হচ্ছে" তা হলে তারা "করদানে আপত্তি" কমাতে শুরু করবে।[১৭২] কিন্তু কোষাগারে যথেষ্ট রাজস্ব আমদানি করার মত স্থানীয় কর ব্যবস্থা করাটা প্রাদেশিক সরকারগুলির কাছে আদৌ সহজ বোধ হল না। জনমত নানা রকম কর বাড়ানোর বিপক্ষে ছিল। Argyll অত্যন্ত সঠিকভাবেই বলেছিলেন যে সাম্রাজ্যিক করের চেয়ে স্থানীয় করের অধিকতর জনপ্রিয় হবার সম্ভাবনা কম যদি দুই-ই "সরকার কর্তৃক এবং জনগণের অনুভূতি ও মতামতের তোয়াক্কা না রেখে চাপানো হয়"।[১৭৩] মনে হয় ১৮৭১-৭২ সালে প্রস্তাবিত স্থানীয় করগুলি যথা বোম্বাই শহরে নগর প্রবেশ (octroi) শুল্ক ও বাড়ির উপর কর, বাংলায় ভূমি-রাজস্বের উপর রাস্তা, শিক্ষা সেস এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে নানারকম স্থানীয় করের বিরুদ্ধে জনমানসে রীতিমত প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।[১৭৪]

(২) ভারত সরকারের মোট রাজস্বের দশ ভাগের এক ভাগেরও কম প্রাদেশিক সরকারগুলিকে দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক তহবিলের মধ্যে একটা যথাযথ অনুপাত বজায় রাখারও ব্যবস্থা ছিল না। প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে তহবিল বণ্টনের অসমতা নিয়ে যথেষ্ট মনকষাকষি ছিল। মাদ্রাজের গভর্নর Napier যখন এ বিষয়ে নালিশ করেন তখন Mayo লিখেছিলেন "এ প্রশ্ন যদি মাদ্রাজের পক্ষ থেকে তোলা হয় তা হলে আপনি নিশ্চিত দেখতে পাবেন যে ভারতে এমন একটা প্রদেশও নেই যে আরও টাকার জন্য মাদ্রাজের সমানই ভাল যুক্তি খাড়া করতে পারবে না······প্রত্যেকেই

নিজ নিজ কায়দায় ও নিজের সম্পূর্ণ সন্তুষ্টি অনুযায়ী দেখাতে সক্ষম হবে যে অন্যে অত্যন্ত বেশি পাচ্ছে।"[১৭৫] কথাটা সত্যি, কিন্তু এ কথাও সত্যি যে বিভিন্ন প্রদেশকে বরাদ্দ করা হত অতীত বণ্টনের নজির অনুযায়ী, বর্তমান অথবা ভবিষ্যৎ প্রয়োজন হিসাব করে নয়।

(৩) উপরন্তু প্রাদেশিক সরকারগুলিকে যেসব বিভাগ দেওয়া হয় নি যাতে তারা মূলতঃ আগ্রহান্বিত, যথা সাধারণ প্রশাসন, ভূমি-রাজস্ব, অন্তঃশুল্ক। "এগুলির বর্তমান রাজস্ব যথাযথভাবে বৃদ্ধি করায় তাদের কোনও আগ্রহ ছিল না কারণ এ বিষয়ে যে-কোনও বৃদ্ধি কেবল ভারত সরকারেরই উপকারে আসবে।"[১৭৬] Sir Charles Trevelyan মনে করেছিলেন Mayo পরিকল্পনা সম্বন্ধে এটাই চূড়ান্ত আপত্তি। তিনি বলেছিলেন স্থানীয় সরকারগুলির কাজ কড়াকড়িভাবে বেঁধে দেওয়া যেতে পারে না, কিন্তু সাম্রাজ্যিক স্বার্থকে প্রভাবিত করার মত শাখাগুলিতে যথা সৈন্যবাহিনী, বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক, রাষ্ট্রীয় ঋণ ও ডাক ব্যবস্থা প্রভৃতিতে ভারত সরকারের কিছু কাজ আছে ; এই সমস্ত কাজগুলিকে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং এইগুলির জন্য বাৎসরিক বরাদ্দ করা উচিত ছিল, অবশিষ্ট কাজ এবং রাজস্বের অবশিষ্ট অর্থ প্রাদেশিক সরকাগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল।[১৭৭]

(৪) Mayo ধরে নিয়েছিলেন যে অর্থব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ স্বায়ত্তশাসন শিক্ষার ব্যবস্থা করবে এবং প্রাদেশিক ও মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইউরোপীয়দের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে ভারতীয়দের শিক্ষিত করে তুলবে। সেক্রেটারি অব স্টেটের ধারণা ছিল যে সরকার "স্থানীয় সম্প্রদায়গুলির হয়ে গৃহীত এই সব ব্যবস্থায় তাঁদের সাধারণ সম্মতি আদায় করবে"।[১৭৮] প্রকৃতপক্ষে ১৮৭১-৭২ সালের ব্যবস্থা-বলীর মানে ছিল কেবল রাজস্বের ও খরচের কিছু খাত হস্তান্তর করা। বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটি ও লোকাল বোর্ডের মারফত প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা হয় নি। ১৮৮১ সাল পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে কোনও নির্বাচনভিত্তিক উপাদান ছিল না : স্থানীয় সংস্থাগুলিতে সরকারি সদস্যদের আধিপত্য ছিল।[১৭৯] Sir Charles Trevelyan বলেন যে প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ শেষ পর্যন্ত "একটা প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থায়" নিয়ে যায় ; "সেই উদ্দেশ্য

যখন সাধিত হবে প্রভু ও শিক্ষকদের তখন দেশের কোনও ক্ষতি না করে বিদায় নিতে দেওয়া যাবে"।[১৮০] নেতৃস্থানীয় "দেশীয়" প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন যে স্মারকলিপি পেশ করেছিল তাতে এই কথাগুলির একটা চাপা প্রতিধ্বনি শোনা যায়।[১৮১] স্মারকলিপি পেশকারকদের মত ছিল "প্রত্যেক প্রদেশকে একটা রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য করা উচিত" এবং "প্রশাসনে যতটা সম্ভব ব্যবহারিক অংশ নেওয়ার জন্য লোকদের আমন্ত্রণ জানান উচিত"। সেনাবাহিনী, রাষ্ট্রীয় ঋণ এবং ইংল্যাণ্ডের খরচের মত কতকগুলি সর্বভারতীয় খরচ মিটিয়ে বাকি রাজস্ব প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে রাখা উচিত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কেবল সাধারণ তত্বাবধান করা উচিত। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও "দেশীয়" উভয় সংবাদপত্রই অধিকতর বিকেন্দ্রীকরণের জন্য শোরগোল করছিল।[১৮২] এ কথা মনে করা হচ্ছিল যে Mayo-র পরিকল্পনা সঠিক দিকে একটা পদক্ষেপ ছিল, কিন্তু যথেষ্ট দূর যেতে পারে নি। ফেডারেল ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার দিকে অগ্রগতির পথে এটা একটা ধাপ মাত্র ছিল। আর Trevelyan যে "প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থার" কথা বলেছিলেন সাম্রাজ্যের বেশিরভাগ প্রশাসকদের পক্ষে তা একটা সুদূর সম্ভাবনার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। সাম্রাজ্যবাদের সূর্য যখন মধ্যগগনে তখন Trevelyan-এর মত ব্যক্তি কেবল একটি ক্ষুদ্র ছায়াই ফেলতে পারেন।

উল্লেখিত পুস্তকাদি (References)

১ Mayo-র নিকট Argyll। ৬ই জানুয়ারি, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৯, ১ নং।

২ H. Dodwell-এর মতে সেক্রেটারি অব স্টেটের হাতে অর্থ-বিষয়ক ক্ষমতাগুলির কেন্দ্রীভবন ছিল "সম্ভবতঃ ১৯৫৮ সালের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পরিবর্তন"। Henry Dodwell-এর 'A. Sketch of the History of India 1858-1918' (London, 1925), পৃষ্ঠা ৩২।

৩ George Couper-এর নিকট Dalhousie, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৫৪। J. G. A. Baird সম্পাদিত 'Private Letters of the Marquess of Dalhousie' (London, 1910), পৃষ্ঠা ৩২১।

৪ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট। Fin. Despatch, ৪৩ নং, ২৬শে মার্চ ১৮৬০।

৫ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. Despatch, ১ নং, ১২ই জানুয়ারি, ১৮৬০ ; ৮৫ নং, ২৬শে মে ১৮৬০।

৬ পাঞ্জাবের Lt. Governor, Sir R. Montgomery-র পক্ষ থেকে Lord Canning-এর প্রতি, ২৫শে এপ্রিল ১৮৬০, C. Wood-এর নিকট লেখা Canning-এর চিঠি উদ্ধৃত করে লেখা E I. Barrington-এর 'Servant of All', II, পৃষ্ঠা ২১। Wood-এর নিকট J. Wilson, ১১ই জুলাই ১৮৫৯, 'পূর্বোক্ত' পৃষ্ঠা ১৭১। J. Wilson-এর নিকট C. Wood, ২৬শে মার্চ ১৮৬০, 'পূর্বোক্ত' পৃষ্ঠা ২৩৮।

৭ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin., ১২২ নং, ২রা আগস্ট ১৮৬১। সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin., ১৭০ নং, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৬১।

৮ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin., ১৯৬ নং, ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৬১।

৯ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin., ৬৩ নং, ১৭ই মার্চ ১৮৬ ।

১০ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার Fin., ৬১ নং, ২৬শে মে ১৮৬৪।

১১ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin., ২২৭ নং, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৪।

ফিনান্স মেম্বার C. Trevelyan অপর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে অপরাপর ঔপনিবেশিক সরকারগুলি এ ধরনের নিয়ন্ত্রণের অধীন নয়। সেক্রেটারি অব স্টেট দেখান যে Rules and Regulations for Her Majesty's Colonial Service-এর ৩৪৬ এবং ৩৬৭ ধারা অনুসারে ঔপনিবেশিক সরকাগুলির (প্রতিনিধিত্বমূলক বিধানসভা যাদের নেই) উপর বাধা-নিষেধগুলি সমানভাবে কঠোর।

১২ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

১৩ যোগাযোগ ব্যবস্থায় দ্রুত উন্নয়নের একটি ফল হয়েছিল যে সংবাদপত্র ও ব্যবসায়ীরা প্রায়ই দ্রুত সংবাদ সংগ্রহ করতে পারতেন, অপরদিকে জবড়জং সরকারি যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক পিছনে পড়ে থাকত। Argyll-এর প্রতি Mayo, ১৩ই নভেম্বর ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪১, ৩১১ নং।

১৪ Lord Cranborne-র 'Hansard', তৃতীয় সিরিজ CXCIV, ১০৭৪; CXCVI, ৭০০। উদ্ধৃতি আছে A. B. Keith-এর 'A Constitutional History of India' (London, 1936), পৃষ্ঠা ১৬৮। Sir C. Ilbert-এর 'The Government of India' (Oxford, 1922), পৃষ্ঠা ১০৫।

১৫ Lord Canning-এর কাছে C. Wood, ৯ই জানুয়ারি ১৮৬১। Wood Papers, India Office Library, ভল্যুম ৬, পৃষ্ঠা ১৪, উদ্ধৃত C. H. Philips (সম্পাদক)-এর 'The Evolution of India and Pakistan 1858-1947 Select Documents' (London, 1962), পৃষ্ঠা ১১-১২।

১৬ B. Frere-র নিকট C. Wood, ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৬০। J. Martineau-র 'The Life and Correspondence of Sir Bartle Frere' (London, 1895), I, পৃষ্ঠা ৩৫৩।

১৭ এই-ই ছিল Canning ও Bartle Frere-এর সুচিন্তিত মত, তাঁদের কোন মতেই চরমপন্থী বলা চলে না। Sir C. Wood-এর নিকট B. Frere, ২২শে অক্টোবর ১৮৬০, 'পূর্বোক্ত', পৃষ্ঠা ৩৫৫; Sir C. Wood-এর নিকট Lord Canning, ২৪শে অক্টোবর ১৮৬০, 'পূর্বোক্ত', পৃষ্ঠা ৩৫৮।

১৮ Argyll-এর নিকট Mayo, ২২শে জুলাই ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪০, ২০৮ নং। Mayo মন্তব্য করেছিলেন যে যদিও প্রস্তাবটি চমৎকার, লেফটেনান্ট গভর্নর, গভর্নর ও বহু ধরনের প্রাক্তন-প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পাশে ২৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন জেলা অফিসারকে, যার জীবন তাঁবু ও গরম কাছারি ঘরে কেটেছে, তাকে বসানো আমার ধারণা খুবই বিরক্তিকর হবে······।"

১৯ J. Lawrence-এর কাছে S. Northcote, ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮।

Lawrence Papers, J. Lawrence-এর কাছে সেক্রেটারি অব স্টেট, ভল্যুম V, ৫ নং।

২০ কেম্ব্রিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক অর্থনীতির অধ্যাপক Henry Fawcett, M.P.-র 'Indian Finance' (London, 1880), পৃষ্ঠা ১১৫। ভারতীয় অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ এম.পি'দের অজ্ঞতার ব্যাপারে Northcote-র নিকট Mayo-র চিঠি দেখুন, ৩রা মার্চ ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৮, ৬১ নং।

২১ ১৮৬৮ সালের ৩১শে আগস্ট তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' মন্তব্য করেছিল যে ভারতের অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে বিতর্ক 'একটি তামাসা'; ১৮৬৮ সালের অর্থ-বিষয়ক বিবৃতির উপর বিতর্কের সময় ৬৩০ জন এম.পি-র মধ্যে ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন। 'The Englishman' (৩রা আগস্ট ১৮৭০) ঘোষণা করেছিল যে পার্লামেন্টে যেহেতু ভারতীয় অর্থ-বিষয়ক প্রশ্নাবলী উপেক্ষিত হচ্ছে, তাই ভারত শাসন ভারতেই করতে হবে। 'ভারতকে ভারতেই শাসন করতে হবে' এই আওয়াজ সর্বদাই জনপ্রিয় ছিল। (Friend of India, ১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৬২)।

২২ সব্যসাচী ভট্টাচার্যের 'Laissez Faire in India' দেখুন। The Indian Economic and Social History Review, ভল্যুম II, ১ নং, জানুয়ারি ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ১-২২।

২৩ তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখুন।

২৪ তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখুন।

২৫ S. Northcote-র নিকট Mayo, ১৬ই নভেম্বর ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪১, ৩১৫ নং।

২৬ পূর্বোল্লিখিত স্থানে 'Qui Hyes', অর্থাৎ 'কোই হ্যায়' অথবা আগেকার অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা তাদের চাকরদের কোই হ্যায় (কেউ আছে ?) বলে ডাকতে অভ্যস্ত ছিল।

২৭ Argyll-এর নিকট Mayo, ১৮ই জানুয়ারি ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪২, ২৪ নং।

২৮ S. Northcote-র নিকট Mayo, ১৬ই নভেম্বর ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪১, ৩১৫ নং।

২৯ O. T. Burne-র নিকট B. T[illegible] ২৭শে [illegible] Mayo Papers, বাণ্ডিল ৬১ (নম্বর উল্লেখ নেই)। ভারত সরকারের সদস্য ও কর্মচা[illegible] প্রতি সিলেক্ট কমিটিতে প্রশ্নাবলীর সুর "ছিল উদ্ধত ও আপ[illegible] ··Mr. F's (Fawcett's)-এর তথাকথিত প্রশ্নাবলীর অনেকগুলি কোন প্রশ্নই নয়, আসলে ভারত সরকারের প্রতি পরোক্ষ আঘাত !"

৩০ Mayo-র নিকট Argyll, ১৬ই ডিসেম্বর, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৮, ৩৪ নং।

৩১ B. Disraeli-র নিকট Mayo, ৯ই মে ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪১, ১০০ নং। Mayo-র নিকট Argyll, ৪ঠা মে ১৮৭[illegible] Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৯, ১০ নং।

৩২ Richard Temple-এর 'Men and Events of my time in India' (London, 1882), পৃষ্ঠা ১৮৭।

৩৩ Eliza Wilson-এর নিকট J. Wilson, ২১শে জুলাই ১৮৫৯ এবং Lord Canning-এর নিকট J. Wilson, ২৫শে আগস্ট ১৮[illegible]। E. Barrington-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, ভল্যুম II, পৃষ্ঠা ১৮১।

৩৪ এ. বি. রুদ্রের 'The Viceroy and Governor General of India' (O.U.P., 1940), পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫।

৩৫ Argyll-এর মতে Gladstone এবং Sir Charles Wood (Lord Halifax)-এর মতও ছিল একই। Mayo-র নিকট Argyll, [illegible] অক্টোবর ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৮, ২৬ নং।

৩৬ Mayo-এর নিকট Argyll, ১লা নভেম্বর ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৯, ১৯ নং।

৩৭ Lord Canning-এর নিকট B. Frere ১১ই জুন ১৮৬১, Martineau-র পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, I, পৃষ্ঠা ৩২৬-৭, Mayo-র মতও ছিল এই : "ইংল্যাণ্ড থেকে প্রেরিত ফিনান্স মেম্বাররা আমার মতে (একজন বাদে) কোন নিশ্চিত সাফল্য অর্জন করেন নি।" Argyll-এর প্রতি Mayo, ১৪ই জুলাই ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪০, ২০২ নং

৩৮ Sir C. C. Wood-এর নিকট B. Frere ২৩শে নভেম্বর ১৮৬০ Martineau-র পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, I, পৃষ্ঠা ৩১৩।

৩৯ ১[illegible]৬ই ফে[illegible] ১৮৬৮ "নতুন অর্থ মন্ত্রী" শীর্ষক সম্পাদকীয়।

৪০ পূর্বোল্লেখিত স্থানে দেখুন। ১৮৭২[illegible] 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রস্তাব করে যে একজন হিন্দুকে ফিনান্স [illegible] উচিৎ: "জনগণের অভ্যাস, তাঁদের উপায় উপকরণ কুসংস্কার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান যদি চান—অনুপযোগী, নিপীড়নমূলক ও নিষ্ফলা কর উদ্ভাবনের বিপদ কাটিয়ে তুলবে……" 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৭২।

৪১ Mayo-র নিকট Argyll, ১লা নভেম্বর ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৯, ১৯ নং।

কমন্স সভায় C. Wood-এর বক্তৃতা, ৯ই আগস্ট ১৮৫৯। 'Financial Statements relating to India……reprinted from Hansard's Parliamentary Debates' পৃষ্ঠা ২৮১।

৪৩ ভারত সরকারের প্রতি সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin., ৯৬ নং, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৫৯।

৪৪ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin., ৮৩ নং, ৮ই জুন ১৮৬২।

৪৫ Sir W. Mansfield-এর নিকট Mayo, ১১ই মার্চ ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৪, ৮৯ নং।

Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬৮, Sep. Rev. ৩২ নং, W. R. Mansfield-এর তৈরি Minute, ২৮শে আগস্ট ১৮৬৮।

৪৭ Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৮, Accts. নং ৮২, W. R. Mansfield-এর তৈরি Minute, ৫ই এপ্রিল ১৮৬৮।

৪৮ Argyll-এর নিকট Mayo, ৯ই জানুয়ারি ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৭, ১৩ নং।

৪৯ ১৮৬১ সালের ১লা আগস্ট 'Friend of India' পত্রিকায় "The Council becomes a Cabinet" শীর্ষক সম্পাদকীয় দেখুন।

৫০ J. Lawrence-এর নিকট Northcote, ৯ই জানুয়ারি ১৮৬৮, Lawrence Papers, সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছ থেকে চিঠিপত্র, ভল্যুম V, ১ নং।

৫১ J. Lawrence-এর নিকট Northcote, ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮,

Lawrence Papers, সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছ থেকে চিঠিপত্র, ভল্যুম V, ৫ নং।

৫২ Sir Courtenay Ilbert-এর 'The Government of India' (London, 1922), পৃষ্ঠা ৯০-৯২।

৫৩ তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষে দেখুন।

৫৪ Sir C. Wood-এর নিকট Bartle Frere, ১০ই এপ্রিল ১৮৬১, Martineau-র পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, I, পৃষ্ঠা ৩৩৬।

৫৫ B. Frere-এর নিকট Sir C. Wood, ৯ই জুন ১৮৬১ ও ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ Martineau কর্তৃক পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থে উদ্ধৃত, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ৩৩০-৩৩৬। মহীশূরের রাজাদের অর্থ মঞ্জুরের ব্যাপারে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে সমালোচনা সরকারকে বিব্রত করেছিল। L. C. Progs. (old series), ভল্যুম VI, ১৮৬০, পৃষ্ঠা ১৩৪৩-১৪০২।

৫৬ C. Wood-এর নিকট B. Frere, ১০ই এপ্রিল ১৮৬১, Martineau পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, I, পৃষ্ঠা ৩৩৬।

৫৭ B. Frere-এর নিকট C. Wood, ১৭ই আগস্ট ১৮৬১ Martineau পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, I, পৃষ্ঠা ৩৪৩।

৫৮ "আইন প্রণয়নের জন্য গভর্নর-জেনারেলের পরিষদে অতিরিক্ত লোক নিয়ে বাড়ানো হয়েছিল, ৬ জনের কম নয় এবং ১২ জনের বেশি নয় এমন সংখ্যক সদস্যকে গভর্নর-জেনারেল ২ বছরের মেয়াদে মনোনীত করতেন। এই অতিরিক্ত সদস্যদের ন্যূনপক্ষে অর্ধেক নিতে হত বেসরকারী লোক, অর্থাৎ যাঁরা রাজার বেসামরিক বা সামরিক কাজে নিযুক্ত নন এমন লোকেদের মধ্যে থেকে।" C. Ilbert পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১০০।

৫৯ C. Ilbert পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১০০।

৬০ C. Trevelyan-এর Minute, ২০শে মার্চ ১৮৬০, P.P.H.C. ১৮৬০, ভল্যুম ৪৯, পৃষ্ঠা ১১২। এখানে এ কথা উল্লেখ করা উচিত যে Trevelyan India Council Act ১৮৬১ গৃহীত হবার আগেকার পরিস্থিতি সম্পর্কে বলেছিলেন।

৬১ "জনমত (Public Opinion)" সম্পর্কে পরিচ্ছেদটির শেষে দেখুন।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৬০, ৬ই মার্চ ১৮৬৮, ৬ই এপ্রিল ১৮৬৮, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭০, ১১ই জুলাই ১৮৭০, ১০ই এপ্রিল ১৮৭১, 'সোম প্রকাশ' ৯ই মার্চ ১৮৬৮, R.N.P. (Bengal) ১৮৬৮, পৃষ্ঠা ১০২, 'জাম-ই-জামশেদ' ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯, ১০ই মার্চ ১৮৬৯, R.N.P. (Bombay) ১৮৬৯, পৃষ্ঠা ৯৪, ১৩৩। Fin. Progs. জুলাই ১৮৬০, ২৬ নং। ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েশনের সেক্রেটারি, ২২শে মে ১৮৬০, Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৮, ৩৪ নং, বাংলা সরকারের সেক্রেটারির নিকট ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েশনের সেক্রেটারি, ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮, 'পূর্বোক্ত' ৩৫ নং, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েশনের দরখাস্ত, ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮।

৬২ Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৭, "Rev নং ২১" সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, ২০শে এপ্রিল ১৮৬৭।

৬৩ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

৬৪ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. Despatch ৯৬ নং, ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৯।

৬৫ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. Despatch ২৬শে নভেম্বর ৮৫৯, ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ৩৩ নং, ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬০।

৬৬ Home Progs. Public ১১ই মার্চ ১৮৬১, ৫৫ নং, ভারত সরকারের প্রস্তাব, ১১ই মার্চ ১৮৬১।

৬৭ Home Progs. Public ১১ই মার্চ ১৮৬২, ৭ নং, ভারত সরকারের প্রস্তাব, ১১ই মার্চ ১৮৬১।

৬৮ Home Progs. Public ৬ই নভেম্বর ১৮৬৩, ১৪ নং, "স্ট্যাম্প" ও "বহিঃশুল্ক" শাখাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য হোম সেক্রেটারির উপর নির্দেশ বাতিল করে ১৮৬২ সালের মার্চ মাসের নির্দেশাবলী।

৬৯ পূর্বোল্লেখিত স্থানে। ১৮৬৪ সালের সেপ্টেম্বরের আগে কয়েকটি প্রদেশ যথা পাঞ্জাব, অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশসমূহ, ব্রিটিশ বার্মা এই পরিবর্তিত আইনের আওতায় পড়ে নি। স্বরাষ্ট্র দপ্তর আগের মতই ডাকঘর, তারবার্তা ও ভূমি রাজস্ব বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে।

৭০ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin., ১নং, ৮ই জানুয়ারি ১৮৬৩ ; সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Mily Despatch ১৩২ নং, ১৯শে মার্চ ১৮৬৪।

৭১ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin., ১১৬ নং, ৩০শে জুন ১৮৬৪।

৭২ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin., ১৬১ নং, ৩০শে জুন ১৮৬৫।

৭৩ Home Progs. Public ডিসেম্বর ১৮৬৭, ৭৮ নং, H. W. Norman, সামরিক সেক্রেটারির Minute, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৭।

৭৪ Home Progs. Public ডিসেম্বর ১৮৬৭, ৬০ নং, স্বরাষ্ট্র দপ্তরে সেক্রেটারি E. C. Baley-র নোট।

৭৫ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin., ৯৬ নং, ১৫ই এপ্রিল ১৮৬৫।

৭৬ Home Progs. Public ডিসেম্বর ১৮৬৭, ৬২ নং, পূর্তকর্ম দপ্তরের সেক্রেটারি Col. C. H. Dickens-এর নোট, ২১শে নভেম্বর ১৮৬৭।

৭৭ Argyll-এর নিকট Mayo, ৬ই এপ্রিল ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৯, ১০০ নং। ঐ একই ২২শে জুলাই ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪০, ২০৮ নং।

৭৮ Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬১, Exp., ৮১ নং, অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারি E. H. Lushington-এর নোট, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫। 'Friend of India' ১৫ই মে ১৮৬২।

৭৯ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin, ৫৫ নং, ২০শে মার্চ ১৮৬৫। ১৮৬২ থেকে ১৮৬৫ সালের মধ্যে মাত্র একজন শিক্ষানবিশ অর্থ দপ্তরে নিযুক্ত হয়েছিলেন। Fin. Progs. এপিল ১৮৬৫, Exp., ৮১ নং, অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারির নোট, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫।

৮০ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin., ১৪১ নং, ১৬ই জুন ১৮৬৫।

৮১ Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৫, Exp., ৮২ নং, E. H. Foster-এর নোট, ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫।

৮২ Edward Hughes-এর "Sir Charles Trevelyan and Civil Service Reforms 1853-55". 'The English Historical Review' ভল্যুম LXIV, ১৯৪৯, পার্ট I, পৃষ্ঠা ৫৩ ; পার্ট II, পৃষ্ঠা ২০৬। Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৫, Exp., ৮৩ নং, C. E. Trevelyan-এর Minute, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫।

৮৩ 'পূর্বোক্ত' ৮১ নং, অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারি, E. H. Lushington-এর নোট, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫।

৮৪ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

৮৫ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

৮৬ Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৫, Exp., ৮৩ নং, C. E. Trevelyan-এর Minute, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫।

৮৭ B. Frere-এর নিকট Mayo, ৬ই ডিসেম্বর ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৭, ৩৪৫ নং ; Argyll-এর নিকট Mayo, ২রা অক্টোবর ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৭, ২৬৫ নং।

৮৮ Fin. Progs ১৭ই আগস্ট ১৮৬০, Accts. নং ৯৫(এ)।

৮৯ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

৯০ W. Begehot-এর নিকট J. Wilson, ১৯শে জুলাই ১৮৬০, 'Literary Studies, (London, 1879)-এর ভল্যুম I, ৪০১ পৃষ্ঠায় W. Bagehot কর্তৃক উদ্ধৃত। বিদ্রোহ পুরাণ ব্যবস্থাটির অর্থ-বিষয়ক দুর্বলতা উদ্ঘাটিত করেছে এবং দেখিয়েছে যে "বিশেষতঃ সামরিক বিভাগে একটি বোধগম্য ও দূরদর্শী, ভবিষ্যতের খরচ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য হিসাব প্রণয়নের দিকে সামান্যই অগ্রগতি হয়েছে······খরচের হার যখন প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছিল, এই আনুমানিক হিসাবগুল (১৮৬০ সালের পূর্বের আনুমানিক হিসাব) তার ফলস্বরূপ সর্বদাই ভুল হত এবং বিদ্রোহ জনিত সাধারণ বিশৃঙ্খলা দ্বারা এই ভুল আরও বেড়ে গিয়েছিল।" সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin., ১৫২ নং, ৯ই জুলাই ১৮৬১।

৯১ Fin. Progs. ডিসেম্বর ১৮৬০। মাদ্রাজের গভর্নর C. E. Trevelyan-এর Minute, ১২ই মে ১৮৬০। Trevelyan তাঁর ২৫শে মে ১৮৫৯ এবং ১৩ই জুলাই ১৮৫৯ তারিখে লেখা Minute-এ

ভারতীয় অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে ইংল্যাণ্ডের বাজেট ব্যবস্থা প্রয়োগের জন্য প্রস্তাব করেছিলেন ; বৃটিশ ট্রেজারির কাজে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থাকার দরুণ Trevelyan Wilson-এর মতই ইংল্যাণ্ডের অর্থ-বিষয়ক ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

৯২ Fin. Progs. ৪ঠা মে ১৮৬০, ১৩ নং, অর্থ দপ্তরে ভারত সরকারের প্রস্তাব, ৭ই এপ্রিল ১৮৬০।

৯৩ 'পূর্বোক্ত'।

৯৪ 'পূর্বোক্ত' Fin. Progs. ৪ঠা মে ১৮৬০, ১৪ নং, ফিনা সেক্রেটারির নিকট অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেলের স্মারকলিপি।

৯৫ Fin. Progs. ১১ই মে ১৮৬০, ২১ নং, ভারত সরকারের প্রস্তাব, ১১ই মে ১৮৬০।

৯৬ Fin. Progs. ১৮ই আগস্ট ১৮৬০, ৯৩(এ) নং, বাজেট কমিটির কাছ থেকে রিপোর্ট, ৩০শে জুলাই ১৮৬০।

৯৭ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

৯৮ 'পূর্বোক্ত' অর্থ-বিষয়ক দপ্তরে ভারত সরকারের প্রস্তাব, ১৮ই আগস্ট ১৮৬০। সারা ভারতে হিসাব-পরিক্ষকরা (Auditors) প্রাথমিক পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব পরীক্ষা করবেন এবং অডিটর-জেনারেল চূড়ান্ত অর্থ গ্রহণের হিসাব পরীক্ষা করবেন, স্থানীয় হিসাব-রক্ষকরা (Accountants) হিসাবের পরীক্ষা করা ও সমন্বয় করার জন্য দায়ী থাকবেন, তা ছাড়া তাঁদের দায়িত্ব হল হিসাবের চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য অডিটর-জেনারেলের নিকট রিটার্ন পেশ করা। বেসামরিক হিসাব-পরীক্ষকরা তাঁদের নিজ নিজ স্থানীয় সরকারের পে-মাস্টার নিযুক্ত হবেন এবং কয়েকটি ট্রেজারির প্রয়োজন মেটাবার জন্য তহবিলের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করবেন। প্রত্যেকটি পে-মাস্টার অর্থ দপ্তরের নিকট দায়ী থাকবেন এবং প্রত্যেকটি ব্যয় নির্বাহ করার অফিসার বা দপ্তর পে-মাস্টারের কাছে দায়ী থাকবেন।

৯৯ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin., ১৪০ নং, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৬০।

১০০ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin., ২০৮ নং, ২০শে অক্টোবর ১৮৬০ ; ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব

স্টেট, Fin., ৫২ নং, ৮ই এপ্রিল ১৮৬১।

১০১ Fin. Progs. ১৪ই নভেম্বর ১৮৬০। বাজেট কমিটির পক্ষ থেকে রিপোর্ট (ষষ্ঠ), ২৭শে অক্টোবর ১৮৬০। অর্থ-বিষয়ক দপ্তরে ভারত সরকারের প্রস্তাব, ১৫ই নভেম্বর ১৮৬০। ভারতীয় হিসাব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমিত হিসাবের 'ফর্ম' যেখানে পরিবর্তন করা হয়েছিল, সেখানে সেক্রেটারি অব স্টেটের বিরোধিতার জন্য হিসাব পেশ করার 'ফর্মের' কোনও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো যায় নি, বিগত বছরের হিসাবের অঙ্কের সঙ্গে যাতে তুলনা করা যায়, তার জন্য সেক্রেটারি অব স্টেট চেয়েছিলেন যতদূর সম্ভব ব্যয়ের খাতগুলির শ্রেণী বিভাজন ব্যবস্থা বজায় রাখতে। সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin., ১৭১ নং, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৮৬১। ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin., ৬৮ নং, ৮ই মে ১৮৬২ এবং Fin., ৩১ নং, ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩। ১৮৬০ সাল থেকে Government of India Act 1858-এর ধারা অনুযায়ী হিসাব পেশ করা ছাড়াও স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট আনুমানিক ও প্রকৃত রাজস্ব ও ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করে নিয়মিত একটি সরকারী বার্তা প্রেরণ করতেন, পার্লামেন্টে যেভাবে হিসাবের রিটার্ন পেশ করা হত, সেভাবে ঐ বার্তা প্রকাশ করা হত না। সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin., ৮০ নং, ৪ঠা এপ্রিল ১৮৬০।

১০২ একটি মত ছিল যে এটাই ছিল সুবিধাজনক, কারণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু জনিত বর্ষাকাল আরম্ভ হবার ফলে এপ্রিল মাসের শেষে জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত সময় শেষ হয়ে যেতো।

১০৩ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin., ২২৩ নং, ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৭০।

১০৪ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin., ৮৯ নং, ১৯শে এপ্রিল ১৮৬৬।

১০৫ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin., ১৫৪ নং, ২৫শে জুন ১৮৬৮ ; ভারত সবকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin., ৪৩১ নং, ১৪ই জুন ১৮৬৯ ; সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত

সরকার, Fin., ৮৭ নং, ২৯শে মার্চ ১৮৭০।

১০৬ আর্থিক বছরকে "প্রাকৃতিক বছরের সঙ্গে সমকালীন" করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলার সময় Argyll সম্ভবতঃ ফসল কাটার কালের কথাই বলেছিলেন। Mayo-র নিকট Argyll, ৯ই আগস্ট ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৮, ২৩ নং।

১০৭ Fin. Progs. জুন ১৮৬৫, Accts. ৮৩ নং। ভারত সরকারের অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে হিসাব-পরীক্ষক ও ভারতের অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেল এবং স্থানীয় হিসাব-রক্ষকদের নিকট প্রেরিত সার্কুলার, ৯ই জুন ১৮৬৫।

১০৮ Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৬৯, Accts. নং ১৪, অধীনস্থ সকল সরকারের সকল অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেলের নিকট অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারি E. H. Lushington, ১৪ই জানুয়ারি ১৮৬৯, Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬৯, Accts. নং ৪৬। সকল অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেলদের নিকট ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সার্কুলার, ২১শে অক্টোবর ১৮৬৯। যে বছরের জন্য বাজেট রচিত হবে তার আগের বছরের আর্থিক বছরের ১লা জানুয়ারির মধ্যে স্থানীয় কোনও সরকারের পক্ষ থেকে যদি ভারত সরকারের নিকট আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব না পৌঁছত তবে ভারত সরকারের অর্থ দপ্তর নিজেই সেই সরকারের বাজেট তৈরি করত।

১০৯ স্থানীয় অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেলদের কাজ ছিল বাজেট বরাদ্দ থেকে বিচ্যুতি নিরোধ করা ও তা সর্বোচ্চ সরকারের গোচরে আনা। Fin. Progs. মে ১৮৬৯, Accts. নং ৫৫। সকল অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেলদের নিকট ভারত সরকারের অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারি, ২৫শে মে ১৮৬৯।

১১০ Fin. Progs. মে ১৮৬৯ Sep. Rev. ৩৪ নং, সকল স্থানীয় সরকারের প্রধানদের প্রতি ভারতের গভর্নর-জেনারেল, ১৩ই মে ১৮৬৯।

১১১ Fin. Progs. মে ১৮৬৩, ১৫ নং, ভারত সরকারের অডিটর-জেনারেলের নিকট অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারি, ৬ই মে ১৮৬৩।

১১২ Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৮, Accts. নং ২৬, কণ্ট্রোলার জেনারেল অব অ্যাকাউন্টসের স্মারকলিপি, ২৫শে মার্চ ১৮৬৭।

১১৩ Fin. Progs. মার্চ ১৮৬৩, Miscell. ১ নং, C. E. Trevelyan-এর Minute, ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin., ৩২ নং, ৪ঠা মার্চ ১৮৬৩। ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin., ১৩১ নং, ২৫শে জুলাই ১৮৬৩।

১১৪ Fin. Progs. মে ১৮৬৫, Accts. নং ১১৩, অর্থ-বিষয়ক দপ্তরে ভারত সরকারের প্রস্তাব, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৫। Fin. Progs. জুন ১৮৬৫, Exp. নং ২৪৬, অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারির নিকট M. H. Foster, ২৭শে মে ১৮৬৫; ১৮৬৬ সালে রেলপথে হিসাব-পরীক্ষায় একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের রেলপথের হিসাব-পরীক্ষক হিসাবে ৩ জন Royal Engineer Officers (সহকারীদের একটি স্টাফসহ) নিযুক্ত হয়েছিল, চূড়ান্ত হিসাব পরীক্ষা করা হত কেন্দ্রীয় পূর্তকর্ম বিভাগে ও অর্থ দপ্তরে। সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin., ২১৫ নং, ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৬। ১৮৬৭ সালে রেলপথের অর্থ গ্রহণের হিসাব পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল। সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin., ৯ নং, ৮ই জানুয়ারি ১৮৬৭। রেল-পথের হিসাব পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করার প্রয়াসে Mayo সফল হন নি। সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin., ৭৫ নং, ২৯শে এপ্রিল ১৮৭১।

১১৫ Bartle Frere-এর নিকট Mayo, ৬ই ডিসেম্বর ১৮৬৯। Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৭, ৩৪৫ নং।

১১৬ ৩ ও ৪ Will IV, Cap. ৮৫, অংশ ৫৯।

১১৭ ১৮০৪ সালের Regulation V, অংশ ২৩।

১১৮ W. Bagehot-এর নিকট J. Wilson, ১৯শে জুলাই ১৮৬০, Barrington-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, II, পৃষ্ঠা ৩০৩।

১১৯ Fin. Progs. ৮ই মে ১৮৬১, ৭ নং; ২৩শে জুলাই ১৮৬১, ১৫৮ নং Home Progs. ৩১শে অক্টোবর ১৮৬২, Public(B) ২১১-১৩ নং।

১২০ ২৪ ও ২৫ Vict. Cap. ৬৭, অংশ ৪২।

১২১ 'Friend of India' ২রা মে ১৮৬১।

১২২ Fin. Progs. ডিসেম্বর ১৮৬০, পৃষ্ঠা ৩০৮৯, Sir C. E.

Trevelyan-এর Minute, ১৩, জনুলাই ১৮৫৯।

১২৩ Fin. Progs. ডিসেম্বর ১৮৬০, Accts. নং ২, Sir C. E. Trevelyan-এর Minute, ১২ই মে ১৮৬০।

১২৪ পন্বের্বাল্লেখিত স্থানে।

১২৫ J. Wilson-এর নিকট Canning, ২৩শে এপ্রিল ১৮৬০, Barrington-এর পন্বের্বাল্লেখিত গ্রন্থ, ভল্যুম II, পৃষ্ঠা ২৬৩।

১২৬ J. Wilson-এর নিকট Canning, ২৪শে জনুলাই ১৮৬০, Barrington-এর পন্বের্বাল্লেখিত গ্রন্থ, ভল্যুম II, পৃষ্ঠা ৩০১।

১২৭ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin., ৭৪ নং, ১০ই মে ১৮৬০।

১২৮ Fin. Progs. ১৬ই মার্চ ১৮৬১, Accts. নং ১৯৮-২০৪।

১২৯ Fin. Progs ১৬ই মার্চ ১৮৫১, Accts. নং ১৯৭, বাংলা সরকারের সেক্রেটারির নিকট ভারত সরকারের অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারি C. H. Lushington, ১৬ই মার্চ ১৮৬১।

১৩০ পি. এন. ব্যানার্জির 'Provincial Finance in India' (London, 1929), পৃষ্ঠা ২৩-৭। এই বইয়ে J. F. Finlay কর্তৃক সংগৃহীত দলিলগুলি থেকে অংশ-বিশেষ (History of Provincial Financial Arrangements, Calcutta 1887) অবিকলভাবে দেওয়া হয়েছে।

১৩১ Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬৭, Accts. নং ২২, গভর্নর, লেফটানাণ্ট গভর্নরবৃন্দ ও চিফ্ কমিশনারবৃন্দের নিকট W. N. Massey, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬।

১৩২ 'পূর্বোক্ত' Accts. নং ২২, W. N. Massey-র নিকট C. Beadon, ৮ই মার্চ ১৮৬৭

১৩৩ 'পূর্বোক্ত' বোম্বাই'র গভর্নর B. Frere, Minute ১৫ই নভেম্বর ১৮৬৬।

১৩৪ 'পূর্বোক্ত' W. N. Massey-র নিকট উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির গভর্নর E. Drummond, ৮ই মার্চ ১৮৬৬, মাদ্রাজের গভর্নর W. T. Denison-এর Minute, ২৩শে মার্চ ১৮৬৬।

১৩৫ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin., ২০৯ নং, ১৯শে

সেপ্টেম্বর ১৮৬৭।

১৩৬ John Lowrence-এর প্রতি W. N. Massey, ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬, ঐ একই ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬, Lawrence Papers কাউন্সিলের সদস্যদের পক্ষ থেকে চিঠিপত্র, ভল্যুম ২, ১৮৬৬, ৮ ও ৮(এ) নং।

১৩৭ Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬৭, Accts. নং ২৩, Col. R. Strachey-র নোট, ১৭ই আগস্ট ১৮৬৭।

১৩৮ এই ধরনের বিরোধের একটি উদাহরণ হল বোম্বাইতে পূর্তকর্মের ব্যয়ের প্রশ্নে বোম্বাইর'র গভর্নর B. Frere ও গভর্নর-জেনারেলের পরিষদের C. Trevelyan-এর মধ্যে ১৮৬৪ সালে বহুল প্রচারিত ঝগড়া। সে সময়ে সেক্রেটারি অব স্টেট, Sir Charles Wood মন্তব্য করেছিলেন: "আমি মনে করি যে আর্থিক ব্যাপারে ভারত সরকারকে অবশ্যই কঠোর 'সাধারণ' নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে।" কিন্তু সর্বত্র নগণ্য কাজের খুঁটিনাটির মধ্যে নিজেকে সে কখনই হারিয়ে ফেলবে না। J. Lawrence-র নিকট C. Wood, ১৭ই অক্টোবর ১৮৬৪, Lawrence Papers, Letters from Secretary of State, ভল্যুম ১, ৫৬ নং। তা সত্ত্বেও বর্তমান আইনকানুনের আমলে সর্বোচ্চ সরকার কর্তৃক প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী।

১৩৯ Home Progs. ডিসেম্বর ১৮৬৭, Public, ৬২ নং, পূর্তকর্ম দপ্তরের সেক্রেটারি C. H. Dickens-এর নোট, ২১শে নভেম্বর ১৮৬৭। আইনের বিধান অনুসারে স্থানীয় সরকারগুলিকে ব্যয়ের ক্ষুদ্রতম বিষয়টির জন্যও স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেলের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হত; বাজেট ও হিসাব পরীক্ষার নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার আগে সঙ্কলিত এই সব নিয়মাবলী একসময়ে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হিসাবে কাজে লাগাত। কিন্তু পরে একটা বাজে ঝঞ্ঝাট হয়ে উঠেছিল।

১৪০ Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬৭, Accts. নং ২৩, Col. R. Strachey-র নোট, ১৭ই আগস্ট ১৮৬৭।

১৪১ প্রাদেশিক সরকারগুলিকে রাজস্বের যে অংশ হস্তান্তরিত করা হত তার অনুপাত ছিল নিম্নরূপ: ভূমি রাজস্বের এক-ষষ্ঠাংশ, সংগৃহীত

আয়করের এক-চতুর্থাংশ, লাইসেন্স করের এক-চতুর্থাংশ। Strachey পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থানীয় সরকারের উপর যে ব্যয় বর্তাত তার মোট পরিমাণ দাঁড়াত ৫৬ লক্ষ পাউণ্ড, এবং রাজস্বের যে অংশ তাদের দেওয়া হত তার মোট পরিমাণ দাঁড়াত ৮৮ লক্ষ পাউণ্ড। ফলে প্রায় ১২ লক্ষ পাউণ্ড স্থানীয় পূর্তকর্মের জন্যছাড়া থাকত।

১৪২ Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬৭, Accts. নং ২৬, W. N. Massey-র স্মারকলিপি, ১৭ই আগস্ট ১৮৬৭।

১৪৩ Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৭, Accts. নং ৩৬, ভারত সরকারের অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারির নিকট মধ্যপ্রদেশগুলির চিফ কমিশনারের সেক্রেটারি ২২শে অক্টোবর ১৮৬৭, 'পূর্বোক্ত' ৩৯ নং, ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির লেফটেন্যান্ট গভর্নরের Minute, ২১শে নভেম্বর ১৮৬৭। 'পূর্বোক্ত' ব্রিটিশ বার্মা, অযোধ্যা ও পাঞ্জাবের সরকারগুলির পক্ষ থেকে চিঠিপত্র, নং ৪০, ৪৪ ও ৪৫। অধিকাংশ স্থানীয় সরকারগুলির অভিমতে পরিকল্পনাটি ছিল সঠিক রাস্তায় একটি পদক্ষেপ কিন্তু তা যথেষ্ট অগ্রসর হতে পারে নি।

১৪৪ Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬৭, Accts. নং ১৪, H. M. Durand-এর Minute, ৭ই অক্টোবর ১৮৬৭।

১৪৫ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

১৪৬ Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৮, Accts. নং ৪৮, Fort St. George-এর পরিষদের সভাপতির Minute, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮।

১৪৭ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

১৪৮ Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬৭, Accts. নং ৭৩, গভর্নর-জেনারেলের Minute, ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৭।

১৪৯ Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬৭, Accts. নং ৭৩, গভর্নর-জেনারেলের Minute, ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৭।

১৫০ Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৮, Accts. নং ৪৮, Fort St. George-এর সরকারের চিফ সেক্রেটারির নিকট বোর্ড অব রেভিনিউ-র সেক্রেটারি, ২৭শে জানুয়ারি ১৮৬৮।

১৫১ S. Fitzgerald-এর নিকট Mayo, ২০শে আগস্ট ১৮৭০, Mayo

Papers, বাণ্ডিল ৪০, ২৩৯ নং।

১৫২ W. Arbuthnot-এর নিকট Mayo, ১৫ই মার্চ ১৮৭৮, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪২, ৬৮ নং।

১৫৩ W. Arbuthnot-এর নিকট Mayo, ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৮, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৩, ৬ নং।

১৫৪ Argyll-এর নিকট Mayo, ৩১শে জানুয়ারি ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৪, ২৩ নং।

১৫৫ B. Frere-এর নিকট Mayo, ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৭, ৩৪৫ নং।

১৫৬ Sir S. Fitzgerald-এর নিকট Mayo, ১৫ই নভেম্বর ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৭, ৩১৩ নং।

১৫৭ Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৭১ Accts. নং ২২, গভর্নর-জেনারেলের Minute, ২৩শে জুন ১৮৭০।

১৫৮ Merchistoun-এর Lord Napier-এর নিকট Mayo, ১৩ই মার্চ ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৫, ৭৪ নং।

১৫৯ Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৭১, Accts. নং ২২, গভর্নর-জেনারেলের Minute, ২৩শে জুন, ১৮৭০।

১৬০ S. Fitzgerald-এর নিকট Mayo, ৫ই জানুয়ারি ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪২, ১০ নং।

১৬১ H. Durand-এর নিকট Mayo, ২৯শে এপ্রিল ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৯, ১০৭ নং।

১৬২ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

১৬৩ Sir W. Muir-এর নিকট Mayo, ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪০, ২৫৫ নং।

১৬৪ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

১৬৫ Argyll-এর নিকট Mayo, ১০ই এপ্রিল ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৩, ৯১ নং।

১৬৬ Temple প্রস্তাব করেছিলেন (১৮৬৮ সালের ৭ই নভেম্বরের Minute) যে সামাজিক ব্যয়ের জন্য বর্তমান ব্যবস্থা অনুসারে দেয় অর্থ মজুদ রেখে মাদ্রাজ ও বোম্বাই সরকারের বাকি রাজস্ব ও ব্যয় নিজেদের

এক্তিয়ারে খরচ করতে দেওয়া উচিত। দপ্তর খরচের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হবে, কিন্তু উচ্চতর মজুরি ও বেতনের সাধারণ স্কেলের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে। বস্তুতঃ এই পরিকল্পনাটির অর্থ হল রাজস্বের এক-ষষ্ঠাংশ প্রেসিডেন্সি সরকারগুলির হাতে দেওয়া হবে (ভারত সরকারের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে) এবং রাজস্বের পাঁচ-ষষ্ঠাংশের উপর ভারত সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে।

১৬৭ Argyll-এর নিকট Mayo, ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৪, ২৪ নং।

১৬৮ Argyll-এর নিকট Mayo, ১৯শে আগস্ট ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪০, ২৩৭ নং।

১৬৯ Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৭১, Accts নং ১১, গভর্নর-জেনারেলের Minute, ২৩শে জুন ১৮৭০। 'পূর্বোক্ত' ২৫ নং ও পরবর্তী। স্থানীয় সরকারগুলির নিকট অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারি R. B. Chapman-এর পক্ষ থেকে চিঠিপত্র, ১৭ই আগস্ট ১৮৭০। 'পূর্বোক্ত' ৪৮ নং, স-পারিষদ গভর্নর-জেনারেলের প্রস্তাব, ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৭০। পূর্বোক্ত ৪৯ নং, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin., ২৬১ নং, ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৭০। এই পরিকল্পনা প্রস্তুত করার কাজে Temple এবং John Strachey (Richard Strachey-এর ভ্রাতা) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। 'পূর্বোক্ত' ২০ নং, Temple-এর Minute, ২৩শে জুন ১৮৭০; 'পূর্বোক্ত' ২১ নং, J. Strachey-র Minute, ১৫ই জুলাই ১৮৭০।

১৭০ প্রথমে Mayo প্রস্তাব করেছিলেন (Minute, ২৩শে জুন ১৮৭০) যে, যেসব বিভাগ প্রাদেশিক সরকাগুলির হাতে দেওয়া হয়েছে তার ব্যয় নির্বাহের জন্য আবগারি শুল্ক তাদের দিয়ে দেওয়া হোক, কিন্তু পরবর্তীকালে এই বিষয়টি পরিত্যক্ত হয়। ১৮৭১-৭২ সালের পর থেকে সাম্রাজ্যিক বাজেটে "প্রাদেশিক কাজের" জন্য এককালীন মজুরির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৪৬ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭১১ পাউণ্ড। প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে এই অর্থ নিম্নরূপে ভাগ হত: বাংলা ১১,৬৮,৫৯২ পাউণ্ড; বোম্বাই ৮,৮০,০৭৫ পাউণ্ড; মাদ্রাজ ৭,৩৯,

৪৮৮ পাউণ্ড ; পাঞ্জাব ৫,১৬,২২১ পাউণ্ড ; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ ৬,৪০,৭৯২ পাউণ্ড ; বার্মা ২,৭৭,৩৩২ পাউণ্ড ; মধ্যপ্রদেশসমূহ ২,৬১,২৬৩ পাউণ্ড ; অযোধ্যা ২,০৫,৯৪৮ পাউণ্ড। বিভিন্ন প্রদেশে পূর্ববর্তী আর্থিক বছরে অর্থাৎ ১৮৭০-৭১ সালে একই কাজের জন্য যা খরচ হয়েছিল তার ভিত্তিতে বরাদ্দের অনুপাত স্থির করা হয়েছিল। ১৮৭১-৭২ সালের এই সব কাজের জন্য মোট বরাদ্দ পূর্ববর্তী বছরের খরচের পরিমাণ থেকে কম ছিল। এইভাবে সাম্রাজ্যিক রাজস্বে ৩,৩০,৮০০ পাউণ্ড বাঁচানো হয়েছিল। Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৭১, Accts নং ৪৮, ভারত সরকারের প্রস্তাব ১৪ই, ডিসেম্বর ১৮৭১।

১৭১ ভবিষ্যতে বর্দ্ধিত ব্যয় মেটাবার জন্য অধিকতর তহবিল মঞ্জুর এবং রাজস্বের প্রসারমান কয়েকটি উৎসকে হস্তান্তরিত করার বাঞ্ছনীয়তার কথা মাদ্রাজ, বোম্বাই ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের সরকারগুলি বিশেষ করে বলেছিল। Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৭১, Accts. নং ৩১, অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারির নিকট Fort St. George-এর সরকারের সেক্রেটারি, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৭০ ; 'পূর্বোক্ত' ৪০ নং, বোম্বাই সরকারের Minute, ১লা অক্টোবর ১৮৭০ ; 'পূর্বোক্ত' ৩৩ নং, অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারির নিকট উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের সেক্রেটারি, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭০। বাংলা ও পাঞ্জাবের লেফটেনাণ্ট গভর্নররা হস্তান্তরিত কাজগুলির ব্যয় নির্বাহের জন্য নতুন স্থানীয় কর প্রচলনের অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছিলেন। 'পূর্বোক্ত' ৪৫ নং, বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্নরের Minute, ২৫শে নভেম্বর ১৮৭০ ; 'পূর্বোক্ত' ৪৩ নং, পাঞ্জাবের লেফটেনাণ্ট গভর্নরের Minute, ২২শে নভেম্বর ১৮৭০ ও ১০ই জুন ১৮৭০। তৎসত্ত্বেও প্রাদেশিক সরকারগুলি পরিকল্পনাটি সামগ্রিকভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে মেনে নিয়েছিল।

১৭২ Marchistoun-এর Napier-এর নিকট Mayo, ৪ঠা জানুয়ারি ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪২, ৭ নং।

১৭৩ Mayo-এর নিকট Argyll, ৩রা মার্চ ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৯, ৫ নং।

১৭৪ প্রাদেশিক অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে যেহেতু আমরা আলোচনা

করছি না, তাই আমাদের এখানে স্থানীয় করের ইতিহাসের মধ্যে ঢোকার প্রয়োজন নেই। নগর শুল্ক (J. Strachey-র নিকট Mayo-র চিঠি দেখুন, ২০শে নভেম্বর ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪১, ৩২১ নং) এবং গৃহ কর ('ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট' ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭১ দেখুন) বোম্বাইতে জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় ছিল। 'The Times of India'-র সম্পাদকের নিকট (Indian Economist'-এর ১৮৭৩ সালের ২১শে অক্টোবর সংখ্যায় ৬৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) J. S. Mill-এর চিঠিটি (তারিখ ২৬শে আগস্ট ১৮৭১) খুবই আগ্রহোদ্দীপক ; Mill মনে করেছিলেন যে যদিও গৃহ কর খুবই যুক্তিযুক্ত। নগর শুল্ক হল "জনসাধারণ কর্তৃক সাধারণভাবে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের উপর" আপত্তিজনক কর। "আমি এ কথা বলছি না যে ভারতের মত একটি দেশে, যেখানে এমন কোনও কর যা দিতে জনগণ অভ্যস্ত নয় তা ধার্য করা কঠিন, কখনও কখনও আর্থিক প্রয়োজনে এই ধরনের করের আশ্রয় গ্রহণ করার ন্যায্যতা প্রমাণিত নাও হতে পারে। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে শুধু চরম অবস্থাতেই এই ধরনের কর ধার্যের ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া উচিত।" ভূমি রাজস্বের উপর শিক্ষা ও পথ সেস রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইন লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হত (পথ সেস বিলের উপর 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ৫ই জুন, ১২ই জুন ও ১৯শে জুন (১৮৭১) দেখুন ; জমিদারদের উপর শিক্ষা ও পথ সেস চাপানোর অন্যায্যতা সম্পর্কে পূর্বোক্ত পত্রিকার ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭১, ২৩শে জানুয়ারি ১৮৭১ ও ১০ই জুলাই ১৮৭১ দেখুন)। সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এই যে ১৭৯৩ সাল থেকে জমিদাররা পথ সংরক্ষণের যে দায়-দায়িত্ব থেকে সরে এসেছিল পথ সেস সেই দায়-দায়িত্বকেই পুনরুজ্জীবিত করেছে (G. Campbell-এর 'Memories of my Indian Career' London, 1893, ভল্যুম II, পৃষ্ঠা ২১০ দেখুন)। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ সম্পর্কে Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৭১, ৪৭ নং দেখুন, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের 'লোকাল ট্যাক্সেসন কমিটি'র রিপোর্ট ১২ই নভেম্বর ১৮৭০।

১৭৫ Napier-এর নিকট Mayo, ৪ঠা জানুয়ারি ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪২, ৭ নং।

১৭৬ W. S. Meyer-এর 'Memorandum on the Financial Powers of the Government of India and Provincial Government, for the Royal Commission on Decentralistion (Simla, 1907), পৃষ্ঠা ১৩ ও পরবর্তী।

১৭৭ Sir C. Trevelyan-এর বক্তৃতা, ১৮৭১ সালের ৭ই মার্চ লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সভার কার্য-বিবরণী। 'Journal of the E.I.A.' ভল্যুম V, পার্ট II, ৯২নং, পৃষ্ঠা, ১০৮-২৭১।

১৭৮ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ৫নং, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭১।

১৭৯ M. Venkatarangaiya-র 'The Beginnings of Local Taxation in the Madras Presidency' (Madras, 1928), W.S. Meyer পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

১৮০ Sir C. Trevelyan-র পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১০৮।

১৮১ Fin. Progs. ১৮ই মার্চ ১৮৭১, Accts. নং ৯০, অর্থ দপ্তরের সেক্রেটারির নিকট ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি যতীন্দ্র ? জোতেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ১০ই মার্চ ১৮৭১।

১৮২ 'পাইওনিয়ার' ২রা জানুয়ারি, ৬ই জানুয়ারি, ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭১। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ৯ই জানুয়ারি, ১৬ই জানুয়ারি, ২৩শে জানুয়ারি ও ১৬ই মার্চ, ১৮৭১।

৩

ব্যয় ও বিনিয়োগ নীতির ধারা

ব্যয়ের তালিকার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত ছিল সৈন্যবাহিনী। ১৮৬০-এর দশকে ভারত সরকারের মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশই সৈন্য-বাহিনীর খাতে যেত। বিদ্রোহের পর দু বছরের মধ্যে ভারতে সৈন্যসংখ্যা অনেক বাড়ানো হয় এবং সেই সঙ্গে সামরিক খাতে ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। ষাটের দশকে সৈনাবাহিনীর সংখ্যা ও ব্যয় হ্রাসের জন্য থেকে থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা একটা জোর ধাক্কা দিয়েছিল এবং সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করার ব্যাপারে আমলাতন্ত্রের ভিতর থেকেই তীব্র আপত্তি উঠেছিল। পূর্তকর্মের জন্য ব্যয় (সমগ্র ব্যয়ের প্রায় ১৫ শতাংশ) অংশত করা হত 'সাধারণ পূর্তকর্মের' দরুন বাৎসরিক রাজস্ব থেকে এবং অংশত করা হত 'অসাধারণ পূর্তকর্মের' দরুন—যার খরচ যোগানো হত ঋণের মারফত।[১] বেসামরিক প্রশাসনের ব্যয় বাজেটের কয়েকটি খাতে ভাগ করা হত। প্রথমতঃ, বাজেট ও আয়-ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে 'সাধারণ প্রশাসন' শিরোনামায় লেখা খাতের মধ্যে পড়ত গভর্নর-জেনারেল, তাঁর কার্য-নির্বাহী ও লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ, গভর্নরবৃন্দ, লেফটেনান্ট গভর্নর ও চিফ কমিশনারবৃন্দ, ভারত সরকারের সেক্রেটারিবৃন্দ, হিসাব রাখা ও হিসাব পরীক্ষা এবং কারেন্সি বিভাগের অফিসারবৃন্দ ইত্যাদির বেতন। এই খাতে ব্যয় সামগ্রিক ব্যয়ের দুই থেকে চার শতাংশ দাঁড়াত। দ্বিতীয়তঃ, বিচার বিভাগীয় প্রশাসনের খরচ (আদালত অথবা বিচার বিভাগ, জেল ইত্যাদির খরচ) 'আইন ও বিচার' এই শিরোনামায় লেখা হত (সামগ্রিক ব্যয়ের প্রায় ৫ শতাংশ)। তৃতীয়তঃ, রাজস্ব সংগ্রহের সংস্থা সমূহ চালানোর খরচ বহিঃশুল্ক অন্তঃশুল্ক ও বন সংরক্ষণ বিভাগ, বাংলা ও মালওয়ার আফিম এজেন্সি, লবণ শুল্ক আদায় করার জন্য অন্তর্দেশীয় শুল্ক বিভাগের কর্মচারী, দলিল রেজিস্ট্রি ও স্ট্যাম্প বিক্রয়ের কর্মচারী এবং আয়কর নির্ধারণ ও সংগ্রহের জন্য মাঝে মাঝে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য খরচকে 'রাজস্ব সংগ্রহের ব্যয়' নামক খাতে একত্রিত করা হত।[২] এই খাতে ব্যয় খুব ওঠা-নামা করত। কিন্তু

তা সাধারণতঃ সমগ্র ব্যয়ের ১৭ থেকে ২০ শতাংশে দাঁড়াত। 'বার্ধক্য পেন্সন ও সহানুভূতিসূচক ভাতা' (সরকারের ইউরোপীয় ও ভারতীয় কর্মচারীদের দেওয়া হত) এবং 'লম্বা ছুটি ও অনুপস্থিতি জনিত ভাতা' (ভারতীয় বেসামরিক কর্মচারীদের দেওয়া হত) বেসামরিক প্রশাসনের ব্যয়ের সঙ্গে একত্রিত করলে তা ৬০-এর দশকে বছরে গড়ে দাঁড়াত সরকারের সমগ্র ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি।[৩] ব্যয়ের অপরাপর খাতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল 'রাজনৈতিক এজেন্সি' খাতে ব্যয়। এর তালিকায় পড়ত দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজ্যগুলিতে রাজনৈতিক এজেন্সি ও রেসিডেন্সি (রাজ-প্রতিনিধি ভবন) রাখার খরচ, সীমান্তের অঞ্চলগুলিতে সশস্ত্র বাহিনীর খরচ, পারস্য ও কাবুলে রাষ্ট্রদূতের খরচ। এডেনে সামরিক কেন্দ্র রাখার খরচ (ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ভাগ করে), সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে উপজাতীয় প্রধানদের রাজনৈতিক অনুদান বা উৎকোচ প্রদান ইত্যাদি আরও অনেক কিছু। ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টকের মালিকদের দেয় লভ্যাংশ সহ 'সুদের খরচ' দাঁড়াত সমগ্র ব্যয়ের এক-দশমাংশ। ঊনবিংশ শতাব্দীর আমলাতান্ত্রিক ভাষায় 'হোম চার্জে'র প্রকৃত অর্থ হল বৈদেশিক ব্যয়, অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে স্টার্লিংয়ে ব্যয়। ব্যয়ের এই খাতে ধরা হত ইংল্যাণ্ডের ঋণের উপর সুদ, ভারতের জন্য ইংল্যাণ্ডে ক্রীত মালপত্রের (stores) খরচ, ভারতের ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর জন্য হোম চার্জ, ভারতে সৈন্য প্রেরণ ও তাঁদের ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তনের জন্য যাতায়াত খরচ, সৈন্যবাহিনীর অফিসারদের পেন্সন ও বার্ষিক বৃত্তির জন্য খরচ এবং গ্যারান্টিপ্রাপ্ত রেল কোম্পানিগুলিকে প্রদত্ত সুদ। বিদ্রোহের পরবর্তীকালের নীতিসংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর বিচার বিবেচনার সময়ে আয়-ব্যয়ের হিসাবের খাতার চেহারা কেমন ছিল তার এই সব সাধারণ তথ্যগুলি মনে রাখলে কাজে দেবে।

॥ ১ ॥

১৮৬০-এর দশকে সামগ্রিক ব্যয়ের সঙ্গে সামরিক ব্যয়ের গড় অনুপাত ছিল ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত, আর ব্যয়ের তালিকায় সৈন্যবাহিনীর খাতে ব্যয় ছিল সর্বোচ্চ। ব্রিটেনের সাম্রাজ্যিক পরিকল্পনায় ভারতীয় সৈন্য-

বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলঃ সামরিক ব্যয়সংক্রান্ত নীতি কেবল ভারতের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনের ভিত্তিতে রচিত হত না। প্রতিরক্ষার জন্য এই বিপুল ব্যয় কি সমর্থন যোগ্য ? 'হোম গভর্নমেণ্ট'এর (ইংল্যাণ্ডের সরকারের) সঙ্গে ভারত সরকারের সামরিক ব্যবস্থা কি ভারতের রাজস্ব ও সম্পদ লুণ্ঠনের একটা পথ ছিল না ? এই সব প্রশ্নের জবাব আমরা দিতে চেষ্টা করব।

বিদ্রোহের দরুন স্বাভাবিকভাবেই ভারত সরকারের সামরিক খাতে ব্যয়ের বিপুল বৃদ্ধি ঘটেছিলঃ ১১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা থেকে (১৮৫৬-৭) বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকায় (১৮৫৭-৫৮) দাঁড়িয়েছিল। বৃদ্ধির এই ঝোঁক ১৮৫৮-৫৯ সালে (২১ কোটি টাকা) এবং ১৮৫৯-৬০ সালে (২৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা) বজায় ছিলঃ স্থানীয় সৈন্য ও পুলিশ নিয়োগের এবং ইংল্যাণ্ড থেকে সৈন্য আনয়নের ব্যবস্থা একবার চালু করার পর তা হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব ছিল না।[৪] ১৮৫৯-৬০ সালে সেন্যবাহিনীর মোট সংখ্যা সর্বোচ্চ স্তরে উঠেছিল। ইউরোপীয় ও ভারতীয় সৈন্যদের অনুপাত ১৮৫৭ সালের ১ঃ৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৫৮-৬০ সালে প্রায় ১ঃ২ তে দাঁড়িয়েছিল ; সামরিক খাতে 'হোম চার্জ' ৩ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড (১৮৫৬-৫৭) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০ লক্ষ ৮২ হাজার পাউণ্ডে (১৮৬০-৬১) দাঁড়িয়েছিল। বিদ্রোহের পর তৎকালীন কর্ম-নীতি অনুযায়ী সৈন্যবাহিনীতে ইউরোপীয়দের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং যে গোলন্দাজ বাহিনীতে এতদিন প্রধানতঃ ভারতীয়রাই ছিলেন, সেখানে এখন প্রায় কেবল মাত্র ইউরোপীয়রা নিযুক্ত হলেন। সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে মাথাপিছু ব্যয় বৃদ্ধি (কারণ ভারতীয় সৈন্যদের তুলনায় ইউরোপীয় সৈন্যদের জন্য সরকারের খরচ বেশি হত) বিপুল বোঝা হয়ে উঠল। ১৮৫৯ সালের গোড়ার দিকে সেক্রেটারি অব স্টেট সৈন্যদের বিন্যাসে ও সামরিক জিনিসপত্র সরবরাহে কোনও রকম কৃপণতা না দেখিয়ে সামরিক ব্যয়ের উপর সতর্ক নজর রাখার জন্য গভর্নর-জেনারেলকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।[৫] তিনি ভারত সরকারকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে "সরকারের সাধারণ চাহিদা মেটাবার জন্য ঋণের ব্যবস্থা চালু রাখা অসন্তোষজনক"।[৬] স-পারিষদ গভর্নর-জেনারেল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব "বর্তমানের বিপুল সামরিক ব্যয় হ্রাস করা হবে" এবং

ততখানিই করা হবে যতটা নিরাপদ বলে বিবেচিত হতে পারে[৭], কিন্তু এখনই ব্যয় হ্রাস সম্ভব নয়।[৮] সেক্রেটারি অব স্টেটের মত ছিল যে পরিস্থিতি যখন শান্ত হয়েছে তখন ভারতীয়দের মধ্যে থেকে সংগৃহীত সৈন্যদল ভেঙ্গে দেওয়া যেতে পারে।[৯] তিনি আরও প্রস্তাব করেছিলেন যে ভারতীয় সৈন্যদের যেসব কাজ আগে করতে বলা হয়েছিল সেসব কাজ নবনিযুক্ত পুলিশ বাহিনীকে দিয়ে করানো যেতে পারে এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা দ্রুত হ্রাস করা উচিত।[১০] তিনি আরও বলেন যে একই সঙ্গে পদাতিক সৈন্যদের আরও কিছু বাহিনীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইংল্যাণ্ডে ফেরত পাঠানো উচিত।[১১] আর্থিক ভারসাম্য আনার জন্য ভারতে খরচ কমানোর ব্যাপারে সেক্রেটারি অব স্টেট উদ্বিগ্ন ছিলেন। "আপনারা (ভারত সরকার) সম্প্রতি যে অসাধারণ সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন সে সম্পর্কে সর্বপ্রকার বিচার-বিবেচনা করা উচিৎ, কিন্তু এই দেশটাকে সোনা-রূপার উৎস হিসাবে গণ্য করার দৃষ্টিভঙ্গিকে অননুমোদনের পক্ষে যথেষ্ট জোরাল ভাষা খুঁজে পাওয়া কঠিন।[১২]

সেক্রেটারি অব স্টেটের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতে পদাতিক বাহিনীতে ছাঁটাই শুরু হয়ে গেল। সামরিক ব্যয় হ্রাসের জন্য Col. Balfour-এর নেতৃত্বে সামরিক অর্থ-বিষয়ক কমিশন ১৮৬৯ সালে কাজ শুরু করল! সামরিক মালপত্রের ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য এই কমিশনের সুপারিশে রসদের ব্যয় (commissariat charges) কমানো হল।[১৩] দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ২ লক্ষ ১৩ হাজার (১৮৫৯-৬০) থেকে কমিয়ে ১ লক্ষ ৮৪ হাজারে (১৮৬০-৬১) আনা হল।[১৪] সেক্রেটারি অব স্টেট দাবি করলেন যে দেশীয় সৈন্যদের সংখ্যা আরও কমাতে হবে: "দেশীয় সৈন্যদের সংখ্যা হ্রাস করেই কেবল অধিকতর সংখ্যক ইউরোপীয়দের খরচের সংস্থান করা সম্ভব।"[১৫] তাই ১৮৬২-৬৩ সালে দেশীয় সিপাইদের সংখ্যা আরও কমিয়ে ১ লক্ষ ২১ হাজার করা হল। এ কথা স্বীকৃত হল যে ভারতের সৈন্যবাহিনীতে অধিকতর অনুপাতে ইউরোপীয়দের রাখা বিদ্রোহের আগে প্রথাসিদ্ধভাবে চালু ছিল, কিন্তু এখন সেটা একটা রাজনৈতিক প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। কিন্তু সেক্রেটারি অব স্টেট চেয়েছিলেন যে এই সংখ্যা যেন "আমাদের সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত করার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়" সংখ্যার চেয়ে বেশি না হয়।[১৬] সেই জন্য ছাঁটায়ের

ব্যাপারে সরকার যা করেছিল তাতে Sir. C. Wood সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।[১৭] ভারত সরকার আসলে সৈন্যসংখ্যা যতটা কমানো সম্ভব ছিল তার চেয়ে বেশি করার আশা দিয়েছিল ; ছাঁটাই কিন্তু শ্লথগতিতেই চলছিল।[১৮] উপরন্তু সামরিক হিসাব-নিকাশের বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্য অপব্যয়ের বহু দিক গোপন থেকে যেত।[১৯] ১৮৬২ থেকে ৬৩ সালের মধ্যে ইউরোপীয় সৈন্যদের সংখ্যা কমিয়ে ৭৬ হাজার করা হল, অর্থাৎ ৫ বছরে (১৮৫৮/৫৯-১৮৬২/৬৩) প্রায় ৩০ হাজার কমানো হল।

বিদ্রোহের সময় সামরিক ব্যয় যে অস্বাভাবিক স্তরে উঠে গিয়েছিল, ছাঁটাইয়ের এই ব্যবস্থা তাকে নাবিয়ে আনল। ১৮৫৯-৬০ সালে সামরিক খাতে ব্যয় হয়েছিল ২০'৯ কোটি টাকা, ১৮৬৩-৬৪ সালের মধ্যে তা কমে দাঁড়াল ১৪'৫ কোটি টাকা। এর জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন Sir C. Wood এবং সামরিক অর্থ-বিষয়ক কমিশনের Col. Balfour—যিনি অনমনীয়ভাবে ছাঁটাইয়ের মত একটি অপ্রিয় কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন।[২০] সামরিক অর্থ-বিষয়ক কমিশন*(১৮৫৯ সালের জুন মাসে গঠিত) একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগে পরিণত হল (জুলাই ১৮৬০)। ১৮৬৪ সালের এপ্রিলে এই বিভাগের বিলুপ্তি ঘটানো হল এবং সামরিক ব্যয়ের দৈনন্দিন তদারকির ভার সামরিক ব্যয়ের কণ্ট্রোলার জেনারেলের উপর ন্যস্ত হল।[২১]

১৮৬৪-৬৫ থেকে ১৮৭০-৭১ সালের মধ্যে সামরিক ব্যয় ১৬ কোটির কাছাকাছি অঙ্কে প্রায় স্থিতিশীল হয়ে গিয়েছিল। Lawrence ভাইসরয় থাকার সময়ে সামরিক ব্যয়ের সামান্য বৃদ্ধির ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নিয়ন্ত্রণ Lawrence-এর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল।[২২] সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির কারণ ছিল অংশতঃ ভুটান যুদ্ধের খরচ, অংশতঃ সাধারণভাবে মূল্য ও মজুরি বৃদ্ধি।[২৩] ভারত সরকার উভয়সঙ্কটে পড়েছিল। সেক্রেটারি অব স্টেটের ভাষায় তা হল 'কম সৈন্য অথবা বেশি কর'।[২৪] Lawrence সামরিক ব্যয় কমাতে আগ্রহী ছিলেন, কিন্তু Wood-এর আশঙ্কা মতই পরিষদের সামরিক সদস্যরা ব্যয় হ্রাস করার ব্যবস্থাবলীর বিরোধিতা করেছিলেন।[২৫] কর্মদক্ষতা বাড়ানোর অছিলায় তাঁরা আরও ব্যয়বহুল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য Lawrence-এর কাছে সুপারিশ করেছিলেন।[২৬]

১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে সেক্রেটারি অব স্টেট বিগত পাঁচ বছরে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির ব্যাপারে গভর্নর-জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। তাতে তিনি দেখিয়েছিলেন যে ইউরোপীয় সৈন্যদের জন্য মাথাপিছু খরচ যথেষ্ট বেড়েছে ; সৈন্যদের রসদ সরবরাহ বিভাগের খরচ এমন কিছু একটা কমানো হয় নি ; আস্তাবল ও ঘোড়া যোগানোর বিভাগের খরচ এবং কর্মচারী নিয়োগ ও দপ্তরের খরচও বেড়েছে ; নতুন পুলিশ ব্যবস্থায় যা আশা করা হয়েছিল তার উল্টো ফলই ফলেছিল, তাতে সামরিক ব্যয় হ্রাস করতে সাহায্য হয় নি।[২৭] Mayo ব্যয় হ্রাসের কাজ হাতে নিলেন। তিনি Lord Sandhurst-এর কাছে লিখলেন যে সামরিক ব্যয় ১২ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা সম্ভব ঃ এ হল আসলে Balfour-এরই সুপারিশ, যদিও ছাঁটাই করার জন্য তাঁর সমস্ত সুপারিশ পুরোপুরি কার্যকর করা হয় নি।[২৮]

Mayo দেখলেন যে ভারতে "প্রচুর সংখ্যক দায়িত্ববিহীন বেতনভুক সামরিক কর্মচারী রয়েছেন" এবং এমন "তত্ত্বাবধায়ক অফিসার রয়েছেন যাঁদের তত্ত্বাবধান করার কাজ সামান্যই আছে বা কিছুই নেই, এমন 'কর্তব্যরত' অফিসার রয়েছেন যাঁদের করার কিছুই নেই"।[২৯] উপরন্তু Mayo অনুভব করেছিলেন যে বিদ্রোহের পর থেকে রাজনৈতিক আবহাওয়ার যথেষ্ট বদল হয়েছে। তিনি Argyll-কে লিখেছিলেন "আমার আশঙ্কা আছে ভারতে সামরিক ব্যাপারে যে অসাধারণ পরিবর্তন ঘটেছে সে বিষয়ে ইণ্ডিয়া অফিসে যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয় না····· দক্ষিণ ভারতে যা প্রয়োজন তা হল একটি সুসংগঠিত পুলিশ বাহিনী এবং বর্তমানের ন্যায় একটি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী।"[৩০] বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে যখন কোনও রাজনৈতিক বিপদ নেই, তখন একটি বৃহদাকার দেশীয় বাহিনী রাখা নিষ্প্রয়োজন। ব্যারাক নির্মাণ, সৈন্যবাহিনীর রসদ ইত্যাদির জন্য খরচ ছাঁটাই করে Mayo "সমস্ত নিন্দা মাথা পেতে নেন"।[৩১] সামরিক ব্যয় হ্রাসে তিনি সফলকাম হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন সৈন্য হ্রাসের প্রস্তাব দিলেন তখন নানাদিক থেকে বাধার সম্মুখীন হলেন।[৩২]

Mayo কুড়িটি রেজিমেণ্টকে ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব দিলেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি সৈন্যবাহিনীতেই মূলতঃ সংখ্যা হ্রাস করা হল। Mayo-র কয়েকজন উপদেষ্টার (যথা Durand ও Mansfield-এর) মত ছিল যে

মাদ্রাজে আরও কয়েকটি রেজিমেণ্ট বাতিল করা যেত।[৩৩] Mayo মনে করেছিলেন যে মাদ্রাজ বাহিনী দুর্বল ও শৃঙ্খলাহীন।[৩৪] মাদ্রাজে যে সৈন্যবাহিনী রাখা হয়েছিল তা "প্রয়োজনের সঙ্গে একেবারেই সামঞ্জস্য-হীন"[৩৫] এবং এই বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়াই ভাল কারণ তা "ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুকূল মনোভাবাপন্ন নয়"।[৩৬] তিনি এ কথা অস্বীকার করেছিলেন যে "মাদ্রাজ বাহিনীর বিরুদ্ধে বাংলার কোনও প্রতিকূলতা" আছে।[৩৭] ব্যাপারটা হল করদাতাদের খরচায় বিনা প্রয়োজনে ওখানে একটি সৈন্য-বাহিনী পোষা অন্যায়।[৩৮]

সামরিক বিভাগের জেনারেল স্টাফ, আস্তাবল, রসদ সরবরাহ ইত্যাদির প্রশাসনিক শাখাগুলিতে ব্যয় হ্রাসের জন্য Argyll উৎসুক ছিলেন।[৩৮ক] কিন্তু তিনি সৈন্যসংখ্যা কমাতে চান নি।[৩৮খ] বহু অপ্রত্যাশিত দিক থেকে সৈন্যসংখ্যা কমানোর প্রস্তাবের বিরোধিতা এল। Mayo Bartle Frere-কে লেখেন "আমি স্বীকার করছি এই ঘটনা দেখে আমি কৌতুক অনুভব করছি যে, যেসব লোকেরা ব্যয় হ্রাসের জন্য সবচেয়ে বেশি শোরগোল করছিলেন তাঁদের মধ্যে এখন সমালোচনার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এবং যা করা হয়েছে তার খুঁটিনাটিতে খুঁত ধরছেন।"[৩গ] "বরঞ্চ এ কথা শুনে আমি হতাশ হয়েছি……যাঁরা এতদিন ব্যয় সঙ্কোচের জন্য চিৎকার করছিলেন ও অপ্রোয়জনীয় ব্যয়ের নিন্দা করছিলেন, এখন যখন সত্যিই ব্যয় হ্রাস করা হচ্ছে তখন তাঁরা মাথা নাড়ছেন এবং যদিও কোনও বিকল্প দেন নি, 'অবিমৃষ্যকারী', 'নিষ্ঠুর'……(পড়া যায় না) 'অপ্রয়োজনীয়' ইত্যাদি বলছেন।"[৩৯] ম্যাগডালার Lord Napier ছাঁটাই করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। নিতান্ত বিব্রত হয়ে Mayo Argyll-কে লিখেছিলেন, "Lord Napier বোধ হয় ভাবেন যে অর্থ অপচয় এড়ানোর প্রত্যেকটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করাই তাঁর কর্তব্য……।"[৪০] এ কথা জেনে Mayo খুব বিরক্ত হয়েছিলেন যে Napier লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস ও Argyll-এর কাছে কিছু-কিছু কাগজপত্র পাঠিয়েছেন : সরাসরি বিতর্ক এড়ানোর জন্য Mayo 'লেখালেখির যুদ্ধ' চালিয়ে যান নি, এবং Napier Mayo-র 'অতিরিক্ত বিবেকবত্তার' সুযোগ নিচ্ছিলেন।[৪১] Mayo Argyll-এর কাছে অভিযোগ করেন যে কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ'এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সুখকর নয়। কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ'এর মনোভাব সহযোগিতার নয় এবং ব্যয় হ্রাসের সিদ্ধান্ত আটকাবার

জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র তিন মাস চেপে রেখেছিলেন।[৪২] ঘটনাক্রমে ব্যাপারটি এমন দশায় পৌঁছল যে "কাউন্সিল (স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেল) থেকে সি.ইন.সি.-র (কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ) ক্রমাগত অনুপস্থিতিই বার বার বিস্ফোরণ ঠেকিয়েছে।"[৪৩] সৈন্যবাহিনীর স্বার্থের প্রবক্তার Sir H. N. Durand প্রায় প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রাস্তব করেছিলেন যে বেসামরিক ব্যয় হ্রাস করতে হবে।[৪৪] গভর্ণর-জেনারেল অবশ্য এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন যে সামরিক খাতে ব্যয় হল বাজেটের সবচেয়ে বড় অঙ্ক।[৪৫] Mayo চেয়েছিলেন যে কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ'কে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তাঁকে "শুধু ভারত সরকারের অধীনস্থ থাকলে চলবে না, সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের জরুরী প্রয়োজনের বশবর্তীও থাকতে হবে"।[৪৬]

কিন্তু কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ একাই ছাঁটাইয়ের প্রস্তাবের বিরোধিতা করছিলেন না। Argyll নিজেই প্রস্তাবিত ছাঁটাইয়ের অনুমোদন করতে অনিচ্ছুক ছিলেন।[৪৭] ছাঁটাইয়ের ফলে সৈন্যবাহিনীর দক্ষতায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে বলে কেম্ব্রিজের ডিউক খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।[৪৮] লণ্ডনের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের প্রায় সকল সদস্যই সৈন্যসংখ্যা হ্রাসের বিরোধিতা করেছিলেন। Argyll ও তাঁর কাউন্সিল সদস্যদের মতে বিদ্রোহের পর বিপুল সংখ্যক সৈন্য কমানো সম্ভবপর হয়েছিল, কিন্তু সে সংখ্যা আরও হ্রাস করা এখন আর নিরাপদও নয় উচিতও নয়।[৪৯] ১৮৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে Argyll Mayo-কে জানালেন যে ইণ্ডিয়া কাউন্সিল যেহেতু গভর্ণর-জেনারেলের প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়েছে তাই বিষয়টি মন্ত্রীসভায় উপস্থাপিত হবে।[৫০] মন্ত্রী-সভা Mayo-র বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিল এবং সেই অনুযায়ী Argyll সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করার জন্য ভারত সরকারের প্রস্তাবে সম্মতি দিতে অস্বীকার করলেন।[৫১]

এই প্রসঙ্গটি আমরা কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি কারণ এতে সামরিক ব্যয় হ্রাসের পথে প্রধান প্রধান বাধাগুলি, বিশেষতঃ গভর্ণর-জেনারেলের পরিষদের সৈন্যবাহিনীর লোকেদের চাপ সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। Mayo অনুমান করেছিলেন যে এই ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হবে। ১৮৭০ সালে Agryll-কে তিনি অত্যন্ত তিক্ততার সঙ্গে লিখেছিলেন "আত্ম-স্বার্থকে পরাজিত করা খুব কঠিন। উচ্চ বেতনভুক

অযোগ্যতা সর্বদাই অনেক উকিল পায়। জনসেবা দ্বিতীয় বিবেচ্য হয়ে দাঁড়ায়—যে ধরনের ব্যয় হ্রাস যুক্তিযুক্তভাবেই করা যায় তা করার চেয়ে সদস্যরা জনগণের উপর বোঝা বাড়ানোর জন্য প্রকাশ্যে ওকালতি করছেন।"[৫২] আগেই আমরা দেখেছি যে Mayo এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে আর্থিক ব্যাপারে কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ'কে গভর্নর-জেনারেল ও তাঁর পরিষদের অপরাপর সদস্যদের অধীনস্থ করতে হবে। Argyll একখানি ব্যক্তিগত চিঠিতে (গোপন বলে চিহ্নিত) তাঁর মতামত জানান: "আমার মনে হয় আপনার লক্ষ্য হল যে, যেসব বিশেষ প্রভাব অনুচিত সামরিক ব্যয়কে উৎসাহ যোগায় তাদের পরিষদ থেকে সরিয়ে দেওয়া। আপনার ধারণা এই প্রভাবের মধ্যমণি হলেন কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ······।"[৫৩] কিন্তু Argyll এর ধারণা ছিল যে ভারতে 'যুদ্ধ দপ্তরের মন্ত্রী' কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ'এর কাজ চালাতে পারেন না, কারণ "যদি সি.ইন.সি. কোনও সামরিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন তবে তাঁর বিরোধিতার ক্ষমতা বোধ হয় কাউন্সিলের ভিতরে যতটা হবে বাইরে তার বেশি ছাড়া কম হবে না।"[৫৪] Argyll আরও বলেন: "যেহেতু ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর খরচ সর্বদাই সবচেয়ে বড় খরচ হয়ে থাকবে, তাই এর সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত সামরিক কর্তৃপক্ষকে স্বপক্ষে রাখার চেষ্টা করতে হবে।"[৫৫]

সামরিক ছাঁটাইয়ের সম্পর্কে ১৮৬৯-৭১ সালের বিতর্ক থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হয় যে কর্তৃত্বসম্পন্ন সামরিক অফিসাররা (বিশেষতঃ যাঁরা গভর্নর-জেনারেলের পরিষদ ছিলেন) ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থায় বাধা দিচ্ছিলেন; ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ ভারতে সশস্ত্রবাহিনী হ্রাস করার ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। Lawrence-এর ('হোম' কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বাধা দানের ব্যাপার নিয়ে যিনি অভিযোগ এনেছিলেন)[৫৬] এবং সেই সঙ্গে Mayo-র (ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব দেবার পর তিনি ইণ্ডিয়া অফিসে খুবই সামান্য সমর্থন পেয়েছিলেন) এই অভিজ্ঞতাই হয়েছিল।[৫৭] তবে এটা স্বাভাবিকই ছিল, কারণ ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনীর সংখ্যা কত থাকবে তা সর্বদাই বিবেচিত হত গ্রেটব্রিটেনের ব্যাপক সাম্রাজ্যিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে।[৫৮]

॥ ২ ॥

ভারত ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যেকার আর্থিক লেনদেনের অনুশীলন—

'হোম' (ইংল্যাণ্ডের) সরকারের উপর ভারত সরকারের নির্ভরশীলতা, 'হোম' সরকারকে যে অর্থ দেওয়া হত, ভারতে ব্রিটিশ সৈন্য রাখার জন্য ভারতীয় করদাতাদের যে খরচ দিতে হত—আমরা যে অন্য প্রশ্নটির অবতারণা করেছিলাম তার উপর আলোকপাত করবে : 'হোম' সরকারের সঙ্গে বর্তমান সামরিক বন্দোবস্তের দরুন ভারত কি ব্রিটেনের বৃহত্তর সাম্রাজ্যিকবাদ স্বার্থের জন্য অর্থ দিতে বাধ্য হচ্ছিল ?

ব্রিটিশ যুদ্ধ দপ্তর (War Office) ও ইণ্ডিয়া অফিসের মধ্যে একটি চুক্তির ভিত্তিতে রাজকীয় ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর কাজের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি খরচ দিত। বিদ্রোহের বছর পর্যন্ত নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, ডিপো চালান ও ইংল্যাণ্ডের ব্যারাক ব্যবস্থার খরচ যথাক্রমে ভারতীয় ও ব্রিটিশ দপ্তরগুলিতে সৈন্যদের সংখ্যা অনুযায়ী এবং বেতন ইত্যাদি বাবদ প্রদত্ত অর্থ অনুযায়ী আনুপাতিকভাবে ভাগ করে দেওয়া হত।[৫৯] বিদ্রোহের সময়ে ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ ফৌজের দরুন খরচ হঠাৎ বেড়ে গেল। ইংল্যাণ্ড থেকে নতুন নতুন সৈন্য আমদানির খরচ ভারতীয় রাজস্ব থেকে দেওয়া হত—এইভাবে যেসব সৈন্য পাঠানো হত ইংল্যাণ্ডের উপকূল ছাড়ার পরমুহূর্ত থেকেই তাদের খরচ ভারতের উপর বর্তাত। ভারতে স্থানীয় কাজের জন্য পৃথক ইউরোপীয় ফৌজ রাখার যে ক্ষমতা ভারত সরকারের ছিল তা ১৮৬০ সালে তুলে নেওয়া হল।[৬০] ১৮৬১ সালে সৈন্যবাহিনী একত্রীকরণ আইন (Army Amalgamation Act) বলে স্থানীয় ইউরোপীয় বাহিনীগুলিকে রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল।[৬১] এর ফলে ভারতে কর্মরত রাজকীয় বাহিনীর দরুন যুদ্ধ দপ্তরকে দেয় খরচ স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পেল।

বর্তমান চাকুরেদের জন্য খচর (effictive charges) নামে পরিচিত এই সব খরচ (অর্থাৎ ভারতে কর্মরত ব্রিটেনের সৈন্যদলের খরচ) ইণ্ডিয়া অফিস, যুদ্ধ দপ্তর (War Office) ও ট্রেজারির মধ্যে বিরোধের মীমাংসার জন্য নিযুক্ত Sir A. Tulloch-এর কমিটির আওতায় আনা হয়েছিল। এই কমিটির সুপারিশে একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা সকলের ঐক্যমতে স্থিরীকৃত হয়। ভারতে নিযুক্ত প্রতি ১,০০০ সৈন্যের জন্য বছরে ভারত সরকারকে ১০ হাজার পাউণ্ড দিতে হবে। অর্থাৎ মাথাপিছু ১০ পাউণ্ড করে দিতে হবে বলে স্থির হয় এবং যে সংখ্যার উপর এই অর্থ দিতে হবে তা

স্থির হবে ১২ মাসের মাস্টার রোলে গড় হাজিরার ভিত্তিতে। এই অর্থের মধ্যে পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম ও যাতায়াতের খরচ বাদে সৈন্যদের ভারতে এসে পেঁছান পর্যন্ত সৈন্য সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সব খরচই পড়ত।[৬২] Sir C. Wood-এর মতে এই খরচ অত্যন্ত বেশি ছিল।[৬৩] কিন্তু শুরুতে এই যে অস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়েছিল মাঝে মাঝে তার পুনর্নবীকরণ হত এবং ১৮৬১-৬২ থেকে ১৮৬৯-৭০ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা কার্যকর ছিল।

যুদ্ধ দপ্তর এই চুক্তিতে সন্তুষ্ট হয় নি। ভারতে পাঠাবার জন্য জাহাজে ওঠানোর আগে পর্যন্ত সৈন্য সংগ্রহের খরচ ও ডিপোর খরচ বৃদ্ধি পেয়েছিল, তাই যুদ্ধ দপ্তর দাবি করেছিল যে মাথাপিছু ১০ পাউণ্ডে ভারতের জন্য নির্ধারিত সৈন্যদের খরচ কুলোয় না। যুদ্ধ দপ্তর দাবি করল যে মীমাংসার ভিত্তি হিসাবে মাথাপিছু ১০ পাউণ্ডের মোটামুটি গড় ধরলে হবে না, প্রকৃত ব্যয়কেই ভিত্তি হিসাবে ধরতে হবে। এই বিষয়ে তদন্তের জন্য এবং মাথাপিছু হার পুনর্বিবেচনার জন্য ১৮৬৯ সালে Seccombe কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছিল।[৬৪] নতুন ব্যবস্থা অনুযায়ী নিম্নলিখিত হার স্থিরীকৃত হয়েছিল: অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনীর জন্য ১৩৬ পাউণ্ড ১৩ শিলিং ১১ পেন্স, পদাতিক বাহিনীর জন্য ৬৩ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৫ পেন্স, রাজকীয় অশ্বযুক্ত গোলন্দাজ বাহিনীর (Royal Horse Artillery) জন্য ৭৮ পাউণ্ড ১৪ শিলিং ৮ পেন্স, রাজকীয় অশ্বারোহী গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য ৫৯ পাউণ্ড ২ শিলিং ১০ পেন্স, এবং রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর জন্য ৫৮ পাউণ্ড ৯ শিলিং ৩ পেন্স।

ইণ্ডিয়া অফিস তর্ক তুলেছিল যে বর্তমান অবস্থাই যথেষ্ট ব্যয়বহুল এবং ফলপ্রসূ খরচের আরও বৃদ্ধি ভারতের উপর অন্যায় হবে। ১৮৬১ সালে সৈন্যবাহিনী একত্রীকরণ আইন (Army Amalgamation Law) উল্লেখ করে সেক্রেটারি অব স্টেট Duke of Argyll লিখেছিলেন: "ভারতে স্থানীয় ইউরোপীয় বাহিনীর অবলোপ সাধন এমন একটা ব্যবস্থা যা সাম্রাজ্যিক নীতির কথা বিবেচনা করে নির্ধারিত হয়েছে ; কিন্তু এ কথা যদি ভালভাবে জানা থাকত যে ভারত সরকারের উপর চাপানো অতিরিক্ত বোঝার পরিমাণ কি বিপুল হবে তবে, এই ব্যবস্থা এত সহজে

কার্যকর করা হত কিনা সন্দেহজনক।[৬৫] সৈন্য সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণেব ব্যবস্থাতেও বিনা প্রয়োজনে অতিরিক্ত ব্যয় হয় এবং ইংল্যাণ্ডের ডিপোগুলিতে অতিরিক্ত লোক রাখা হয়। ভারতের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি এবং তার সামর্থ্যের অধিক এমন একটি সৈন্যবাহিনী সংগ্রহের খরচ ভারতের রাজস্বের উপর চাপিয়ে দেবার বিষয়টি Argyll 'বিজ্ঞজনোচিত বা ন্যায্য' বলে গণ্য করতে পারেন নি।

যুদ্ধ দপ্তরের সেক্রেটারি অব স্টেট Cardwell দাবি করেছিলেন যে ভারত সরকারের উপর যে 'এফেকটিভ' খরচ চাপানো হয়েছে তা আদৌ অন্যায় নয়, বরং আসলে খুব পরিমিত। যুদ্ধ দপ্তর যুক্তি দিয়েছিল যে ইংল্যাণ্ডের সৈন্যবাহিনী এক সংরক্ষিত বাহিনীর কাজ করে যেখান থেকে ভারত সরকার জরুরী অবস্থায় সৈন্য আনতে পারেন। এই ধরনের একটি সংরক্ষিত বাহিনী (Reserve Force) থাকার জন্য ভারত সরকার ভারতে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করতে সক্ষম হয়েছে। "Cardwell এর মতে এই ব্যবহারযোগ্য সংরক্ষিত বাহিনী রাখার খরচ ব্রিটিশ রাজস্বের প্রকৃত ব্যয়ের একটি বিশেষ খাত হয়ে পড়েছে, যা পরিশোধ করার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ভারতের রাজস্বের······।"[৬৬] সুতরাং সৈন্য সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণের খরচ এবং ফলপ্রসূ সৈন্যদের সংরক্ষিত বাহিনীর খরচের একটি আনুপাতিক অংশ ভারতকেই বহন করতে হবে।[৬৭]

Cardwell-এর চিঠির জবাবে ভারতের পাল্টা দাবি জোরের সঙ্গে তোলা হয়।[৬৮] যুদ্ধ দপ্তর দাবি করেছিল যে ভারত সরকারের ইংল্যাণ্ডে একটি ব্রিটিশ বাহিনী আছে, এই সংরক্ষিত বাহিনী ভারতের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবার জন্য প্রস্তুত। "ইংল্যাণ্ডের প্রতিটি অফিস বা প্রতিষ্ঠান—তা যেকোনও ধরনেরই হোক না কেন যাকে ভারত সরকার প্রথা হিসাবে বা কর্মনিয়োগের জন্য ব্যবহার করে তার খরচার অংশ" তা হলে ঐ একই নীতিতে ভারত সরকারের উপর চাপানো যেতে পারত। আসল ঘটনা হল এই যে গ্রেট ব্রিটেনই ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে একটি সংরক্ষিত বাহিনী হিসাবে ব্যবহার করত। "এ কথা স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত হবে যে সাম্রাজ্যিক সরকার এ দেশে (ভারতে) আমাদের রাজত্ব রক্ষার জন্য যত বেশি সংখ্যক সৈন্য রাখার প্রয়োজন তা রেখেছে এবং তার জন্য এ দেশের রাজস্বের উপরই ভর করেছে ; সরকার সৈন্যবাহিনীর ওই অংশকে সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনের

জন্য একটি সংরক্ষিত বাহিনী হিসাবে বরাবরই গণ্য করে ; সাম্রাজ্যিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার জন্য তারা নিয়মিতভাবে ভারতের বাহিনী থেকে ইউরোপীয় সৈনা নিয়ে গেছে এবং এই সরকার প্রায়শই ভারতের দেশীয় বাহিনী থেকে ভারতের বাইরেকার এমন সব যুদ্ধে সাহায্যের জন্য সৈন্য নিয়ে যায় যার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খুবই সামান্য বা একেবারেই নেই, আর এই সব ক্ষেত্রেও এই দেশীয় বাহিনীর জন্য খরচের কোনও অংশই ঐ সরকার বহন করে না।" কেবল বিদ্রোহের মত একটা অসাধারণ ব্যাপারের ক্ষেত্রেই যুদ্ধ দপ্তরের দাবি কিছুটা যুক্তিযুক্ত বলে প্রতীয়মান হতে পারে, কিন্তু সেই সময়ে ব্রিটিশ বাহিনীর খরচ ভারতীয় করদাতারাই যুগিয়েছিলেন। যুদ্ধ দপ্তরের মতে ইংল্যাণ্ডে সৈন্য সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণের খরচ বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আসলে কৃত্রিম ব্যয় ব্যবস্থার মারফত খরচকে ফাঁপিয়ে তোলা হত, তাতে এমন সব খরচ ধরা হত যার সঙ্গে প্রশিক্ষণের কোনও সম্পর্কই নেই। বরং তা ইংল্যাণ্ডের সৈন্যাবাস সংগঠিত করার সঙ্গেই সম্পর্কিত এবং ভারতের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক বিহীন। Argyll-এর কাছে নিজেদের দাবি পেশ করার সময়ে ভারত সরকার এই যুক্তিরই অবতারণা করেছিল।[৬৯]

'হোম চার্জেস' (ইংল্যাণ্ডে খরচ) খাতে প্রধান স্থান ছিল সৈন্যবাহিনীর খরচ। এর খাতগুলি নিম্নরূপঃ ভারতে কর্মরত রাণীর সৈন্যবাহিনীর জন্য মহামান্যা মহারাণীর সরকারকে প্রদত্ত অর্থ ; সৈন্যদের যাতায়াতের খরচ ; পোশাক-আশাক ; ইংল্যাণ্ডের ডিপোর খরচ ও সৈন্য সংগ্রহের খরচ ; অ্যাডিসকোম্বের সামরিক কলেজের খরচ ; অফিসারদের লম্বা ছুটির সময়কার ও অবসরকালীন ভাতা ; পেন্সন।[৭০]

আমরা এতক্ষণ 'বর্তমান চাকুরে সৈন্যদের খরচে'র কথাই আলোচনা করছিলাম। 'নন-এফেকটিভ' (non-effective) খরচ অর্থাৎ অবসর গ্রহণের পর সৈন্যদের দেয় পেন্সন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বাজেটের একটি বিরাট অঙ্ক।[৭১] ১৮২৩ সালে পূর্বে ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ বাহিনীর জন্য যুদ্ধ দপ্তরকে 'নন-এফেকটিভ' খরচ হিসাবে কোনও অর্থ দেওয়া হত না। ১৮২৩ সালের পর থেকে কোর্ট অব ডিরেকটরস এই খাতে ব্যয় হিসাবে বছরে স্থায়ীভাবে ৬০ হাজার পাউণ্ড করে দিতে রাজী হয়েছিল। ১৮৫৮ সালে যুদ্ধ দপ্তর এই চুক্তির পুনর্বিবেচনা দাবি করেছিল কারণ ১৮২৩ সালের পর থেকে ভারতে কর্মরত রাজকীয় বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি

পেয়েছিল।[৭২] ১৮৫৯ সালে এই ব্যয় নিরূপণ করার জন্য একটি কমিটি ভারতে কর্মরত ৩০ হাজারের একটি সৈন্যবাহিনীর জন্য বছরে ২ লক্ষ পাউণ্ড দিতে হবে বলে স্থির করে দিল।[৭৩] এই অর্থ অত্যধিক হয়েছে বলে কমিটির ইণ্ডিয়া অফিসের সদস্যারা এই সিদ্ধান্তে মতভেদ জ্ঞাপন করলেন। আর একটি কমিটি গঠিত হল এবং এদের সুপারিশ অনুযায়ী (৩১শে জানুয়ারি, ১৮৬১) সকল ধরনের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য প্রতি বছরে 'নন-এফেকটিভ' খরচ স্থির হল বছরে ৩,৫০০ পাউণ্ড। এই সুপারিশ গৃহীত হল এবং ১৮৬১ সালের মার্চ থেকে প্রথমে এক বছরের জন্য ও পরে আরও পাঁচ বছরের জন্য তা কার্যকর হয়েছিল।[৭৪] গোড়ায় একটি সামরিক ব্যবস্থা হিসাবে এটি শুরু হয়েছিল। ১৮৭০ সালে Seccombe কমিটির সুপারিশে ভারত সরকার কর্তৃক যুদ্ধ দপ্তরকে দেয় খরচের আরও নির্ভুল হিসাব চালু করা হয়। ১৮৭০ সালের এপ্রিল মাস থেকে একটি নতুন নীতি গৃহীত হল। পেন্সনের নির্ধারিত মূল্যের (Actuarial Table অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু এবং বিভিন্ন পাওনার হিসাব সূচীর) ভিত্তিতে ভারতীয় অংশের মূলধনীকরণ মঞ্জুর হল। এই ব্যবস্থা ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।

সমগ্র সামরিক ব্যয়কে ভাগে ভাগে ভাগ করলে দেখা যাবে যে বর্তমান চাকুরে ও অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যদের জন্য সামরিক মালপত্রের ব্যয় নির্বাহের জন্য ইংল্যাণ্ডে খরচ হত মোট খরচের এক-পঞ্চমাংশ। এর একটা বড় অংশ প্রশাসনের কর্মচারী ও দপ্তরের (রসদ যোগান বিভাগ, ব্যারাক ও স্বাস্থ্য-রক্ষা ইত্যাদি) জন্য ব্যয়িত হত; মালপত্রের খরচ হত অত্যধিক; ইংল্যাণ্ডের অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যদের জন্য খরচ প্রায় সর্বদাই ভারতে অনুরূপ খরচের চেয়ে বেশি হত।

ভারতীয় ব্যয়ের মধ্যে কোনও খাতে নৌবাহিনীর উল্লেখ নেই, কারণ ১৮৬২ সাল থেকে ভারতের নিজস্ব কোনও নৌবাহিনী ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে যে নৌবাহিনী ছিল তাকে ১৮৬২ সালে রয়্যাল ইণ্ডিয়ান মেরিন নামক একটি অসামরিক বাহিনীতে পরিণত করা হয়েছিল ঃ এর দায়িত্ব ছিল ভারতীয় নৌপথে সৈন্য চলাচল, আলোকস্তম্ভগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, সামুদ্রিক জরীপ ইত্যাদি। ভারতীয় ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে নৌ-সংক্রান্ত ব্যয় আলাদাভাবে দেখানো হত ঃ ব্যয় হত ৫০ লক্ষ থেকে ১

কোটির মধ্যে। সমুদ্রপথে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ছিল রাজকীয় নৌবাহিনীর উপর। ১৮৬২ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষের অফিসে এর জন্য কোনও অর্থ দেওয়া হয় নি, কিন্তু ১৮৬৯ সালের পর থেকে প্রতিরক্ষার জন্য নৌবাহিনীর ৬টি জাহাজ রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাবদ বছরে ৭০ হাজার পাউণ্ড দেওয়া হত। 'ভারতের প্রয়োজনে' শব্দটি ভাসা ভাসা ভাবে ব্যাখ্যাত হত: রাজকীয় নৌবাহিনীর জাহাজগুলি ভারতে মহাসাগরে ব্রিটিশ বাণিজ্য রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হত। ১৮৬৮ সালের এক কার্য-বিবরণীতে গভর্নর-জেনারেল Lawrence দেখান যে ইংল্যাণ্ড যদি ভারতের প্রতিরক্ষার জন্য নৌবাহিনীকে লাগিয়ে থাকে তবে সে তা নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্যই করেছে। "আমার অনুমান বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার খাতিরেই ইংল্যাণ্ড এই কর্তব্য করছে, যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে বছরে কোটি কোটি মুদ্রা……।"[৭৫] নৌবাহিনী দিয়ে সাহায্যের জন্য ভারতের উপর খরচ চাপানোর প্রতিবাদে Mayo, Argyll-কে বলেছিলেন: "আমি আশা করি যে সাম্রাজ্যিক সরকারকে বছরে ৭০ হাজার পাউণ্ড দেবার জন্য আমাদের বাধ্য করবেন না……বাস্তব সত্য এই আমরা সকলেই অনুভব করছি যে আমাদের 'সম্পূর্ণ' সর্বনাশ হল" এবং এ একটা 'ঘোর জলদস্যুতার' সামিল।[৭৬]

ভারত সীমান্তের বাইরে ভারতীয় সৈন্যদের ব্যবহারের ঘটনা খুব বিরল ছিল না। ১৮৫৮ সালে গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট অনুযায়ী পার্লামেণ্টের বিনা অনুমতিতে আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যাপার ছাড়া সীমান্তের বাইরে কোনও সামরিক অভিযানের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনও মতেই ভারতের রাজস্ব ব্যবহার করা যেত না।[৭৭] এই আইন কিছু পরিমাণে ভারতের স্বার্থ রক্ষা করছিল। ভারতীয় সীমান্তের বাইরে সামরিক অভিযান থেকে উদ্ভূত সমস্ত বিশেষ বা অতিরিক্ত ব্যয় (অর্থাৎ অফিসার ও সৈন্যদের সাধারণ বেতন ও ভাতার উপর অতিরিক্ত ব্যয়) ব্রিটিশ রাজকোষ বহন করত। ভারত সরকার এই নীতিতে পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারে নি: ইংল্যাণ্ড থেকে যখনই ভারতে সৈন্য পাঠানো হত তখন জাহাজে ওঠার মুহূর্ত থেকে সেই সৈন্যদের সমূহ বেতন ও বিশেষ বা অতিরিক্ত ব্যয় ভারতের উপর চাপানো হত, কিন্তু ভারতের বাইরে সামরিক অভিযানে প্রেরিত ভারতীয় সৈন্যদের সাধারণ খরচ (অর্থাৎ বেতন ও ভাতা) সচরাচর ব্রিটিশ রাজকোষ

থেকে দেওয়া হত না। অন্য দেশে ভারতীয় সৈন্যদের ব্যবহার করা হলে তাদের সাধারণ ব্যয় ব্রিটিশ রাজকোষ কেন বহন করবে না তার কোনও কারণ ছিল না। ১৮৭২ সালে ইণ্ডিয়া অফিসের সামরিক সেক্রেটারি লিখেছিলেন, "এ কথা নিশ্চিত যে এই সমস্ত যুদ্ধ সাম্রাজ্যিক সরকারের হুকুমে হচ্ছে এবং ব্রিটিশ বাণিজ্যের স্বার্থে, ব্রিটিশ বণিকদের ক্ষোভ ও ব্রিটিশরাজের সম্মান এই সবই এই যুদ্ধের পিছনকার নিয়ামক বিবেচনা ছিল।"[৭৮] ১৮৪২ ও ১৮৫৯-৬০ সালে চীনে, ১৮৫৫ সালে ক্রিমিয়াতে, ১৮৫৬-৫৭ সালে পারস্যে, ১৮৬০ সালে নিউজিল্যাণ্ডে এবং ১৮৬৭ সালে আবিসিনিয়াতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে ব্যবহার করা হয়েছিল। ভারতীয় সৈন্যদের ১৮৭৮ সালে যখন মাল্টায় পাঠানো হয়েছিল তখন ইংল্যাণ্ডে নিম্নোক্ত ব্যঙ্গাত্মক ছড়াটির উদ্ভব হয়েছিল: "আমরা যুদ্ধ করতে চাই নে, কিন্তু জিঙ্গোর নামে যদি করেও ফেলি (তবু) নিজেরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাব না, পাঠাব নিরীহ হিন্দুকে।"[৭৯]

১৮৬৭ সালের আবিসিনিয়ার যুদ্ধ—যার ফলে কিছুটা আর্থিক সঙ্কট হয়েছিল সেটা এর একটা প্রমাণ।[৮০] আবিসিনিয়াতে ভারতীয় সৈন্যদের অতিরিক্ত বা বিশেষ ব্যয় ব্রিটেন বহন করেছিল, কিন্তু সাধারণ খরচ ভারতের উপর চাপানো হয়েছিল। গভর্নর-জেনারেল Lawrence এই বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য বিবরণী লিখেছিলেন: "এই যুদ্ধে ভারতের কোনও প্রত্যক্ষ স্বার্থ নেই······বর্তমান রুলিং সম্পর্কে পূর্ব উদাহরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে, কিন্তু আসল কথা এই যে এই সব পূর্ব উদাহরণগুলি সুবিচার অথবা ন্যায্য ব্যবহারের ভিত্তিতে হয়েছিল কি? ইংল্যাণ্ড যখন ভারতকে সৈন্য ধার দেয় তখন কি সে একই নীতি অনুযায়ী চলে? ······ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ সৈন্যদের জন্যই শুধু ভারত সৈন্য যোগায় না, সেই সঙ্গে সৈন্যদের প্রশিক্ষণের জন্য এবং যথাযথ সংখ্যা বজায় রাখার জন্যও খরচ যোগায়। ইংল্যাণ্ড থেকে সৈন্যদের যাতায়াতের খরচও ভারত যোগায়······।"[৮১] ভারতের বাইরে থাকার সময়ে ভারতীয় সৈন্যদের সাধারণ খরচ ভারতের বহন করার নীতি যদি পরিবর্তিত না হয় তবে "ভারতীয়দের এই ধারণাই হবে যে ইংল্যাণ্ডের স্বার্থে এক ধরনের নীতি অনুসৃত হয় আর ভারতের জন্য হয় ভিন্ন নীতি, এবং উভয়ই শেষোক্ত দেশের বিরুদ্ধে যায়"।[৮২] এ রকম লাগসই প্রকাশ্য নিন্দা এমন কি ভারতের জাতীয়তাবাদী মুখপাত্রদের লেখাতেও কদাচিৎ

মেলে। ভারতীয়দের এ থেকে কি ধারণা হতে পারে সে ব্যাপারে Lawrence-এর মত Mayo-ও উদ্বিগ্ন ছিলেন : "এর ফলে এ দেশে এমন অসন্তোষ দেখা দেবে যা প্রশমিত করা কঠিন হবে এবং তা প্রায় বিপজ্জনকও হয়ে উঠতে পারে।"[৮৩]

১৮৬৭ সালে Marquess of Salisbury বলেছিলেন যে ভারতকে 'প্রাচ্যের সমুদ্রে একটি ইংরেজ ব্যারাক'[৮৪] হিসাবে দেখা উচিত নয়। বাস্তবে অবশ্য ভারতের সৈন্যবাহিনীকে একটি সংরক্ষিত বাহিনী (Reserve Force) হিসাবেই গণ্য করা হত, এবং ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে ভারতে রাখা হত ও ভারতের রাজস্ব থেকেই তাদের খরচ চালানো হত। Sir Charles Dilke দেখিয়েছিলেন যে ভারত সরকারের সঙ্গে ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্রিটেনকে ৭০ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য ভারতের খরচে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যাতে বিপদের সময় তাদের পাওয়া যায়।[৮৫] সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ভার ভারতকে দিয়ে বহন করানো যেত এবং ইংল্যাণ্ডে যেসব বাধা ছিল—পার্লামেন্টের আইনের দরুন আইনগত বাধা ও আর্থিক বাধা—সেসব থেকে ভারত সরকার মুক্ত ছিল।[৮৬] সুতরাং সামরিক অর্থ বরাদ্দের প্রশ্নটি কেবল ভারতের স্বার্থ বিবেচনা করেই নির্ধারিত হত না; ভারতের আশু পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের বাইরে 'সাধারণ বিবেচনাবলীকে হিসাবের মধ্যে রাখা হত।[৮৭] হাউস অব কমন্সের ভারতীয় অর্থ-বিষয়ক সিলেক্ট কমিটি ১৮৭৪ সালে "এই রকম একটা ধারণা পেয়েছিল······যে কতকগুলি ক্ষেত্রে এমন সব খরচ ভারতের উপর চাপানো হয়েছিল যা ইংল্যাণ্ডেরই বহন করা উচিত ছিল। যাই হোক আপনাদের কমিটিতে বিভিন্ন সাক্ষী অবশ্য বলেছেন যে বিভিন্ন ইংরেজ বিভাগে এমন একটা সদিচ্ছা রয়েছে যে ভারতের উপর কোনও অনুচিত ব্যয়ভার চাপানো না হয়।"[৮৮] ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ সব সময়েই ভারতের প্রতি অবিবেচক ছিলেন না, কিন্তু, গভর্নর-জেনারেল Lawrence-এর ভাষায়, 'তাঁদের স্বাভাবিক মানসিক প্রবণতা' ছিল 'ইংল্যাণ্ডের করদাতাদের অব্যাহতি দেওয়া'।[৮৯] তাঁদের রাজস্বের নিরাপত্তা বিপন্ন না করে তাঁরা ভারতের সামরিক ব্যয় হ্রাস করতে চেয়েছিলেন এবং সৈন্যবাহিনী নিয়োগ ও তার ব্যায়ভার বহনের ক্ষেত্রে তাঁরা এই নীতিতে চলতেন যে ভারতের স্বার্থ গ্রেট ব্রিটেনের বৃহত্তর সাম্রাজ্যিক স্বার্থের অধীন।

॥ ৩ ॥

ভারতে রেলপথের বিকাশ ভারতে রাষ্ট্রীয়-সাহায্যপ্রাপ্ত ব্রিটিশ শিল্পোদ্যোগের (entrepreneurship) এক কৌতূহলোদ্দীপক উদাহরণ। ১৮৪৯ থেকে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ভারত সরকার রেল কোম্পানিগুলিকে জমি দিয়েছিল যার জন্য কোম্পানিকে দাম দিতে হয় নি।[২০] সরকার একটা সর্বনিম্ন সুদের গ্যারাণ্টি করেছিল—সাধারণতঃ নিরানব্বই বছর ধরে আদায়ীকৃত মূলধনের উপর ৫ শতাংশ। চালু রাখা ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ এবং সংরক্ষিত তহবিলের (reserve fund) অর্থ কেটে রেখে অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত প্রথম ব্যবহার করার কথা চলতি ৫ শতাংশ সুদ মেটানোর জন্য (ভারত সরকার যাতে এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়)। অবশিষ্টাংশ ভারত সরকারের (অতীতে যে গ্যারাণ্টি করা সুদ আগাম দেওয়া হয়েছিল সেই আগাম পরিশোধ হিসাবে) এবং রেল কোম্পানির মধ্যে সমভাবে ভাগ হত। সরকারের দেওয়া আগাম যখন পুরোপুরি শোধ হয়ে যেত তখন সমস্ত মুনাফাটাই রেল কোম্পানির প্রাপ্য হত। প্রত্যেক রেল কোম্পানির অধিকার ছিল রেল-লাইন ও অপরাপর যা-কিছু করা হয়েছে তা সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়ার এবং ব্যয়িত সমস্ত মূলধনের জন্য পূর্ণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার। ৯৯ বছরের লীজ শেষ হবার আগেই যে-কোনও সময়ে কোম্পানি এই অধিকার প্রয়োগ করতে পারত। ৯৯ বছর পরে রেলপথ ও অপরাপর যা-কিছু করা হয়েছে সেগুলি আপনা থেকেই ভারত সরকারের সম্পত্তি হয়ে যেত। সরকারের কাছে মালিকানা হস্তান্তরের পূর্বোক্ত নিয়ম দুটি পরস্পরে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। একটা রেল কোম্পানি গ্যারাণ্টি পাওয়া সুদ সহ চুক্তির সমস্ত সুবিধাগুলি ৯৮ বছর পর্যন্ত ভোগ করতে পারত, আর ঠিক যখন ৯৯ বছরের শেষে তার সম্পত্তি আপনা থেকে সরকারের কাছে (বিনা খেসারতে) ফিরে যাবার নিয়ম কার্যকর হতে যাবে তার পূর্বমুহূর্তে লাইনটা সরকারের হাতে ছেড়ে দিয়ে অন্ততঃ আইনত পুরো ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারত। সংক্ষেপে বললে এই চুক্তি রেল কোম্পানিগুলির গ্যারাণ্টি করা পাঁচ শতাংশ মুনাফাও সুনিশ্চিত করত, আবার সেই সঙ্গে হাত গোটানোর স্বাধীনতাও সুনিশ্চিত করত, আর "অ-লাভজনক ব্যবসার দায় রাষ্ট্রের হাতে ফেলে" রাখত।[২১]

একে 'রাষ্ট্রীয় ঝুঁকিতে ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগ' বলা হয়েছে। সেক্রেটারি

অব স্টেট Duke of Argyll Mayo-কে লিখেছিলেন "গ্যারান্টি পাওয়া কোম্পানিগুলি মোটেও ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগের স্থান নেয় না।"[৯২] এই কোম্পানিগুলি টাকা তোলার ও খরচ করার এজেন্সি ছাড়া আর কিছু নয়, শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত (entrepreneurial) ঝুঁকি সমস্তই রাষ্ট্রের। "এটা ইঙ্গিতবহ যে ভারতের রেলপথগুলির লোকসান হলে ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব নেবার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপের প্রধান প্রবক্তাদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটেনে অবাধনীতির হৃদকেন্দ্র ম্যাঞ্চেস্টারের উৎপাদকরা ও সেখান থেকে নির্বাচিত পার্লামেণ্ট সদস্যরা।"[৯৩]

আপাতদৃষ্টিতে এ যুক্তি সত্য বলে মনে হতে পারে যে গ্যারান্টি চুক্তিগুলির শর্ত অনুকূল ছিল না, তবু ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে একমাত্র এই পথই খোলা ছিল। Danvers, Chesney ও Strachey এই মত পোষণ করতেন।[৯৪] তাঁরা উল্লেখ করেছিলেন যে জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি-গুলির নিয়োগ রেলপথ নির্মাণের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে মূলধন যোগাড় ও বিনিয়োগ নিশ্চিত করে। ভারত সরকার যদি সরাসরি এই মূলধন যোগাড় করত তা হলে সে টাকা বোধ হয় অপরাপর উদ্দেশ্যে খরচ হয়ে যেত—বিশেষ করে বিদ্রোহের অর্থসঙ্কটের যুগে। কাজেই রেলপথের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হত। উপরন্তু ভারত ছিল বিনিয়োগের একটা নতুন ক্ষেত্র, কাজেই বিনিয়োগকারীরা স্বভাবতই আশা করতেন যে সরকার লোকসানের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব নেবে এবং কিছুটা উচুঁহারে সুদের গ্যারান্টি দেবে।[৯৫]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে ব্রিটিশ পুঁজি ভারতে এসেছিল তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ রেলপথে গিয়েছিল। মোটামুটি হিসাব করা হয়েছে যে ১৮৫৪ ও ১৮৬৯ সালের মধ্যে প্রায় ১৫ কোটি পাউণ্ড ব্রিটিশ মূলধন ভারতে নিয়োজিত হয়েছিল। এর মধ্যে প্রায় অর্ধেক গিয়েছিল রেলপথে। ১৮৫৮ ও ১৮৫৯ সালের মধ্যে ভারতীয় রেলপথে ব্যয়িত হয়েছিল ৭ কোটি ১ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড।[৯৬] গ্যারান্টির ব্যবস্থা মূলধন আকর্ষণে নিঃসন্দেহে সহায়ক হয়েছিল।

কিন্তু গ্যারান্টি ব্যবস্থার কতকগুলি সুস্পষ্ট ত্রুটি উড়িয়ে দেওয়া যেত না। (ক) গ্যারান্টি দেওয়া ৫ শতাংশ সুদ সরকারি ঋণপত্রের সুদের চেয়ে এক শতাংশ বেশি, অর্থাৎ ভারত সরকার যদি চাইত তা হলে আরও সস্তায় ধার পেত। ইংল্যাণ্ডে পাঠানো সুদ ইংল্যাণ্ডের খরচ (Home Charges) অনেক

বাড়িয়ে দিচ্ছিল এবং রেলপথে নিয়োজিত মূলধন যেহেতু বছরে বছরে বাড়ছিল, সুদের দরুন ব্যয়ও বেড়ে চলেছিল। এর ফলে ভারত সরকারের যে উদ্বেগ তা দূর করার জন্য সেক্রেটারি অব স্টেট উল্লেখ করেছিলেন যে "এই সুদের চরিত্র নিঃসন্দেহে অন্য সব (সুদের) থেকে তফাত, কারণ এটা শেষ পর্যন্ত সরকার ফিরে পাবে।"[৯৭] রেলপথ তৈরি যেমন শেষ হবে চলাচল ও মালবহন থেকে মোট পাওনাও তত বাড়বে এবং ভারতীয় রাজস্ব থেকে এই খরচটা কমবে। কিন্তু পরিশোধের সময় আসার ঢের দেরি ছিল, আর ইতিমধ্যে গ্যারাণ্টি দেওয়া সুদের খরচ একটা বড় বোঝা হয়ে উঠেছিল।

(খ) গ্যারাণ্টি চুক্তির আর একটা ত্রুটি ভারত সরকারের অনেক লোকসান ঘটাচ্ছিল। চুক্তিতে ব্যবস্থা ছিল যে, রেল কোম্পানিগুলি কর্তৃক তোলা মূলধন ইংল্যাণ্ডে ভারত সরকারের নামে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডে জমা পড়বে এবং কোম্পানির এজেণ্টরা ভারতে সরকারি কোষাগার থেকে টাকা প্রতি ১ শিলিং ১০ পেন্স বাঁধা হারে অর্থ নেবে। আলোচ্য সময়ে ভারত সরকার ও লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিসের মধ্যেকার হিসাব টাকা প্রতি ২ শিলিং হারে নিষ্পত্তি করা হত। কাজেই রেলপথ কোম্পানিগুলি ভারতীয় কোষাগার থেকে যে টাকা তুলতো তার প্রতি টাকায় ভারত সরকারের ২ পেন্স করে লোকসান হত।[৯৮] এই লোকসানটাকে হিসাবে 'বিনিময়ের দরুন লোকসান' বলে দেখানো হত।[৯৯] ১৮৬২-১৮৭২ সালের দশকে এই লোকসান প্রতি বছরে গড়ে ১ লক্ষ ৪২ হাজার পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছিল।[১০০] ১৮৬১-তে স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল সেক্রেটারি অব স্টেটকে অনুরোধ করেন যে 'এই আপত্তিজনক ধারাটি তুলে না দিয়ে'[১০১] যেন কোনও চুক্তির নবীকরণ না করা হয়, অথবা নতুন চুক্তি না করা হয়।

ভারত সরকার দাবি করে যে বিনিময়ের দরুন লোকসানের খরচের বোঝা বাৎসরিক রাজস্ব-আয়ের ঘাড়ে ফেলা উচিত নয়।[১০২] ভাইসরয়ের কাউন্সিলের ফিনান্স মেম্বার Samuel Laing ভারতের রাজস্ব-আয় থেকে 'বিনিময়ের দরুন লোকসানের' টাকা দেওয়ার নীতিগতভাবে বিরোধী ছিলেন।[১০৩] কিন্তু সেক্রেটারি অব স্টেট Sir Charles Wood পীড়াপীড়ি করেন যে চলতি রাজস্ব-আয় থেকেই এই খরচ মেটাতে হবে।[১০৪] তাঁর কাছ থেকে অনুমোদন না নিয়ে ১৮৬১-৬২ সালের বাজেট থেকে এই দফাটি বাদ

দেওয়ার জন্য Laing কড়া ভাষায় তিরস্কৃত হয়েছিলেন। 'বিনিময়ের দরুন লোকসান' ছাড়াও ভারত সরকারকে রেলপথের জমির জন্য ও তদারকির জন্য খরচ করতে হত।

(গ) চুক্তি অনুযায়ী ভারতে রেল কোম্পানিগুলির ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা রেল কোম্পানির কর্মকর্তা ও সরকারি অফিসারদের দিয়ে যুক্তভাবে করাতে হত। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সরকারের স্বার্থরক্ষা করা। কিন্তু হিসাব পরীক্ষার ব্যাপারে সেক্রেটারি অব স্টেট Wood ভারত সরকারকে নির্দেশ দিলেন "আপনাদের উচিত রেল কোম্পানিগুলির সঙ্গে উদার মনোভাব নিয়ে ব্যবহার করা, এত বৃহৎ আকারের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তা অত্যাবশ্যক...।[১০৫] বস্তুতঃ রেল কোম্পানিগুলির ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার ব্যর্থ হল। ১৮৫৮ সালে Canning এবং ১৮৬১ সালে Sir W. Denison উল্লেখ করেন যে (সম্ভবতঃ রেল ও সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে দায়িত্ব বিভাজনের দরুন) রেল কোম্পানিগুলির অঢেল খরচ ঠেকানো যায় নি।[১০৬] ১৮৭২ সালের সিলেক্ট কমিটির কাছে সাক্ষ্য প্রদানের সময় Lord Lawrence, Sir Arthur Cotton, Major Chesney, W. N. Massey, William Thornton ও অন্যান্যরা এক বিষয়ে একমত ছিলেন—তা হল ভারতে রেলপথ নির্মাণের খরচ অসাধারণ বেশি হয়েছে।[১০৭] "এটা সুস্পষ্ট যে আমরা যে ৫ শতাংশের গ্যারাণ্টি দিই তা বহুল পরিমাণে মিতব্যয়িতা—যা ব্যক্তিগত মালিকানার অন্যতম বড় সুবিধা—তাকে নষ্ট করে।"[১০৮] এইখানে Duke of Argyll রোগটা ঠিক ধরেছিলেন। রেলপথ চুক্তিগুলি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'দ্বৈত শাসনের অস্বাভাবিক ব্যবস্থা' সম্বন্ধে কোনও কিছু করা গেল না।[১০৯]

(ঘ) রেল কোম্পানির সঙ্গে সরকারের সম্বন্ধ থেকে উদ্ভূত আর একটা সমস্যাও খেয়াল করা দরকার। সাধারণতঃ রেলপথ নির্মাণের জন্য কোম্পানিকে ভারত সরকার আগাম দিত—ইংল্যাণ্ডের কোষাগারে রেল-কোম্পানি যা জমা দিত ব্যয় তা ছাড়িয়ে গেলেও এই আগাম দেওয়া হত, দুইয়ের মধ্যেকার তফাতটা কোম্পানির নামে ধার হিসাবে লেখা থাকত। এই ছিল সেক্রেটারি অব স্টেটের নির্দেশ।[১১০] রেল কোম্পানিগুলি প্রায়ই জমার থেকে বেশি টাকা তুলে নিত এবং ভারতে সরকারি কোষাগার থেকে তাদেরকে প্রদত্ত অর্থের সমপরিমাণ ইংল্যাণ্ডে তাড়াতাড়ি জমা দিত না। এতে

গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হত। উদাহরণস্বরূপ ১৮৬০ সালে ভারত সরকারকে রেলপথকে আগাম দেওয়া কমিয়ে দিতে হয়েছিল, ফলে কতকগুলো লাইন তৈরি শেষ হতে দেরি হয়ে গিয়েছিল।[১১১] সেক্রেটারি অব স্টেট ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ নেবার জন্য পার্লামেণ্টের অনুমোদন নিয়েছিলেন, কারণ রেল কোম্পানিগুলি ভারত থেকে পাওয়া অর্থ শোধ দিতে পারছিল না।[১১২] ১৮৬১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সঙ্কট আরও ঘনীভূত হল, সেক্রেটারি অব স্টেট সতর্ক করে দিলেন যে ভারত সরকার রেল কোম্পানিকে টাকা দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিতে পারে।[১১৩] ধার নেওয়ার জন্য আগে পার্লামেণ্ট থেকে যে অনুমতি নেওয়া হয়েছিল ১৮৬১ সালের গোড়ার দিকে সেক্রেটারি অব স্টেট তাকে কাজে লাগাতে ঠিক করলেন।[১১৪] এতে ভারত সরকারের সঙ্কট উত্তীর্ণ হতে সাহায্য হল। রেল কোম্পানিগুলির জমার বেশি টাকা নেওয়ার অভ্যাসের দরুন সরকার ১৮৬৬-৬৭-তে আবার অসুবিধায় পড়ল। ভারত সরকারের হাতে নগদ টাকা কম ছিল, সেক্রেটারি অব স্টেটকে অনুরোধ করা হয়েছিল যাতে রেল কোম্পানিগুলি তাড়াতাড়ি পাওনা মেটায় এবং তাদের নামে জমা মূলধনের অঙ্ক বাড়ায় তার ব্যবস্থা করতে।[১১৫] ১৮৬৬-৬৭ সালের মধ্যে ভারতে রেল কোম্পানিগুলিকে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল তা ইংল্যাণ্ডে তাদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থের চেয়ে ২৬ লক্ষ ১২ হাজার পাউণ্ড অতিরিক্ত হয়ে গিয়েছিল।[১১৬] অতএব যে তথাকথিত গ্যারাণ্টি ব্যবস্থায় ভারতে রেলপথ নির্মিত হয়েছিল এইগুলিই ছিল তার প্রধান ত্রুটি। এই সব ত্রুটি দূর করার জন্য ভারত সরকার (ক) অঢেল খরচ ঠেকানোর জন্য ব্যয়ের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ শক্ত করার নীতি নিল, (খ) বিনা গ্যারাণ্টিতে নতুন কোম্পানি দিয়ে রেলপথ তৈরির এবং বর্তমান কোম্পানিগুলির সঙ্গে চুক্তি বদলানোর জন্যও ভারত সরকার চেষ্টা করতে লাগল, (গ) উপরন্তু, সরকার ঠিক করল নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় নিজে মূলধন যোগাড় করে রাষ্ট্রীয় রেলপথ তৈরি করবে।

(ক) রেল কোম্পানিগুলির ব্যয়ের সরকারি হিসাব পরীক্ষা কর্মকর্তারা করতেন। Sir Charles Wood মন্তব্য করেছিলেন যে "এই পর্যালোচনাই সরকারের ও অংশীদারদের স্বার্থের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ এবং এতে শেষোক্তদের কোনও খরচ নেই"।[১১৭] ১৮৬৪ সালের আগে এই তদারকি বিশেষ কার্যকর হয় নি, কার্যকর হল ১৮৬০ সালে পূর্তকর্ম

বিভাগের অ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেলের পরামর্শে অর্থগ্রহণের হিসাব পরীক্ষা (Appropriation Audit) ও তার সঙ্গে কিছু ছোটখাট সংস্কার প্রবর্তিত হবার পর।[১১৮] প্রত্যেক রেল কোম্পানির দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন সরকারি পরীক্ষক মূল ভাউচারগুলির সঙ্গে মিলিয়ে হিসাব পরীক্ষা করতেন। কিছু সময় পরে পরে আয় ও ব্যয়ের হিসাব তৈরি হত ও সরকারের কাছে পেশ করা হত।[১১৯] Argyll Mayo-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন হিসাব পরীক্ষা ও হিসাব রাখার ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধির মারফত গ্যারাণ্টি দেওয়া রেলপথগুলির দরুন লোকসান ঠেকানোর জন্য।[১২০] ১৮৭১ সালে সেক্রেটারি অব স্টেটের অনুমোদন পাওয়া যাবে ধরে নিয়ে ভারত সরকার গ্যারাণ্টিপ্রাপ্ত রেল কোম্পানিগুলির হিসাব পরীক্ষার জন্য একদল হিসাব-পরীক্ষক নিয়োগ করল[১২১] পরবর্তীকালে ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ এ নিয়োগ অনুমোদন করেছিল।[১২২]

রেল কোম্পানিগুলির জমার চেয়ে বেশি টাকা নেবার অভ্যাসের জন্য ভারত সরকার অনেক সময়ে অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়ত। ভারতে রেল কোম্পানিগুলির প্রদত্ত আগাম তাড়াতাড়ি পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য ভারত সরকার প্রস্তাব করল রেল কোম্পানিগুলি জমার উপর বাড়তি যে টাকা নেবে তার উপর ৫ শতাংশ হারে সুদ ধার্য করা হোক।[১২৩] সেক্রেটারি অব স্টেট Northcote স্বীকার করেন যে চুক্তিতে যখন এ রকম আগাম দেবার কথা নেই তখন ন্যায়তই সুদ ধার্য করা যেতে পারে। এইভাবে যে অঙ্ক ধার্য হবে তা গ্যারাণ্টি দেওয়া সুদের দরুন ভবিষ্যতে রেল কোম্পানির কাছ থেকে পাওনা অঙ্কের সঙ্গে যুক্ত হবে।[১২৪] সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কোষাগারে তাদের যে আয় জমা হবে তা থেকে সরকার তাদের যে আগাম দিয়েছে সেই টাকা কেটে নিয়ে বাকি টাকার জন্য রেল কোম্পানিকে সুদ দেওয়া হবে।[১২৫]

(খ) গ্যারাণ্টি দেওয়া সুদের ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত সমস্যাবলী এড়ানোর জন্য ভারত সরকার গ্যারাণ্টি ছাড়া কিছু হাল্কা উপ-রেলপথ (feeder line) তৈরি করানোর চেষ্টা করল।[১২৬] কিন্তু দেখা গেল যে প্রতি মাইলে ১০০ পাউণ্ড করে অনুদান দিতে হচ্ছে এবং এই অনুদানও মূলধন আকর্ষণের পক্ষে যথেষ্ট হচ্ছে না।[১২৭] শেষ পর্যন্ত পুরানো গ্যারাণ্টি দেওয়া চুক্তির ধারাতেই কিছু সুবিধা দিতে হল। তবে নতুন চুক্তিগুলি কতকগুলি

ব্যাপারে, বিশেষ করে বিনিময় হার ও ব্যয়ের উপর উন্নততর সরকারি নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে ভারতীয় স্বার্থের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অনুকূল হল।[১২৮]

১৮৪৯ সালে ও পরবর্তী বছরগুলিতে যেসব গ্যারাণ্টি দেওয়া সুদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেগুলোর বদল হল ১৮৬৯ সালে। সেক্রেটারি অব স্টেট Argyll রেল কোম্প্যানিগুলিকে একটা সংশোধিত চুক্তিতে রাজী হতে বললেন, সে চুক্তিতে বলা হল উদ্বৃত্ত নীট মুনাফার অর্ধেক ভারত সরকার বরাবর পাবে। তিনি মনে করলেন যে দরকষাকষির দিক থেকে এই লেনদেন ভারত সরকারের পক্ষে অনুকূল হবে আর বিনিময়ে রেল কোম্পানিকে দুটি সুবিধা দিতে রাজী হলেন। প্রথমটি হল গ্যারাণ্টিপ্রাপ্ত সুদের জন্য ভারত সরকার যেসব আগাম দিয়েছিল তার দরুন সমগ্র দেনাটা বাতিল করা হবে, কোম্প্যানিগুলিকে এই দেনা শোধ করতে হবে না। দ্বিতীয়তঃ, Argyll এ আশ্বাসও দিলেন যে সরকার আগামী ২৫ বছরের মধ্যে রেল-লাইন কিনবে না। বেশিরভাগ রেল কোম্প্যানিই এই শর্ত মেনে নিল।[১২৯] গভর্নর-জেনারেল এই ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন করে সেক্রেটারি অব স্টেটকে লিখলেন।[১৩০] Argyll-এর কাছে ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে, যাতে সরকারি লেখালেখির চেয়ে অনেক বেশি দ্বিধাহীন-ভাবে মত প্রকাশ করা যেত তাতে Mayo অভিযোগ করলেন রেল কোম্পানি-গুলির সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রতিক বন্দোবস্তের ফলে "কেবল আমাদের করদাতাদের উপর একটা অপ্রয়োজনীয় ভারী বোঝা চাপানোই হবে না, বিপুল পরিমাণ ইংরেজ মূলধনকে একটা প্রায় অনির্দিষ্টকালের জন্য ভারতে আটকে রাখাও হবে"।[১৩১] গ্যারাণ্টি ব্যবস্থার গুরুতর ত্রুটিগুলি সম্পর্কে অচেতন না থাকলেও Argyll ভাবলেন 'গ্যারাণ্টি ব্যবস্থা আংশিকভাবে টিকিয়ে রাখা' যুক্তিযুক্ত।[১৩২] তিনি আশা করেছিলেন যে রেলপথগুলি সম্পূর্ণ হলে যাত্রী ও মাল চলাচলের আয় ও নীট মুনাফা বাড়বে এবং আগাম বাবদ রেল কোম্পানিকে যে টাকা ভারত সরকার দিয়েছে তার জন্য কোম্পানির কাছ থেকে তার যে বকেয়া পাওনা আছে তা ছেড়ে দেবার দরুন সরকারের যে ক্ষতি হবে মুনাফার অর্ধেক পেলে তা পূরণ হয়ে যাবে।

(গ) গ্যারাণ্টি ব্যবস্থা সম্পর্কে মোহমুক্ত হয়ে ভারত সরকার ষাটের দশকের শেষে রাষ্ট্রীয় রেলপথ তৈরি শুরু করার সিদ্ধান্ত করল। এই

সিদ্ধান্তে আসতে ভারত সরকারের অনেক সময় লাগল ; সে একটা নতুন ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল। এটা অস্বাভাবিক নয় যে তথাকথিত 'পেটার্নালিস্ট' চিন্তাধারার শরিক Lord Lawrence-ই ব্যাপারটা শুরু করলেন। Laing ও Frere-র মত কিছু লোক ছিলেন যাঁরা রেলপথের বিকাশে রাষ্ট্রীয় এজেন্সির বদলে ব্যক্তিগত এজেন্সি পছন্দ করতেন।[১৩৩] কিন্তু পূর্তকর্মের বিষয়ে স্বীকৃত বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশ যথা Thornton (ইণ্ডিয়া অফিসের পূর্ত বিভাগের প্রধান), Chesney (পূর্ত বিভাগের অ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেল), R. Strachey (পূর্ত বিভাগের সেক্রেটারি) এবং সেই সঙ্গে Lord Lawrence-এরও স্থির মত ছিল যে রাষ্ট্রীয় রেলপথ গ্যারাণ্টি দেওয়া রেলপথের চেয়ে ঢের সস্তা ও সুব্যবস্থিত হবে।[১৩৪] গোড়ায় অবশ্য রেলপথ নির্মাণে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের চিন্তায় কিছু আপত্তি উঠেছিল, ১৮৬৭ সালে উপস্থাপিত Lawrence-এর প্রস্তাব ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের আনুকূল্য পায় নি।[১৩৫] তৎকালীন সেক্রেটারি Northcote চালু-ব্যবস্থাকে ওলট-পালট করতে অনিচ্ছুক ছিলেন, যদিও তিনি স্বীকার করেছিলেন যে অ-লাভজনক রাজনৈতিক লাইনগুলি (অর্থাৎ যেগুলি নিরাপত্তার দিক থেকে প্রয়োজনীয়) রাষ্ট্রকর্তৃক গৃহীত হওয়া উচিত।[১৩৬] এর অল্প দিনের মধ্যেই Nortcote-র জায়গায় Argyll এলেন এবং Lawrence-এর জায়গায় এলেন Mayo। রাষ্ট্রীয় রেলপথ পরিকল্পনা চালু করার জন্য Argyll ও Mayo পাল্লা দিতে শুরু করলেন। Argyll Mayo-কে লিখলেন "ওই (গ্যারাণ্টি দেওয়া) ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমার চেয়ে কড়া মনোভাব আর কারও নেই। Lawrence সমর্থন করছেন তা জানার অনেক আগেই প্রত্যক্ষ সরকারি নির্মাণের প্রশ্নটি আমি তুলেছিলাম ......।"[১৩৭] Argyll তাঁর রাষ্ট্রীয় রেলপথ পরিকল্পনার জন্য মন্ত্রীসভার অনুমোদন যোগাড় করলেন।[১৩৮] Mayo-ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে সরকারি নির্মাণের পক্ষে বলতে লাগলেন। "নির্মাণের কাজ যতই হোক, যার জন্য মূলধন যোগাড় করা যায় এবং রাজস্ব থেকে সুদ দেওয়া যায়, তেমন কাজ ভারত সরকার করতে পারে না এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই।"[১৩৯] ভারত সরকার সরকারি নির্মাণের কথাটা সরকারিভাবে আবার তুলল এবং এবার দুটো রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনায় অনুমোদন আদায় করল।[১৪০] সরকারি নির্মাণের পক্ষের যুক্তি Argyll স্পষ্ট করে উপস্থিত করলেন ঃ

"আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ ঋণপত্রের মারফত ৪ শতাংশ সুদে টাকা যোগাড় করতে পারি—কোম্পানিকে যেখানে আমরা ৫ শতাংশ সুদের গ্যারান্টি দিচ্ছি—আর এ ছাড়াও সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত মুনাফার উপর আমাদের অধিকার আমরা ছেড়ে দিই।…… আমার ইচ্ছা একটা বিরাট রেলপথ বিভাগ তৈরি হোক—রেলপথের কাজের জন্য একান্তভাবে প্রযোজ্য পৃথক ঋণ সংগ্রহ করুক—একদল সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে চুক্তি অনুযায়ী সে অর্থ খরচ করুক এবং ডিরেক্টর ইত্যাদি—যারা কেবল সেই কাজই করতে পারে যা আমরা ঢের ভাল করে করতে পারি তাদের 'দ্বৈত শাসন' সম্পূর্ণ বাদ দিক।"[১৪১] Argyll যেসব প্রশ্ন তুলেছিলেন তার মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে রেল কোম্পানিগুলির মারফত মূলধন সংগ্রহ করার যে কায়দা তাতে ভারতীয় মূলধন সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে কেবল ব্রিটিশ মূলধনই নিয়োজিত হয়। "ভারতের দেশীয় লোকদের আমাদের ঋণে আরও বেশি করে বিনিয়োগ করতে যদি আমরা উৎসাহিত করতে পারি তা হলে একটা বড় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে। আমায় এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করতে দিন যে আমাদের রাষ্ট্রীয় ঋণে এখন তাঁরা যে অংশ নেন তা কমে যাচ্ছে……রেলপথ সংক্রান্ত যে ৮ কোটি বিনিয়োগ হয়েছে তার মধ্যে তাঁরা যুগিয়েছেন এক কোটির খুব বেশি নয়।"[১৪২] তিনি আশা করেছিলেন ভারত সরকার বাজারে ঋণপত্র ছাড়লে ভারতীয় মূলধন আকৃষ্ট হবে। হাউজ অব লর্ডস-এ তাঁর অর্থ-বিষয়ক বিবৃতিতে Argyll মন্তব্য করেছিলেন যে রাষ্ট্রীয় এজেন্সি "টাকা তোলার কম অমিতব্যয়ী কায়দা এবং টাকা খরচেরও কম অমিতব্যয়ী কায়দা।"[১৪৩] Argyll যে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার চেয়ে ঢের বেশি বিরোধিতার তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় রেলপথ পরিকল্পনার গোড়ার দিকে তিনি Mayo-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন এ বিষয়ে চুপচাপ থাকতে। "বর্তমানে এ প্রশ্নটিকে খুব গোপন রাখা ভাল হবে। বহু স্বার্থ এ প্রস্তাবে শঙ্কিত হবে।"[১৪৪] কিন্তু তাঁর সুনিপুণ চালের দরুন এবং প্রস্তাবটা পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে উপস্থাপনার দরুন পরিকল্পনাটি মসৃণভাবে শুরু হয়ে গেল। অবাধনীতি বর্জিত হল। ১৮৭২ সালে ভারতীয় অর্থব্যবস্থা সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটির তদন্তের সময়ে সাক্ষ্যদানকারী কেউই রেলপথ নির্মাণে সরাসরি সরকারি অংশগ্রহণের সুবিধা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন নি।

রেলপথ বিকাশের প্রভাব—আঞ্চলিক বিশিষ্ট জ্ঞান অর্জন, বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি, শিল্পোদ্যোগের ও লোক নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি, মানুষকে যাতায়াতে উৎসাহিত করা, দরের ও মজুরির উপর প্রভাব ইত্যাদি—কেবল অনুভূত হতে শুরু করেছিল। Willson (ইণ্ডিয়া বোর্ড অব কন্ট্রোলের সদস্য হিসাবে ও পরে ভারতে ফিনান্স মেম্বার হিসাবে) যিনি রেলপথের বিকাশ শুরু করার নিমিত্ত হয়েছিলেন, তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে "এ যেসব সুবিধা দিতে পারে বলে ভাবা হচ্ছে তা এ পর্যন্ত যা কিছুর অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে তার চেয়েও বেশি।......"[১৪৫] আমরা দেখেছি অর্থ-বিষয়ক বিচারে যে গ্যারাণ্টি ব্যবস্থায় রেলপথ নির্মিত হয়েছিল তা ভারত সরকারের কাছে একটা লোকসানের উৎস ছিল। কিন্তু আমরা উল্লেখ করেছি যে ন্যায়সঙ্গত আশাবাদ নিয়ে কর্তৃপক্ষ সেই সময়ের দিকে চেয়েছিলেন যখন রেলপথ লাভের উৎস হয়ে উঠবে। আশা করা হয়েছিল সরকার লাভজনক লাইনগুলি থেকে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করবে, আবার অপ্রত্যক্ষভাবেও লাভ করবে। Cranborne John Lawrance-কে লিখেছিলেন "প্রতি বছর এগুলি (রেলপথগুলি) নিরর্থক বিলম্বিত হচ্ছে, আর ফলতঃ ভবিষ্যতে অর্থ-যোগানদারকে (সেই) অপ্রত্যক্ষ করের বর্ধিত আদায় থেকে বঞ্চিত করছে যার দিকে ক্রমাগত ও অনিবার্য খরচ বৃদ্ধি মেটানোর জন্য তাকে চাইতেই হবে।"[১৪৬]

॥ ৪ ॥

১৮৫৪ সাল পর্যন্ত ভারতে পূর্তকর্মের কোনও পৃথক বিভাগ ছিল না। পূর্তকর্মের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে তদারকি সংস্থা হিসাবে কাজ করার জন্য একটা করে সামরিক বোর্ড ছিল, তাতেই চলে যেত কারণ পূর্তকর্মের খরচের অধিকাংশ (পরিমাণের দিক থেকে নগণ্য) সামরিক নির্মাণের দরুনই হত। ১৮৫৪ সালে Dalhousie-র প্রশাসনের আমলে একটা পৃথক পূর্তকর্ম বিভাগ খোলা হল। এটা একটা মোড় ঘোরার সূচনা করল। সামরিক বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ থেকে পূর্তকর্মকে সরিয়ে নেবার পর বেসামরিক কাজকর্মের দিকে, অর্থাৎ বেসামরিক ঘরবাড়ি,

রাস্তা, বাঁধ, খাল ইত্যাদি নির্মাণ ও সেচ কাজের দিকে বেশি বেশি নজর পড়তে শুরু করল। পূর্তকর্মের অগ্রগতির জন্য পাওয়া তহবিল ১৮৪৯-৫০ সালে সামান্য ষাট লক্ষ ছিল, ১৮৫৬-৫৭ সালে পূর্তকর্মের জন্য খরচ দাঁড়িয়েছিল প্রায় ২২৫ কোটি টাকায়। দেখা যাচ্ছে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে তার মেয়াদের প্রায় গোটা আমলটায় পূর্তকর্মকে অবহেলা করে শেষ তিন চার বছরে হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠেছিল।[১৪৭] "কোম্পানি তার রাজত্বকে সেইভাবে দেখত যেভাবে একজন প্রাচ্য স্বৈরাচারী তার জমিদারিকে দেখে—শোষণ করার জন্য, উন্নয়নের জন্য নয়—একটা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক তফাত এই যে ইউরোপীয় জমিদার ছিল অন্যত্র বসবাসকারী" (absentee)।[১৪৮]

বিদ্রোহের সময়ে উত্তর ভারতে দলিলপত্র নষ্ট হওয়া, প্রশাসনিক কাজকর্মের ওলট-পালট এবং হিসাব রাখার যথেষ্ট মনোযোগের অভাবের দরুণ ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ সালে পূর্তকর্মের জন্য খরচের সঠিক হিসাব পাওয়া কঠিন। বেসামরিক নির্মাণ প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ বিদ্রোহের বছরে ও তার ঠিক পরে গুরুতরভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়। ষাটের দশকে পূর্তকর্মের বরাদ্দ ধীরে ধীরে উঠতে থাকে, ১৮৬০-৬৫ সালের মধ্যে গড়ে ৪·৭ কোটি টাকা থেকে এই দশকের দ্বিতীয়ার্ধে গড়ে ৬·৮ কোটি টাকায় ওঠে। ১৮৬৭-৬৮-র পর থেকে পূর্তকর্মের ব্যয় অংশত নির্বাহ হত ঋণ থেকে ('বিশেষ বা অতিরিক্ত ব্যয়' নামে পরিচিত) এবং অংশত রাজস্ব থেকে ('সাধারণ ব্যয়' নামে পরিচিত)। ১৮৭১-৭২ সালে পূতকর্মের জন্য মাথাপিছু ব্যয় মোটামুটি হিসাব করা যায় কারণ সে বছরে একটা লোক-গণনার ভিত্তিতে জনসংখ্যা সংক্রান্ত কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। 'সাধারণ' পূর্তকর্মের জন্য মাথাপিছু ব্যয় অত্যন্ত কম ছিল বাংলায় (০·১০৭ টাকা), মাদ্রাজে (০·১০৬ টাকা) ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ-গুলিতে (০·১৯ টাকা); আর কেবল সামান্য বেশি ছিল পাঞ্জাবে (০·৩৪) ও বোম্বাইতে (০·৫৩)।[১৪৯]

সরকারের পূতকর্ম সংক্রান্ত নীতি সম্বন্ধে জাতীয়তাবাদী মুখপাত্রদের প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে অনুন্নয়নমূলক খরচ বাড়ার ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল এবং রাজস্বের যে অনুপাত উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হত তা এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকছিল, নয় কমছিল। সরকারের জাতীয়তাবাদী

সমালোচকরা তাঁদের সোজা-সাপ্টা কায়দায় রাস্তা, খাল, বাঁধ, অ্যানিকাট, বন্দর ইত্যাদির দরুন ব্যয়কে উন্নয়ন ব্যয় হিসাবে ধরতেন, আর বিচারালয়, জেল ইত্যাদি বেসামরিক ঘরবাড়ি এবং সামরিক ব্যারাক—যা স্পষ্টতই একটা পৃথক জাতের ছিল—সেগুলিকে অনুন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে ধরতেন। জাতীয়তাবাদী মুখপাত্ররা অনুন্নয়নমূলক ব্যয় হিসাব করার যে ভিত্তি ধরেছিলেন সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। তবে এটা লক্ষ্য করবার যে ভাইসরয় ও তাঁর কাউন্সিলেরও এ বিষয়ে দ্বিধা ছিল। সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে পাঠানো এক বার্তায় স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল মন্তব্য করেছিলেন যে ষাটের দশকের শেষের দিকে "সামরিক নির্মাণে ব্যয়, যে ব্যয় জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে না, তার অনুপাত অনেক বেড়েছে⋯ ⋯"।[১৫০]

ভারতের বিশাল চাহিদার তুলনায় রাস্তা ও সেচকার্যের জন্য অর্থ-সংস্থানের অপ্রতুলতা একটা সুস্পষ্ট পথই দেখাচ্ছিল: "ঋণ তুলে আয় বাড়ানো। কিন্তু তৎকালে সরকারের ঋণ নেওয়া সম্পর্কে বেশ কিছুটা বদ্ধ বিরূপতা ছিল, এই বিরূপতার ভিত্তি ছিল রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণের মধ্যে কৃত্রিম তুলনা। Henry Fawcett-এর (কেম্ব্রিজে অর্থনীতির অধ্যাপক, পার্লামেণ্টের সদস্য এবং ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতির জন্য খ্যাত) সূত্র একটা নমুনা: রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়ের পক্ষেই সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার হল সংস্থানের অতিরিক্ত কায়দায় জীবনযাত্রা নির্বাহ করা, ঋণের বোঝায় নিজেকে প্রপীড়িত করা।"[১৫১] রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থার এই গোঁড়া ভিক্টোরিয়ান বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন সরকার যদি ঋণ নেওয়া যতটা সম্ভব পরিহার না করে তা হলে 'সরকারের দেউলিয়া হবার' বিভীষিকা দেখা দেবে।[১৫২] লণ্ডনের মুদ্রার বাজারে ভারত সরকার যে শর্তে ঋণ পেতে পারত তা অনুকূল ছিল, আর একটা সাম্রাজ্যিক গ্যারাণ্টি পেলে তা আরও ভাল হত। কিন্তু এ যুক্তি হাজির করা হত যে ঠিক যেমন একটা ব্যক্তিগত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কেবল ধার করে গেলে বাজারে তার সুনাম ক্ষুণ্ণ না হয়ে পারে না, তেমনি কোনও সরকারও অনুরূপ ঝুঁকি না নিয়ে ব্যাপকভাবে ধার করতে পারে না। চালু মত ছিল যে সরকারের উচিত ঋণ গ্রহণ যতদূর সম্ভব পরিহার করা। ধার যদি নেওয়াই হয় তা হলে তা কেবল 'লাভজনক' সেচ কাজের জন্য খরচ করা হোক যাতে সুদ উশুল হয়ে আসে।

১৮৬৪-৬৫ সালে ভারত সরকার ও সেক্রেটারি অব স্টেটের পত্র বিনিময়ের মধ্যে এই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। ১৮৬৪ সালের আগস্ট মাসে সেক্রেটারি অব স্টেট ভারত সরকারকে বলেছিলেন বিদ্রোহোত্তর বছরগুলিতে আর্থিক অনটনের জন্য সেচ কাজে এ যাবৎকাল যে স্বল্প মনোযোগ দেওয়া হয়েছিল তার বদলে এখন সেদিকে অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে। সেক্রেটারি অব স্টেট জানিয়েছিলেন যে প্রয়োজন হলে ঋণ গ্রহণেও তিনি প্রস্তুত।[১৫৩] ভারত সরকার ৪ অথবা ৫ কোটি স্টার্লিং ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করল যে ঋণ কয়েক বছর ধরে ছড়ানো হবে এবং দেশের বিভিন্ন অংশে সেচ প্রকল্পের জন্য বণ্টন করা হবে।[১৫৪] এই পরিকল্পনা সেক্রেটারি অব স্টেটের অনুমোদন পায় নি কারণ এতে প্রস্তাবিত কাজের সুনির্দিষ্ট উপাদানগুলির উল্লেখ ছিল না এবং এতে বস্তুতঃ বলা হয়েছিল যে ইংল্যাণ্ডে একটা বিরাট অঙ্ক ধার করা হোক ও তা ভারত সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হোক।[১৫৫] সেক্রেটারি অব স্টেট বললেন যে তিনি অল্প খরচে (৩০ হাজার পাউণ্ডের মধ্যে) করা যায় এমন ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা মঞ্জুর করতে রাজী আছেন, অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে এইগুলিতে ব্যয় করলে ভাল উশুল হয় কিন্তু শেষ হতে অনেক বছর লাগবে এবং অনেক টাকা খাটানোর দরকার হবে এমন বড় প্রকল্প অর্থ-বিষয়ক ফলাফল পুরোপুরি পরীক্ষা না করে নেওয়া যাবে না। এই সূত্রে সেক্রেটারি অব স্টেট একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ করে দেন ঃ "সেচ প্রকল্প এমনভাবে নির্মিত হতে হবে যাতে সে অন্ততঃ নির্মাণে ব্যয়িত মোট মূলধনের সুদ উশুল করে আনার মত লাভজনক হবে—একমাত্র এই শর্তেই সেচের কাজ যথাযথভাবে হাতে নেওয়া যেতে পারে। সেক্রেটারি অব স্টেট মন্তব্য করেছিলেন যে সেচের কাজের জন্য তহবিল পাওয়ার সমস্যাটার সরল সমাধান হল ধার করা ভারত সরকারের এ চিন্তা ভুল।" ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষকে অপরাপর বিষয়ও চিন্তা করতে হত, যথা সুদের খরচ কত হবে, এবং লণ্ডনের মুদ্রার বাজারের অবস্থা কি। সেক্রেটারি অব স্টেট একটা অমীমাংসিত সুরে বার্তাটি শেষ করেন ঃ "আমি এ কথা বলতে আদৌ প্রস্তুত নই যে এই প্রস্তাবিত ব্যয়ের অংশ-বিশেষ নির্বাহের জন্য আরও কর বসানো উচিত নয়; তবে সে যাই হোক, বর্তমানে এ কথা ঠিক করা অসম্ভব যে শেষ পর্যন্ত কত ধার করার প্রয়োজন হতে পারে বা কখন তার প্রয়োজন হবে। আমি নিশ্চিত এ কথা মনে

করি নে যে আমার পক্ষে বড় ধার নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে, আর এ কথা ঘোষণা করতেও আমি প্রস্তুত নই যে ভবিষ্যৎ বছরগুলিতে আমি ধার করব।......"

সরকারি ঋণ গ্রহণের প্রশ্নে ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের দ্বিধাগ্রস্ত ও অতি-সতর্ক দৃষ্টিভঙ্গি দেখানোর জন্যই উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি দেওয়া হল। ১৮৬৫-৬৬ সালের দুর্ভিক্ষ যা উড়িষ্যাতে সব চেয়ে মারাত্মক হয়েছিল, সেটা একটা ধাক্কা হিসাবে এল। সেক্রেটারি অব স্টেট Cranborne ভাইসরয় John Lawrence-কে লিখেছিলেন "আমার কোনও সন্দেহ নেই যে বিগত দুর্ভিক্ষ অনেক লোকের মাথায় এ কথা ঢোকাবে যে এই সমস্ত প্রকল্প (সেচ) নির্মাণে দেরি হওয়ার মানে মাঝে মাঝে বিপুল সংখ্যক মানুষকে এবং তারা যে উৎপাদিকা শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে সে সব হারান।"[১৫৬] Cranborne Lawrence-কে বলেছিলেন ভারতকে সেচ দেবার জন্য পূর্তকর্ম বিভাগে যতখানি পারেন 'সকল কর্মশক্তি সঞ্চার করতে'। সেচকে রাস্তা ও সামরিক নির্মাণের চেয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে, এগুলোর কোনোটারই সেচের কাজের মত এত আশু ও এত বেশি প্রয়োজন নেই। ইউরোপীয় সৈন্যদের জন্য ব্যারাক নির্মাণে সরকার বিরাট টাকা খরচ করছে অথচ সেচের কাজে তহবিল জুটছে না। Cranborne বলেছিলেন "জনসংখ্যার বিপুল অংশের জীবনের চেয়ে—অথবা আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দুর্ভিক্ষ হবে না ধরে নিলে—নিদেন পক্ষে জমি চাষের সব চেয়ে জরুরী প্রয়োজনের চেয়ে সৈন্যদের আরামকে" অগ্রাধিকার দেওয়া অন্যায়।

১৮৬৬ সাল থেকে ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের মনোভাবে একটা স্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৮৬৬ সালের আগস্ট মাসে সেক্রেটারি অব স্টেট জানালেন যে তিনি উৎপাদক প্রকল্পের জন্য ধার করতে প্রস্তুত কারণ সেচ ভারতের প্রগতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।"[১৫৭] ১৮৬৭-৬৮ সালে ভারত সরকার পূর্তকর্মের জন্য ঋণ সংগ্রহের প্রস্তাব করল, ইণ্ডিয়া অফিস তৎপরতার সঙ্গে মঞ্জুরি দিয়ে দিল।[১৫৮] Cranborne বুঝেছিলেন যে 'উন্নয়ন থেকে বিরত হয়ে ঋণ গ্রহণ এড়ানোর চেষ্টার চেয়ে' সেচের জন্য ধার করাই 'সত্যতর মিতব্যয়িতা'।[১৫৯]

ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের মনোভাব পরিবর্তনের আভাস পেয়ে ভারত সরকার এখন প্রস্তাব করল যে ভবিষ্যতে সেচের জন্য সব প্রকল্পের ব্যয়ই

ধার থেকে নির্বাহ করা হোক। ভারত সরকার প্রস্তাব করল যে সেচ প্রকল্পগুলির থেকে রাজস্ব উঠছে সেগুলির জন্য সমস্ত খরচ 'বাৎসরিক রাজস্ব ও ব্যয়' বাজেট থেকে বাদ দেওয়া হোক, এই সব খরচ ঋণ থেকে মেটানো হোক, এবং একে 'মূলধন বাবদ খরচ' হিসাবে গণ্য করা হোক ও বাৎসরিক বাজেটে কেবল সুদের খরচ দেখানো হোক। এ ছাড়া সামরিক ব্যারাক, জেল, রাস্তা প্রভৃতি বিশেষ পূর্তকর্মের জন্য মোটা খরচকে 'বিশেষ বা অতিরিক্ত' খরচ হিসাবে গণ্য করা হোক এবং তা অংশত রাজস্ব থেকে ও অংশত ঋণ থেকে মেটানো হোক।[১৬০]

সেক্রেটারি অব স্টেট এ প্রস্তাব পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি মনে করলেন সেচের খরচ রাজস্ব হিসাব থেকে সরিয়ে 'ঋণের' হিসাবে ঢোকানো বিজ্ঞতার কাজ হবে না। তিনি ভারত সরকারকে নির্দেশ দিলেন বাৎসরিক অর্থ-বিষয়ক দেনা পাওনার লিখিত হিসাবে বড় বড় রাস্তা, সামরিক ব্যারাক ইত্যাদির দরুন অপরাপর 'বিশেষ বা অতিরিক্ত' খরচের মত সেচ প্রকল্পের খরচকেও 'বিশেষ বা অতিরিক্ত' খরচ হিসাবে দেখানো হোক।[১৬১] পরবর্তীকালে Cranborne-র এই সিদ্ধান্তকে তাঁর উত্তরাধিকারী Northcote একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক থেকে বদল করেন। তাঁর মতে[১৬২] "নিয়ম হিসাবে সমস্ত কাজকেই 'সাধারণ' বলে গণ্য করা উচিত, ব্যতিক্রম কেবল সেইগুলি যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে লাভজনক হবে বলে আশা করা যেতে পারে। অর্থাৎ খরচের যে সুদ হবে তার চেয়ে বেশি লাভ দিতে পারে… …।" এখন সামরিক ব্যারাক, রাস্তা, বাঁধ ও জেলকে লাভজনকের পর্যায়ে ফেলা যেত না। কাজেই, 'বিশেষ বা অতিরিক্ত' পূর্তকর্মের তালিকা থেকে তারা সব বাদ গেল ; এই সব কাজের (সামরিক কাজ, রাস্তা, জেল ইত্যাদির) খরচ সারা বছরের রাজস্ব থেকেই মেটাতে হবে। কেবল সেচ কাজের খরচই ঋণ তুলে মেটাতে হবে এবং তা বাজেটে 'বিশেষ বা অতিরিক্ত' পূর্তকর্ম হিসাবে দেখাতে হবে।[১৬৩]

অতএব শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল যেঃ (ক) 'পুনরুৎপাদনমূলক' অথবা লাভজনক সেচ কাজ যা 'বিশেষ বা অতিরিক্ত' কাজের শ্রেণীতে পড়বে, তার জন্য সরকার ধার নিতে পারবে ; (খ) এবং সামরিক কাজ, রাস্তা, জেল, বাঁধ প্রভৃতি অ-লাভজনক কাজ, যা 'সাধারণ কাজে'র শ্রেণীতে পড়ছে তার জন্য যথাসম্ভব ধার করবে না। অ-

লাভজনক কাজের জন্য ধার করার একমাত্র উদাহরণ হল ১৮৬৭-৬৮ সালে সামরিক ব্যারাক তৈরির জন্য ১০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ তোলা।[১৬৪]

Col. Richard Strachey-কে ১৮৬৭ সালে পূর্ত বিভাগের নবগঠিত সেচ শাখার প্রধান হিসাবে বসানো হল।[১৬৫] তাঁরই চেষ্টায় ১৮৬৯ সালে ভারত সরকার সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে একটা পরিকল্পনা পেশ করল যাতে আগামী কয়েক বছরে অন্ততঃ ৩০ কোটি টাকা খরচের প্রস্তাব করা হল—সমস্ত টাকাটাই ঋণের মারফত যোগাড় করা হবে এবং সেচ প্রকল্পের জন্য ব্যয় করা হবে।[১৬৬] এ হিসাবটা আসলে কমসম করে দেওয়া ছিল, কারণ গভর্নর জেনারেল Mayo তাঁর সরকারকে একটা বিরাট সুদের বোঝায় বিব্রত করতে অনিচ্ছুক ছিলেন।[১৬৭] সেক্রেটারি অব স্টেট Mayo-কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যাতে কাজগুলির খরচ ও লাভজনকতা সম্পর্কে খবরাখবর ছাড়া দেদার শুরু করে দেওয়া না হয়।[১৬৮] Argyll নতুন নতুন সেচ পরিকল্পনা নিরুৎসাহিত করতে চান নি, কিন্তু চেয়েছিলেন যে ভারত সরকার বরং তুলনামূলকভাবে কম খরচওয়ালা এবং লাভজনক প্রকল্প নির্মাণ করুক।[১৬৯]

তিনি Mayo-কে এ পরামর্শও দিয়েছিলেন যে 'বিশেষ বা অতিরিক্ত' কাজের খরচ যখন বাড়ছে তখন 'সাধারণ' পূর্তকর্মের ব্যয় এখন কমানো হোক।[১৭০] সরকার যে সেই নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা এই তথ্য থেকেই প্রমাণিত হয় যে মোট ব্যয়ের সঙ্গে সাধারণ পূর্তকর্মের ব্যয়ের অনুপাত ১৮৬৮-৬৯ সালে ১২৩ শতাংশ থেকে ১৮৬৯-৭০ সালে ১০ শতাংশ, ১৮৭০-৭১ সালে ৮·২ শতাংশ এবং ১৮৭১-৭২ সালে ৫·৩ শতাংশে নেমে গিয়েছিল।

পূর্তকর্ম বিভাগে অপব্যয়ের জন্য সম্পদের অপ্রতুলতা আরও বেড়ে গিয়েছিল। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' কাগজ এই বিভাগকে একটা 'রটন বরো' (rotten borough) সঙ্গে তুলনা করেছিল। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি অভিযোগ করেছিল যে করদাতারা তাঁদের খরচের ফল পান না; অভিযোগ উঠেছিল যে পূর্তকর্ম তহবিলের অনেকটাই অপচয় হয়ে যাচ্ছিল।[১৭১] নীচের স্তরে দুর্নীতি, ঠিকা বিলির ব্যাপারে অসদাচারণ এবং ইউরোপীয় ইঞ্জিনিয়ারদের অসতর্ক তদারকির অভিযোগও উঠেছিল।[১৭২] ১৮৭১ সালে যখন পূর্ব ভারতে

অর্থ-বিষয়ক সিলেক্ট কমিটির তদন্ত শুরু হয় তখন এই সমস্যার প্রতি কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বম্বে অ্যাশোসিয়েশন থেকে অনুরোধ জানানো হয়।[১৭৩] ষাটের দশকের শেষের দিকে অপচয় বন্ধ করার জন্য সোৎসাহ প্রচেষ্টা শুরু হয়। অনেক অপব্যয়ের কারণ ছিল যথেষ্ট পরিমাপ ও তথ্য সংগ্রহ না করেই কাজ শুরু করা।[১৭৪] ১৮৬৯ সালের সেপ্টেম্বরের একটা প্রস্তাবে স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল উদ্বেগের সঙ্গে উল্লেখ করেন যে মঞ্জুরিবিহীন 'নিয়মবিরুদ্ধ' খরচ বেড়ে চলেছে। সরকার অফিসারদের নির্দেশ দিল 'অনুমোদিত অনুমিত হিসাব অথবা আগে অর্থগ্রহণের ব্যবস্থা (appropriation)' না করে কাজ শুরু না করতে।[১৭৫]

ভারতে দপ্তরের খরচ (establishment charges) মনে হয় ইংল্যাণ্ডের চেয়ে চার-পাঁচগুণ বেশি ছিল। এর প্রধান কারণ ছিল বেসামরিক কাজ-কর্মের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল সামরিক অফিসারদের নিয়োগ এবং অধস্তন কর্মচারীদের উপর ছাড়া যেত এমন গুরুত্বহীন তদারকির কাজে ইউরোপীয়দের নিয়োগ।[১৭৬] ১৮৬০-এর দশকের একটা মোটামুটি গড় বছরে (সাধারণ) পূর্তকর্মের মোট ব্যয়ের সঙ্গে দপ্তরের খরচের অনুপাত ছিল ১৮ শতাংশ।

বিদ্রোহের বছর থেকে ১৮৫৯-৬০ পর্যন্ত সামরিক পূর্তকর্মের জন্য স্বভাবতই অসাধারণভাবে বেশি ছিল। ১৮৬০-৬ সালের সময়টাতে গড় ব্যয় অপেক্ষাকৃত নীচু স্তরে—প্রায় ০'৭২ কোটি টাকা। সারা ভারতে সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি স্থানে নতুন সামরিক ব্যারাক নির্মাণের দরুন এই ব্যয়বৃদ্ধি ঘটেছিল। সৈন্যবাহিনীর স্বাস্থ্যসম্পর্কিত রয়াল কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার ১৮৬৫ সালে ইউরোপীয় সৈন্যদের জন্য নতুন ব্যারাক তৈরির কাজ হাতে নিয়েছিল।[১৭৭] বিদ্রোহের পর ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে ইউরোপীয় সৈন্যদের উঁচু অনুপাত বজায় রাখার সিদ্ধান্ত (দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে আবার বিদ্রোহের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসাবে) ইউরোপীয়দের জন্য নতুন ব্যারাক নির্মাণ অনিবার্য করে তুলল। তখনকার 'স্বাস্থ্যকর পরিবেশের বাতিক' স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থার মান এবং জীবনযাত্রার সাধারণ আরাম সম্পর্কে প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছিল, আধুনিক মাপজোখ অনুযায়ী সামরিক ঘরবাড়ি নির্মাণ ও সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ

অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছিল। ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ বললেন, "সৈন্যদের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের স্বাভাবিক ইচ্ছা যদি এই সব ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট না হয় তা হলে আমাদের ইউরোপীয় সৈন্যদের দক্ষ থাকার কাল দীর্ঘায়িত করার দরুন সরকারের যে নিছক আর্থিক সুবিধা হবে" তাও এই বর্ধিত ব্যয়কে যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত বলে প্রমাণ করবে।[১৭৮] নতুন ব্যারাকগুলির নির্মাণ খরচ গোড়ায় ধরা হয়েছিল ১ কোটি পাউণ্ড।[১৭৯] এই হিসাব পরে সংশোধিত হয়ে ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ডে দাঁড়ায়। এই মোট খরচ পাঁচ বছর ধরে করার কথা হয় (১৮৬৫-৬৬ থেকে ১৮৬৯-৭০)।[১৮০] যে সরকারের প্রায়ই টানাটানি চলত তার পক্ষে এ এক বিরাট বোঝা হয়েছিল। ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল সেক্রেটারি অব স্টেটকে লিখলেন "সামরিক নির্মাণের খরচ যদি বাদ দেওয়া যায় তা হলে অপরাপর সাধারণ পূর্তকর্ম, যথা রাস্তা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সরকারি ঘর-বাড়ি ইত্যাদি বাড়া দূরে থাক উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছে এবং এই আর্থিক প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে আমরা শেষোক্ত কাজগুলির জন্য খরচ কমিয়ে দিয়েছি……।" ভারত সরকার স্বীকার করেছিল যে খরচের এই ধরনের ঝোঁক 'দেশের সাধারণ উন্নয়নে' সাহায্য করে না।[১৮১] এর ফলে সরকারকে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 'দেশীয়' অর্থাৎ ভারতীয় পত্রিকাগুলি অভিযোগ করেছিল যে ইউরোপীয় সৈন্যদের আরামে ও বিলাসে রাখার জন্য বিরাট টাকা খরচ হচ্ছে, অথচ টাকার অভাবে জনসাধারণের উপযোগের কাজ হচ্ছে না।[১৮২]

উন্নয়নমূলক ব্যয়ের রাস্তা, খাল এবং জনসাধারণের পক্ষে দরকারি অপরাপর কাজের জন্য রাজস্বের আরও বেশি অংশ যাতে খাটানো যায় তার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল যে সামরিক নির্মাণের খরচ ঋণ মারফত তোলা হোক। সামরিক ব্যারাক নির্মাণের জন্য সরকারের ধার করা উচিত কিনা এ নিয়ে তীব্র বিতর্ক বেধে ওঠে।

১৮৬৫ সালে সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে একটা গোপন চিঠিতে ভারত সরকার মন্তব্য করেছিল যে বেসামরিক পূর্ত কাজ, পুরানো সামরিক ও বে-সামরিক ঘরবাড়ি ইত্যাদির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং রেলপথের খরচের উপর আবার সামরিক ব্যারাক তৈরির বাড়তি খরচ এক অসহনীয় বোঝা। 'জনগণের শ্রীবৃদ্ধি ও সন্তোষের হানি করে কর বৃদ্ধি ছাড়া' চলতি রাজস্ব

থেকে এ সমস্ত খরচ চালানো 'অসম্ভব'।[১৮৩] আর যেসব উন্নয়নমূলক নির্মাণকার্য চিরকালের জন্য, তার গোটা খরচটা বর্তমানের উপর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় হবে।

বার বার ভারত সরকার প্রস্তাব করেছিল যে সেক্রেটারি অব স্টেট একটা ঋণ সংগ্রহ করুন, সামরিক ব্যারাক নির্মাণের ব্যয় অংশত ঋণ থেকে এবং অংশত চলতি রাজস্ব থেকে নির্বাহ করা হোক।[১৮৪] ১৮৬৫-৬৬ সালে তিনবার সেক্রেটারি অব স্টেটকে অনুরোধ করা হয়েছিল সামরিক নির্মাণের জন্য ৩০ লক্ষ পাউণ্ডের ঋণ সংগ্রহ করা হোক, পর পর তিন বছর ঋণ গ্রহণের মারফত এই অর্থ সংগৃহীত হোক, প্রশ্ন উঠেছিল "আমরা কি বিশেষ ও সামরিক কর ধার্যের আশ্রয় নেব····· নাকি আমরা উত্তর পুরুষের সঙ্গে এই বোঝা ভাগ করে নেব।" শেষোক্ত কর্মধারাই উপযুক্ততর ছিল কারণ একমাত্র সামরিক নির্মাণই বাজেটে ঘাটতি ঘটাচ্ছিল।[১৮৫]

ভারত সরকার আর একটা প্রস্তাবও উপস্থিত করেছিল। তা হল যে সামরিক ব্যারাক নির্মাণ সহ সমস্ত পূর্তকর্মের জন্য মোটা খরচগুলিকে 'বিশেষ বা অতিরিক্ত' খরচের খাতে দেখানো হোক এবং মূলধন বাবদ খরচ হিসাবে গণ্য করা হোক। প্রস্তাব করা হয়েছিল যে ঐ খরচকে রাজস্ব ও ব্যয়ের বাৎসরিক বিবৃতি থেকে দেওয়া হোক এবং হাতে নগদ টাকা সংক্রান্ত বিবৃতিতে তাকে 'ধার' হিসাবে দেখানো হোক।[১৮৬]

অবশেষে ১৮৬৭ সালে সেক্রেটারি অব স্টেটকে ১০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ গ্রহণে রাজী করানো গেল, কিন্তু পরবর্তী দু বছরে অনুরূপ ঋণ সংগ্রহের জন্য ভারত সরকারের প্রস্তাবে ইংল্যাণ্ডের সরকারকে অঙ্গীকার করিয়ে রাখতে Cranborne সম্মত হলেন না।[১৮৭] 'বিশেষ বা অতিরিক্ত' খরচগুলিকে 'চলতি বৎসরের হিসাব' থেকে 'ঋণের খাতায়' নিয়ে যাওয়াতে সেক্রেটারি অব স্টেট Cranborne রাজী হলেন। তিনি এতেও রাজী হলেন যে সামরিক ব্যারাক নির্মাণের খরচকে 'বিশেষ' খরচের শ্রেণীতে ফেলা হোক।[১৮৮]

পরবর্তীকালে অবশ্য এই দুটি সিদ্ধান্তই কিছুটা পরিবর্তিত হল। ইণ্ডিয়া অফিসে Cranborne-র উত্তরাধিকারী Northcote বিধান দিলেন যে সামরিক নির্মাণ খরচকে 'বিশেষ' শ্রেণী থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক। কেবল সেচ কাজের খরচকেই চলতি হিসাব থেকে 'ঋণের খাতায়' স্থানান্তরিত

করা যাবে। তাঁর বক্তব্য ছিল ব্যারাক ও অপরাপর অ-লাভজনক কাজের দরুন খরচকে বাদ দেওয়ার ফলে 'আপনার সরকারের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক ধারণা সৃষ্টি হতে পারে'[১৮৯] কাজেই ভারত সরকার সামরিক নির্মাণের (সেই সঙ্গে রাস্তা ও বাঁধের) খরচ 'বিশেষ বা অতিরিক্ত খরচের' শ্রেণী থেকে 'সাধারণ খরচের' (অর্থাৎ রাজস্ব থেকে মেটাতে হবে এমন খরচের) শ্রেণীতে নিয়ে এল।[১৯০] উপরন্তু সেক্রেটারি অব স্টেটের নির্দেশ অনুযায়ী ফিনান্স মেম্বার W. N. Massey ভারত সরকারের তরফ থেকে ঘোষণা করলেন যে ব্যারাক নির্মাণের খরচ চলতি রাজস্ব থেকেই মেটানো হবে, এই উদ্দেশ্যে আর ঋণ নেওয়া হবে না।

সামরিক সদস্য ও কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ সহ গভর্নর-জেনারেলের পরিষদের অনেক সদস্য এই নীতি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। Sir W. R. Mansfield বললেন যে কর্তৃপক্ষ প্রগতিবিরোধী কাজ করছেন কারণ সামরিক নির্মাণের খরচ যদি ঋণের বদলে রাজস্ব থেকে মেটাতে হয় তবে উন্নয়নমূলক খরচ কমাতে হবে। ঋণ নিতে অস্বীকার করে ভারত সরকার একটা পুরানো সেকেলে নীতিতে ফিরে যাচ্ছে যাতে নির্মাণকার্যে দীর্ঘসূত্রিতা আনবে।[১৯১] Major-General H. M. Durand উল্লেখ করলেন যে Northcote-র 'সুস্পষ্টভাবে পশ্চাদগামী' সিদ্ধান্ত সরকারকে লাইসেন্স অথবা সার্টিফিকেট কর নামক জনগণের অপ্রিয় ব্যবসায় কর বজায় রাখতে বাধ্য করছে। ভারত সরকার "ব্রিটিশ মূলধনের অবাধ ও সুস্থ আগমে বাধা দিয়ে ভারতে সাধারণ প্রগতিকে পিছিয়ে দিচ্ছে।...... এমন এক সময়ে সে তা করছে যখন ব্রিটিশ মূলধন নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগের সন্ধানে ব্যাপৃত।"[১৯২] গভর্নর-জেনারেল Sir J. Lawrence, হোম মেম্বার John Strachey ও W. N. Massey Northcote-র সিদ্ধান্তের সপক্ষে যুক্তি দেবার চেষ্টা করলেন। Lawrence মনে করেছিলেন "ধার করতে বাধ্য হওয়া নিঃসন্দেহে একটা গুরুতর আপদ।"[১৯৩] John Strachey তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। ব্যারাকের মত অ-লাভজনক কাজে সরকার কেবল তখনই ধার করবে যখন রাজস্ব থেকে খরচ মেটানো অসম্ভব হবে, কিন্তু তা নইলে নয়।"[১৯৪] শেষ পর্যন্ত এই মতই চালু রইল। Durand ও Mansfield কার্য-বিবরণীতে তাঁদের দ্বিমত লিখিয়ে দিলেন, কিন্তু 'মন্ত্রীসভার নীতি অনুযায়ী' তাঁরা 'একই সরকারের সদস্য

হিসাবে ভারতের জনগণের সামনে কোনও বিরোধিতা না করতে বাধ্য' ছিলেন।[১৯৫]

সংক্ষেপে বললে ভারত সরকারের নীতি হল চলতি রাজস্ব থেকেই সামরিক নির্মাণের খরচ যতদূর সম্ভব মেটানো, এবং যতটা এড়ানো যায় সে ধার না করা। ১৮৬৭-৬৮ সালের ঋণ গ্রহণ চলতি বছরের রাজস্ব থেকে এই ব্যয় নির্বাহ করার নীতি থেকে আংশিক বিচ্যুতি। Cranborne এই নিয়মকে যেভাবে শিথিল করেছিলেন Northcote তা করতে রাজী ছিলেন না কারণ লাভজনক সেচ কাজ (যা নিয়োজিত মূলধনের সুদ উসুল করতে পারবে) ছাড়া অন্য কিছুর জন্য ধার নিতে ভারত সরকারকে অনুমোদন দানে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। কাজেই ১৮৬৮-৬৯ সালে থেকে সরকার সামরিক নির্মাণের খরচ মেটানোর জন্য সম্পূর্ণই রাজস্বের উপর নির্ভর করল। ১৮৬৮ সালে প্রেরিত বার্তায় ভারত সরকার বলে যে এর ফলেই সরকারকে নানারূপে কর, যথা লাইসেন্স কর, সার্টিফিকেট কর এবং আয়কর, ধার্যে বাধ্য করল। এই একই বার্তায় স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল অসাধারণ স্পষ্টবাদিতা সহকারে লিখেছিলেনঃ "প্রথম নজরে এ কথা মনে হতে পারে যে এখন আমরা দেশের উন্নতির জন্য বরাবরকার মতই কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে······সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমাদের সামরিক ব্যয়ের অনুপাত অনেক বেড়ে গিয়েছে ; এ ব্যয় ভারতের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত করে না।"[১৯৬]

॥ ৫ ॥

এই পরিচ্ছেদের গোড়ায় ব্যয়ের প্রধান প্রধান খাতগুলির পর্যালোচনার সময়ে এ কথা লক্ষ্য করা গিয়েছে যে ভারত সরকারের মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ খরচ হয় সামরিক খাতে এবং পূর্তকর্মে খরচ হয় প্রায় ১৫ শতাংশ। তার মানে মোট বায়ের প্রায় অর্ধেক খরচ হয় সৈন্যবাহিনী ও পূর্তকর্মের জন্য। বেসামরিক প্রশাসনের জন্য খরচ হয় আর এক-তৃতীয়াংশ। এই খাতের মধ্যে আছেঃ চুক্তিবদ্ধ (Convenanted) ও চুক্তিবদ্ধ নয় এমন সিভিল সার্ভেন্টদের বেতনের দরুন ও দপ্তরের দরুন

খরচ, রাজস্ব আদায়ের খরচ, আইন ও ন্যায়বিচার খাতে খরচ, ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলিতে ও বিদেশে রাজনৈতিক এজেন্সিগুলির খরচ, পেন্সন ও বৃত্তিভোগী লোকেদের জন্য খরচ, এবং ইউরোপীয় সিভিল সার্ভেণ্টদের স্বদেশে লম্বা ছুটি কাটানোর ও অনুপস্থিতি ভাতার দরুন খরচ। আলোচ্য সময়ে এই সব বেসামরিক খরচ সমানেই বেড়ে চলেছিল। এর একটা কারণ আমরা ইতিমধ্যেই একাধিকবার উল্লেখ করেছি, তা হল ভারতে দ্রব্যমূল্য ও মজুরি বৃদ্ধি, অন্য কারণটা হল উন্নততর প্রশাসনের দাবি : আধুনিক ধারণা অনুযায়ী একটা প্রশাসনের সমস্ত আনুষঙ্গিক 'প্রয়োজনীয় সামগ্রী'র ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।[১৯৭] অতএব একদিকে নতুন নতুন বিভাগ খোলা হয়েছিল, পুরানো দপ্তরগুলিকে প্রসারিত করতে হয়েছিল, কাজের বিভিন্ন শাখার পুনর্গঠন ও উন্নয়ন করা হয়েছিল, অপরদিকে বেতনের পুরানো হারের সংশোধন করা হয়েছিল; সিভিল সার্ভেণ্টদের (বিশেষ করে ইউরোপীয় অফিসারদের) সুযোগ-সুবিধা বাড়ানো হয়েছিল এবং মজুরি ও দর বৃদ্ধির দরুন অনেক রকম নতুন খরচ করা হয়েছিল।

দেশীয় বিচারকরা এবং আদালতের অধস্তন দেশীয় কর্মকর্তারা অত্যন্ত কম বেতন পেতেন। গড় বেতন ছিল বছরে ২৫০ টাকার কম এবং সর্বোচ্চ বেতন ছিল বছরে মাত্র ১,৮০০ টাকা। Lawrence ভাইসরয় থাকাকালীন বিচার সংক্রান্ত কাজের বেতন সংশোধিত হয়েছিল, গোড়ায় বাংলা প্রেসিডেন্সিতে, তারপর অন্যান্য প্রদেশে। এটা ছিল John Strachey-র সাহায্যে Lawrence কর্তৃক প্রবর্তিত ব্যবস্থাগুলির অন্যতম। John Strachey ব্যাপারটা তদন্ত করেছিলেন এবং বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করেছিলেন।[১৯৮] বিচারকার্যে ব্যাপৃত ও চুক্তিবদ্ধ নয় এবং অপরাপর কাজেও চুক্তিবদ্ধ নয় এমন কর্মকর্তাদের বেতন বৃদ্ধি ঘটাল। সংবাদপত্রে সংবাদ বেরোচ্ছিল যে, 'টাকার ক্রয় ক্ষমতা দ্রুত কমে যাওয়ার দরুন' চুক্তিবদ্ধ নয় এমন কর্মকর্তাদের অসুবিধা হচ্ছিল।[১৯৯] অ-চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভেণ্টরা গভর্নর-জেনারেলের কাছে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন, তাতে তাঁরা উল্লেখ করেছিলেন যে, "ভারতে যখন লাভজনক চাকুরির নানা নতুন ক্ষেত্র খুলেছিল"[২০০] তখন ওই বেতন ও পেন্সন যথাযোগ্য গুণসম্পন্ন লোককে আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সরকার

এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিল যে 'মজুরির বাজারের প্রকৃত তথ্যের'[২০১] সঙ্গে অসংশ্লিষ্টভাবে কেবল পূর্বের উদাহরণের ভিত্তিতে বেতনের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যে বহু যোগ্য সরকারি আমলা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্কে যোগ দেবার জন্য সরকারি চাকরি ছেড়ে যাচ্ছেন।[২০২] প্রকৃতপক্ষে বোম্বাই সরকার ১৮৬৩ সাল থেকে ২০০ টাকার কম বেতনওয়ালা আমলাদের 'শস্য বাট্টা' দিচ্ছিল, বর্তমানে যাকে মহার্ঘ্য ভাতা বলা হয়। এটি বোধ হয় তার প্রথম উদাহরণগুলির অন্যতম।[২০৩] ১৮৬৫ সাল থেকে ১৮৬৭ সালের মধ্যে পর পর অনেকগুলি বেতনহার সংশোধনের ভিত্তিতে অধস্তন প্রশাসনিক কর্মীদের বেতন ভারতের প্রায় সব অঞ্চলেই বাড়ানো হয়েছিল।[২০৪]

অনেক ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়রা অ-চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিসে ছিলেন, তাঁরা পেন্সন ও স্বদেশে লম্বা ছুটি কাটানোর দাবি করলেন, তাতেও সরকারের অনেক টাকা খরচ হল।[২০৫] সেক্রেটারি অব স্টেট "তেমন একটা অ-চুক্তিবদ্ধ সার্ভিস গজিয়ে ওঠা যাতে সমস্ত উচ্চতর নিয়োগ······ ইংরেজদের দখলে থাকবে" তা ঠেকাতে চেয়েছিলেন। ১৮৬৮ সালের একটা তদন্ত অনুযায়ী ভারত সরকার কর্তৃক (বেসামরিক প্রশাসন) নিয়োজিত আমলাদের মধ্যে মাসিক ১০০ টাকার উপর বেতনওয়ালা লোকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪,০৩৯, এঁদের মধ্যে বেশির ভাগ (৩,৮৯৮) ৫০০ টাকা অথবা তার কম বেতন পেতেন, আর সারা ভারতবর্ষে ১,০০০ টাকা অথবা তার বেশি বেতনওয়ালা ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫।[২০৬] এই সব অঙ্ক থেকে সরকারের নিয়োগ নীতি সম্পর্কে ভারতের নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের উষ্মার কারণ খানিকটা বোঝা যাবে। সরকারের নিয়োগ নীতির সমালোচকেরা এই কথার উল্লেখ করেও তাঁদের যুক্তিকে আরও শক্তিশালী করতে পারতেন যে ব্রিটিশ প্রশাসকদের নিয়োগ রাষ্ট্রের পক্ষে অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 'বেসামরিক লম্বা ছুটি (স্বদেশে) এবং অনুপস্থিতি ভাতা'র খাতে খরচের প্রায় সবটাই হত ব্রিটিশ সিভিল সারভেন্টদের জন্য, যুক্তি ছিল যে গ্রীষ্মমণ্ডলের আবহাওয়ায় কিছুকাল কাজ করার পরে ইংল্যাণ্ডে স্বাস্থ্যোদ্ধারে যাওয়া তাঁদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল। এই স্বদেশে দীর্ঘ ছুটির ভাতা ১৮৬৩-৬৪ সালে ছিল ৭২,০০০ পাউণ্ড, এই খাতে খরচ-দ্বিগুনেরও বেশি হয়ে গেল এবং ১০ বছরে প্রায় ১০ লক্ষ বেড়ে গেল।

সরকারের কাছ থেকে যাঁরা পেন্সন পেতেন তাঁদের মধ্যে বার্ধক্যের দরুন অবসর গ্রহণ এবং দুঃস্থ বৃত্তি প্রাপকদের মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যাই বেশি ছিল, কিন্তু টাকার বেশির ভাগটাই ইউরোপীয়দের কাছে যেত; বলা বাহুল্য পেন্সনের পরিমাণ চাকরিতে থাকাকালীন বেতন হারের অনুপাতেই নির্ধারিত হত। এই খাতে খরচ বৃদ্ধি—এক দশকের মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ (১৮৬৩/৬৪-১৮৭২/৭৩)—অসাধারণ কিছু ছিল না। বৃদ্ধি আরও বেশি হত যদি ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ 'অ-ফলপ্রসূ বেসামরিক খরচ' বাড়ানোর ঝোঁক কড়াভাবে না ঠেকাতেন। ১৮৬৮ সালে অ-চুক্তিবদ্ধ সিভিল সারভেন্টরা তিনটি প্রেসিডেন্সিতে বিক্ষোভ শুরু করেন, পেন্সন বৃদ্ধি করতেই হবে এই মর্মে তাঁরা সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন।[২০৭] এই স্মারকলিপিতে যেসব পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছিল তাতে ভারত সরকারের বাড়তি ব্যয় দাঁড়াত বছরে ৭৮ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার পাউণ্ডের মধ্যে। 'এই বিক্ষোভের সমাপ্তি ঘটাতে' ইচ্ছুক ভারত সরকার পেন্সনের দরুন ভাতা বাড়ানোর সুপারিশ করল।[২০৮] কিন্তু সেক্রেটারি অব স্টেট তাঁর পরিষদ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থিত হয়ে[২০৯] এই ব্যাপারে বর্ধিত ব্যয় অনুমোদন করতে অস্বীকার করলেন। ভাতা বৃদ্ধির কোনও যুক্তি ছিল না: "গোটা সাম্রাজ্যে সম্ভবতঃ সারা পৃথিবীতে, অন্য কোনও সার্ভিসের ক্ষেত্রে এত বেশি উদার মনোভাব দেখানো হয় না।"[২১০] সেক্রেটারি অব স্টেট একমাত্র যে সুবিধা মঞ্জুর করলেন তা হল যে সমস্ত চুক্তিবদ্ধ সিভিল সারভেন্টরা ২৫ বছর ধরে চাকরি করেছেন এবং ২১ বছর ভারতে থেকেছেন অবসর গ্রহণের সময়ে তাঁরা ১,000 পাউণ্ড সর্বনিম্ন বাৎসরিক পেন্সন নিশ্চিত পাবেন।[২১১] Mayo-র কাছে ব্যক্তিগত চিঠিতে Argyll "নিজেদের পেন্সন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সিভিল সার্ভিসের এই বিক্ষোভ প্রদর্শন" সম্বন্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।[২১২] চুক্তিবদ্ধ ইউরোপীয় সিভিল সারভেন্টদের ব্যয়বহুল সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার পেছনে নিজ স্বার্থসিদ্ধির যে মনোভাব ভারত সরকারকে পরিচালিত করেছিল Argyll তাকে খোলাখুলি নিন্দা করেন। "ভাইসরয় কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ এবং আইনের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ছাড়া ভারত সরকারের (অর্থাৎ গভর্নর-জেনারেলের পরিষদের) সব কজন সদস্যই সিভিল সারভেন্ট, এ প্রশ্নে তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে স্বার্থান্বিত।"[২১৩] সিভিল সারভেন্টরা অত্যন্ত

স্বাভাবিকভাবেই 'গোষ্ঠী মনোভাবের' প্রভাবাধীন ছিলেন এবং সারা ভারতের সমস্ত আমলা সমাজ তাঁদের পেন্সন বৃদ্ধির জন্য গভর্নর-জেনারেলকে পীড়াপীড়ি করলে তাঁর পক্ষে সে চাপ ঠেকানো কঠিন ছিল।[২১৪]

থেকে থেকে বেসামরিক খরচ কমানোর চেষ্টা হয়েছিল। Canning ভাইসরয় থাকা কালে R. Temple-এর নেতৃত্বে একটি বেসামরিক অর্থ-বিষয়ক কমিশন নিয়োজিত হয়েছিল। একটা দীর্ঘ পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের (১৮৬০ সালের জুলাই থেকে ১৮৬২ সালের মার্চ পর্যন্ত) পর কমিশন নানা খাতে যে খরচ কমানোর সুপারিশ করেছিল তাতে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বাঁচত, খরচ কমানোর সমস্ত সুপারিশ সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি, তবে প্রায় ১ কোটি টাকা কমানো সম্ভবপর ছিল।[২১৫] খরচ কমানো সংক্রান্ত ব্যবস্থাবলী আমলা সমাজের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল না।[২১৬] ১৮৬৯-৭০ সালে বেসামরিক প্রশাসনের খরচ কমানোর জন্য Mayo আর একবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, "অমিত-ব্যয়িতার উপর সংশোধন, 'স্বার্থসমূহের' উপর এবং সাধারণভাবে অপ্রয়োজনীয় পদ ও অকর্মা লোকের উপর আক্রমণ কোন রাজনৈতিকের পক্ষে সব চেয়ে অপ্রীতিকর কর্তব্য।"[২১৭] আমলাশ্রেণী ব্যয় সঙ্কোচের ব্যবস্থাবলীকে প্রতিরোধ করতে থাকলেন। আমলাদের মত ছিল যে, সরকার যদি 'ব্রিটিশ শাসকদের কর্তব্য ও আনুষঙ্গিকের' প্রতি নজর দেয় তা হলে বেসামরিক প্রশাসনের খরচ বাড়তে বাধ্য।[২১৮]

ভারত সরকারের ইংল্যাণ্ডে ও ভারতে প্রদেয় সুদের খরচ ছিল মোট ব্যয়ের এক-দশমাংশেরও বেশি। নানা ধরনের দেনার জন্য এই খরচ হত। মোটামুটি তিনভাগে এই দেনাকে ভাগ করা যায়ঃ (ক) স্থায়ী ঋণ, (খ) ভাসমান অথবা অস্থায়ী ঋণ, (গ) তহবিলে ঢোকানো হয় নি এমন ঋণ। ভাসমান ঋণটা ছিল লোকেদের যে ট্রেজারি বিল দেওয়া হত সেইগুলি অথবা সংরক্ষিত কাগজী মুদ্রা দিয়ে। সাধারণতঃ এগুলি এক বছরের কম সময়ের জন্য হত, কিন্তু কখনও কখনও সেগুলির মাঝে মাঝে নবীকরণ করা হত, আবার কখনও ট্রেজারি বিলের মালিকদের ইচ্ছা হলে সেগুলিকে অন্য স্টকে বদলে নেবার সুযোগ দেওয়া হত—এইভাবে অস্থায়ী ঋণকে স্থায়ী ঋণে পরিণত করা হত।[২১৯] টানাটানির সময়ে অথবা অনিশ্চিত সময়ে সরকারের শোধ দেবার দরকার হতে পারে এমন সব ঋণকে

অপেক্ষাকৃত স্থির চরিত্রের করে ফেলবার জন্য Wilson এই শেষ পদ্ধতিটি ব্যবহার করতেন।[২২০] তহবিলে পরিণত করা ঋণগুলি ছিল পোস্ট-অফিসের ক্যাশ সার্টিফিকেট এবং বেসামরিক ও সামরিক চাকরির তহবিলের আমানত। এই ধার ও ট্রেজারি বিলের দরুন ধার এমন কিছু বড় অঙ্কের হত না, এখানে আমরা প্রধানতঃ স্থায়ী ঋণ নিয়েই আলোচনা করব।

স্থায়ী ঋণকে সাধারণতঃ দুই ধরনের হিসাবের মধ্যে ভাগ করা হত। (১) সাধারণ ঋণ অর্থাৎ অনুৎপাদক ঋণ আর (২) উৎপাদক ঋণ। দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে পড়ত সেচ, রেলপথ ও অপরাপর পূর্তকর্মের জন্য ঋণ, এগুলিকে উৎপাদক বলা হত, কারণ আশা করা হত যে এই বিনিয়োগ থেকে কিছু রাজস্ব পাওয়া যাবে (যথা, জলের সেচ, রেলপথ থেকে আয় ইত্যাদি) এবং যে মূলধন ধার করা ও বিনিয়োগ করা হয়েছে তার সুদের খরচ মেটানো যাবে। 'সাধারণ ঋণ' হল সেইগুলি যা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে দায়-দায়িত্ব হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল এবং যা বিদ্রোহের সময়ে ও তার পরে জমে উঠেছিল।

ভারতের 'সাধারণ ঋণ' ১৮৫৬ সালে ৪ কোটি ৯২ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৫৮ সালে ভারতে উন্নততর সরকারের জন্য আইনের (Act for Better Government of India) ৪২ নং অংশ অনুযায়ী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত মূলধনী স্টকের উপর লভ্যাংশ কোম্পানির সমস্ত বণ্ড, ডিবেঞ্চার এবং ইংল্যাণ্ডে অপরাপর ঋণ ভারতের রাজস্ব থেকে শোধ হবার কথা। বিদ্রোহের সময়ে এবং বিদ্রোহের ঠিক পরের কয়েক বছরে এই ঋণ দ্রুত বেড়ে যায়। ইংল্যাণ্ডে ও ভারতে সরকারের দেনা ১৮৫৭ সালে ৫ কোটি ৯৪ লক্ষ পাউণ্ড থেকে ১৮৬০ সালে ৯ কোটি ৮১ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়ায়।

Wilson আসার আগে, বিদ্রোহের দরুন খরচের ফলে যে আর্থিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, তার মোকাবেলা করার মত কোনও অর্থ-বিষয়ক নীতি নির্ধারণে ভারত সরকার সক্ষম হয় নি। Wilson প্রবর্তিত ব্যবস্থাগুলির পুরো সুফল যতক্ষণ বোঝা না যাচ্ছিল ততক্ষণ সরকারকে প্রায়ই ঋণের আশ্রয় নিতে হচ্ছিল : ১৮৬১-৬২ সালের মধ্যে ঋণ বেড়ে ১০ কোটি ৭৫ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছিল। Charles Travelyan-এর প্রচেষ্টার ফলে ১৮৬১-৬২ সালে এই ঝোঁক প্রতিহত হয়েছিল। ১৮৬৪ সালের এপ্রিলে

ভারত সরকার সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে জানিয়েছিলেন যে এই ধার বিগত দু বছরে প্রায় ৯০ লক্ষ পাউণ্ড কমিয়ে ফেলা হয়েছে, শোধ দেওয়া হয়েছে প্রধানতঃ হাতে থাকা নগদ টাকা থেকে। ইংল্যাণ্ডে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কিছু বণ্ড মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে (২ লক্ষ ৫৬ হাজার পাউণ্ড), ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বণ্ডের কোম্পানির কাগজের দরুন ঋণ পুনরায় শোধ করে দেওয়া হয়েছে (১৫ লক্ষ পাউণ্ড) এবং ৫৫ লক্ষ পাউণ্ডের ডিবেঞ্চার মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে হাতে থাকা নগদ টাকা ও পতিত জমি বিক্রির টাকা দিয়ে ১১ লক্ষ পাউণ্ড সরকারি ঋণপত্র কিনে নেওয়া হয়েছে, তাঞ্জোর ঋণ ও কাশ্মীরের রাজার কাছে ঋণ শোধ করা হয়েছে এবং আরও নানা ধরনের দায় উদ্ধার করা হয়েছে।[২২১] তা ছাড়া ঋণের হিসাব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল এবং ভারত সরকারের কাছে জমা রাখা বিভিন্ন ট্রাস্টের তহবিল, বেসামরিক ও সামরিক কর্মচারীদের জমা তহবিল এবং বিভিন্ন স্থানীয় তহবিলকে যথাযথ সরকারি তহবিল থেকে পৃথক করা হয়েছিল।[২২২] এইভাবে ঋণের পরিমাণ কমিয়ে ফেলা হয়েছিল এবং অপেক্ষাকৃত আয়ত্তযোগ্য একটা অঙ্কের মধ্যে আনা হয়েছিল। ১৮৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত ঋণ মোটামুটি ৯ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ডের কাছাকাছি স্থির রইল। সে বছর থেকে ঋণ আবার বাড়তে লাগল, ১৮৭১-৭২ সালে ১২ কোটি ১৭ লক্ষ পাউণ্ডের বিরাট অঙ্কে উঠে গেল। Lord Mayo-র সরকার এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল এবং সমস্ত সাধারণ ব্যয়কে রাজস্ব থেকে মেটানোর এবং ধার করা থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিল।[২২৩] ইংল্যাণ্ডে বেড়াতে গিয়ে Richard Temple প্রধানমন্ত্রী Gladstone-এর সংস্পর্শে এলেন, তিনি দেনার ব্যবস্থাপনার আধুনিক নীতি সম্পর্কে Temple-কে পরামর্শ দিলেন; তাঁর পরমর্শ অনুযায়ী Temple ধারের একটা অংশের সুদ কমিয়ে দিলেন এবং স্টকের মালিকদের বললেন তাঁরা ইচ্ছে করলে তাঁদের আসল ফেরত নিতে পারেন, নয়তো কম হারে সুদ নিতে হবে।[২২৪] পাঁচ বছর পুরানো ডিবেঞ্চার ঋণ সমমূল্যে শোধ করে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে আরও কিছু ঋণের দায় উদ্ধার হল।[২২৫] Temple যে ৫% সুদকে ৪% সুদে এনে ফেলতে পারলেন তার থেকে বোঝা গেল বাজারে ভারত সরকারের "মর্যাদা ধীরে ধীরে সেই জায়গায় যাচ্ছে যেখানে ৪ শতাংশ সুদে একটা যুক্তিযুক্ত পরিমাণ ধার পাওয়ার আশা আমরা করতে পারি"।[২২৬]

পরবর্তীকালে সরকার তার ৫ শতাংশ সুদের আরও কিছুকে ৪% শতাংশে বদলে নিতে পেরেছিল। তথাপি পুরানো ঋণ সহজে বিলোপ করা সম্ভব হল না। Mayo ও তাঁর সরকারের অবদান হল Mayo যাকে 'বৃহত্তম ভারতীয় বিপদ' মনে করতেন, অর্থাৎ একটা বেসামাল ঋণ জমে ওঠা—তা ঠেকানোর চেষ্টা।[২২৭]

সুদের খরচটা কর্তৃপক্ষের হিসাবের মধ্যে একটা ভারী বোঝা হিসাবে রয়ে গেল। পূর্তকর্মে বিনিয়োগ থেকে যে উৎপাদক ফল আশা করা যেতে পারে তা তাঁরা পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। সরকারি ও ব্যক্তিগত ধার নেওয়ার মধ্যে একটা ভুল তুলনা এবং 'সরকারের দেউলিয়া হওয়ার' ভয়কে ভিত্তি করে একটা বদ্ধ ধারণা উন্নয়নের জন্য ব্যাপকভাবে ধার নেবার পথে বাধা হয়ে রইল।[২২৮] একটা মহলের চিন্তা অবশ্য সেচ-কার্যের জন্য ধার নেওয়ার পক্ষে ছিল। ১৮৫৪ সালে Sir Arthur Cotton লিখেছিলেনঃ "বড় বড় পূর্তকর্মের জন্য ব্যয় চলতি রাজস্ব কখনও মেটাতে পারে না, শেষোক্তর অপেক্ষা করে থাকব মানে গাড়িকে ঘোড়া টানতে দেওয়া······পূর্তকর্ম ছাড়া আর কিছু রাজস্ব বাড়াতে পারে না।"[২২৯] ভারতের জনমত পূর্তকর্মের জন্য সরকারি ঋণ গ্রহণের সপক্ষে ছিল। 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' মন্তব্য করেছিল যে ঋণ গ্রহণের বিরুদ্ধে বদ্ধ ধারণা ভারতীয় অর্থব্যবস্থার পক্ষে অভিশাপস্বরূপ ছিল।[২৩০] 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিষ্ট' জোর দিয়ে বলেছিল যে পূর্তকর্মের জন্য ব্যয় যা আছে তার তিনগুণ হওয়া উচিত এবং স্বল্প-মেয়াদী ঋণের মারফতই এই ব্যয় নির্বাহ হওয়া উচিত।[২৩১] কিছু ভারতীয় মালিকানায় মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রও এই আওয়াজ তুলেছিল।[২৩২] ১৮৭১ সালে হাউজ অব কমন্সের কাছে প্রেরিত স্মারকলিপিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন দাবি করেছিল যে এ কথা পুনর্বিবেচনা করা উচিত যে "একটা দেশ যা সম্পদে সমৃদ্ধ, কিন্তু মূলধনে দরিদ্র, সেখানকার পূর্তকর্মের খরচ এখনও চলতি রাজস্ব থেকে মেটানো হবে না ঋণ ও পরিশোধ তহবিলের একটা যথাযথ ব্যবস্থার মারফত মেটানো হবে······।"[২৩৩] ১৮৭০ সালে বোম্বে চেম্বার্স অব কমার্স এই ইচ্ছা প্রকাশ করে ভাইসরয়ের কাছে লিখেছিল যে "স্থায়ী চরিত্রের পূর্তকর্মের (ব্যয়) স্বল্প-মেয়াদী ঋণের দ্বারা মেটানো হোক—যার দায়িত্ব রাজস্বের উপর থাকবে এবং যা একটা নির্দিষ্ট তারিখে শোধ দেওয়া

হবে……।"[২৩৪] T. B. Jeffries 'National Credit and Public Works' শীর্ষক তাঁর পুস্তিকায় 'জাতীয় ঋণের একটা স্বচ্ছন্দ ও উপযুক্ত ব্যবহারের' সুপারিশ করেছিলেন কারণ "রাজস্ব থেকে পূর্তকর্মের ব্যয় নির্বাহ বস্তুতঃ নতুন প্রকল্প নির্মাণের উপর এক ধরনের নিষেধাজ্ঞার কাজ করে ……।"[২৩৫] প্রথম ভারতীয় অর্থনীতি-বিষয়ক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা Robert Knight রাষ্ট্রীয় ঋণ গ্রহণের বিরুদ্ধে বদ্ধ ধারণা দূর করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে উন্নয়নযোগ্য জমিদারির মালিক যে-কোনও জমিদারের মত ভারত সরকারের উচিত ধার করা এবং দেশের উন্নতির দিকে নজর দেওয়া এবং সেই ব্যয়ের যুক্তিযুক্ততা প্রমাণের জন্য রাজস্ব বৃদ্ধি করা।[২৩৬]

অতএব দেখা যাচ্ছে পূর্তকর্ম গড়ে তোলার পক্ষে বেশ উল্লেখযোগ্য একটা মত ছিল। তথাপি সরকারের নীতি ছিল ধার যতদূর সম্ভব এড়ানো। এমন কি ঋণ তোলার সিদ্ধান্ত যখন গৃহীত হল তখনও ভারত সরকার সেক্রেটারি অব স্টেট কর্তৃক চাপানো বহুতর শর্তের দ্বারা কণ্টকিত হয়ে রইল। এই সব শর্তের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল যে ঋণ গ্রহণের মারফত সৃষ্ট তহবিলকে কেবল লাভজনক কাজে নিয়োগ করা যাবে। এ যুক্তি একটা ভুল তুলনার উপর ভিত্তি করে খাড়া হয়েছিল ঃ ঠিক যেমন ব্যক্তিগত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ধার করে চলতে পারে না, যদি না খাটানো টাকার সুদ বইতে ও শোধ দিতে সক্ষম হয়, সেই রকম সরকারেরও লাভজনক ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্যে ঋণ নেওয়া উচিত নয়।[২৩৭]

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে সরকারের অতিরিক্ত ঋণ নেওয়ার বিপক্ষে কিছু গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি ছিল। দেশের ভিতর থেকে ঋণ না তুলে ভারত সরকার বিদেশী উত্তমর্ণদের কাছ থেকে ঋণ তুলেছিল। বিদেশীদের কাছ থেকে নেওয়া ঋণের সুদের খরচ বেশ মোটা রকমের ছিল। এই ধরনের ঋণ অবশ্যই অভ্যন্তরীণ ঋণের চেয়ে আলাদা, সেখানে দেশের ভিতরকার উত্তমর্ণদের কাছেই সুদটা যায়। Argyll তাই Mayo-কে উপদেশ দিয়েছিলেন "দেশীয় পুঁজিপতিদের ধরতে। ভারতীয় ঋণের ব্যাপারে আমাদের ভারতের দেশীয় লোকদের আগ্রহান্বিত করা উচিত, এটাকে আমি একটা উচ্চ রাজনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন ব্যাপারে বলে মনে করি……।"[২৩৮] Sir Charles Wood, Lawrence-কে অনুরূপ পরামর্শই দিয়েছিলেন।[২৩৯]

কিন্তু ভারত সরকার লণ্ডনের বাজার থেকেই অর্থ সংগ্রহ করতে লাগল। সরকারি ঋণের দেশীয় গ্রাহক এত কম কেন সে সম্বন্ধে Mayo একটা কারণ দেখিয়েছিলেন, "বর্তমানে আমরা এখান থেকে ঋণ পেতে পারি না। একজন দেশীয় মহাজন তার টাকার উপর মোটামুটি নিরাপদে ১০ থেকে ১৫ অথবা ১৮ শতাংশ (সুদ) আশা করে ও পায়।······ কাজেই বেশ কয়েক বছর আমাদের ইউরোপ থেকেই ঋণ নিতে হবে" মাত্র ৪ শতাংশ সুদ দেবার শর্তে।[২৪০] আরও বলা হত যে "আমাদের ঋণের জন্য ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা", দেশীয় পুঁজিপতিরা "ক্রমশঃ বেশি করে জমির মালিক হবার জন্য ব্যাকুল" (বিশেষ করে বাংলায়) এবং সেই পুরানো সামন্ত শ্রেণীগুলির ক্ষয় অতীতে যাদের বিরাট বিনিময়যোগ্য তহবিল ছিল কিন্তু এখন যারা গরীব হয়ে গিয়েছে।[২৪১] "ইউরোপীয়দের আমরা যে শর্ত দিই তার চেয়ে ভাল শর্ত কবুল করে দেশীয় বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার প্রশ্নই ওঠে না" বলে ভারত সরকার মনে করত। টাকার বাজারের অবস্থা (যা বছরের বিশেষ ঋতু ও কৃষির পরিস্থিতির উপর নির্ভর করত) অনুযায়ী সরকার অবশ্য মাঝে মাঝে ভারত থেকে ঋণ সংগ্রহ করত।[২৪২] কিন্তু মোটামুটিভাবে ভারত সরকার এ কথা বার বার বলত যে লণ্ডনের টাকার বাজার থেকে অপেক্ষাকৃত সহজে ও সুবিধাজনকভাবে ঋণ তোলা যেত।[২৪৩] ১৮৬৭ সালে সেচের কাজের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতে ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে যোগাড় করার একটা আকর্ষণীয় পরিকল্পনা উপস্থাপিত হয়েছিল। বোম্বাই সরকার ৪০ টাকা অথবা ৫০ টাকার মত অল্প টাকায় ঋণ তোলার প্রস্তাব করেছিল এই শর্তে যে ট্রেজারিতে টাকা জমা দেওয়া যাবে। "এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল সেই সব কৃষি সংশ্লিষ্ট ও অপরাপর শ্রেণীর কাছে সরকারি ঋণের সুযোগ খুলে দেওয়া যারা সাধারণতঃ তাদের সঞ্চয় লুকিয়ে রাখে অথবা ব্যক্তিগত গ্রহীতাদের অত্যন্ত অনিশ্চিত নিরাপত্তার ভিত্তিতে ধার দিয়ে ফেলে।"[২৪৪] সেক্রেটারি অব স্টেট অনেক উত্তমর্ণের কাছে এত কম কম-অঙ্কের টাকা ধার নেওয়ার ব্যবস্থাপনায় খুঁটিনাটি প্রশাসনিক অসুবিধা দেখা দেবে বলে মনে করলেন এবং এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন। একটা আমলাতান্ত্রিক কায়দায় পূর্তকর্মের জন্য ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে কাজে লাগানোর একটা চমৎকার পরিকল্পনার গলা টিপে মারা হল।

উল্লেখিত পুস্তকাদি (References)

১ এই পরিচ্ছেদের চতুর্থ অংশে দেখুন।

২ প্রত্যক্ষ করের কর-নির্ধারক ও সংগ্রহকারীরা ছিলেন অস্থায়ী কর্মচারী এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাঁদের নিযুক্ত করা হত।

৩ পরিশিষ্ট দেখুন।

৪ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ১৪৪ নং, ২৯শে জুন ১৮৬০, ঐ একই Fin. ৫৮ নং, ১৯শে এপ্রিল ১৮৬২, ১৮৬০ সালে জুন মাসের আনুমানিক আয়-ব্যয় সংশোধনের জন্য।

৫ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ৬নং, ১৯শে জানুয়ারি ১৮৫৯।

৬ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ৯ নং, ৩১শে জানুয়ারি ১৮৫৯।

৭ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ২৮ নং, ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯।

৮ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ৫৭ নং, ২৩শে এপ্রিল ১৮৫৯।

৯ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ৫৭ নং, ১৫ই জুন ১৮৫৯।

১০ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Military Despatch ৩৫২ নং, ৭ই অক্টোবর ১৮৫৯।

১১ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ৭৫ নং, ১৮ই আগস্ট ১৮৫৯।

১২ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ২৩ নং, ১৬ই মার্চ ১৮৬৯।

১৩ Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬১, ১৯৭ নং, ভারত সরকারের অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারির নিকট সামরিক অর্থ দপ্তর, ২২শে আগস্ট ১৮৬১, Fin. Progs. আগস্ট ১৮৬১ Accts. নং ১। ভারত সরকারের অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারির নিকট সামরিক অর্থ দপ্তর, ১৫ই জুন ১৮৬১। Fin. Progs. সেপ্টেম্বর ১৮৬১, Accts. নং ১৬৮, ভারত সরকারের প্রস্তাব, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৬১।

১৪ পরিশিষ্ট দেখুন।

১৫ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ১৩৬ নং, ২২শে আগস্ট ১৮৬০। Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬১, Accts. নং ১৯৩, অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারির নিকট সামরিক অর্থ দপ্তর, ৮ই অক্টোবর ১৮৬১।

১৬ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ১৩৬ নং, ২২শে আগস্ট ১৮৬০।

১৭ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব.স্টেট, ঐ একই Fin. ৮৫ নং, ১৭ই মে ১৮৬১।

১৮ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ২০৯(এ) নং, ১২ই ডিসেম্বর ১৮৬১।

১৯ C. Wood-এর নিকট B. Frere, ৩রা মে ১৮৬০, Martineau-র পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, ভল্যুম I, পৃষ্ঠা ৩০০, "সামরিক ও পুলিশ কমিশনগুলির মধ্যে যেভাবে সব গোটা গোটা বাহিনী আবিষ্কৃত হয়েছে যার কথা এর আগে কেউ জানত না, অথচ যা রাজনৈতিক বা বিচার বিভাগীয় খরচের কোনও না কোন খাতের তলায় লুকানো ছিল, তা দেখলে হাসাকর মনে হবে, যদি না আরও খারাপ কিছু হয়।" G. Clerk-এর কাছে B. Frere, ৮ই মে ১৮৬১, 'পূর্বোক্ত' ৩১৪ পৃষ্ঠা।

২০ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ১৭ই এপ্রিল ১৮৬২।

২১ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Military Despatch ১৩২ নং, ১৯শে মার্চ ১৮৬৪। সেক্রেটারি অব স্টেটের মনে হয়েছিল যে অর্থ দপ্তরের বাইরে একটা সামরিক অর্থ দপ্তর বজায় থাকাটা সাধারণ রীতিবহির্ভূত। ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ১ নং, ৮ই জানুয়ারি ১৮৬৩। C. E. Trevelyan এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে অর্থ দপ্তরে অর্থ-বিষয়ক নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীয়করণই হল কাম্য। Fin. Progs. ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪, বিবিধ ১৪ নং, C. E Trevelyan-এর Minute, ১৮ই মে ১৮৬৩।

২২ পরিশিষ্ট দেখুন।

২৩ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ৬৬ নং, এপ্রিল ১৮৬৫।

২৪ J. Lawrence-এর নিকট Cranborne, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭, Lawrence Papers, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট থেকে চিঠিপত্র, ভল্যুম IV, ৭ নং।

২৫ J. Lawrence-এর নিকট C. Wood, ৯ই ডিসেম্বর ১৮৬৪, Lawrence Papers, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট থেকে চিঠিপত্র, ভল্যুম I, ৬৭ নং।

২৬ Cranborne-এর নিকট J. Lawrence, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৬, Lawrence Papers, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট J. Lawrence-এর চিঠিপত্র, ভল্যুম III, ৩৪ নং।

২৭ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ৫২ নং, ২৬শে জানুয়ারি ১৮৬৯।

২৮ Lord Sandhrust-এর নিকট Mayo, ২৮শে মে ১৮৭১। Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৩, ১১৭ নং।

২৯ Argyll-এর নিকট Mayo, ১৭ই অক্টোবর ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৭, ২৮৫ নং।

৩০ Argyll-এর নিকট Mayo, ১৫ই মার্চ ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৫, ৭৭ নং।

৩১ W. Arbuthnat-এর নিকট Mayo, ১০ই জানুয়ারি ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৫, ১৭ নং।

৩২ B. Frere-এর নিকট Mayo, ১১ই জানুয়ারি ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৫, ১৫ নং।

৩৩ W. A. Arbuthnat-এর নিকট Mayo, ৫ই ডিসেম্বর ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৭, ৩৪২ নং।

৩৪ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডার-সেক্রেটারির স্মারকলিপি, Argyll-এর নিকট Mayo-র চিঠির সঙ্গে গ্রথিত, ৭ই ডিসেম্বর ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৭, ৩৪৬ নং।

৩৫ W. Arbuthnat-এর নিকট Mayo, ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭০, বাণ্ডিল ৩৫, ৬২ নং।

৩৬ 'পূর্বোক্ত'।

৩৭ Argyll-এর নিকট Mayo, ২০শে মে ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৯, ১৩২ নং।

৩৮ W. Arbuthnat-এর নিকট Mayo ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৫, ৬২ নং।

৩৮ক ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ৭২ নং, ১৬ই মার্চ ১৮৭১।

৩৮খ Mayo-র নিকট Argyll, ৯ই ডিসেম্বর ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৮, ৩৩ নং।

৩৮গ B. Frere-এর নিকট Mayo, ১১ই জানুয়ারি ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৫, ১৫ নং।

৩৯ Argyll-এর নিকট Mayo, ১৭ই জানুয়ারি ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৫, ২০ নং।

৪০ Argyll-এর নিকট Mayo, ১০ই এপ্রিল ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৩, ৯১ নং।

৪১ Argyll-এর নিকট Mayo, ৮ই মে ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৩, ৯৭ নং, Argyll এর মতে লণ্ডনের সঙ্গে Napier-এর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আপত্তিকর নয়। Mayo-র নিকট Argyll, ৯ই জুন ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৯, ১৩ নং।

৪২ Argyll-এর নিকট Mayo, ৪ঠা অক্টোবর ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪১, ২৮২ নং।

৪৩ Argyll-এর নিকট Mayo, ৩০শে নভেম্বর ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৭, ৩৩৫ নং।

৪৪ Fin. Progs. নভেম্বর ১৮৬৯, Accts. নং ৪৫, H. M. Durand-এর Minute, ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৯।

৪৫ 'পূর্বোক্ত' ৪৮ নং, গভর্নর-জেনারেলের Minute, ৪ঠা অক্টোবর ১৮৬৯।

৪৬ Argyll এর নিকট Mayo, ৩০শে নভেম্বর ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৭, ৩৩৫ নং।

৪৭ Mayo-র নিকট Argyll, ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৯, ৩ নং।

৪৮ কেম্ব্রিজের ডিউক H. R. H.-এর নিকট Mayo, ২২শে মার্চ ১৮৭০,

Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৫, ৮২ নং, ১৮৭০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে H. R. H-এর নোটের উত্তরে লেখা।

৪৯ Mayo-র নিকট Argyll, ১০ই ফেব্রুয়ারি Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৯, ৩ নং।

৫০ Mayo-র নিকট Argyll, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৯, ৫ নং।

৫১ Mayo-র নিকট Argyll, ৩রা মার্চ ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৯, ৫ নং।

৫২ Argyll-এর নিকট Mayo, ১৭ই জানুয়ারি ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৫, ২০ নং।

৫৩ Mayo-র নিকট Argyll (গোপনীয়), ২৬শে অক্টোবর ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৭।

৫৪ 'পূর্বোক্ত'।

৫৫ 'পূর্বোক্ত'।

৫৬ P.P.H.C. ১৮৭৩, ভল্যুম ১২, কোড ৩৫৪, ৪৭৫২, ৪৭৫৭, ভারতীয় অর্থ-বিষয়ক প্রশ্নে সিলেক্ট কমিটির সামনে J. Lawrence-এর সাক্ষ্য।

৫৭ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি থেকে পিছিয়ে আসবার জন্য Mayo কার্যতঃ Argyll-কে অভিযুক্ত করেছিলেন, Argyll-এর নিকট Mayo, ১৫ই এপ্রিল ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৩, ৯১ নং, ঐ একই ৯ জানুয়ারি ১৮৭১, বাণ্ডিল ৪২, ১৩ নং।

৫৮ Mayo-র নিকট Argyll, ৪ঠা নভেম্বর ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৭। "আপনাদের প্রস্তাবিত সৈন্যবাহিনী হ্রাস সংক্রান্ত বিষয়টি এমন সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যা শুধু ভারতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, গোটা সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট······মোটের উপর আমি যা বোঝাতে চাই তা হল এই যে 'বর্তমান মুহূর্তে' ভারতের প্রয়োজনের দিক থেকেই কেবল এই সব বিষয় নির্ধারিত হতে পারে না'।"

৫৯ P.P.H.C. ১৮৯৬, ভল্যুম ১৬, C. ৮২৫৯, পৃষ্ঠা ২৮৫-৩০৮। ভারতের ব্যয় সম্পর্কে Royal Commission-এর রিপোর্ট, পরিশিষ্ট।

১৮২৪ সালে ইণ্ডিয়া অফিস, যুদ্ধ দপ্তর ও ট্রেজারির মধ্যে নিষ্পত্তির নীতিগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তা ১৮৬০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।

৬০ অ্যাক্ট ২৩ ও ২৪, Vict. C ১০০।

৬১ Act ২৪ ও ২৫, Vict. C ৭৪। রাজার বাহিনীতে স্থানান্তরিত হবার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যবাহিনীর সৈন্যদের আপত্তি খুবই জোরালো ছিল : একে বলা হত 'শ্বেত বিদ্রোহ'। P.P.H.C. ১৮৬০, ভল্যুম ৫১, কোড ১৬৯, ১৯৬ I, ১৯৬ II দ্র।

৬২ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ৯০ নং, ৩১শে মে ১৮৬১, চুক্তির শর্তাদিকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করেছে।

৬৩ P.P.H.C. ১৮৯৬, ভল্যুম ১৬, কোড ৮২৫৯, পৃষ্ঠা ২৯৭।

৬৪ P.P.H.C. ১৮৭৪, ভল্যুম ৮, কোড ৩২৯, পৃষ্ঠা ২২৬-২৭, ভারতীয় অর্থ-বিষয়ক প্রশ্নে সিলেক্ট কমিটির ৪র্থ রিপোর্টের পরিশিষ্ট। Seccombe Committee সুপারিশ করেছিল (রিপোর্টসমূহ তাং ১১ই মার্চ ১৮৬৯, ২৪শে নভেম্বর ১৮৬৯, ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭০ এবং ১২ই এপ্রিল ১৮৭২) যে ভারত সরকারকে আরও বেশি হারে অর্থ প্রদান করতে হবে, কারণ অত্যধিক ডিপো খরচ ও ভারতে পাঠানোর জন্য জাহাজে ওঠা পর্যন্ত সংগৃহীত সৈন্য প্রতি খরচের দরুন ব্রিটিশ সরকারের কিছু ক্ষতি হচ্ছে, কিন্তু তখনই এই সব সুপারিশ কার্যকরী করা হয় নি, প্রস্তাবিত হারের বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়া অফিস প্রতিবাদ জানিয়েছিল। 'পূর্বোক্ত' পৃষ্ঠা ২৩০-৪৩।

৬৫ যুদ্ধ দপ্তরেব আণ্ডার-সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ইণ্ডিয়া অফিসের মিলিটারি সেক্রেটারির পক্ষে J. P. Thom, ৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৭১। P.P.H.L. ১৮৭৪ ভল্যুম ৮, কোড ৩২৯, পৃষ্ঠা ২৪৫।

৬৬ ভারতের জন্য আণ্ডার-সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট যুদ্ধ দপ্তরের H. Cambell, ১৪ই এপ্রিল, 'পূর্বোক্ত' পৃষ্ঠা ২৪৮।

৬৭ 'পূর্বোক্ত'।

৬৮ যুদ্ধ দপ্তরের আণ্ডার-সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ইণ্ডিয়া অফিসের সামরিক সেক্রেটারি, T. E. Pears, ৯ই আগস্ট ১৮৭২, 'পূর্বোক্ত' পৃষ্ঠা ২৪৯-৫৩।

৬৯ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Military Despatch ৯৪ নং, ১৫ই মে ১৮৭৩। ভারত সরকার দেখিয়েছিল যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সদ্য সংগৃহীত সৈন্যদের যে খরচ দিত (সব রকম সৈন্যদের জন্য ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত ১০ বছরের গড় ছিল ১৯ পাঃ ১৪ শিঃ ১০ই পেঃ) ১৮৭৩ সালের যুদ্ধের জন্য সেক্রেটারি অব স্টেট যে ব্যয় দাবি করেছিলেন তা তার তুলনায় অনেক কম ছিল (অশ্বারোহী সৈন্যদের জন্য ১৩৬ পাঃ ১৩ শিঃ ১১ পেঃ, পদাতিকদের জন্য ৬৩ পাঃ ৮ শিঃ ৫ পেঃ, রয়াল অশ্বারোহী গোলন্দাজ বাহিনী ৭৮ পাঃ ১৪ শিঃ ৮ পেঃ, রয়াল গোলন্দাজ বাহিনী ৫৮ পাঃ ৯ শিঃ ৩ পেঃ)।

৭০ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ১১০ নং, ১০ই জুলাই ১৮৬০।

৭১ P.P.H.C. ১৮৯৬, ভল্যুম ১৬, C ৮২৫৯, পৃষ্ঠা ৩০৪ দেখুন।

৭২ P.P.H.C. ১৮৬২, ভল্যুম ১৬, কোড ১৬৫, পৃষ্ঠা ৪৮৩ ও পরবর্তী।

৭৩ Sir A. Tulloch-এর কমিটি (১৮৫৯) ২ লক্ষ পাউণ্ড সুপারিশ করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল কর্মচ্যুত সৈন্যদের পেনসন বাবদ ১ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড, আহত অফিসারদের পেনসন বাবদ ২ হাজার ৩ শত ৭৪ পাউণ্ড, অবসরের জন্য পূর্ণ মাহিনা অথবা অবসর গ্রহণের জন্য অপরাপর সামরিক ভাতা বাবদ ২১ হাজার ৫ শত ৪১ পাউণ্ড, বিধবা ও শিশুদের জন্য পেনসন ও ভাতা বাবদ ১৫ হাজার ৩ শত ৬৯ পাউণ্ড, 'পূর্বোক্ত'।

৭৪ Act ২৫ ও ২৬, Vict C. ২৭। ১৮৭০ সালের মার্চ অবধি চুক্তিটি বলবৎ ছিল, যদিও আইনটি ১৮৬৭ সালের মার্চ পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

৭৫ Fin. Progs. ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮, Accts. নং ৫৭। গভর্নর-জেনারেলের Minute, ২০শে জানুয়ারি ১৮৬৮।

৭৬ Argyll-এর নিকট Mayo, ৬ই এপ্রিল ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৯, ১০০ নং।

৭৭ Act ২১ ও ২২, Vict. C. ১০৬, অংশ ৫৫।

৭৮ যুদ্ধ দপ্তরের আণ্ডার-সেক্রেটারির নিকট ইণ্ডিয়া অফিসের সামরিক

সেক্রেটারি, T. T. Pears, ৯ই আগস্ট ১৮৭২, P.P.H.C. ১৮৭৪ ভল্যুম ৮, কোড ৩২৯, পৃষ্ঠা ২৪৯ ও পরবর্তী।

৭৯ Oxford Dictionary of Quotations, ১৯৪১, পৃষ্ঠা ৫২৭।

৮০ আবিসিনিয়া অভিযানের দরুন ভারত সরকার বিপুল পরিমাণে আগাম অর্থ দেবার জন্য ভারতের জমা নগদ অর্থের পরিমাণ কমে উদ্বেগ-জনক অবস্থায় পৌঁছেছিল (সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকারের তারবার্তা, ২৫শে আগস্ট ১৮৬৭)। সেক্রেটারি অব স্টেট ভারতের উপর তাঁর টাকার আজ্ঞাপত্র (draft) হ্রাস করেছিলেন (ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ৩১৬ নং, ৩১শে আগস্ট ১৮৬৭)। সেক্রেটারি অব স্টেট ইংল্যাণ্ডে ১২ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ হিসাবে সংগ্রহ করেছিলেন। (ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ৪৮৫, ২৪শে নভেম্বর ১৮৬৮)। ভারত সরকার অভিযোগ করেছিলেন যে 'ভারতের সঙ্গে সম্পর্কহীন কাজের' জন্য ১ বছরে ৭০ লক্ষ পাউণ্ড আগাম দেওয়া খুবই কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল (সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ৩৩২ নং, ২১শে ডিসেম্বর ১৮৬৮)। ভারতে অনেক রকম ঋণ তোলা হয়েছিল (সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার Fin. ৩৩৯, ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৬৮)।

৮১ Fin. Progs ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮, Accts. ৫৭ নং, গভর্নর-জেনারেলের Minute, ২০শে জানুয়ারি ১৮৬৮।

৮২ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

৮৩ H. Durand-এর নিকট Mayo, ২৪শে এপ্রিল ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৯, ১০৫ নং।

৮৪ 'Hansard' তৃতীয় সিরিজ CXC কলাম ৪০৬, ২৮শে নভেম্বর। উদ্ধৃত R. Robinson এবং অন্যান্য। পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ পৃষ্ঠা ১২।

৮৫ Sir C. Dilke-এর Greater Britain (London, 1869), পৃষ্ঠা ৪৭০-৭৪।

৮৬ আর্থিক প্রতিবন্ধক ও Mutiny Act (বিদ্রোহ আইন)-এর শর্তাদি সম্পর্কে ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Military

Despatch (সামরিক বার্তা) ১০৮ নং, ১৭ই মার্চ ১৮৬২ দেখুন ।

৮৭ 'পূর্বোক্ত' ।

৮৮ P.P.H.C. ১৮৭৪, ভল্যুম ৮, কোড ৩২৯, পৃষ্ঠা V ।

৮৯ Fin. Progs. ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮, Accts. নং ৫৭, গভর্নর-জেনারেলের Minute, ২০শে জানুয়ারি ১৮৬৮ ।

৯০ সেক্রেটারি অব স্টেটের ১৮৬৯ সালের ৪ঠা নভেম্বরের বার্তায় (রেলওয়ে চিঠি, ১০৯ নং) রেলওয়ে চুক্তির শর্তাদির পুরোপুরি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। পূর্তকর্মের অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেল George Chesney-এর 'Indian Polity' (London, 1868), পুস্তিকায় একটি চমৎকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। ১৮৪৯ সাল পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরবৃন্দ ও রেলওয়ে কোম্পানিগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে Daniel Thorner-এর 'Investment' in Empire (Philaldelphia, 1950), পৃষ্ঠা ১১৯-৬৭ দেখুন ।

৯১ Daniel Thorner-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৭৮ ।

৯২ Mayo-র নিকট Argyll, ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৭, ৭ নং ।

৯৩ Daniel Thorner পূর্বোল্লেখিত স্থানে ।

৯৪ P.P.H.C. ১৮৭২, ভল্যুম ৮, কোড ৩২৭। ইস্ট ইণ্ডিয়া অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারের উপর সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট ও কার্য-বিবরণী। Danvers (১৮৬১-৬৩), Chesney (২৬৪৩-৪৬) ও R. Strachey (৬৮৮২, ৬৮৮৭)-র সাক্ষ্য। এর পর থেকে 'ফিনান্স সিলেক্ট কমিটি' হিসাবে উল্লেখিত হয়েছে, অনুচ্ছেদের নম্বরগুলি বন্ধনীর মধ্যে দেখানো হয়েছে ।

৯৫ রেলওয়েতে লগ্নিকারকরা "ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ ঋণের উপর ঋণ বাবদ যে সুদ তারা আদায় করতে পারত তার চেয়ে অনেক উচ্চতর হারে সুদ দাবি করতে তারা সক্ষম হয়েছিল, যদিও সিকিউরিটিতে পার্থক্যটা ছিল নেহাতই আধিবিদ্যক (metaphysical)" L. H. Jenks পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২২৩ ।

৯৬ L. H. Jenks-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২২৫, ২১৯ ।

৯৭ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Financial Despatch ১৩৬ নং, ২২শে আগস্ট ১৮৬০।

৯৮ P.P.H.L. ১৮৭২, ভল্যুম ৮, কোড ৩২৭, ফিনান্স সিলেক্ট কমিটি। Strachey প্রদত্ত সাক্ষ্য (১৮৩৬-৪১)। George Chesney-র পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩৭৬। অবশ্য, বিনিময় হার ভারত সরকারের নিকট লাভের একটি উৎস হয়ে উঠতে পারত, পরিবহনের আয় থেকে লণ্ডনে কোম্পানিগুলির নামে জমা দেওয়া প্রত্যেকটি টাকায় ২ পেন্স করে ভারত সরকারের লাভ হবে।

৯৯ "লণ্ডনে রেল কোম্পানিগুলির কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ এবং ভারতে সেই অর্থ টাকায় ১ শিলিং ১০ পেন্স হারে রেল কোম্পানিগুলিকে দেওয়ার ফলে বিনিময় জনিত ক্ষতি অদ্যাবধি ভারতীয় রাজস্ব থেকে ব্যয় হিসাবে বিবৃত হয় নি, কিন্তু ভবিষ্যতে আনুমানিক আয়-ব্যয় ও হিসাবের (Estimates and Accounts) মধ্যে তা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।" ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. Despatch ৬৭ নং, ২৬শে এপ্রিল ১৮৬০।

১০০ পরিশিষ্ট দেখুন।

১০১ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Financial Despatch ৬৩ নং, ২০শে মে ৮৬১।

১০২ 'পূর্বোক্ত'।

১০৩ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কার্য-বিবরণী, ১৮৬৪, ভল্যুম III (নিউ সিরিজ), পৃষ্ঠা ২১৯-২০।

১০৪ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. Despatch ৮৩ নং, ৯ই জুন ১৮৬২।

১০৫ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Railway Despatch, ১০৯ নং, ৪ঠা নভেম্বর ১৮৫৯।

১০৬ N. Sanyal-এর 'Development of Indian Railways' (Calcutta, 1930), পৃষ্ঠা ৬৪।

১০৭ P.P.H.C. ১৮৭২, ভল্যুম ৮, কোড ৩২৭। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য সিলেক্ট কমিটি। Lord Lawrence (৪৫৮৯-৯২), A. Cotton (৮৩১১), Chesney (২৬২২-২৫), W. N. Massey

(৮৮৬৬-৬৭) এবং Thornton (১৭৮১-৮২)-এর সাক্ষ্য। প্রারম্ভিক খরচের মতই রেল চালানোর খরচও ছিল বিরাট। যুক্তরাজ্যে ১৮৭২ সালে রেলপথের মোট আয়ের ৪৯% খরচ হত রেল চালানোর জন্য, আর ভারতে হত ৫৪%। যুক্তরাজ্যে নীট আয় হত লগ্নিকৃত মূলধনের ৪.৪৭%, আর ভারতে হত ৩½%। J. A. Raynes-এর 'Railways in the United Kingdom and India 1872', 'The Indian Economist', ৩১শে জানুয়ারি ১৮৭৪।

১০৮ Mayo-র নিকট Argyll, ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৭, ৭ নং।

১০৮ 'Friend of India', ২৮শে মে ১৮৬৩ 'Railway Anarchy' এই শিরোনামায় প্রবন্ধ।

১১০ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Railway Despatch, ৭৮ নং, ১০ই অক্টোবর ১৮৬০। যেসব কোম্পানি তাদের অ্যাকাউণ্টে জমা টাকা থেকে বেশি টাকা নিয়েছে তাদের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেবার অনুমতি দিয়ে ১৮৬০ সালের ১০ই জুলাই তারিখে সেক্রেটারি অব স্টেটের Financial Despatch নং ১১০-এ লিখিত পূর্বেকার নির্দেশনামাটি সেক্রেটারি অব স্টেটের ঐ বার্তায় বাতিল করে দেওয়া হল।

১১১ Fin. Progs. সেপ্টেম্বর ১৮৬০, ৪২ নং, ভারত সরকারের মন্তব্য সমূহ, ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৮৬০।

১১২ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Financial Despatch ২০৫ নং, ৮ই ডিসেম্বর ১৮৬০।

১১৩ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Financial Despatch ১৬ নং, ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬১।

১১৪ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Financial Despatch ২২ নং, ২রা ফেব্রুয়ারি ১৮৬১।

১১৫ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Financial Despatch ১৯৯ নং, ৩১শে আগস্ট ১৮৬৬।

১১৬ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Financial Despatch ৫৮ নং, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭।

১১৭ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Railway Despatch ১০ নং, ৪ঠা নভেম্বর ১৮৫৯।

১১৮ Fin. Progs. ডিসেম্বর ১৮৬৪, Accts. ৫৪৬ নং, রেলওয়ে অ্যাকাউন্টসের অডিট ও কণ্ট্রোল সম্পর্কে কার্য-বিবরণী।

১১৯ Fin .Progs. জুন ১৮৬৯, Accts. ৬৫ নং, ভারত সরকারের প্রস্তাব, ১৯শে জুন ১৮৬৯।

১২০ Mayo-র নিকট Argyll, ৩রা আগস্ট ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৭।

১২১ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Financial Despatch ৩৪১ নং, ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৭১।

১২২ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Financial Despatch ৪১ নং, ৩১শে জানুয়ারি ১৮৭২।

১২৩ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Financial Despatch ৭৪ নং, ৮ই মার্চ ১৮৬৭। cf. ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Railway Despatch ৯৪ নং, ১৭ই নভেম্বর ১৮৬০।

১২৪ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Financial Despatch ২৫১ নং, ২৪শে জুন ১৮৬৭।

১২৫ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Financial Despatch ১৭ নং, ৩০শে এপ্রিল ১৮৬৬। সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. Despatch ১১৬ নং, ২৩শে এপ্রিল ১৮৬৮। Fin. Progs. মার্চ ১৮৬৮, Accts. ৩৫ নং, ভারত সরকারের প্রস্তাব, ৫ই মার্চ ১৮৬৮।

১২৬ ইস্ট ইণ্ডিয়া ট্রামওয়ে কোম্পানি এবং ইণ্ডিয়ান ব্রাঞ্চ রেলওয়ে কোম্পানি। N. Sanyal-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৬৭ দেখুন।

১২৭ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Railway Despatch ১৮ নং, ২৩শে মার্চ ১৮৬৭।

১২৮ অযোধ্যা রেলওয়ে কোম্পানি ও কর্ণাটক রেলওয়ে কোম্পানির সঙ্গে সম্পাদিত নতুন চুক্তির মধ্যে ছিল ২ শিলিং-এ ১ টাকা বিনিময়

হার, ২০ বছর পরে রেলপথ অধিগ্রহণ এবং সরকার কর্তৃক আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করায় রাষ্ট্রের অধিকার। ভারত সরকারের নিকট সেকেটারি অব স্টেট, Railway Despatch ৪৪ নং, ১১ই জুন ১৮৬৮।

১২৯ ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি এই প্রস্তাব মেনে নেয় নি; দি গ্রেট ইণ্ডিয়া পেনিনসুলা রেলওয়ে, বোম্বাই-বরোদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে এবং মাদ্রাজ, বোম্বাই, সিন্ধু, পাঞ্জাব ও দিল্লির রেলওয়ে কোম্পানিগুলি ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। N. Sanyal-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৬৭ ও পরবর্তী দেখুন।

১৩০ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Railway Despatch ৮০ নং, ১১ই আগস্ট ১৮৭০।

১৩১ Argyll-এর নিকট Mayo, ১২ই আগস্ট ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪০, ২২৯ নং।

১৩২ Mayo র নিকট Argyll, ১৭ই জানুয়ারি ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৮, ১ নং।

১৩৩ P.P.H.C. ১৮৭২, ভল্যুম ৮, কোড ৩২৭, ফিনান্স সিলেক্ট কমিটি, S. Laing (৭৫২৬-২৯)-এর সাক্ষ্য। Argyll লিখেছেন Bartle Frere-কে, "গ্যারাণ্টিপ্রাপ্ত কোম্পানিগুলি যত দ্রুত রেলপথ নির্মাণ করেছে ভারত সরকার বাস্তবে তা কখনও পারবে কিনা সে সম্পর্কে চরম অবিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন।" Mayo-এর নিকট Argyll, ১৯শে নভেম্বর ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৭। বোম্বাই'র গভর্নর থাকাকালীন Frere ব্যক্তিগত মালিকদের 'আইন বহির্ভূত' সাহায্য দেওয়া পর্যন্তও অগ্রসর হয়েছিলেন। L. H. Jenks-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২১৬।

১৩৪ P.P.H.C. ১৮৭২, ভল্যুম ৮, কোড ৩২৭, ফিনান্স সিলেক্ট কমিটি, W. Thornton (৩০৩২ ও পরবর্তী), Strachey (৬৩৮০-৮১) ও G. Chesney (২৬২৩)-এর সাক্ষ্য। P.P.H.C. ১৮৭৩, ভল্যুম ১২, কোড ৩৫৪, ফিনান্স সিলেক্ট কমিটি, Lord Lawrence-এর সাক্ষ্য (৪৭৭৭-৭৯)।

১৩৫ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Railway Desp-

১২৫ নং, ৩রা ডিসেম্বর ১৮৬৭। সঙ্গে দেওয়া হল গভর্নর-জেনারেল Lawrence -এর Minute, ১৬ই আগস্ট ১৮৬৭।

১৩৬ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Railway Despatch ৫ নং, ২৪শে জানুয়ারি ১৮৬৮।

১৩৭ Mayo-র নিকট Argyll, ১৭ই জানুয়ারি ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৮, ১ নং।

১৩৮ 'পূর্বোক্ত'।

১৩৯ Argyll-এর নিকট Mayo, ২১শে ডিসেম্বর ১৮৬৮, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৭, ৩৬৩ নং।

১৪০ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Railway Despatch ২৪ নং, ১১ই মার্চ ১৮৬৯। ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Railway Despatch ৪২ নং, ১৫ই জুলাই ১৮৬৯।

১৪১ Mayo-র নিকট Argyll, ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৭, ৭ নং।

১৪২ 'পূর্বোক্ত'।

১৪৩ Duke of Argyll-এর অর্থ-বিষয়ক বিবৃতি, ২৩শে জুলাই ১৮৫৯। 'Financial Statements……Reprinted from Hansard's Parliamentary Debates (Calcutta, 1873), পৃষ্ঠা ৮১০'।

১৪৪ Mayo-র নিকট Argyll, ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯। Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৭, ৭ নং (মূল গ্রন্থে বাঁকা হরফ)।

১৪৫ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Financial Despatch ২৪৪ নং, ২৯শে জুন ১৮৬০, এই অর্থ-বিষয়ক সরকারি বার্তাটির খসড়া তৈরি করেছিলেন Wilson—"রেলওয়ে ব্যবস্থা শুরু করার ব্যাপারে আমি প্রায় একাই ছিলাম সহায়ক।" Lord Canning-এর নিকট J. Wilson, ২৫শে আগস্ট ১৮৫৯ (E. B. II, পৃষ্ঠা ১৮১)। Wilson লজ্জাকর অতিরঞ্জনের দোষে দোষী।

১৪৬ J. Lawrence-এর নিকট Cranborne, ৩রা নভেম্বর ১৮৬৬, Lawrence Papers, J. Lawrence-এর নিকট সেক্রেটারি অব স্টেটের চিঠিপত্র, ভল্যুম III, ৩৯ নং।

১৪৭ Strachey-র 'India its, administration and progress'

(London, 1911), পৃষ্ঠা ২২৮-৩৪। William to Thornton-এর 'Public Works in India' (London, 1875)। Sir A. Cotton-এর 'Public works in India' (London, 1854)।

১৪৮ L. H. Jenks—The Migration of British Capital (London, 1938), পৃষ্ঠা ২০৮। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির Ross D. Mangles-এর বিবৃতি অনুযায়ী ১৮৩৪ থেকে ১৮৪৮-এর মধ্যে কোম্পানি বছরে ২ কোটি পাউণ্ড বাৎসরিক আয়ের মধ্যে থেকে মাত্র ১৪ লক্ষ ৩৪ হাজার পাউণ্ড ভারতে পূর্তকর্ম বাবদ খরচ করেছিল ('পূর্বোক্ত' পৃষ্ঠা ২০৮)। ১৮৫৮ সালে John Bright বলেছিলেন, ১৮৩৪ থেকে ১৮৪৮ সাল, এই ১৪ বছরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তার সমগ্র বিশাল সাম্রাজ্যে সব রকম পূর্তকর্মের জন্য যা খরচ করেছিল একমাত্র ম্যাঞ্চেস্টার শহরই ঐ সময়ে তাদের অধিবাসীদের শুধু জল সরবরাহ বাবদ তার থেকে বেশি খরচ করেছে।" (উদ্ধৃত, J. Strachey-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৩৩)।

১৪৯ পরিশিষ্ট দেখুন।

১৫০ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার Fin. Despatch ২৩৯ নং ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৮।

১৫১ 'Indian Finance' (London, 1880), পৃষ্ঠা ১৫৫।

১৫২ L. C. Probyn-এর বিতর্কমূলক পুস্তক 'Is India Solvent?' (London, 1880) এবং W. M. Thorburn, 'India Solvent' (Madras, 1880), অধ্যাপক Fawcett-এর তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন Probyn "ব্যক্তিবিশেষ ও সরকারের ব্যালান্স-শীট-এর মধ্যে তফাত" বুঝতে পেরেছিলেন। পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৩।

১৫৩ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Public Despatch ৩৯ নং, ৮ই আগস্ট ১৮৬৪।

১৫৪ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, P. W. Despatch ২৯ নং, ৯ই মার্চ ১৮৬৫। সেক্রেটারি অব স্টেট-এর নিকট ভারত সরকার Sep. Rev. Despatch ১৩ ও ১৪ নং, তাং ৭ ও ৮ই এপ্রিল ১৮৬৫।

১৫৫ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, ৩০শে নভেম্বর ১৮৬৫। Fin. Progs.-এর Exp. ২০৬, জানুয়ারি ১৮৬৬।

১৫৬ J. Lawrence-এর নিকট Cranborne, ৩রা নভেম্বর ১৮৬৬। John Lawrence Papers, J. Lawrence-এর নিকট সেক্রেটারি অব স্টেটের চিঠিপত্র, ভল্যুম III, ৩৯ নং।

১৫৭ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Financial Despatch ২০০ নং, ২৩শে আগস্ট ১৮৬৬।

১৫৮ সেক্রটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Financial Despatch ২১০ নং, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৬। ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. Despatch ২৬৩ নং, ৯ই নভেম্বর ১৮৬৬।

১৫৯ J. Lawrence-এর নিকট Cranborne, ৩রা নভেম্বর ১৮৬৬, J. Lawrence Papers, J. Lawrence-এর নিকট সেক্রেটারি অব স্টেটের পক্ষ থেকে চিঠিপত্র, ভল্যুম III, ৩৯ নং।

১৬০ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Financial Despatch ২৫৫ নং, ২০শে ডিসেম্বর ১৮৬৬। কর্তৃপক্ষ যদিও সেচ কার্যের লাভজনক চরিত্রের উপর জোর দিয়েছিলেন তা সত্ত্বেও একটা সেচ প্রকল্প কতখানি লাভজনক তা নির্ধারণ করা তাঁদের পক্ষে বস্তুতঃ অসম্ভব ছিল। যেমন, সেচের সুযোগের দরুন ভূমি রাজস্বের যে বৃদ্ধি হবে তা কি পূর্তকর্মে বিনিয়োগ থেকে লাভ বলে গণ্য করা করা হবে? মাদ্রাজের একটা সেচ প্রকল্পকে নির্মাণের আগে যে পরিমাণ ভূমি রাজস্ব পাওয়া যেত এবং নির্মাণের পরে যে পরিমাণ পাওয়া গেল তার মধ্যেকার তফাতের গোটা কৃতিত্বটাই দেওয়া হয়েছিল। কাজেই মাদ্রাজের সেচ প্রকল্প উচ্চ হারের রিটার্ন দেখাল। উত্তরপ্রদেশ সীমান্ত প্রদেশগুলিতে একটা সেচ প্রকল্পকে কেবল সেচপ্রাপ্ত ক্ষেতের জল করের কৃতিত্বটুকু দেওয়া হল। কাজেই কাগজে-কলমে রিটার্নের হার নীচু বলে মনে হল যদিও ভূমি রাজস্বে সরকারের লাভ হল। Home Progs. Revenue, ২৮শে মে ১৮৭০, ১৫(৭) নং। ১৮৬৯ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে Col. R. Strachey কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট। ১৮৫৭-৫৮ ও ১৮৬২-

৬৩ সালের মধ্যে মাদ্রাজের কতকগুলি সেচ প্রকল্প থেকে ৪ শতাংশ সুদ দেবার পর নীট আয় ০'৩ শতাংশ থেকে ২৯'৯ শতাংশ পর্যন্ত হয়েছে বলে দেখা গেল, অপর কতকগুলি থেকে নীট আয় দেখা গেল ০'৩ শতাংশ থেকে ৫৪'৩ শতাংশ পর্যন্ত; মোটামুটি প্রকল্পগুলি লাভজনকই ছিল। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলিতে এই একই সময়ে রীতিমত ক্ষতি হয়েছিল (ভারত সরকারের কাছে সেক্রেটারি অব স্টেট, Financial Despatch ২৬৬ নং, ৩০শে নভেম্বর ১৮৬৫)।

১৬১ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট Financial Despatch ৭৯ নং, ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭। ইতিমধ্যেই ১৮৬৭-৬৮ সালের বাজেটে সেচ কাজের ব্যয়কে চলতি হিসাব থেকে সরিয়ে ঋণের হিসাবের মধ্যে আনা হয়েছিল। (সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. Despatch ৭৩ নং, ৮ই মার্চ ১৮৬৭)। ১৮৬৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে সেক্রেটারি অব স্টেটের সরকারি বার্তা পেয়ে ভারত সরকার বাজেট বিবৃতি বদল করে নিয়েছিল: (ক) সেচ কাজ বাবদ খরচ 'ঋণ' থেকে তুলে নিয়ে 'অসাধারণ ব্যয়' খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল ; (খ) 'জেলসমূহের' জন্য খরচকে ইণ্ডিয়া অফিসের নির্দেশে অসাধারণ ব্যয় থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। হিসাব পদ্ধতিতে এই ধরনের পরিবর্তন ভারতীয় অর্থ-বিষয়ক পরিসংখ্যানের তুলনামূলক বিচার করার কাজ খুবই কঠিন করে তুলেছে।

১৬২ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. Despatch ২২০ নং, ১৪ই জুন ১৮৬৭।

১৬৩ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. Despatch ২৮৮ নং, ৯ই জুলাই ১৮৬৮। নির্দেশ অনুযায়ী ভারত সরকার সামরিক প্রকল্প, যোগাযোগ, বাঁধ ও জেল-এর সকল ব্যয়কে 'সাধারণ খরচ' খাতে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছিল—সমগ্র বোঝাটাই বছরের রাজস্বের উপর সমগ্রভাবে চাপানো হয়েছিল। শুধু সেচ ও বিশেষ তহবিল প্রকল্পকে 'অসাধারণ খরচ' খাতে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছিল—যেসব খরচ ঋণ সংগ্রহ করে মেটাতে হবে।

(সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. Despatch ২৮৩ নং, ২১শে অক্টোবর ১৮৬৮, ৩১৩ নং ২৩ নভেম্বর ১৮৬৮ ।

১৬৪ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Financial Despatch ৭২ নং, ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭ ।

১৬৫ Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৬৭ । Exp. ১১৩ নং পূর্তকর্ম বিভাগে স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেলের প্রস্তাব, ২২শে জানুয়ারি ১৮৬৭, ১১৪ নং, অর্থ দপ্তরের প্রস্তাব, ৩১শে জানুয়ারি ১৮৬৭ ।

১৬৬ Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৬৯, Accts. নং ১৫ । ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Finance Despatch ৪৭৭ নং, ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৬৭ ।

১৬৭ Argyll-এর নিকট Mayo, ১৬ই মার্চ ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৪, ১০২ নং ।

১৬৮ Mayo-র মতও একই ছিল ।

১৬৯ সেচ প্রকল্প কতখানি লাভজনক তা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন । পাদটীকা নং ১৬০ দেখুন ।

১৭০ Mayo-র নিকট Argyll-এর ১৮৬৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি (বাণ্ডিল ৪৭, ৭ নং) ও ১৮৭০ সালের ১৭ই জানুয়ারি (বাণ্ডিল ৪৮, ১ নং) তারিখে লেখা চিঠি দুটিতে পূর্তকর্ম সম্পর্কে তাঁর মতামত ছিল ।

১৭১ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ১০ই অক্টোবর, ১৮৬১ । 'ভৃত্য প্রকাশ' ২রা মে ১৮৬৮ (R.N P. বোম্বাই ১৮৬৮, পৃষ্ঠা ৩১), 'হিন্দু রিফরমার' ১লা নভেম্বর ১৮৬৯ (R.N.P. বোম্বাই ১৮৬৯, পৃষ্ঠা ৫৫৪), 'দনিয়ান প্রকাশ' ১৫ই নভেম্বর ১৮৬৯ (R.N.P. বোম্বাই ১৮৬৯, পৃষ্ঠা ৫৮৬), 'পূর্বোক্ত' ২২শে জুন ১৮৬৮ (R.N.P. বোম্বাই, ১৮৬৮, পৃষ্ঠা ১০২), 'আসাম মিহির' ২৮শে মে ১৮৭৩ (R.N.P. বাংলা, ১৪ই জুন ১৮৭৩), 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ৮ই জুলাই ১৮৬৮ (R.N.P. বাংলা ১৮৫৮, পৃষ্ঠা ১৪৭), 'প্রয়াগ দূত' ১৫ই জুলাই ১৮৬৮ ।

১৭২ 'সোম প্রকাশ' ২৩শে নভেম্বর ১৮৬৮ (R.N.P. বাংলা, ১৮৬৮, পৃষ্ঠা ৩৪৩), 'হিন্দু রিফরমার' ১লা ডিসেম্বর ১৮৬৯ (R.N.P.

বোম্বাই, ১৮৬৯, পৃষ্ঠা ৬০৪), 'সানডে রিভিউ: ৬ই মে ১৮৭০ (R.N.P. বোম্বাই, ১৮৭০, পৃষ্ঠা ১৩৪), 'দনিয়ান প্রকাশ', ২৭শে জুলাই ১৮৬৮ (R.N.P. বোম্বাই, ১৮৬৮, পৃষ্ঠা ২১১)।

১৭৩ বোম্বাই অ্যাশোসিয়েশন এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দেশীয় অধিবাসীদের পক্ষ থেকে দরখাস্ত (১৮৭১)। P.P.H.C. ১৮৭১, ভল্যুম ৮, কোড ৩৮৩, পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ৫১১।

১৭৪ H. Bartle Frere-র নিকট Mayo, ২১শে আগস্ট ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৬, ২০৮ নং।

১৭৫ Fin. Progs. সেপ্টেম্বর ১৮৬৯। Accounts নং ৫৪, ভারত সরকারের পূর্তকর্ম বিভাগের প্রস্তাব, ১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৯।

১৭৬ P.P.H.C. ১৮৭১, ভল্যুম ৪, কোড ৩৬৩। ফিনান্স সিলেক্ট কমিটির কার্য-বিবরণী। Mr. Geddes-এর সাক্ষ্য (১৯৬৮-৭১)। Alexander R. Binnie-র 'Public Works in India : A letter addressed to the Right Hon. W. E. Gladstone, M.P and other Members of Her Majesty's Govt.' (London, 1881)। ভারতেব পূর্তকর্ম বিভাগের পূর্বতন কর্মচারী Binnie বলেন যে যেখানে ইংল্যাণ্ডে দপ্তর পরিচালনা বাবদ ব্যয় হত সমগ্র কাজের মূল্যের ৫ থেকে ৬ শতাংশ, সেখানে ভারতে ব্যয় হত ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ।

১৭৭ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Public Works Despatch ৬৭ নং, তাং ৩০শে জুন ১৮৬৫; এবং ৩ নং, তাং ৬ই জানুয়ারি ১৮৬৬। সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার P.W.D. (Military) Despatch ৩৪ নং, তাং ১৭ই মার্চ ১৮৬৫, ৫২ নং, ১১ই মে ১৮৬৫, ১০৮ নং, ৩০শে আগস্ট ১৮৬৫।

১৭৮ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. Despatch ২৫২ নং, ৮ই নভেম্বর ১৮৬৫।

১৭৯ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. Despatch ১০ নং, ১২ই জানুয়ারি ১৮৬৫ (গোপনীয়)।

১৮০ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. Despatch ২৫২ নং, ৮ই নভেম্বর ১৮৬৫। এই খাতে প্রতি বছরে আনুমানিক

খরচ ছিল নিম্নরূপ :

১৮৬৫-৬৬	১২ লক্ষ ৭০ হাজার পাউণ্ড
১৮৬৬-৬৭	২০ লক্ষ ,,
১৮৬৭-৬৮	২৮ ,, ,,
১৮৬৮-৬৯	২৮ ,, ,,
১৮৬৯-৭০	২৫ ,, ,,

১৮১ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Financial Despatch ২৩৯ নং, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৮।

১৮২ 'দা রাস্ত গফতার' (বোম্বাই) ইউরোপীয়দের ব্যারাকের জন্য ঢালাও খরচকে ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে দেখত। 'রাস্ত গফতার' ৩০শে অক্টোবর ১৮৭০, বোম্বাই-এর দেশীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে রিপোর্ট, ১৮৭০, পৃষ্ঠা ৫২৫)। স্কুল পক্ষপাতিত্বের ঘটনা হিসাবে একে চিহ্নিত করা হয়েছিল ('রাস্ত গফতার' ২৪শে অক্টোবর ১৮৬৯, R.N.P. বোম্বাই, ১৮৬৯, ৫৪৩ পৃষ্ঠা। এবং 'সোম প্রকাশ' ৭ই নভেম্বরের ১৮৬৪, R.N.P. বাংলা, ১৮৬৪ সালের ১৪ই নভেম্বর রিপোর্ট)।

১৮৩ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভাবত সরকার, Financial Despatch ১০ নং, ১২ই জানুয়ারি ১৮৬৫ (গোপনীয়)।

১৮৪ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Financial Despatch ২১০ নং, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৬।

১৮৫ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Financial Despatch ২৫৮ নং, ২০শে ডিসেম্বর ১৮৬৬।

১৮৬ 'পূর্বোক্ত'।

১৮৭ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Financial Despatch, ৭২ নং, ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭।

১৮৮ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Financial Despatch ৭৯ নং, ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭।

১৮৯ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Financial Despatch ২৮৮ নং, ৯ই জুলাই ১৮৬৮।

১৯০ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Financial Despatch ২৮৩ নং, ২৯শে অক্টোবর ১৮৬৮। ১৮৬৮-৬৯ সালের বাজেট

তদনুসারে বদলানো হয় ; বাজেটে গোড়ায় ২'৪ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত দেখানো হয়েছিল ; প্রকৃতপক্ষে সে বছর বাজেটে ৪'১ কোটি টাকা ঘাটতি হয়েছিল। সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Financial Despatch ৩১৩ নং, ৩০শে নভেম্বর ১৮৬৮।

১৯১ Fin. Progs. মার্চ ১৮৬৮, Accts. নং ৮৮, W. R. Mansfield-এর লেখা Minute, ১৪ই মার্চ ১৮৬৮।

১৯২ Fin. Progs. মার্চ ১৮৬৮, Accts. নং ৮৭, Sir H.M. Durand-এর লেখা Minute, ১৩ই মার্চ ১৮৬৮। এবং ১৮৬৮ সালের ২৩শে মার্চ-এ লেখা Durand-এর Minute, পূর্বোল্লেখিত স্থানে, ৯১ নং, Durand-এর Minute, তাং ১৭ই আগস্ট ১৮৬৮ (একই ধারায়)। Fin. Progs. সেপ্টেম্বর ১৮৬৮, Accts নং ১৬৪।

১৯৩ Fin. Progs. মার্চ ১৮৬৮, Accts. নং ৮৯, J. Lawrence-এর লেখা Minute, ১৮ই মার্চ ১৮৬৮।

১৯৪ Fin. Progs. মার্চ ১৮৬৮, Accts. নং ৯০, J. Strachey-র Minute।

১৯৫ Fin. Progs. মার্চ ১৮৬৮, Accts. নং ৮৮, W. R. Mansfield-এর লেখা Minute, ১৪ই মার্চ ১৮৬৮।

১৯৬ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Financial Despatch ২৩৯ নং, সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ (R.N.P. বাংলা ১৮৬৮, পৃষ্ঠা ২৫৩)। 'মুফিদ-ই-আলম' ১৫ই জুলাই ১৮৭১ (S.V.N. উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ, ১৮৭১, পৃষ্ঠা ৪০১), 'কুম্ভ কোনম আথোনাইয়ুম' ১৭ই জুলাই ১৮৭২ (তামিল সংবাদপত্র সম্পর্কে রিপোর্ট, তাং ৩১শে জুলাই ১৮৭২), 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ১২ই ডিসেম্বর ১৮৭০ ও ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭০।

১৯৭ J. Strachey-র ভারতীয় অর্থব্যবস্থার কয়েকটি বিষয়ের উপর স্মারকলিপি। P.P.H.C. ১৮৭৪, ভল্যুম ৪৭, কোড ৩২৬, পৃষ্ঠা ২৪৫।

১৯৮ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ৭ নং, ১৩ই জানুয়ারি ১৮৬৬, ঐ একই, Fin. ৩৭ নং, ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬।

Home Progs. ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬, ১৩৮৭ নং। J. Strachey-র স্মারকলিপি, ১০ই আগস্ট ১৮৬৫ ও ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৫ ; গভর্নর-জেনারেলের Minute, ৭ই অক্টোবর ১৮৬৫ ; W. N. Massey-র Minute, ২৯শে ডিসেম্বর ১৮৬৫। সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Judicial Despatch ৩০ নং, ৪ঠা জুলাই ১৮৬৩।

১৯৯ 'ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ' ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬। পত্রিকাটি দাবি করেছিল যে জীবনযাত্রার খরচ ১০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। 'পূর্বোক্ত' ১ ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬।

২০০ Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৬৫, পেনসন ও গ্র্যাচুইটি, ৯২ নং, চুক্তিবদ্ধ নয় এমন কয়েকজন সরকারি কর্মচারীদের ভাইসরয়ের নিকট স্মারকলিপি, আগস্ট ১৮৬৪।

২০১ Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৬৫, Expend. Miscell. ৪১৫ নং, কমাণ্ডার-ইন-চিফের লেখা Minute, ৩০শে নভেম্বর ১৮৬৪।

২০২ Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৬৫। Sep. Rev. ৩০৯ নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট বোম্বাই সরকারের সেক্রেটারি, ৭ই জানুয়ারি ১৮৬৫।

২০৩ বোম্বাই সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিশন ১৮৬৩ সালের জুলাই মাসে শস্য বাট্টা সুপারিশ করেছিল। সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ২২ নং, ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪। অতিরিক্ত ব্যয় ছিল নিয়ম-বিরুদ্ধ। কিন্তু তা সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে অনুমোদিত হয়েছিল। ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ১১৮, ১৬ই মে ১৮৬৪। ১৮৬৭ সালে মাহিনা স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি হবার আগে পর্যন্ত শস্য বাট্টা দেওয়া হত, Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৭, Accts. নং ১০৯। ভারত সরকারের প্রস্তাব, ৩০শে এপ্রিল ১৮৬৭।

২০৪ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ৭৪ নং, ১৭ই এপ্রিল ১৮৬৫ ; Fin. ৩৮ নং, ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬ ; Fin. ৪৩ নং, ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬ ; Fin. ১৬০ নং, ২৪শে জুলাই ১৮৬৬ ; Fin. ৯৬ নং, ২৬শে মার্চ ১৮৬৭।

২০৫ সেক্রেটারি অব স্টেট হোম (পাবলিক)-এর নিকট ভারত সরকার, ১৮৬১ সালের ৮ই ও ১৫ই জুনের ৩৭ ও ৪২ নং। সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ১১০ নং, ৪ঠা আগস্ট ১৮৬২। ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ২০৫ নং, ৮ই ডিসেম্বর ১৮৬২।

২০৬ Home. Progs. ডিসেম্বর ১৮৬৮, Public ৬৬ নং। ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত দেশীয়দের সংখ্যা দিয়ে বিবরণ।

২০৭ Fin. Progs. জুন ১৮৭০, পেনসন ও গ্র্যাচুইটি ৬৭ নং, Duke of Argyll-এর নিকট চুক্তিবদ্ধ অসামরিক কর্মচারীদের (বাংলা) স্মারকলিপি, 'পূর্বোক্ত' ৭০ ও ৭১ নং। Sir. S. Northcote-র নিকট মাদ্রাজ ও বোম্বাই'র চুক্তিবদ্ধ অসামরিক কর্মচারীদের স্মারকলিপি।

২০৮ Mayo-এর নিকট Argyll, ১১ই এপ্রিল ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৯, ৮ নং।

২০৯ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ১৫৫ নং, ২৪শে জুন ১৮৭০, ঐ একই, Fin. ১৭১ নং, ১৪ই জুলাই ১৮৭০।

২১০ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ৫২ নং, ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭১।

২১১ তদনুসারে আইনকানুন রচিত হয়েছিল। Fin. Progs. মার্চ ১৮৭১, পেনসন ও গ্র্যাচুইটি ১৭ নং, ভারত সরকারের প্রস্তাব, ৩১শে মার্চ ১৮৭১। তৎকালে প্রচলিত বিনিময় হার অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডে দীর্ঘদিনের ছুটির সময়কার ভাতা প্রদান করা হত। Fin. Progs. জুলাই ১৮৭১, পেনসন এবং গ্র্যাচুইটি ৬১-২ নম্বর। পরবর্তীকালে যখন টাকা-স্টার্লিং বিনিময় হার ভারতের বিরুদ্ধে গেল, তখন স্টার্লিং-এ স্থিরীকৃত পেনসনের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের আর্থিক ক্ষতি হল।

২১২ Mayo-র নিকট Argyll, ৩রা মার্চ ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৯, ৫ নং।

২১৩ Mayo-র নিকট Argyll, ১১ই এপ্রিল ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৯, ৮ নং।

২১৪ 'পূর্বোক্ত'। Mayo দাবি করেছিলেন যে আত্ম-স্বার্থ সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে নি, কারণ তাঁর পরিষদের অসামরিক সদস্যারা ঐ বিষয়ে কোন মন্তব্য বা সুপারিশ করা থেকে বিরত ছিলেন। Argyll-এর নিকট Mayo, ২৩শে মে ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪০, ১১০ নং। বর্ধিত পেনসনের জন্য দরখাস্ত প্রত্যাখ্যান করে প্রেরিত সরকারি বার্তার সুর দেখে অসামরিক কর্মচারীরা অসন্তুষ্ট হতে পারেন এই ভয়ে Mayo Argyll-কে ঐ বার্তাটি প্রকাশ না করতে অনুরোধ করেছিলেন। Mayo-র নিকট Argyll, ২২শে জুন ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৯, ১৪ নং।

২১৫ Fin. Progs. ১৫ই এপ্রিল ১৮৬২, বিবিধ ২৫ নং, অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারির নিকট অসামরিক অর্থ কমিশন, ২০শে মার্চ ১৮৬২।

২১৬ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ৮ই মে ১৮৬২, 'পূর্বোক্ত' ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩।

২১৭ Fin. Progs. নভেম্বর ১৮৬৯। Accts. নং ৪৮, গভর্নর-জেনারেলের স্মারকলিপি, ৪ঠা অক্টোবর ১৮৬৯। Argyll-এর নিকট Mayo, ৯ই জানুয়ারি ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪২, ১৩ নং।

২১৮ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ১৪৪ নং, ২৯শে জুন ১৮৬০।

২১৯ Fin. Progs. মে ১৮৬০, ২১ নং। অর্থ সংক্রান্ত ঘোষণাপত্র, ২৭শে এপ্রিল ১৮৬০, ২৩ নং, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট J. Wilson, ২৮শে এপ্রিল ১৮৬০।

২২০ 'পূর্বোক্ত' ২৫ নং। অর্থসংক্রান্ত ঘোষণাপত্র, ১০ই মে ১৮৬০।

২২১ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ৫৩ নং, ৯ই এপ্রিল ১৮৬৪। ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ১৪ নং, ৯ই জুলাই ১৮৬২ এবং সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ১১৬ নং, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৩।

২২২ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ৬২ নং, ২২শে মে ১৮৬৩।

২২৩ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ২৪০ নং, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৯। ঐ একই, Fin. ২৫৮ নং, ১১ই অক্টোবর ১৮৬৯।

২২৪ R. Temple-এর 'The Story of my Life' (London, 1896), ভল্যুম I, পৃষ্ঠা ২০১, ২০৮।

২২৫ Fin. Progs. ডিসেম্বর ১৮৭১, ৩৮ নং। ভারত সরকারের ঘোষণাপত্র, ২০শে ডিসেম্বর ১৮৭১।

২২৬ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. (গোপনীয়) ১৩০ নং, ১৬ই জুন ১৮৭১।

২২৭ Argyll-এব নিকট Mayo, ২৭শে মে ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৯, ১৪১ নং।

২২৮ উপরে IV দেখুন।

২২৯ A. Cotton-এর 'Public Works in India' (London, 1854), পৃষ্ঠা ৫২-৩। ২৫-৯ এবং ৪৯-৫২ পৃষ্ঠাও দেখুন।

২৩০ 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া ৯ই মে ১৮৬৩।

২৩১ 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট' ১১ই জুলাই ১৮৭০। একমাত্র 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' সরকারের বিপুল পরিমাণ ধার করাকে নিন্দা করেছিল। ১৮৬৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ও ১৮৬৯ সালের ১১ই মার্চ-এর সম্পাদকীয় দুইটি দেখুন।

২৩২ 'রাস্ত গফতার' ১১ই সেপ্টেম্বর ১৮৭০, R.N.P. (বোম্বাই) ১৮৭০, পৃষ্ঠা ৪৪৩; 'পার্বোক্ত', ৯ই অক্টোবর ১৮৭০, R.N.P. (বোম্বাই) ১৮৭০, পৃষ্ঠা ৪৯১। 'সোম প্রকাশ' ৩০শে জুলাই ১৮৬৬, R.N.P. (বাংলা) ৯ই আগস্ট ১৮৬৬।

২৩৩ কমন্স সভায় উপস্থাপিত ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাশোসিয়েশনের দরখাস্ত, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭১, 'Journal of the East India Association, ভল্যুম V, ১৮৭১, পার্ট II, পৃষ্ঠা ১২৮-৯।

২৩৪ Fin. Progs. মে ১৮৭০, Sep. Rev. ৮৩ নং, H. E. Lord Mayo-র নিকট বোম্বাই চেম্বার অব কমার্সের সদস্যবৃন্দ, ১৮ই এপ্রিল ১৮৭০।

২৩৫ T. B. Jeffries-এর 'National Credit and Public Works' (Kurrachi, 1871), পৃষ্ঠা ১৪।

২৩৬ R. Knight এর 'The Financial Statement that should have been delivered and was not' (Bombay, 1870, বেনামীতে

প্রকাশিত), পৃষ্ঠা ৪২। নাইট ছিলেন 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট'-এর প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক।

২৩৭ Mayo-র নিকট Argyll, ১২ই মার্চ ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৭।

২৩৮ J. Lawrence-এর নিকট Halifax (C. Wood), ১০ই মার্চ ১৮৬৬, Lawrence Papers, J. Lawrence-এর নিকট সেক্রেটারি অব স্টেটের চিঠিপত্র, ভল্যুম III, ১৩ নং।

২৩৯ Argyll-এর নিকট Mayo, ১৬ই মার্চ ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৪, ১০২ নং। Mayo তাঁর তথ্যের ব্যাপারে খুবই নির্ভুল ছিলেন। L. C. Jain-এর মতে (Indigeneous Banking in India, London 1929, পৃষ্ঠা ২৫০) দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির সুদের হার সিকিউরিটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে ৬ ও ১৮ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করত।

২৪০ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ১৫৯, ২৪শে জুন ১৮৭০।

২৪১ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার (গোপনীয়), ১৩০ নং, ১৬ই জুন ১৮৭১।

২৪২ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ১৬ নং, ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬১, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ৫৭ নং, ১৩ই মার্চ ১৮৬১, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ২৫৮ নং, ২০শে ডিসেম্বর ১৮৬৬।

২৪৩ Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৬৭, Accts. নং ১০৬, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, ৮ই অক্টোবর ১৮৬৬।

২৪৪ Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৬৭, Accts. নং ১০৮, বোম্বাই সরকারের পূর্তকর্ম বিভাগের সেক্রেটারির নিকট ভারত সরকারের অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারি, ২১শে জানুয়ারি, ১৮৬৭।

৪

রাজস্বের উৎস : কর্মনীতি সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন

যখন বিদ্রোহ শুরু হল ব্রিটিশ ভারতের বিভিন্ন অংশের ভূমিসত্ত্বের ব্যবস্থা তখন ইতিমধ্যেই ছাঁচে ঢালা হয়ে গিয়েছিল—১৭৬৫ সাল থেকে বিভিন্ন ক্রমিক পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে সেগুলি রূপ পরিগ্রহ করেছিল—জমিদারি, রায়তওয়ারি, মহলওয়ারি ইত্যাদি নানা নামে নামাঙ্কিত হয়েছিল—প্রত্যেকটাই ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদদের মতবাদগুলির ভাসা ভাসা ছাপ বহন করছিল। মূলতঃ প্রয়োগবাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণকে কিছু বিদ্বৎসমাজ-গ্রাহ্য বংশমর্যাদায় ভূষিত করার উদ্দেশ্যে এই সব অর্থনীতিবিদদের বুলি ভারতবর্ষে এন্তার ধার নেওয়া হত। ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা—যা বিদ্রোহের পরও বহুলাংশে অপরিবর্তিত ছিল, এবং ভূমি সম্পর্ক—বিদ্রোহত্তর আইনকানুন যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল—সেই দুই ব্যাপার সম্বন্ধে অনুশীলন স্পষ্টতই এই রচনার এক্তিয়ার বহির্ভূত। এখানে ভূমি কেবল আমরা রাজস্বের অথবা ভূমি করের উৎস হিসাবেই দেখব। ভূমি রাজস্ব সম্বন্ধে আমাদের আলোচ্য সময়ে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কর্মনীতিগত প্রশ্ন ছিল সেই সব এলাকায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্প্রসারণ যেখানে অস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভূমি রাজস্ব থেকে সরকারি আয়ের ক্রমবৃদ্ধি বন্ধ করত। ভূমি রাজস্ব থেকে যেহেতু ভারত সরকারের আয়ের ৪০ শতাংশেরও বেশি আসত এই প্রশ্নটির চূড়ান্ত গুরুত্ব ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেবল রাজস্ব আইনের একটা ব্যাপার ছিল না, এ ছিল একটা সামাজিক দর্শন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এক স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলার দর্শনের জন্ম দিয়েছিল—এ দর্শনের ভিত্তি ছিল সম্পত্তি নামক পবিত্র প্রতিষ্ঠান, একে পুষ্ট করত খাজনা এবং সুদের সুস্থিত আয়, এর সোচ্চার প্রকাশ হত উচ্চতর শ্রেণীগুলির সমিতি-সমূহের মারফত। এই সব সমিতি জমির মালিক ও খাজনাভোগী শ্রেণী-গুলির জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক কাঠামোতে সেই মর্যাদা ও ক্ষমতা দাবি করত যা 'সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক নেতাদের' যাদের 'জমিতে একটা স্থায়ী স্বার্থ

ছিল' এবং 'রাজার' যাঁরা অনুগত ছিলেন তাঁদের স্বাভাবিক প্রাপ্য। বাংলা ছিল এই দর্শনের জন্মভূমি, কিন্তু অন্যান্য জায়গায়ও এটা শিকড় গেড়েছিল। এই মতবাদের সঙ্গে হুইগদের রাজনৈতিক ধারণার একটা অনুকরণ ছিল এবং উপযোগিতাবাদী চিন্তাধারা এর মধ্যে ছিল দেদুর। ফলতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত কর্মনীতিতে একটা মতাদর্শগত সংঘাত দেখা দিয়েছিল। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মনে হয়েছিল যে Mill-এর শিষ্যরা তথাকথিত বঙ্গীয় আমলাদের চিন্তাধারাকে (Bengal School) সম্পূর্ণ পরাস্ত করেছেন। তথাপি কিন্তু ষাটের দশকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভাবধারা পুনরুজ্জীবিত হল। ১৮৬২ সালে সেক্রেটারি অব স্টেট ভারত সরকারের সারা ভারতবর্ষে ভূমি রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মঞ্জুর করার পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন।[১] পরবর্তী দুই দশকে যখন এই রকম একটা বন্দোবস্ত সম্প্রসারণের প্রশ্নের খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছিল তখন সিদ্ধান্তটিকে স্থগিত করে রাখা হয়েছিল, আর ১৮৮৩ সালে তা চূড়ান্তভাবে বর্জিত হয়েছিল।[২] বিদ্রোহত্তর পর্যায়ের প্রধান আগ্রহের বিষয় হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের এবং সে সিদ্ধান্ত থেকে ক্রমে ক্রমে সরে আসার পিছনকার মতলব কি ছিল তার অনুশীলন করা।

Warren Hastings সম্পর্কিত রচনায় Macaulay কথাচ্ছলে একটা কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন ঃ ব্রিটিশ ভারতীয় কর্মকর্তাদের শব্দ নির্বাচন তত্ত্বে 'রাজনৈতিক' শব্দটি 'কূটনৈতিক' শব্দটির সঙ্গে সমার্থক ছিল। সিভিল সারভেণ্টরা আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের কাজ যোগ্যতার সঙ্গে চালিয়ে যেতেন, কিন্তু তাঁরা 'সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাপার সম্পর্কে রীতিমত অজ্ঞ' ছিলেন।[৩] ভাষান্তরে বললে কর্মকর্তাদের মনের কাছে সাম্রাজ্যের প্রশাসন রাজনৈতিক নিরিখে বিবেচিত হত না। জেলার অফিসার কিংবা কলকাতার আমলাদের মধ্যে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলির সামাজিক ও রাজনৈতিক নিহিতার্থ অগ্রাহ্য করার ঝোঁক ছিল। কাজেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে বেশিরভাগ সময়ে নিছক রাজস্ব আদায়ের সুবিধা হিসাবেই গণ্য করা হত। সিদ্ধান্ত গ্রহণের উচ্চতর স্তরে অবশ্য ভূমিসত্ত্ব ও বন্দোবস্ত ব্যবস্থার সামাজিক ফলাফল সম্পর্কে বৃহত্তর সচেতনতা দেখা যেত। গভর্নর-জেনারেল পরিষদের ফিনান্স মেম্বার Samuel Laing-এর কাছে

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল একটা নতুন সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি। "আমরা সরকার হিসাবে বিরাজ করি কেবল দেশটা থেকে যত বেশি সম্ভব পাওয়ার জন্যই নয়, অথবা ব্যাপক জনগণকে একটা একই রকমের মৃত স্তরে রেখে দেবার জন্যও নয়, এমন কি যদি একটা পিতৃসুলভ সরকারের অধীনে কৃষক প্রজা সমাজ হিসাবে মোটামুটি সুখী ও সন্তুষ্ট জনগণ হিসাবেও থাকে। আমরা যদি একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিই······আমরা সমাজের একটা অবস্থার ভিত্তি স্থাপন করি—দেশ শাসন করার দিক থেকে তাতে হয়তো সমস্যা উঠতে পারে, কিন্তু সভ্যতা ও প্রগতির উপাদানের দিক থেকে অনেক বেশি বৈচিত্র্য-পূর্ণ ও সমৃদ্ধ।"[৪] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পত্তন করলে "যদিও আরও কষ্ট, অসমতা ও সংঘর্ষ আসতে পারে, তবু সরকার যেখানে সর্বেসর্বা সেখানে যা হতে পারে তার চেয়ে এতে অনেক বেশি প্রাণ, সক্রিয়তা ও প্রগতি থাকতে পারে।······প্রাচ্যে আমাদের যদি আদৌ কোনও কাজ থেকে থাকে তবে তা হল প্রাচ্যে স্বৈরাচারের পুরানো অনুমোদিত ছকের চেয়ে আরও ভাল কিছু চেষ্টা করা ও খুঁজে বের করা······।" Laing স্বীকার করেন যে সমাজে "স্তর বিভাগ এবং অসমতা থাকবে, কিন্তু রাজস্ব দাতা জমিদারই হোক আর অধস্তন রায়তসহ স্থায়ী সত্ত্ববান রায়তই হোক এটা অনিবার্য যে তারা ক্রমে ক্রমে জমি বিক্রি করবে অথবা ইজারা দেবে।"[৫] ভূমির স্থির সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা অবশ্যই একটা প্রবণতার সৃষ্টি করবে ক্রমশ বেশি বেশি লোককে সাধারণ খাজনাদাতা প্রজার ও ভাড়া করা শ্রমিকের পর্যায়ে নিয়ে আসার "কারণ রায়তরা—যাদেরকে স্বাধীন সত্ত্ববান করা হয়েছে—তারা ক্রমে ক্রমে বিক্রি করবে অথবা ইজারা দেবে।"[৫] তার মানে এ কথা বলা যায় যে একদল মধ্যসত্ত্বভোগী তৈরি হয়ে উঠবে। Laing ও Sir Charles Wood-এর মতে এই রকম একটা মধ্য শ্রেণীর আবির্ভাব অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় ছিল, এমন কি Sir John Lawrence যিনি মধ্য-শ্রেণীর চেয়ে জমিওয়ালা চাষীর ("Yeomon") প্রতিই বেশি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তিনিও এঁদের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। ১৮৬২ সালের ৯ই জুলাই প্রেরিত রাজস্ব বার্তায় (Reveuue Despatch) সারা ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সুপারিশ করে Wood 'জমির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রমবিকাশের' আশা করেছিলেন। Lawrence এই রকম একটা শ্রেণীর বাঞ্ছনীয়তার কথাও বলেছিলেন "যে প্রায় নিশ্চিতভাবেই সরকারের প্রতি অনুগত

হবে।"[৬] কিন্তু মনে হয় তাঁর ধারণা Laing থেকে কিছু ভিন্ন রকমের ছিল। Lawrence-এর ইচ্ছা ছিল জমির সঙ্গে সম্পর্কিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি হোক 'বর্তমান জমিওয়ালা চাষী ও সত্ত্ববান চাষীদের জমি থেকে বিচ্যুত না করে', যদিও Laing প্রায় নিশ্চিত জানতেন যে শেষোক্ত শ্রেণীর উচ্ছেদ এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের প্রক্রিয়ারই একটা অঙ্গ। Lawrence তাঁর পাঞ্জাবের কার্যকাল থেকে হয়তো 'পিতৃত্ববাদী' (Paternalist) হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু Laing বা Wood-এর মনোভাবের পিতৃত্ববাদের (Paternalism) কিছু ছিল না। অনেকের এ রকম মত যে বিদ্রোহের পর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাবের পুনরুজ্জীবন John Lawrence-এর প্রশাসনকালে পিতৃত্ববাদের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।[৭] কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধিকাংশ প্রবক্তার দৃষ্টিভঙ্গি মূলতঃ ছিল প্রয়োগ সর্বস্ব, তাঁদের সামাজিক দর্শনে পিতৃত্ববাদে ফিরে যাওয়ার সাক্ষ্য বিশেষ মেলে না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্নকে মতাদর্শগত প্রশ্ন হিসাবে বুঝতে হলে এই বিষয়ে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকেও হিসাবের মধ্যে নেওয়া দরকার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাতীয়তাবাদীদের অর্থ-নৈতিক কর্মসূচীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। তাঁদের মধ্যে রমেশ দত্ত ছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতবাদের প্রধান হোতা। ১৮৭৫ সালে রমেশ দত্ত জমিদার ও সরকারের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত জমিদার ও রায়তদের মধ্যেও অনুরূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে বলেছিলেন।[৮] ১৭৯৩ সালের ১নং রেগুলেশন রায়তদের জমিদারের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়েছিল; পরবর্তী প্রজাসত্ত্ব আইন রায়তদের কিছু আইনগত অধিকার দিয়েছিল, কিন্তু নদীয়া ও পাবনার তৎকালীন গোলযোগগুলি কৃষক অসন্তোষের তীব্রতা ও ব্যাপকতা কত তা দেখিয়ে দিয়েছিল। রমেশ দত্ত জমিদার ও রায়ত 'এই দুই শ্রেণীর মধ্যে মনোমালিন্য মেটানোর জন্য' ব্যবস্থা নিতে সরকারকে অনুরোধ করেন, তিনি বলেন এই দিকে প্রথম পদক্ষেপ হল রায়তরা যে খাজনা দেন তার হারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রমেশ দত্তকে তাঁর সহকর্মী সিভিলিয়ানরা সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে সরকারি নীতির সমালোচনা সিভিল সার্ভিসে তাঁর পদোন্নতির সম্ভাবনা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। দত্ত তাঁর ভাইকে লিখেছিলেন "চাকরিতে পদোন্নতির জন্য আমি বিশেষ পরোয়া করি

না", তবে "সৌভাগ্যক্রমে আমি অন্যান্য যে বই লিখতে চাই তা ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।"[৯] জমিদারি স্বার্থের মুখপাত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' 'যেসব তরুণেরা কয়েক বছর ইংল্যাণ্ডে বাস করেছেন······(এবং) নতুন গজান ধারণা ও মতামত নিয়ে ভারতে ফিরেছেন তাঁদের মধ্যেকার বিপ্লবী মনোভাব'কে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করেছিল। এই ভর্ৎসনার রচয়িতা কৃষ্টদাস পাল আশা করেছিলেন যে 'বয়স তারুণ্যের এই অত্যুৎসাহকে শান্ত করবে'। দত্তের জামাই ও তাঁর জীবনী লেখক জে. এন. গুপ্তও 'জমিদারদের দাবির প্রতি যথেষ্ট ন্যায়বিচার করতে' তাঁর ব্যর্থতার জন্য 'তাঁর যুবসুলভ উৎসাহ ও অপরিণত বুদ্ধি'কে দায়ী করেছিলেন। মনে হয় দত্তের উপর নানারকম মহল থেকে চাপ এসেছিল এবং তার পরবর্তী রচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে তিনি তাঁর মত অনেকটা বদলে ফেলেছিলেন।[১০] দত্তের রচনাবলী বিশেষতঃ তাঁর 'বাংলার কৃষক সম্প্রদায়' (The Peasantry of Bengal, 1875) এবং 'ভারতে দুর্ভিক্ষ' (Famines in India, 1900) রায়তদের প্রতি গভীর সহানুভূতিতে ভরপুর ছিল এবং এই সব বই ভারতীয় কৃষি সংক্রান্ত সমস্যা সম্বন্ধে A. P. Mac-Donnell এবং H. J. Reynolds-এর মত ব্রিটিশ প্রশাসকদের, দাদাভাই নওরোজির মত ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের, এমন কি প্রিন্স ক্রোপোতকিনের মত ভারতীয় দৃশ্যপট থেকে বহুদূরের মানুষের চেতনা জাগিয়েছিল।[১১] কিন্তু ১৮৭৫ সালে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' যার জন্য দুঃখ করেছিল সেই 'বিপ্লবী চিন্তার মনোভাব' দত্তের পরবর্তী রচনাগুলিতে লক্ষ্যণীয়ভাবে অনুপস্থিত ছিল। বোম্বাই ও মাদ্রাজের অস্থায়ী রায়তওয়ারি ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনীয় বাংলার খাজনা বন্দোবস্তের ব্যবস্থার গুণগুলিকে দত্ত অত্যন্ত প্রশংসা করেছিলেন, কিন্তু জমিদারি ব্যবস্থার মধ্যেকার শোষণের দিকটার উপর নজরই দেন নি। ১৯০০ সালে দত্ত যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছিলেন তার এই ছিল মোক্ষম দুর্বলতা এবং Lord Curzon এর সুযোগ নিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে দত্তের চিন্তাধারায় রায়তদের ওপর জমিদারদের দাবির উচ্চসীমা বেঁধে দেওয়ার প্রয়োজনের প্রতি যথেষ্ট নজর দেওয়া হয় নি। রায়তদের স্বার্থই যদি রক্ষা করতে হয় তা হলে ব্রিটিশ সরকার এর ভূমি রাজস্বের দাবির বিরুদ্ধে তাদের রক্ষাব্যবস্থা যতটা দরকার জমির মালিকের খাজনার দাবির বিরুদ্ধেও তাদের রক্ষাব্যবস্থা কিছু কম দরকার

নয়। তবে রমেশ দত্ত ও জাতীয়তাবাদী শিবিরে তাঁর বন্ধুরা বাংলার ধরনের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সারা ভারতে হুবহু নকল করার কথা বলেন নি। এ কথা উপলব্ধি করা হয়েছিল যে বাংলায় যে ধরনের জমিদারি প্রথা গড়ে উঠেছিল তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল না। যে দাবি উঠেছিল তা হল রায়তের উপব রাজস্বের দাবির একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। রায়ত ছিল বিধিবদ্ধ প্রজা, তার ও সরকারের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তার স্বার্থ রক্ষিত হত বটে, কিন্তু জমিতে অধস্তন সত্ত্বওয়ালা অথবা একেবারে সত্ত্ববিহীন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে লাভবান হবে না। একজন আধুনিক ভারতীয় অর্থনীতিবিদ মন্তব্য করেছেন ঃ "যে সমাজে রায়তদের অধস্তন রায়ত সৃষ্টির স্বাধীনতা ছিল এবং তা থেকে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হত যে শোষিতরা শোষকে পরিণত হত, সেখানে বন্দোবস্তটা রায়তের সঙ্গে হওয়া উচিত এ যুক্তি অসার।"[১২] সমস্যার এ দিকটা দত্ত অগ্রাহ্য করেছিলেন। রমেশ দত্তের যে দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণ তাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সামাজিক পটভূমিকার নিরিখে ব্যাখ্যা করা যায় ঃ জাতীয়তাবাদীরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সামাজিক ন্যায়বিচারের চেয়ে মহত্তর আদর্শ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অংশতঃ তারই ফল।

চিরস্থায়ী সর্বভারতীয় বন্দোবস্তের প্রসারণের পরিকল্পনার ভিত্তি কি ছিল? বস্তুতঃ কিছুই ছিল না। ভাসা ভাসা ভাবে এই রকম একটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা খাজনায় রাষ্ট্রের ভাগ কমালে, কৃষি সংশ্লিষ্ট সম্পদ সঞ্চয়ে (capital accumulation) মদত দেবে এবং কৃষির উন্নয়নের জন্য মূলধন বিনিয়োগ উৎসাহিত করবে। কেবল দত্ত ও তাঁর চিন্তাধারার লোকেরা নয়, পরে আমরা দেখতে পাব, অনেক ব্রিটিশ কর্মকর্তারাও এ কথা ধরেই নিয়েছিলেন। এই রকম ধবে নেওয়া Turgot ও Smith-এর বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার তত্ত্বের কথা মনে করিয়ে দেয় যাতে বলা হত যে কারও যদি বিনিয়োগযোগ্য মূলধন থাকে তা হলে বিনিয়োগ আপনা থেকে হবে এবং উৎপাদক ক্ষমতার প্রসার ঘটাবে। কিন্তু সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পথে বাধাগুলি, যথা যৌথ পরিবার সুবিদিত ফলাফল, সামন্ততান্ত্রিক অতীত থেকে পাওয়া অথবা ইউরোপীয়দের সঙ্গে সংযোগের

মাধ্যমে নতুন করে জোটানো ভোগের অভ্যাসের সঞ্চয়-বিনাশক ফল, ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন নতুন 'অনুপস্থিত জমিদারদের'· একটা নতুন শ্রেণী কর্তৃক লক্ষ্যণীয় ভোগ (conspicuous consumption) ও অপচয় কৃষি উন্নয়নের এই সমস্ত বাধা বাংলায় অত্যন্ত বেশি দেখা যেত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচকেরা এদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতেন। অর্থনীতির উপযোগিতাবাদী চিন্তাধারার নীতিগুলির আশ্রয়ও তাঁরা নিতে পারতেন। খাজনা সম্বন্ধে Mill-এর তত্ত্ব অনুযায়ী খাজনার অনুপার্জিত বৃদ্ধির (unearned increment) একটা অংশ রাষ্ট্রের নিয়ে নেওয়া উচিত—কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তা বন্ধ করত। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে আর্থিক দিক থেকে পুষিয়ে যাওয়ার মত খাজনার একটা ক্ষুদ্র অংশই কেবল রাষ্ট্র রাজস্ব হিসাবে নিচ্ছে, ভারতের ক্ষুদ্র হলেও বর্ধমান ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সরকারকে অনুরোধ করছিল বৃহত্তর অংশ নিতে। ক্যালকাটা ট্রেডস-অ্যাসোসিয়েশন ১৮৬৭ সালে সেক্রেটারির কাছে স্মারকলিপিতে বলেছিল: J. S. Mill দেখিয়ে দিয়েছেন যে সব রকম করের মধ্যে ভূমি রাজস্বই হল সব চেয়ে কম ক্ষতিকর, অথচ সরকার ব্যবসায়ী ও উৎপাদকদের উপর লাইসেন্স করগুলির মারফত সেই মূলধনের উপরই কর বসাচ্ছে যা 'উৎপাদক খাতে (রয়েছে) এবং দেশের সম্পদ ও সমৃদ্ধিতে অবদান করছে', অথচ সম্পত্তি এবং অল্প পুঁজি বস্তুতঃ করমুক্তই থেকে যাচ্ছে।[১৩] বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অভিযোগ করেছিল যে প্রত্যক্ষ কর যদি ব্যবসায়ী ও কারিগরদের উপর পড়ে থাকে 'ভূসম্পত্তির অধিকারী ও সরকারি ঋণপত্রের মালিকদের' উপর না পড়ে তা হলে 'জাতীয় শিল্পগুলির উপর একটা অমন বোঝা চাপিয়ে দেওয়া' হয়।[১৪] ১৯৫৯ সালেই আমরা দেখেছি বোম্বাইয়ের দেশীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে সরকারের কাছে অনুরোধ করতে যাতে "অলস ও সম্পদশালীদের উপকারের জন্য শিল্প সংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলির উপর কর (বসানো না হয়)·· ·জীবনকালের আয় এবং ব্যবসায় ও বৃত্তি থেকে পাওয়া আয়ের উপর সম্পত্তি থেকে পাওয়া আয়ের চেয়ে কম করে কর বসানো উচিত······।"[১৫] কলকাতা, বোম্বাই, আহমেদাবাদ ও মাদ্রাজ থেকে সরকারের কাছে এই রকম অনেকগুলি স্মারকলিপি গিয়েছিল।[১৬] এই সব প্রতিবাদের নিহিতার্থ সুস্পষ্ট: জমিদার ও খাজনাভোগীদের আয়ের উপর বণিক, ব্যবসায়ী ও কারিগরদের অর্জিত আয়ের চেয়ে বেশি হারে

কর বসানো উচিত। আয়ের উৎসের ভিত্তিতে আয়ের উপর কর হারের পার্থক্য করার পরামর্শ দিয়েছিলেন Mill। হাউস অব কমন্সের Hubbard-এর কমিটি (১৮৬১) অর্জিত ও অনর্জিত আয়ের মধ্যে পার্থক্য করার ন্যায্যতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[১৭] পার্থক্য করার নীতি ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় নি কিন্তু কোনও একটা ধরনের সম্পত্তি-করের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল।[১৮] সরকার এ রকম কোনও কর উদ্ভাবন করতে ব্যর্থ হল এবং ষাটের দশকে আয়কর নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখিয়ে দিল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পাদন করার পর কৃষিজাত আয়ের উপর বর্ধিত কর ধার্য করা কঠিন ব্যাপার।[১৯] এই পটভূমিকায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে উপযোগিতাবাদী যুক্তিগুলিকে কেবল তাত্ত্বিক বলে অগ্রাহ্য করা যায় না। ষাটের ও সত্তরের দশকের রাজস্ব বিতর্কে J. S. Mill উল্লেখযোগ্যভাবে অংশ নেন নি, কিন্তু পটভূমিকায় তাঁর সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল। H. S. Maine ও W. T. Thornton-এর সঙ্গে ব্যক্তিগত পত্রালাপে J. S. Mill তাঁদের '(বিদ্রোহের পর) বর্তমান ইংরেজ ধাঁচের জমিদারতন্ত্রের পক্ষে একটা প্রতিক্রিয়ার' বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন এবং এই আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলেন যে ভূমি রাজস্বকে চিরস্থায়ীভাবে বেঁধে দেওয়া 'সরকারেব পক্ষে একটা অ-লাভজনক ব্যাপার' হয়ে দাঁড়াবে।[২০]

মোট কথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে বিভিন্ন লোক বিভিন্নভাবে বুঝেছিলেন। Samuel Laing-এর কাছে এ ছিল একটা সক্রিয় ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীসহ এক স্তর-বিন্যস্ত ও উন্নতিশীল সমাজের ভিত্তি। রমেশ দত্তের কাছে সেটা ছিল কৃষিজাত আযের উপর বিদেশী সরকারের দাবির চূড়ান্ত সীমা নির্ধারণ, যা কৃষিজ সম্পদের বৃদ্ধি ঘটাবে। জমিদারদের কাছে এ ছিল নিজেদের সম্পদ চিরকাল বজায় রাখা। আর Mill ও তাঁর শিষ্যদের কাছে এ ছিল অ-লাভজনক একটা চুক্তি।

১৮৬২ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নীতি স্বীকার করে নেবার পেছনে ভারত সরকারের কি উদ্দেশ্য ছিল? দুর্ভিক্ষের সমস্যা যে অগ্রাধিকার পেয়েছিল তা আমাদের স্বীকার করতে হবে, Col. Baird Smith উল্লেখ করেছিলেন যে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার উপর এই সমস্যার প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল। Baird Smith যখন দুর্ভিক্ষের প্রশ্নের মধ্যে ঝাঁপিয়ে

পড়লেন তখন তিনি তাঁর এই কর্তব্যে নবাগত। তিনি একজন প্রখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, কিন্তু রাজস্ব প্রশাসনে এবং দুর্ভিক্ষ সম্পর্কিত অপরাপর বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ ছিল। এ বোধ হয় একটা সুবিধাই ছিল, কারণ Lord Canning যখন তাঁকে ১৮৬০ সালের উত্তর ভারতের দুর্ভিক্ষের কারণগুলি সম্পর্কে তদন্ত করতে বললেন তখন তিনি একটা তাজা মন নিয়ে সমস্যাটায় ঢুকলেন। মে ও আগস্ট মাসে তিনি যে তিনটি রিপোর্ট পেশ করলেন তাতে তিনি উল্লেখ করলেন যে দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে লোকের ক্ষমতা রাজস্বের 'যে বন্দোবস্ত ব্যবস্থার অধীনে তারা বাস করছে ও বেড়ে উঠছে তার নিখুঁতীকরণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অনুপাতে, বরং বলব, প্রায় জ্যামিতিক অনুপাতে' হয়।[২১] জমির উপর সরকারের দাবি দীর্ঘ মেয়াদের জন্য সীমাবদ্ধ করার ফলে এবং সত্ত্বের রেকর্ড সতর্কভাবে করার ফলে কৃষি সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্য বেড়েছিল। বস্তুতপক্ষে ১৮৩৭-৩৮ সালের এবং ১৮৬০ সালের দুর্ভিক্ষের মধ্যেকার বছরগুলিতে ভূমি ব্যবস্থা এত উন্নত হয়েছিল যে দুর্ভিক্ষের মধ্যেও লোকের টিকে থাকার ক্ষমতা বেড়েছিল। বন্দোবস্তের দীর্ঘতর মেয়াদের দরুনই এই উন্নতি হয়েছে এই বলে Baird Smith যুক্তি দিলেন যে এই নীতির আরও প্রয়োগ, অর্থাৎ ত্রিশ বছরের মেয়াদী বন্দোবস্তের জায়গায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সম্প্রসারণ লোকের অবস্থার আরও উন্নতি ঘটাবে এবং দুর্ভিক্ষের সময়ে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের দুরবস্থা কমিয়ে দেবে। চাষীদের প্রকৃত অবস্থা অবশ্য সামান্যই জানা ছিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির লেফটেনান্ট গভর্নর Baird Smith-এর সিদ্ধান্তগুলিকে চ্যালেঞ্জ করলেন এবং বললেন যে 'উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির কৃষিজীবী বাংলার (কৃষিজীবীর) সঙ্গে আর্থিক অবস্থার দিক থেকে সমানে সমান' যদিও সম্পত্তিবানের সংখ্যা সেখানে বাংলার মত অত নয়।[২২] তবে মোটামুটিভাবে এ কথা অনস্বীকার্য ছিল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে মোট কৃষিজাত আয়ের ক্ষুদ্রতর অনুপাত সরকার কর্তৃক গৃহীত হত (এবং অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর অনুপাতে জমির মালিকের হাতে ছেড়ে দেওয়া হত)। তাই বলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কৃষকের সমৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে এক করে দেখাটা সম্পূর্ণ অবাস্তব। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে ১৮৬২ সালে Wood-এর প্রেরিত বার্তার (despatch) দ্বিমতজ্ঞাপক মন্তব্য জানুত কাউন্সিলের সদস্য Ross D.

Mangles এ কথা উল্লেখ করেছিলেন।[২৩] তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রকে যারা রাজস্ব দিচ্ছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেবল তাদেরই উপকার করবে, কিন্তু জমিতে অধস্তন সত্ত্বওয়ালা বিরাট কৃষিজীবী জনসমষ্টির উপকার করবে না। কাজেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 'একটা আনুকূল্যভোগী শ্রেণীর লাভের জন্য রাষ্ট্রের অধিকার ও স্বার্থ বিসর্জন' দেওয়ায় দাঁড়িয়ে যেতে পারে। তবে এই কুফল এড়ানো যেতে পারত যদি Baird Smith-এর সুপারিশ অনুযায়ী রাজস্বের দাবি চিরস্থায়ীভাবে স্থির করে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সত্ত্বের রেকর্ড করাটাও হত। মনে হয় Baird Smith-এর রিপোর্টের দ্বারা Sir Charles Wood গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং ১৮৬২ সালে প্রেরিত তাঁর রাজস্ব সংক্রান্ত বার্তায় (revenue despatch) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষের যুক্তিকে শক্তিশালী করার জন্য তিনি এই রিপোর্টের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছিলেন।[২৪]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে আরও একটি জোরালো যুক্তি ছিল রাজনৈতিক। বলা হত যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমির মালিক শ্রেণীকে সরকারের পক্ষে নিয়ে আসবে। সেক্রেটারি অব স্টেট Lord Stanley ১৮৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বরে তাঁর রাজস্ব বার্তায় লিখেছিলেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর জমিদার নিজেকে সরকারের সঙ্গে একাত্ম হিসাবে দেখবে এবং 'তাঁর আনুগত্য একটা পরিণামদর্শিতা ও আত্মস্বার্থের ব্যাপার' হবে।[২৫] Sir Charles Wood ভূসম্পত্তিবানদের সঙ্গে চিরকালের মত বন্দোবস্তের একটা সুবিধা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে 'জমিতে নিঃশর্ত সম্পত্তি সৃষ্টি' সরকারের প্রতি আনুগত্য বাড়াবে।[২৬] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উৎসাহী প্রবক্তা Sir John Lawrence-এরও এই মত ছিল।[২৭] তিনি লিখেছিলেন : "দেশের প্রকৃত শারীরিক শক্তি যারা সেই কৃষিজীবীদের সন্তোষের উপরই ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে।" Lawrence-এর মত এমন একজন কর্তা ব্যক্তির কাছ থেকে, তাও আবার বিদ্রোহের ঠিক পরেই এ রকম একটা যুক্তি গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হতে বাধ্য। তবে এটা সম্ভব যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজনৈতিক সুবিধাটা অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেখা হচ্ছিল। প্রশাসনিক বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন অফিসারের মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে খাজনা বেঁধে দেওয়ার প্রভাবে ভারতীয় চাষীর প্রতিক্রিয়া যা

প্রত্যাশা করা হচ্ছিল তার চেয়ে অন্যরকমও হতে পারত। "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার সময়ে খাজনার হার তৎকালে জমি যতখানি বহন করতে পারবে প্রায় ততখানি উঁচুতে নিরূপিত হবে, আর (যে হার) বিগত দুই পুরুষ যে খাজনা দিতে অভ্যস্ত ছিল তার চেয়ে উচ্চতর হবে", কাজেই বাঁধত নিরূপণ কৃষকের উপর একটা ভারী বোঝা হবে। তারা দীর্ঘ-মেয়াদী লাভের সামান্যই তারিফ করবে কারণ কৃষক 'জমির সাধারণ দাম বাড়ার সম্ভাবনার সুযোগ নিজে পাবে অতটা বোঝার মত দূরদৃষ্টি রাখতে পারে না'।[২৮] ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ বাংলায় তেমন প্রসার লাভ করে নি বলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজনৈতিক লাভটাকে অতিরঞ্জিত করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে— এ কথা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (North-Western Province) বোর্ড অব রেভিনিউয়ের W. Muir উল্লেখ করেছিলেন। বস্তুতঃ যেসব কারণ লোককে বিদ্রোহ করতে উত্তেজিত করেছিল (কারণগুলি কি সে প্রসঙ্গ Muir আর তোলেন নি) বাংলার কোনও অংশেই তার পূর্ণ প্রকোপ পড়ে নি, "কিন্তু যেসব জায়গায় পূর্ণ প্রকোপ পড়েছিল—যথা শাহাবাদ, সেখানে তা সামলাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অস্থায়ী বন্দোবস্তের মত সমানই অকেজো হয়েছিল।"[২৯] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে রাজনৈতিক নিরাপত্তার সঙ্গে ভ্রান্তভাবে এক করে দেখার অন্যতম উদাহরণ হল Samuel Laing-এর বিবৃতি যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত "সাম্রাজ্যের বৃহত্তম অংশকে (বাংলা প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বেশিরভাগ প্রদেশগুলিকে বোঝানো হচ্ছে) বিদ্রোহের গোটা সময়টাতে আমাদের প্রতি অনুগত করে রেখেছিল……।"[৩০] মোট কথা ঠিকভাবেই হোক আর ভুলভাবেই হোক এ কথা বিশ্বাস করা হত যে ভূমি রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধা দান সরকারের প্রতি জনগণের আনুগত্য বাড়াবে এবং এমন এক শ্রেণীর সৃষ্টি করবে যা তার নিজের স্বার্থকে একটা বিদেশী সরকারের স্বার্থের সঙ্গে এক করে দেখবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে আর একটা যুক্তি ছিল প্রশাসনের নীচের তলায় প্রশাসনিক কাজ ও খরচ কমানোর সম্ভাবনা। এ কথা সর্বজনস্বীকৃত ছিল যে অস্থায়ী ভূমি-বন্দোবস্তে যেসব ইউরোপীয় অফিসারদের কাজ তদারক করতে হত তাদের পক্ষে এক কঠিন কর্ম ছিল এবং এতে অধস্তন কর্মচারীদের পক্ষে রাজস্বদাতাদের শোষণ করার মস্ত সুযোগ হত। যাদের খাজনা নিরূপিত হত তাদের এতে অত্যন্ত ক্ষোভের কারণ ছিল এবং

প্রত্যেকটা বন্দোবস্তের কাজ চালানোর খরচও অনেক হত।[৩১] হাতে-কলমে কাজ করতে হত যেসব প্রশাসকদের তাদের পক্ষে এই প্রশাসনিক বিবেচনা-গুলিই মনে হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তথাকথিত রাজনৈতিক লাভ অথবা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও কৃষকদের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ ক্ষমতার মধ্যে অনুমিত সম্পর্কের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে ভারতীয় কাঁচামালের সম্প্রসারণ ল্যাঙ্কাশায়ারে তুলোর দুর্ভিক্ষের সময় ১৯৬১-৬৪ সালে ভারতীয় তুলোর তেজী বাজার, কিছু খনিজ ও বাগিচা শিল্পের প্রসার, রেলপথ ও অন্তর্দেশীয় জল-পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নের দরুন ব্যবসা-বাণিজ্যে উদ্দীপনা সঞ্চার, ভারতে ব্রিটি মূলধন নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি ইত্যাদি ষাটের দশকে ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে এক নতুন পর্যায়ের সূচনা করল। ভারত আর 'ইংল্যাণ্ডের ছোট ছেলেদের নাড়া দেবার জন্য কল্পতরুর' ("Pagoda trees for England's younger sons to shake") নন্দনকানন ছিল না।[৩২] ভারতকে বিনিযোগ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্র হিসাবে 'উন্নত' করার দরকার ছিল। ব্রিটেন থেকে আগতদের শ্রম দিয়ে ভারতের পতিত জমিকে উৎপাদক করে তোলার[৩৩] মত অবাস্তব পরিকল্পনা থেকে শুরু করে পেট্রোলিয়াম সম্পদ গড়ে তোলার[৩৪] মত অগ্রসর পরিকল্পনা পর্যন্ত সব রকম পরিকল্পনা--বিনিয়োগের সুযোগ আছে তেমন প্রায় যে কোনও কিছুই—ইংল্যাণ্ডের লোকের মনে আগ্রহ জাগাতো এবং কখনও কখনও সরকারেরও সমর্থন পেত। ভারতে বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের সম্ভবনা অনুসন্ধানে ঔৎসুক্যের কারণ অংশত ছিল অনেক ইউরোপীয় দেশে উঁচু আমদানি-শুল্ক ধার্যের ফলে ইউরোপের বাজার সঙ্কুচিত হওয়া, আর অংশত ছিল ১৮৫৭ সালের পর ভারতবর্ষের উপর পূর্ণতর নিয়ন্ত্রণ চালু হওয়া এবং পার্লামেণ্টারি চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির মারফত সরকারকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা। অস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং মাঝে মাঝে রাজস্বের দাবি বৃদ্ধি ভারতে ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগের পক্ষে উদ্দীপনা বিনাশকের কাজ করত। ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ ভারতে এই ধরনের সমস্ত বাধা দূর করার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, নিষ্কর স্বত্ব প্রদান এবং ভূমি রাজস্ব বেঁধে দেওয়া ভারতে ব্রিটিশ মূলধন ও ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের আগমন বাড়বে বলে মনে করা হত।

ব্রিটিশ মূলধন ভারতে আকৃষ্ট করার জন্য ১৮৫৭ সালে কোর্ট অব ডাইরেকটরস ভারত সরকারকে অনুরোধ করেছিল যে "জমির সব চাইতে মূল্যবান ফসল চাষের জন্য কিছু পরিমাণ মূলধন প্রযুক্ত হবার শর্তে যে কোনও শ্রদ্ধাভাজন লোকের হাতে সরকারি সম্পত্তি, জমি চির-কালের জন্য ছেড়ে দেওয়া" পরীক্ষামূলকভাবে মঞ্জুর করতে।[৩৫] ইংল্যাণ্ডের শিল্পকে সরবরাহ করার জন্য তুলো ও অপরাপর রপ্তানিযোগ্য উৎপন্নের চাষের জন্য অদখলি জমি মঞ্জুর করার উদ্দেশ্যে কোর্ট ও সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে অনেক দরখাস্ত এসেছিল।[৩৬] কাঁচামাল সরবরাহের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর ম্যাঞ্চেস্টারের নির্ভরশীলতা কল মালিকদের উদ্বিগ্ন করছিল, তাদের কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন সাম্রাজ্যের মধ্যে সরবরাহের বিকল্প উৎস গড়ে তোলায় সাহায্য করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ দিচ্ছিল। অ্যাসোসিয়েশন ১৮৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেক্রেটারি অব স্টেট Lord Stanley-র কাছে, ১৮৬১ সালের অক্টোবরে Samuel Laing-এর কাছে একটি করে প্রতিনিধিদল এবং ১৮৬৯ সালের জুলাই মাসে ও ১৮৬০ সালের এপ্রিল মাসে Sir Charles Wood-এর কাছে দুটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছিল।[৩৭] তথাকথিত 'কটন এম.পি.'-দের (অর্থাৎ তুলো বয়নশিল্পের প্রতিনিধিরূপে যাঁরা পার্লামেন্টে ছিলেন তাঁদের) সাহায্যে ও নিজের পত্রিকা 'কটন সাপ্লাই রিপোর্টার'র মারফত সোচ্চার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিল। এই প্রচার পত্রিকার মাথায় যদিও 'তুলো কোনও রাজনীতি জানে না, বলে বড় হরফে লেখা থাকত, রাজনীতির খেলা রীতিমত চলত। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি থেকে সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল এবং কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন তার প্রচেষ্টা বাড়িয়ে তুলল। ইণ্ডিয়া অফিসে প্রতিনিধি দল প্রেরণ এবং স্মারকলিপি পেশে সন্তুষ্ট না থেকে অ্যাসোসিয়েশন ভারতের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করল। "ভূমিসত্ত্বের সেকেলে বিরক্তিকর, জটিল ও উৎপীড়ক বর্তমান ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করে তাদের সহকর্মী ভারতীয় প্রজাদের উপর যে গুরুতর অন্যায় করা হয়েছে অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা তার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।"[৩৮] তুলোর উৎপাদন, উৎসাহিত করার জন্য ভারত সরকারের উচিত ভূমি রাজস্ব বেঁধে দেওয়া এবং নিষ্কর সত্ত্ব প্রদানে অনুমতি দেওয়া। অ্যাসোসিয়েশন দাবি করল যে

'ইউরোপীয় মূলধন বিনিয়োগের অবাধ সুযোগ' দেবার জন্য ভূমি সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন পরিবর্তিত করা হোক।[৩৯] ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্য সংস্থগুলিও ম্যাঞ্চেস্টার গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। ইণ্ডিগো প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, চা-বাগিচার মালিকেরা, কফি বাগিচার মালিকেরা এবং ল্যাণ্ড-হোলডার্স অ্যাণ্ড কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের যৌথ সংস্থা এই ব্যাপারে ভারত সরকারের কাছে স্মারকলিপি পাঠিয়েছিল। ল্যাণ্ডহোলডার্স ও কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশনকে লিখেছিল : "ভূমিসত্ত্ব নিরাপদ না থাকা এবং তার পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থা থাকার দরুন মাতৃভূমি থেকে এসে যে মূলধন, শিল্পগঠনের উদ্যোগ ও কর্মশক্তি ভারতের উৎপাদক সম্পদগুলির উপর প্রভাব ফেলতে পারত সেগুলিকে কার্যতঃ ঠেকিয়ে রাখা হচ্ছে।"[৪০]

এই সব চেষ্টার কিছু ফল ফলল ১৮৬১ সালে। সে বছরের গোড়ায় ভারত সরকার ঘোষণা করল যে 'ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় তুলোর বড় রকম ও হঠাৎ বর্ধিত চাহিদার সম্ভাবনার' দরুন ভূমি সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন পরিবর্তনের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে ; ১৮৬১ সালের অক্টোবর মাসে ভূমি রাজস্ব বেঁধে দেওয়া এবং নামমাত্র দর্শনীর বিনিময়ে ভূমি মঞ্জুর করার জন্য নিয়ম-কানুন রচিত হল।[৪১] এই সিদ্ধান্তে আসার জন্য ভারত সরকার ম্যাঞ্চেস্টারের তুলাস্বার্থের ও ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষের চাপের দ্বারাই প্রভাবিত হয় নি, নিজের অফিসারদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল। এই অফিসাররা হলেন তুলো চাষের উপর রিপোর্ট তৈরির জন্য নিয়োজিত P. Saunders এবং বাংলার বোর্ড অব রেভিনিউ-র Rivers Thompson। শেষোক্তর অভিমত এই ছিল যে সাম্রাজ্যের অপরাপর দেশে যেমন নামমাত্র দর্শনীতে ভূমিসত্ত্ব পাওয়া যায় ভারতে তেমন না পাওয়া গেলে ইউরোপীয় মূলধন এখানে খাটার ঝুঁকি নেবে না।[৪১ক] P. Saunders কেবল ভূমি রাজস্ব বেঁধে দেবার সুপারিশ করেন নি, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরও সুপারিশ করেছিলেন। "লোকের কাছে এ কথা জানার চেয়ে নিরুৎসাহজনক আর কিছু হতে পারে না যে কর ব্যবস্থা জমির উন্নয়নকে ·····অবিরত তাড়া করে বেড়াচ্ছে, তাদের সমস্ত শ্রম ও উন্নয়ন কেবল যে স্থিতিস্থাপক বন্ধনে তারা বাঁধা আছে তাকেই আরও চেপে বসাচ্ছে।"[৪২]

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গভর্নরের মতে অস্থায়ী বন্দোবস্তের উন্নয়ন প্রতিরোধক প্রভাবকে Saunders অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেখেছিলেন।

তবে তিনি এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে এমন কি দেশের একেবারে ভিতরে (রাজধানী কেন্দ্রগুলির বাইরে) যেখানে ইউরোপীয়রা 'জমিদার, বাগিচা মালিক অথবা ব্যবসায়ীর চরিত্র নিয়ে' যেতেন—সেসব জায়গায় তাঁদের বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করার জন্য সরকারের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।[৪৩] সাধারণভাবে সব লোকই "তাঁদের আশেপাশে মূলধন নিয়োগ হলে সর্বদাই যে অনেক বেশি টাকা সঞ্চালিত হয় তা থেকে অল্পবিস্তর লাভবান হবেন।"[৪৪] ১৮৬২ সালের জুলাই মাসে প্রেরিত বিখ্যাত রাজস্ব বার্তায় (যাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুপারিশ করা হয়েছিল) Sir. C. Wood ঘোষণা করেছিলেন (২৪ নং প্যারায়) যে ভারতে ইউরোপীয়দের বসবাসে উৎসাহ দান সরকারের উদ্দেশ্য।[৪৫] তখনকার কালে ইংল্যাণ্ডে Wakefield-এর রচনাবলী ব্যাপকভাবে বিদেশ গমন ও বিদেশেই বসতি স্থাপন সম্পর্কে বেশ একটা আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল।[৪৬] নানা কারণ—সহজেই যা বোঝা যায় যেমন আবহাওয়া, ব্যবহারযোগ্য অনধিকৃত জমির অভাব, জনসংখ্যার চাপ ইত্যাদির দরুন ইউরোপীয়দের বসতি স্থাপনের পক্ষে ভারত খুব একটা উপযুক্ত জায়গা ছিল না। বোম্বাইয়ের গভর্নর Elphinstone যখন নামমাত্র দর্শনীতে পতিত জমি মঞ্জুর সংক্রান্ত প্রস্তাবিত নিয়ম-কানুনের বিষয়ে তাঁর মন্তব্যে লিখেছিলেন যে "ভারতে উপনিবেশ স্থাপন বলে অভিহিত করার উপযুক্ত সংখ্যায় ইউরোপীয়দের এদেশে বসতি স্থাপন আমার কাছে সর্বদাই মিথ্যা কল্পনা বলে মনে হয়েছে"[৪৭]—তখন তিনি সঠিকই ছিলেন। নামমাত্র দর্শনীতে পতিত জমি মঞ্জুর ও ভূমি রাজস্ব বেঁধে দেওয়ার দাবি উঠেছিল বাণিজ্যিক স্বার্থগুলির পক্ষ থেকে এবং সরকার এই আশায় তা মঞ্জুর করেছিল যে জমিতে ব্যাপকহারে ইউরোপীয় মূলধন নিয়োজিত হবে, বিদেশী বিজ্ঞান ও পদ্ধতির আমদানি হবে এবং ভারতে ইউরোপীয় শিল্পোদ্যগীদের বসতি স্থাপিত হবে। এই সব নিয়ম-কানুনের বাস্তব ফল সে আশাকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করে নি। বাগিচা শিল্প ছাড়া ইউরোপীয় শিল্পোদ্যগীরা খুব কমই এই পতিত জমি সংক্রান্ত নিয়ম-কানুনের সুযোগ নিয়েছিলেন, আর ভূমি রাজস্ব বেঁধে দেওয়ায় উৎসাহী ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল আরও কম। মাঝে মাঝে রাজস্ব পুনর্নির্ধারিত হবে এমন অস্থায়ী বন্দোবস্ত—সুতরাং অস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিতে মূলধন নিয়োগ নিরুৎসাহিত করে—তা সে মূলধন ইউরোপীয় হোক আর ভারতীয়ই

হোক—এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত ছিল, আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে এটাই ছিল সব চেয়ে জোরালো যুক্তি। এ কথা সাধারণভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে যেখানেই অস্থায়ী ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারিত হত সেখানেই পরবর্তী রাজস্ব নির্ধারণ উচ্চতর হারে হবার প্রায় নিশ্চিত সম্ভাবনা জমির উন্নয়ন ও জমিতে মূলধন বিনিয়োগকে দ্বিধাগ্রস্ত করত। অস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকায়, যেখানে জমিতে বিনিয়োগের ফলে জমির মূল্য বাড়লে রাজস্বও বেড়ে যাবে সেখানে লোকে স্বভাবতই জমিতে বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত বোধ করত।[৪৮] এ কথা মেনে নিতেই হত যে রাজস্ব চির-স্থায়ীভাবে বেঁধে দেওয়া Cecil Beadon-এর ভাষায়—"নিজ সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে মালিকের প্রবণতার সব চেয়ে শক্তিশালী উদ্দীপক" হত।[৪৯] এ যুক্তি অবশ্য দেওয়া যেতে পারে যে এমন কি সাময়িক বন্দোবস্তের আমলেও বেশ কিছু উন্নয়ন হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলিতে এ রকম ঘটেছিল, ওই প্রদেশগুলির লেফটেনান্ট গভর্নর উল্লেখ করেছিলেন "১৮০৯ সালে যা ছিল সে তুলনায় এ প্রদেশগুলি সুজলা সুফলা এখন উদ্যান।"[৫০] এ কথা সত্য যে ১৮৫৪ সালের সেটলমেণ্ট রুলস-এর ৩৭ নং রুল অনুযায়ী উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে মূলধন বিনিয়োগের ফলে উন্নত জমির উপর রাজস্ব কম করে ধরার কিছু সুবিধা দেওয়া ছিল। তা সত্ত্বেও অস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকাগুলিতে মূলধন নিয়োগে অনীহা লক্ষ্য করা হয়েছিল।[৫১] এ কথা লক্ষ্য করা যেত যে এক-একটা বন্দোবস্তের শেষ দিকে নতুন বন্দোবস্তের সময় যখন এগিয়ে আসত তখন কৃষির উন্নয়ন ব্যাহত হত। কারণ প্রত্যেক জমির মালিকেরই লক্ষ্য থাকত তার খাজনার পরিমাণ যাতে যত কম করে সম্ভব নির্ধারিত হয়, অথচ আগামী বন্দোবস্তে যে জমির উপর খাজনার হার নির্ধারিত হবে কৃষি উন্নয়ন হলে মূল্য ও কর্ষিত জমি উভয় দিক থেকেই তার খাজনা নির্ধারণের হার বাড়ত।[৫২] মাদ্রাজের রাজস্ব কর্তৃপক্ষও এ কথা স্বীকার করেছিলেন।[৫৩] অপরপক্ষে এ কথা মনে করা হত যে বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 'প্রভূত সম্পদ সৃষ্টি করেছিল'।[৫৪] ফিনান্স মেম্বার Samuel Laing-এর অন্ততঃ এই রকম ধারণা ছিল, যদিও সম্পদ সঞ্চয় কতখানি জমির উন্নয়ন ঘটিয়েছিল সে বিষয়টা অনিশ্চিত। সে যাই হোক এ ধারণা চালু হয়েছিল যে ভূমি রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মূলধন সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে সাহায্য করেছিল

এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে সেটা একটা যুক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। সারা ভারতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুপারিশ করে ১৮৬২ সালের জুলাই মাসে Sir Charles Wood-এর বার্তায় তিনি এই যুক্তিই ব্যবহার করেছিলেন।[৫৫]

ষাটের দশ কর মধ্যভাগ পর্যন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবক্তাদেরই আধিপত্য বেশি ছিল। তবু তখনও তেমন লোকের অভাব ছিল না যাঁরা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতেন। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নীতি যদিও সরকারিভাবে স্বীকৃত হয়েছিল তবু কর্তৃপক্ষ আবার ভাবতে শুরু করেছিলেন। ১৮৬৪ সালে Wood একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে Lawrence-কে লিখেছিলেন "আমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নীতি থেকে সরে যাচ্ছি নে।" কিন্তু "যখন খাজনার বর্ধিত হার নির্ধারণের একটা অত্যন্ত সংগত সম্ভবনা রয়েছে তখন একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চাপিয়ে দেবেন না……।"[৫৬] ১৮৬৫ সালে Wood আবার লিখেছিলেন যে "ভূমি রাজস্ব বৃদ্ধি যদি সম্ভব হয় তবে তাতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়।"[৫৭] Wood-এর উত্তরাধিকারী Cranborne Lawrence-কে বলেছিলেন "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যাপারে মন্থর গতিতে এগোতে হবে……টাকার দাম পড়ে যাচ্ছে এবং ভারতে সম্পদের প্রতিটি উপাদান দ্রুত বৃদ্ধিশীল এ কথা ভেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আতঙ্কজনক ফলাফল সম্বন্ধে অনবহিত থাকা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।"[৫৮] Lawrence চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সোৎসাহী সমর্থক ছিলেন।[৫৯] কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী Mayo ছিলেন উল্টো পক্ষে। তিনি Argyll-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাড়াহুড়ো করে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সিদ্ধান্ত না নিতে, কারণ "১৮৬২ সালে Sir C. Wood যখন লিখেছিলেন তখন যাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে ছিলেন তার প্রায় প্রত্যেকটি লোকই এখন মত পরিবর্তন করেছেন।"[৬০] "এখন এ প্রশ্নের গুরুত্ব সামান্য। এখন থেকে ২৫ বা ৩০ বছর পরে এ হয়তো আমাদের শাসনের পক্ষে মরণ বাঁচনের প্রশ্ন হয়ে উঠতে পারে।"[৬১] স্থানীয় সেস, রাস্তা কর, শিক্ষা সেস ইত্যাদির বিরুদ্ধে বাংলার জমিদারদের প্রতিরোধ Mayo-র এই বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 'উন্নয়নের' জন্য বাড়তি করের পথ বন্ধ করে দেবে। "জমিদাররা অবশ্য তাঁদের পকেটকে স্পর্শ করে এমন যে

কোনও কিছুতেই আপত্তি করবেন, আর যাই প্রস্তাব করা যাক না কেন তাতে আসে যায় না তাঁরা 'চুক্তিভঙ্গ' বলে নির্বোধ ঐক্যতান তুলবেন।...... গরীব মানুষকে তার নুন বা তার তামাকের জন্য কতখানি দিতে হচ্ছে তার জন্য তাদের এক পয়সার মাথাব্যথা নেই, কিন্তু তাঁদের মোটা আয়ের আধ শতাংশ ছুঁলেও তাঁরা চিৎকার জুড়ে দেন।"[৬২] Argyll স্বীকার করেছিলেন যে "ব্যক্তিগত উদ্যোগের পক্ষে এবং নিজেদের দক্ষতা ও উদ্যোগের ফল ভোগ করা যাবে এই আস্থা সৃষ্টির পক্ষে কৃষি সংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলির মূলধন বিনিয়োগের পক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এক বিপুল উদ্দীপক।" কিন্তু খাজনার বন্দোবস্তের দরুন কর ধার্য নিষিদ্ধ হয়ে যাবে তা মোটেই চলবে না। তিনি Mayo-কে লিখেছিলেন "আমি আশা করি যে আপনি এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করবেন যাতে এই সব বন্দোবস্ত করার সময়ে একটা স্পষ্ট বোঝাপড়া থাকে (বরং বলা যায় স্পষ্ট জানিয়ে রাখা হয়) যে সামাজিক কর অথবা ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ স্থানীয় উদ্দেশ্যে আরও কর ধার্যের উপর কোন মতেই কোনও বাধা আরোপ করবে না। আপনি জানেন যে জমির ক্রমবর্ধমান দর অনুযায়ী কর বা খাজনার সঠিক হার নির্ধারণ করার অধিকার রাষ্ট্রের হাত থেকে স্থায়ীভাবে ছাড়িয়ে দেওয়ার উচ্চ কর্তৃপক্ষের অনেকের অত্যন্ত আপত্তি আছে। আমার মত হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভাল—কিন্তু কেবল এই শর্তে যে এইভাবে ব্যক্তিবিশেষদের হাতে যে বর্ধিত সম্পদ রেখে দেওয়া হল তা অন্যান্যভাবে করযোগ্য বিবেচিত হবে (অর্থাৎ করের আওতার মধ্যে আনা যাবে)—এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি সর্বদাই এই যে ভারতে নতুন কর ধার্য করা অসম্ভব কিংবা অসুবিধাজনক।[৬৩]

অতএব ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষ তাঁদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভারতে প্রসারিত করার সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করছিলেন, যদিও ১৮৬২ সালে গৃহীত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁদের অভাব সরকারিভাবে কদাচিৎ প্রকাশিত হচ্ছিল। তার বদলে ১৮৬২ সালের কর্মনীতি-গত সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার ইচ্ছাটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিষয়ে নানারকম পূর্বশর্ত সম্বলিত অনেকগুলি বিজ্ঞপ্তি ও নিয়ম-কানুন জারির মধ্যে দিয়েই প্রকাশ হয়ে পড়ছিল। প্রকৃতপক্ষে Sir C. Wood ইতিমধ্যেই কতকগুলি শর্ত আরোপ করে বসেছিলেন, তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি ছিল এই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একমাত্র সেই সব এলাকাতেই দেওয়া হবে যেখানে

এক-একটা এস্টেটে চাষযোগ্য জমির তিন-চতুর্থাংশে ইতিমধ্যে চাষ হচ্ছে।[৬৪] ১৭৯৩ সালে বাংলার বন্দোবস্তের সময়ে সমস্ত জমির রাজস্বের সম্ভাব্য বৃদ্ধি ছেড়ে দিয়ে যে ভুল করা হয়েছিল সে ভুল এড়ানোর জন্যই Cecil Beadon-এর পরামর্শ অনুযায়ী উপরোক্ত শর্ত আরোপিত হয়েছিল।[৬৫] এই শর্তের ফলে যে, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশসমূহ, বোম্বাই ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির কিছু অংশ তখনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না ১৮৬৫ সালে সেক্রেটারি অব স্টেট এই শর্তটিকে নিম্নলিখিতভাবে সূত্রায়িত করলেন : "যে সমস্ত এস্টেট চাষযোগ্য অথবা মালগুজারি এলাকার ৮০ শতাংশে প্রকৃত চাষ হচ্ছে সেসব এস্টেটেই রাজস্ব পুনর্নির্ধারণের পর অবিলম্বে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হবে।"[৬৬] অপরাপর এলাকাকে তাদের সম্পদ আরও উন্নত হবার জন্য অপেক্ষা করতে হবে এবং সেসব জারগায় অস্থায়ী বন্দোবস্ত হবে।

১৮৬৬ সালে আর একটা শর্ত আরোপিত হল। যেসব জমি সরকারি সেচখাল থেকে উপকৃত হচ্ছে বা ভবিষ্যতে উপকৃত হতে পারে, বলে দেওয়া থাকল যে সেগুলিকে বর্ধিত করের আওতায় আনা যাবে। সেক্রেটারি অব স্টেট বিধান দিলেন যে "তেমন কোন এস্টেটে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা যাবে না যেখানে বর্তমানে খাল থেকে সেচ যতখানি হবার পরিকল্পনা আছে তা পুরোপুরি কার্যকরী হলে বর্তমান সম্পত্তির চেয়ে······২০ শতাংশের বেশি অনুপাতে সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি হবে।" পুরো চাষ না হওয়া বা উন্নত না হওয়া এস্টেটের মত সেগুলিতেও অস্থায়ী বন্দোবস্ত হবে।[৬৭] এই শর্তটি অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে সূত্রায়িত হয়েছিল এবং সুদূর ভবিষ্যতে সেচের আওতায় আসতে পারে এমন বহু এস্টেটও এর দ্বারা বাদ হয়ে যেতে পারত।[৬৮] ভারত সরকারের অনুরোধে Northcote এই নিয়মটিকে নিম্নোক্তভাবে নতুন করে সূত্রায়িত করলেন : "সেই সমস্ত এস্টেটে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হবে না যেখানে স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেলের মতে 'আগামী ২০ বছরের মধ্যে' খাল থেকে সেচ সম্প্রসারিত হতে পারে এবং বর্তমান সম্পত্তির মূল্য ২০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে।"[৬৯] ভারত সরকার দাবি করল যে এমন কি এই সব শর্তও সরকারের স্বার্থ সুরক্ষিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। বস্তুতঃ এই কথাই স্থির হল যে একটা স্টেট যতক্ষণ বিকশিত ও উন্নত হতে থাকবে ততক্ষণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হবে না। ১৮৭১ সালের মে মাসের একটা

রাজস্ব বার্তায়[৭০] সরকার এই অভিমত প্রকাশ করল যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ-গুলিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সিদ্ধান্তকে অবশ্যই মূলতুবি রাখতে হবে। এতেই বস্তুত গোটা ব্যাপারটাকে শিকেয় তুলে রাখা হল, অবশ্য বিধিবৎভাবে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিকল্পনাকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত এল ১৮৮৩ সালের ২৪ নং রাজস্ব বার্তায়।[৭১] প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৭১ সালে সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছ থেকে আসা একটা বার্তাতেই ১৮৮৩ সালের সিদ্ধান্তের পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছিল। এই বার্তায় ভারতীয় অর্থ-বিষয়ে হাউজ অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটির মত ব্যক্ত করা হয়েছিল ঃ তাঁরা মনে করেন যে স-পরিষদ সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার—মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত······যাতে তিনি বিষয়টির পুনর্বিবেচনা করেন এবং তাঁর পূর্ব-সূরীর সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা মুলতুবী রাখার কথা বিবেচনা করতে পারেন।"[৭২]

মনে হয় Sir C. Wood চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পথে দুটি সমস্যাকে খাটো করে দেখেছিলেন। জমির মূল্য বৃদ্ধি ও রুপোর মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনাকে তিনি খাটো করে দেখেছিলেন। "টাকার ক্রয়ক্ষমতার তুলনামূলক হ্রাসের আশঙ্কা ·····মহামান্যা মহারাণীর সরকারের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় না·····।"[৭৩] আরও "একবার যখন যথাযথভাবে খাজনা স্থির করা হয়েছে (তারপর) সমাজের স্বাভাবিক প্রগতি থেকে উদ্ভূত কিছু বৃদ্ধি খুব সম্ভবতঃ ঘটবে কিন্তু মন্থরগতিতে এবং বেশ একটা সময়ের ব্যবধানে ছাড়া (সে বৃদ্ধি) কোনও বড় অঙ্কে পৌঁছাবে না ···।"[৭৪] উপরোক্ত দুই ব্যাপারেই Wood-এর ভুল হয়েছিল, আর সে কথা যত স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বপক্ষে উৎসাহ তত কমে যেতে থাকল। জমির দাম দ্রুত বাড়তে লাগল, আর সরকার সিদ্ধান্ত করল যে একটা এস্টেট যতক্ষণ পুরোপুরি কর্ষিত ও উন্নত না হচ্ছে ততক্ষণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মঞ্জুর করা হবে না। তার মানে হল যেসব এলাকা উন্নত নয় তাদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে বঞ্চিত করা হবে, অথচ জমিতে মূলধন বিনিয়োগ ও উন্নয়নই ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য। এ এক হাস্যকর পরিস্থিতি।

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে আর যে একটা সমস্যার পূর্বাভাস পাওয়া যায় নি তা হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পাদনের মারফত সরকার রাজস্বে যা

ছেড়ে দেবে তা পুনরুদ্ধারের মত কোনও কর ব্যবস্থা রচনার সমস্যা। আয়করের ব্যর্থতা এবং প্রত্যাশিত রাজস্ব তুলতে অপ্রত্যক্ষ করগুলির ব্যর্থতা, সরকারের আয়ের অন্যতম প্রধান ও ক্রমবর্ধমান উৎস হিসাবে ভূমি রাজস্বের গুরুত্ব সরকারের উপলব্ধির মধ্যে নিয়ে এল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধা এমন এক সময়ে স্বীকৃত হয়েছিল যখন মনে করা হয়েছিল যে এই রকম বন্দোবস্ত যে কৃষি সম্পদ সৃষ্টি করবে তার উপর কর বসানোর একটা ব্যবস্থা সহজে উদ্ভাবিত করা যাবে। Cranborne লিখেছিলেন "ভারতীয় অর্থ-বিষয়ক ব্যবস্থাপকদের কাছে তেমন কর ব্যবস্থা এখনও স্বপ্নের পরশপাথর হয়ে আছে বলেই মনে হয়, কাজেই এটা স্বাভাবিক যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য আগে যাঁরা উৎসাহী ছিলেন তাঁদের অনেকেই এখন সম্ভাব্য ভূমি-রাজস্ব বৃদ্ধি ছেড়ে দিতে অনিচ্ছুক বোধ করতে শুরু করেছেন।"[৭৫] পরশপাথরের খোঁজে বিফল মনোরথ হয়ে ভারত সরকার শেষ পর্যন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসারের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করলেন।

॥ ২ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর গোটা প্রথমার্ধ জুড়ে ভারত সরকারের আফিম রাজস্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল, বাজারের ওঠাপড়া সত্ত্বেও। শতাব্দীর শুরুতে ১০ লক্ষ পাউণ্ডের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ থেকে ১৮১০ সালে আফিম রাজস্ব প্রায় ১০ লক্ষ পাউণ্ডে উঠেছিল; ১৮৩০ সালে হয়েছিল প্রায় ১৫ লক্ষ এবং ১৮৫০ সালে ৩৫ লক্ষেরও উপর।[৭৬] এই খাতে আয় ১৮৫৬-৫৭ সালে মোট ৫ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ১৮৫৭-৫৮ সালে, অর্থাৎ বিদ্রোহের ও গুরুতর আর্থিক অনটনের বছরে, আফিম রাজস্ব প্রত্যাশিত পরিমাণ বহু ছাপিয়ে ৬·৮ কোটি টাকায় উঠেছিল এবং আর্থিক সঙ্কট কাটাতে সরকারের সাহায্য করেছিল। বিভিন্ন বছরে ওঠাপড়া থাকলেও ১৮৫৮-৬১ সালের মধ্যে আফিম রাজস্ব গড়ে বাৎসরিক ৭ কোটি টাকা হয়েছিল, ১৮৬২-৬৬ সালের বাৎসরিক গড় ৭·৫ কোটি টাকায় উঠেছিল এবং ১৮৬৭-৭১ সালের বাৎসরিক গড় ৮·৫ কোটি টাকা হয়েছিল।

ভারতে প্রধানতঃ দুটি অঞ্চলে পপির উৎপাদন হত। বাংলা প্রেসিডেন্সির আগ্রা, অযোধ্যা ও বিহারের উপর দিয়ে একটা বলয়ে উৎপাদন হত ; আর হত ব্রিটিশ ভারতের বাইরে একটা কেন্দ্রে (মধ্যভারত ও রাজপুতানার অনেকগুলি দেশীয় রাজ্য ও গাইকোয়াড়ের রাজ্যাংশ জুড়ে), এখানে জাতের দিক থেকে মালওয়া আফিম বলে পরিচিত এক রকমের আফিম তৈরি হত। উৎপাদনের এবং রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা দুই অঞ্চলে দুই রকম ছিল।

বাংলায় সরকার আফিমকে একচেটিয়া করে রেখেছিল, সেখানে কেবল সরকারের জন্যই পপির চাষ করা ও তা থেকে আফিম তৈরি করা চলত। পাটনা ও গাজিপুরে দপ্তর করে আফিমের এজেন্টরা বাংলার রেভিনিউ বোর্ডের তরফে আফিমের ব্যবসা চালাতেন।[৭৬] পপির চাষীদের মোটা আগাম দেওয়া হত, তাঁরা স্বেচ্ছায় চাষ করতেন, সামনের মরশুমে যে আফিম তৈরি হবে তারই আংশিক দাম শোধ হিসাবে ওই আগামকে দেখা হত। কাঁচা আফিমকে সরকারি কারখানায় তৈরি করে নেওয়া হত ও কলকাতায় পাঠানো হত। স্থানীয় ব্যবহারের জন্য আফিম বিভাগ আবগারি বিভাগকে আফিম সরবরাহ করত।[৭৭] বাংলায় তৈরি আফিমের বেশিরভাগ কলকাতায় মাসিক বিক্রিতে সর্বোচ্চ দর দেনেওয়ালার কাছে নিলামে বিক্রি করা হত। আফিমের তৈরির খরচ এবং নিলামে পাওয়া দরের মধ্যে যে তফাত সেইটাই মুনাফা বা রাজস্ব হিসাবে সরকারের হাতে আসত।[৭৮] আফিম বিভাগের প্রশাসনের উপর রিপোর্ট তৈরির জন্য ১৮৭১ সালে নিয়োজিত একটা কমিটির মন্তব্য অনুযায়ী "খুব সম্ভবতঃ এ ব্যবস্থাটা ভেবেচিন্তে ঠিক হবার চেয়ে বরং গজিয়েই উঠেছিল।"[৭৯] ব্যাপারটা আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। এই ব্যবস্থার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য একটা সুস্পষ্ট অসুবিধা ছিল সরবরাহ চালু রাখার সমস্যা। সরকার চাষীকে যেমন দর দিত সেই অনুযায়ী সরবরাহ নির্ধারিত হত। সরকারের দাম স্থির করা আবার বহু সমস্যায় সমাকীর্ণ ছিল। কর্তৃপক্ষের ভাবটা ছিল যেন আফিম জিনিষটা "চাহিদা ও সরবরাহের স্বাভাবিক নিয়মের আওতায় পড়ে না।"[৮০] ১৮৫৯-৬০ সালের আর্থিক বছরে এক সের আফিমের দাম ৩ টাকা ৪ আনা থেকে বাড়িয়ে ৩ টাকা ৮ আনা করা হল; ১৮৬০-৬১ সালে আরও বাড়িয়ে ৪ টাকা করা হল, আর ১৮৬১-৬২ সালে আবার বাড়িয়ে ৫ টাকা সের করা হল।[৮১] ১৮৬১ সাল পর্যন্ত যে দর দেওয়া হল তাতেও পপির চাষ

বাড়ানো গেল না দেখে সরকার অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করল।[৮২] ১৮৫৩-৫৪ থেকে ১৮৫৮-৫৯ এই পাঁচ বছরে আফিম চাষ বিহার এজেন্সিতে কমলো ১ লক্ষ ৮ হাজার ৬২৭ বিঘা আর বারাণসী এজেন্সিতে ২৮ হাজার ৫৬ বিঘা।[৮৩] দর বাড়ানো সত্ত্বেও বাংলায় চাষ কমতে থাকল।[৮৪] বাংলায় চাষ কমার কারণ হল কৃষিজাত পণ্যের দর বৃদ্ধি, অতিরিক্ত খাটানোর দরুন আফিম উৎপাদক জমির ক্ষমতা কমে যাওয়া, আফিমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লাগতো এমন সব বাণিজ্যিক ফসলের প্রসার। ১৮৬১ সালের জুন মাসে এক সের আফিমের দর ৫ টাকা করায় চাষ আবার কিছু বাড়লো। কয়েক বছরের মধ্যে দেখা গেল যে রায়তদের বাড়তি দর দেওয়ার দরুন এমন সব এলাকায় আফিম চাষের প্রসার ঘটলো যেখানে বেশি খরচে নিরেস জাতের আফিম তৈরি হয়। কাজেই ১৮৬৫ সালে সিদ্ধান্ত করা হল যে প্রতি সেরের দর কমিয়ে ৪ টাকা ৮ আনা করা হবে এবং চাষ বারাণসী এলাকায় সীমাবদ্ধ করা হবে।[৮৫]

সরকারের একচেটিয়া ব্যবস্থা ও সরকার কর্তৃক দর স্থির করা থেকে যে-সব সমস্যার সৃষ্টি হল তা বিপুল। এই সব সমস্যার অবাধ নীতিসম্মত সমাধান ছিল সরকারের একচেটিয়া ব্যবস্থা ছেড়ে দেওয়া। মালওয়ায় আফিম এজেন্ট Sir Robert Hamltion ১৮৫৮ সালে বাংলার একচেটিয়া ব্যবস্থার বদলে আর একটি ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করলেন যাতে স্বাধীন ও অবাধ পপি চাষ হতে পারবে এবং একটা নির্দিষ্ট শুল্ক দিলে আফিম তৈরি ও রপ্তানি করা যাবে ; প্রস্তাব করা হল যে সরকারি আগাম ক্রমশঃ কমিয়ে আনা এবং আফিম উৎপাদনের লাইসেন্স মঞ্জুর করার মারফত এই নতুন ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে প্রবর্তিত হওয়া উচিত।[৮৬] উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের সরকার এতে সমর্থন জানান। এই পরিকল্পনার সমর্থনে যেসব যুক্তি উপস্থাপিত হল সেগুলি নিম্নরূপ : (ক) আফিমের একচেটিয়া ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষভাবে সরকারের জড়িত থাকার অপযশ ঘুচবে। (খ) একচেটিয়া অধিকার ছাড়ায় কোনও আর্থিক ক্ষতি হবে না, কারণ আফিমের উপর আবগারি ও রপ্তানি শুল্ক রাজস্ব আগম বজায় রাখবে। (গ) আফিম বিভাগ ও আফিম এজেন্সিগুলির দপ্তর চালানোর খরচ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। (ঘ) অবাধ চাষের প্রবর্তন করলে সরকারি হস্তক্ষেপ দরুন কৃষকের হয়রানি বন্ধ হবে।

বাংলার সরকার প্রস্তাবিত পরিবর্তনে প্রবল বাধা দিল। বাংলায়

লেফটেনাণ্ট গভর্নর দাবি করলেন যে "আফিম ব্যবহারের উপর আবগারি শুল্ক এবং রপ্তানির উপর একটা শুল্ক মারফত রাজস্ব আদায়, এবং ওই একই রাজস্ব আফিম তৈরির একচেটিয়া অধিকারের মারফত আদায়ের মধ্যে 'নীতি-শাস্ত্রের প্রশ্ন হিসাবে' একটা পার্থক্য টানা কাল্পনিক ও মিথ্যা......।"[৮৭] শুল্ক ফাঁকি দেবার দরুন অবাধ চাষের ব্যবস্থা হলে পরে বাংলায় বিপুল পরিমাণ লোকসান হবে। ভৌগোলিক উপাদানগুলিকে খেয়াল না করা উচিত হবে না; মালওয়া আফিমের উপরকার রপ্তানি শুল্ক নিয়মিত সংগৃহীত হত কারণ পশ্চিমঘাট পার হয়ে বোম্বাইয়ের দিককার সামান্য কটি বাণিজ্যপথের উপর সহজে নজর রাখা যেত, কিন্তু বাংলার প্রত্যেকটি জলপথ ধরে সমুদ্রোপকূলে আফিমের চোরাই চালান বন্ধ করা অসম্ভব। বাংলা সরকার Hamilton-এর এই অভিযোগ অস্বীকার করল যে আফিম চাষের জন্য চাষীদের উপর চাপ দেওয়া হয়। সরকারি এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত হবার ব্যবস্থা স্বেচ্ছামূলক এবং চাষীর ইচ্ছা অনুযায়ীই তা শেষ করে দেওয়া যেতে পারে, আগাম বিনা সুদে দেওয়া হয়, ইউরোপীয় অফিসারদের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানের দরুন দুর্নীতির সুযোগ সীমাবদ্ধ, আর খারাপ মরসুমে ফসলের ক্ষতি হলে তার জন্য উদারভাবে ছাড় দেওয়া হয়। ভারত সরকার দাবি করল বর্তমান ব্যবস্থায় আফিম উৎপাদকেরা (Assamees) যে সন্তুষ্ট বিদ্রোহের সময় তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল, তখন এমন কি উপদ্রুত জেলাগুলিতেও চাষীরা দাদন শোধ দিতে ও সরকারি এজেণ্টদের সঙ্গে হিসাব-নিকাশ করতে আফিম নিয়ে এসেছিল।[৮৮] এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল যে পপির অবাধ চাষ ভারতের মধ্যে আফিম খাওয়ার ও আফিমের ধূমপান করার অভ্যাস প্রসারিত করতে পারে, বিশেষ করে পারে বাংলায়, কারণ সেখানে প্রায় সব জায়গায় পপি ফলানো যায়।[৮৯] উপরন্তু এর ফলে অতিরিক্ত উৎপাদন হয়ে যেতে পারে, তাতে চীনের বাজারের উপর প্রভাব পড়বে এবং দর কমিয়ে একটা সংকট সৃষ্টি করবে।[৯০] একচেটিয়া ব্যবস্থার পক্ষে চূড়ান্ত যুক্তিটি ছিল যে মালওয়া আফিমের উপর প্রযোজ্য পাস ডিউটির চেয়ে এই ব্যবস্থা সরকারের পক্ষে অধিকতর লাভজনক। এ কথা সুস্পষ্ট যে মালওয়া আফিমের রপ্তানি মধ্য ও পশ্চিম ভারতের আফিম ব্যবসায়ী ও দেশীয় রাজাদের (বিশেষ করে হোলকরের মহারাজাকে) সমৃদ্ধ করছিল।[৯১] ১৮৭১ সালে Cecil Beadon হিসাব করেন যে একচেটিয়া অধিকারের বদলে যদি শুল্ক ব্যবস্থায়

পত্তন করা হয় তা হলে আফিমের পেটি পিছু সরকারের ২০০ থেকে ২৫০ টাকা করে লোকসান হবে।[৯২] আফিম ব্যবসায় সাধারণ ব্যবসার চেয়ে আলাদা এবং তাতে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। একে "অবাধ বাণিজ্যের নীতির চশমা দিয়ে দেখা ভুল হবে।"[৯৩] আগাম ছাড়া পপি চাষ অসম্ভব, আর এই রকম ঝুঁকিওয়ালা ব্যবসায়ে ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিরা বিনিয়োগ করবে কিনা সন্দেহ।[৯৪] যদিও বা পুঁজি জোটে এ কথা নিশ্চিত যে চাষীরা, মহাজনদের দ্বারা শোষিত হবে, সরকারের সঙ্গে চালু প্রথাসিদ্ধ ব্যবস্থার যদি ওলট-পালট করা যায় তবে "আসামীরা ব্যাপকভাবে চাষ ছেড়ে দেবে।"[৯৫] জমিদার আফিম ব্যবসায়ে ঢুকবে সে সম্ভবনা কম। "সরকার যে ক্ষেত্র ছেড়ে দেবে তা প্রায় একান্তভাবে ইউরোপীয়দের দ্বারা অধিকৃত হবে।"[৯৬] যেসব ইউরোপীয়রা নীলের কারখানা চালাচ্ছে সম্ভবতঃ তাঁরাই দিব্যি আফিম কারখানা প্রতিষ্ঠা করবে ও চালিয়ে নেবে। বিহারের একজন আফিম এজেণ্ট লিখেছিলেন "আমার মনে হয় না এই ধরনের একটা ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করার মত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ দেশীয়দের আছে।"[৯৭] নিয়োজিত হবার জন্য তৈরি পুঁজি এবং নীল কারখানা চালানোর অভিজ্ঞতা-লব্ধ বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়রা এ বিষয়ে অচেতন ছিলেন না যে আফিম একটি লোভনীয় সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্র। আফিমে সরকারি একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে এবং অবাধ আফিম তৈরির পক্ষে আন্দোলনের পিছনে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল বলে মনে হয়। ১৮৭১-৭২ সালে ভারতীয় অর্থব্যবস্থা সম্বন্ধে হাউজ অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটির তদন্তের সময়ে এ কথা তোলা হয়। Sir Hamilton ও আরও অনেকে সরকারের একচেটিয়া অধিকার বিলোপের পক্ষে বলেন।[৯৮] কিন্তু বাংলা ব্যবস্থার[৯৯] প্রবক্তারা অবাধ চাষ প্রবর্তনের প্রয়াসকে সফলভাবে প্রতিরোধ করেন।

মালওয়া আফিমের উপর রপ্তানি শুল্ক ছিল। মধ্যভারতে—প্রধানতঃ দেশীয় রাজ্যগুলিতে উৎপন্ন আফিম ইন্দোরে আনা হত, মধ্যভারতের আফিম এজেণ্টের অফিসে ওজন করা হত। তিনি প্রতি পেটি আফিমের উপর একটা নির্দিষ্ট শুল্ক ধার্য করতেন এবং শুল্ক দেওয়া আফিম হিসাবে বোম্বাই বন্দরের জন্য একটা ছাড়পত্র দিতেন। ব্রিটিশ সরকার উৎপাদন, তৈরি করা ও রপ্তানি করা নিয়েমাথা ঘামাতো না, তারা কেবল একটা শুল্ক ধার্য

করত।[১০০] ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত এই শুল্ক ছিল পেটি পিছু মাত্র ২০০ টাকা ; সেই বছরে সেটা ৩০০ টাকায় তোলা হয়, এবং ১৮৪৭-৪৮ সালে তোলা হয় ৪০০ টাকায়। ১৮৫৯ সালে ভারত সরকার এই শুল্ক ৫০০ টাকায় তুলল। কিন্তু ১৮৬০ সালে আবার যখন এই শুল্ক ৬০০ টাকায় তোলা হল তখন রীতিমত আপত্তি উঠল।[১০১] বোম্বাই-এর সরকার উল্লেখ করল যে মালওয়া আফিমকে অন্ততঃ চারটি পক্ষকে লাভ দিতে হয় : চাষী, প্রথম ক্রেতা যিনি চাষীকে টাকা আগাম দেন, দ্বিতীয় ক্রেতা যিনি আফিমটা তৈরি করেন ও বোম্বাই পাঠান এবং আফিমের পেটির রপ্তানিকারক। বোম্বাই সরকার দাবি করল যে ৬০০ টাকা শুল্ক বসালে লাভের পড়তা পোষাবে না। ইন্দোরের আফিম এজেণ্টেরও এই অভিমত ছিল। কিন্তু ভারত সরকার এই আপত্তি অগ্রাহ্য করল, তাদের ধারণা ছিল মাঝখানকার লোকেরা ও রপ্তানিকারকরা "বিপুল লাভ" করছেন।[১০২] বোম্বাইতে প্রতি পেটি আফিমের দরুন সরকার কেবল ৫০০ টাকা (বাইরে যাবার শুল্ক—Pass Duty) পাচ্ছে, অথচ বাংলায় একচেটিয়া ব্যবস্থায় প্রতি পেটির জন্য সরকারের ছাঁকা লাভ হচ্ছে ১,২০০ টাকা।[১০৩] বোম্বাই সরকারের সতর্কীকরণ এবং মোটা শুল্কের বিরুদ্ধে বোম্বাই-এর আফিম ব্যবসায়ীদের স্মারকলিপির কোনও ফল হল না।[১০৪] ১৮৬১ সালে ভারত সরকার আবার শুল্ক বাড়িয়ে ৭০০ টাকা করার নোটিশ দিল।[১০৫] এই একই সময়ে একটা ব্যবসায়িক সঙ্কট দেখা দিল। পেটি পিছু ১,৮৫০ টাকা (এপ্রিল) থেকে ১,৩৫০ টাকা (জুলাই) দর পড়ে গেল তিন মাসের মধ্যে। ৬ জন আফিম ব্যবসায়ী দেউলিয়া হল, দরাদরিতে নিযুক্ত ২০ জন দালাল আত্মগোপন করল, বহু ফাটকা ব্যবসায়ী সর্বস্বান্ত হল।[১০৬] এই অবস্থায় মালওয়ার আফিম এজেণ্ট Col. R. Shakespear অনুনয়-বিনয় করে বললেন ৭০০ টাকা শুল্ক ব্যবসায়ের উপর একটা গুরুতর আঘাত হানবে। David Sassoon & Co. রুস্তমজী জামসেৎজী জীজীভয় অ্যাণ্ড কোম্পানি এবং আফিম ব্যবসায় নিযুক্ত অপরাপর কোম্পানি শুল্ক কমানোর জন্য সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করল।[১০৭] ভারত সরকার আগেকার নোটিশ বাতিল করার সিদ্ধান্ত করল, ঠিক হল শুল্ক ৭০০ টাকায় তোলা হবে না।[১০৮]

মালওয়া ও বাংলা উভয় জায়গাকার আফিম রাজস্বেই গুরুতর ওঠা-পড়া হত। পরিশিষ্টে যে পরিসংখ্যান দেওয়া আছে তার উপর চোখ

বোলালেই দেখা যাবে যে এই ওঠা-পড়ার আধিক্য এবং পৌনঃপুন্য ১৮৬১-৭১-এর দশকের মধ্যে অন্ততঃ তিন বার অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। রাজস্বের হঠাৎ কমতির ফলে ফিনান্স মেম্বার যে হিসাবের ও প্রত্যাশার উপর দাঁড়িয়ে বছরের আয় সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করবেন এবং বাজেট 'সুষম' করার (অর্থাৎ রাজস্ব ও খরচ সুষম করার) চেষ্টা করবেন তা ওলট-পালট হয়ে যেতে পারতো।

বিভিন্ন বছরে এত ওঠা-পড়ার প্রবণতার দরুন আফিম রাজস্বকে সাধারণতঃ রাজস্বের একটা সঙ্কটময় উৎস বলে গণ্য করা হত। আয় এমন কতকগুলো ব্যাপারের উপর নির্ভর করত যা সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল এবং "ফসলের আকস্মিক দুর্ঘটনা ও বাজারের আকস্মিকতা" অনুযায়ী ওঠা-নামা করার প্রবণতা ছিল।[১০৯] বাংলায় সরকারের নীট লাভ নির্ধারণ করার দিক থেকে উপরোক্ত দুটি উপাদান ছাড়াও আর একটি তৃতীয় উপাদান ছিল, সে হল আফিমের খরচ (opium charge—অর্থাৎ পপি চাষীদের আগাম দেবার জন্য খরচ, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দরের হার, বেঙ্গল অপিয়াম এজেন্সিগুলি চালু করার খরচ, ইত্যাদি) ; আফিম তৈরি পর্যন্ত যে খরচ হয়েছে সেই দর এবং কলকাতায় নিলামে পাওয়া দরের মধ্যেকার তফাতটাই ছিল বাংলায় আফিমের নীট মুনাফা।[১১০] মালওয়া আফিমের ব্যাপারে ফসলের অবস্থা, চীনের চাহিদা এবং বোম্বাই-এর টাকার বাজারের পরিস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। মালওয়া আফিমের দর বাংলার আফিমের দরের সঙ্গে "সহানুভূতিশীল" হবার প্রবণতা (অর্থাৎ একইভাবে ওঠা-নামা করার প্রবণতা) দেখাত।[১১১] ষাটের দশকে আফিমের জায়গায় তুলোর প্রবর্তন আফিমের উৎপাদন ব্যাহত করেছিল।[১১২] (আমেরিকার গৃহযুদ্ধের জন্য ল্যাঙ্কাশায়ার সরবরাহ ঘাটতিতে ভুগছিল, তাই তুলোর খুব চাহিদা ছিল)। মালওয়া আফিমের বাণিজ্যে দামের ওঠা-পড়ার জন্য যানবাহনের খারাপ অবস্থাও দায়ী ছিল। বর্ষার সময়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ মালওয়ার দূর গ্রামের সঙ্গে গরুগাড়িতে যোগাযোগ অসম্ভব হত, তখন আফিম পরিবহন ক্ষতিগ্রস্ত হত।[১১৩] এই রকম সময়ে আফিম রপ্তানি এবং ফলতঃ পাস ডিউটি থেকে আয় কমে যেত। জাহাজ পেলেই চীনে পাঠানোর জন্য বোম্বাই শহরের গুদামে আফিম মজুত রাখা যেসব ব্যবসায়ীর স্বার্থে কুলোত না এবং চীনের চাহিদার প্রত্যাশায় আফিম নিয়ে

আসতেন যেসব ব্যবসায়ী তাঁরা বাজারের খবরাখবর দ্রুত জানতে না পারা এবং মাল পরিবহনের মন্থরতার দরুন প্রায়ই গুরুতর লোকসানের মধ্যে পড়তেন।[১১৪] মালওয়া আফিমের বাণিজ্য এবং সেই সঙ্গে বাংলার আফিমের বাণিজ্যও অস্থির ছিল কারণ ভারতের বাইরেকার আফিমের বাজার সম্বন্ধে সামান্যই ধারণা ছিল। W. N. Massey বলেছিলেন আফিম এমন "একটা উৎস যা অত্যন্ত দুর্বোধ্য। এ এমন একটা বাজারের উপর নির্ভরশীল যে সম্পর্কে আমাদের সামান্যই খবরাখবর জানা আছে। এ অতি ভয়ঙ্কর ওঠা-পড়ার শিকার……।"[১১৫] শেষ পর্যন্ত আফিম রাজস্বের তথাকথিত সঙ্কটময়তার অনেকখানির জন্যই বাংলার আফিমের অব্যবস্থাকে দায়ী করা যেতে পারত। ১৮৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত "বছরে বছরে কি পরিমাণ বিক্রির জন্য হাজির করা যাবে, সে বিষয়ে সরকারের তরফ থেকে কোনও নির্ধারিত নীতির অভাবই প্রায় সম্পূর্ণভাবে রপ্তানি বাণিজ্যে অবিরাম ও ভয়ঙ্কর ওঠা-পড়া ঘটাত, এবং স্বাভাবিক পরিণাম হিসাবে আফিম রাজস্বের ওঠা-পড়াও অত্যন্ত বেশি ছিল।"[১১৬] এই সমস্ত কারণে আফিমকে রাজস্বের একটা বিশ্বাসের অযোগ্য উৎস বলে গণ্য করা হত এবং বাজেট তৈরি করার সময়ে সতর্কতার খাতিরে আফিম রাজস্বকে কম করে ধরা একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষ আফিম থেকে কম আয় ধরার রীতিকে উৎসাহ দিতেন। ভারতে কিন্তু এই নীতি জনপ্রিয় ছিল না কারণ আফিম রাজস্বকে ইচ্ছাকৃতভাবে কম করে ধরা প্রায়ই প্রত্যক্ষ কর আরও কড়া করার অছিলা হিসাবে ব্যবহৃত হত। এই সমস্যা নিয়ে সরকার বহুদিন ধস্তাধস্তি করল, তারপর শেষ পর্যন্ত দুটো পরিকল্পনা বেরোল। একটা এল ফিনান্স মেম্বার Richard Temple-এর কাছ থেকে, সে হল একটা আফিম (সংরক্ষিত) তহবিল। আর একটা পরিকল্পনার প্রস্তাবক বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর Sir Cecil Beadon, সেটা হল আফিমের একটা সংরক্ষিত পরিমাণ গুদামে মজুত রাখা হবে এবং সেই সঙ্গে প্রতি বছর কতটা আফিম বিক্রির জন্য হাজির করা হবে তারও একটা পরিকল্পনা থাকবে।

বছরে বছরে আফিম রাজস্বের ওঠা-পড়া এড়ানোর জন্য Lord Lawrence-এর সমর্থনে R. Temple ১৮৬৯ সালে একটা অভিনব ব্যবস্থার প্রস্তাব করলেন। এই পরিকল্পনা গোড়ায় প্রস্তাব করেন Lord Stanley। Lawrence-এর কাছে লেখা একখানা ব্যক্তিগত চিঠিতে Northcote, ঐ

Stanley-র প্রস্তাবিত পরিকল্পনার একটা রূপরেখা হাজির করেন : "আপনাদের উচিত প্রতি বছর রাজস্বের জমার ঘরে একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক ঢোকানো, সু-বৎসরে জেরটা একটা বীমাজাতীয় তহবিলে নিয়ে যাওয়া এবং দুর্বৎসরে সেই তহবিল থেকে টাকা নেওয়া।"[১১৭] কোনও কোনও বছরে আফিম রাজস্ব প্রত্যাশা ছাড়িয়ে যেত, Temple প্রস্তাব করেছিলেন এই উদ্বৃত্ত সংরক্ষিত আফিম তহবিল হিসাবে আলাদা করে রাখা হোক ; হাতে থাকা নগদ টাকার পরিমাণ বাড়ানো বা সরকারি ঋণপত্রে বিনিয়োগের জন্য কিংবা পুনরুৎপাদক পূর্তকর্মে সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য সব সময়ে তৈরি রাখা হোক প্রয়োজন মত যাতে সর্বদাই তা থেকে টাকা পাওয়া যায়। আর আফিমের রাজস্বে যদি ঘাটতি পড়ে তা হলে ঘাটতি মেটানোর জন্য এই সংরক্ষিত তহবিল ব্যবহার করা যাবে।[১১৮] কিন্তু গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের অধিবাংশ সদস্যের দ্বারাই এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যাত হয়।[১১৯] Maine ও Strachey এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করতে পারলেন না, Durand এর উপযোগিতা দেখতে পেলেন না, R. Mansfield আশা করলেন যে "একে যথোপযুক্ত বিস্মৃতির কল্পনরকে নিক্ষেপ করা" হবে।[১২০] কাজেই এ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হল।

আফিম রাজস্বের ভয়ঙ্কর ওঠা-পড়া থেকে ভারতীয় অর্থব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য একটা অপেক্ষাকৃত ভাল পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই প্রস্তাবিত হয়েছিল। ১৮৬৭ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখের একটি মন্তব্যে বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্নর Sir Cecil Beadon বলেছিলেন এই সব ওঠা-পড়ার মূল কারণ হল সরকার কি পরিমাণ বাংলার আফিম বিক্রির জন্য হাজির করবে তার ওঠা-পড়া।[১২১] John Strachey-র এই অভিমত ছিল যে, আফিমের একটি সংরক্ষিত ভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রয়োজন।[১২২] উৎপাদন যদি অতিরিক্ত হয়ে যায় তবে তা ভবিষ্যত মরসুমের ব্যর্থতা ঠেকানোর জন্য সংরক্ষিত ভাণ্ডার হিসাবে রেখে দেওয়া হবে। প্রতি বছর সরকার কর্তৃক আগে থেকে ঘোষিত একটা পরিমাণ বিক্রি করা হবে ; এ ব্যবস্থা "নির্ধারিত" ("Standard") আফিম সরবরাহ বলে পরিচিত ছিল।[১২৩] উৎপাদন যদি নির্ধারিত পরিমাণের বেশি হয় তা হলে সেই বাড়তি আফিম বাজারে যাবে না, একটা সংরক্ষিত মজুত ভাণ্ডারে যাবে। এই পরিকল্পনা গৃহীত হল, যদিও ফসল নষ্ট হবার দরুন গোড়ার দিকে আফিমের যথাযোগ্য মজুত সংগ্রহ করা গেল না।

ইংরেজ বণিক-স্বার্থগুলি এ পরিকল্পনার প্রতি বিরূপ ছিল না। Messers Jardine, Skinner & Co. ও অন্যান্যরা ভারত সরকারের অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারিকে লিখল "মূল্যের দিক থেকে এতটা ওঠা-পড়ার প্রবণতাসম্পন্ন একটা ব্যবসায়ের গতিধারাকে সুস্থিত করার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। আমরা বলতে চাইছি যে প্রতি বৎসরের যোগানের পরিমাণের মধ্যে সমরূপত্বই হল প্রথম বিষয় যা মেনে চলা দরকার .....।"[১২৪] পরবর্তী বছরে সরকার বিক্রির জন্য কতটা হাজির করতে চায় তা আগে থেকে ঘোষণার জন্য ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ভারত সরকারকে পীড়াপীড়ি করছিল। সাধারণভাবে নির্ধারিত লক্ষ্য ছিল ৪৮ হাজার পেটি, তবে গোড়ার দিকে বাড়তি-কমতি হচ্ছিল। ১৮৭৯ সালের আগে প্রতি মাসে কত পরিমাণ বিক্রি হবে (যা সরকার বিনা নোটিশে বদলাতে পারবে না বলে প্রতিশ্রুত) তা সঠিকভাবে ঘোষণা করা সম্ভবপর হয় নি।[১২৫] ১৮৭১-৭২ সালের অভিজ্ঞতা এই পরিকল্পনার সুবিধা দেখিয়ে দিল। যদিও প্রত্যাশিত ফসলের এক-চতুর্থাংশ নষ্ট হয়ে গেল তবু সরকার আগের বছরের সঞ্চিত মজুত থেকে মাল নিতে পারল এবং সেইভাবে "পুরো সরবরাহের মাথায় বর্ধিত দরের পূর্ণ সুযোগ নিতে পারল।"[১২৬]

আফিম থেকে আয়ের ওঠা-পড়াটাই কেবল সমস্যা ছিল না ঃ উদ্বেগের অনেক বড় কারণ ছিল, রাজস্বের এই উৎসটাই নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিল। বিপদ এসেছিল চীনে ও পারস্য উপসাগর এলাকায় উৎপন্ন অপেক্ষাকৃত সস্তা জাতের আফিম থেকে। পারস্যের ইয়েয্দ ও ইস্পাহানে উৎপন্ন পপি থেকে তৈরী আফিম বুশায়ার ও বন্দর আব্বাস হয়ে মস্কটে আসত। সেখান থেকে আরব ও ভারতীয় 'নাখোদারা' সিঙ্গাপুরে ও চীনে আফিম রপ্তানি করত। কথনও কথনও পাচারকারীরা মাকরান বা করাচি বন্দর দিয়ে সেই আফিম ভারতে নিয়ে আসত।[১২৭] কিছু নিরেস জাতের আফিম কেরমানে, সিরাজের আশেপাশে, কাজিরুনের কাছে গুরুমেসির সমতলে ও আশেপাশের জেলাতেও উৎপন্ন হত। পারস্যের আফিমের মোট পরিমাণ অল্পই ছিল, ১০ হাজার শাহ্‌মন-এর মত (১ শাহ্‌মন = ১৪ পাউণ্ড), গড়ে দর ভারতীয় আফিমের চেয়ে কম হত আর তাতে দূর প্রাচ্যের বাজারে পাঠানোর খরচ পুষিয়ে যেত।[১২৮] পারস্যের আফিম উৎপাদন গোটা আফিমের বাজারকে প্রভাবিত করার পক্ষে সামান্য ছিল।

১৮৬৮ সালে একটা কৌতূহলোদ্দীপক প্রস্তাব এল যে ভারত সরকারের উচিত পারস্য ও তুরস্কের সমস্ত আফিম কিনে নিয়ে তাকে যথাযোগ্য দরে বিক্রি করে উপসাগরীয় বাণিজ্যকে রাজস্বের একটা উৎসে পরিণত করা।[১২৯] এই প্রস্তাব উপযুক্ত বলে বিবেচিত হল না। পশ্চিম এসিয়ার আফিম উৎপাদন ও রপ্তানি যদিও সামান্যই রইল তবু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে বর্ধিত চাষের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন বোধ করতে লাগল।[১৩০] পারস্য উপসাগরে পলিটিক্যাল রেসিডেণ্ট Lewis Pelly-র রিপোর্ট অনুযায়ী সত্তরের দশকের গোড়ায় পারস্যের উৎপাদন ছিল মাত্র ২৫,০০ পেটি। পারস্যের ও তুরস্কের আফিম চীন সিঙাপুর ও লণ্ডনে রপ্তানি হত।[১৩১]

চীনের যেসব জাতের আফিম ভারতীয় আফিমের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করত সেগুলির নাম ছিল নান্তু (ইউনান প্রদেশের আফিম), চেংতু (সেচুয়েন-এর) এবং কুইচাওতু (কুইচাও-এর)। ১৭৩৬ সাল থেকেই দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের ইউনান আফিম উৎপাদন করত, আর ১৮৪০ সালের মধ্যেই প্রতিবেশী সেচুয়েন ও কুইচাও প্রদেশে চাষের বিস্তার হয়েছিল।[১৩২] আফিম চাষ নিরুৎসাহিত করাব জন্য চীন সরকারের চেষ্টা সত্ত্বেও চাষ দ্রুত বাড়ছিল। ১৮৫৯-৬০ সালে ইউনান সেচুয়েন ও কুইচাও প্রদেশের আফিম স্থানীয় চাহিদা মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল, অপরাপর প্রদেশেও অল্প কিছু পাঠানো হত। আফিম উৎপাদক প্রদেশগুলির সব চেয়ে কাছের বন্দর হ্যাঙ্কাও ১৮৫৯-৬০ সালে বিদেশী আফিম বাদ দিয়ে কেবল দেশীয় আফিম আমদানি করত। কিন্তু এই বছরই ছিল এর সর্বোচ্চ বছর, তারপর থেকেই দেশীয় উৎপাদন কমতে লাগল এবং পরবর্তী কয়েক বছরে বিদেশী আফিম ফিরে এল। ১৮৬১ সালে ক্যাণ্টনের ব্রিটিশ কন্সাল রিপোর্ট করলেন যে চীনা আফিম যদিও নীরেস জাতের, তবু সস্তা হবার দরুন নিম্নতর শ্রেণীর কাছে জনপ্রিয় আর "আফিমসেবীদের উঠতি পুরুষ" দেশীয় আফিমই বেশি পছন্দ করে। চীনা আফিম দামী ভারতীয় আফিমে ভেজাল দেবার জন্যও ব্যবহৃত হত।[১৩৩] ব্রিটিশ কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা চীনের অভ্যন্তরেও আফিম চাষ প্রসারিত হবার আশঙ্কাজনক খবর পাচ্ছিলেন।[১৩৪] ১৮৬১ সালে ইয়াংসিকিয়াং নদী বরাবর পরিভ্রমণকারী এক ব্যক্তি বস্তুতঃ গোটা পশ্চিম চীনকেই আফিমের দিক থেকে স্বয়ম্ভর দেখেছিলেন। পূর্বাঞ্চলীয় ও উপকূল অঞ্চলের প্রদেশগুলি তখনও বিদেশী

আফিমের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল।[১৩৫] বস্তুতঃ চীনের উৎপাদন এমন একটা পর্যায়ে উঠেছিল যে ব্রিটিশ-বার্মায় রপ্তানি শুরু হয়ে গিয়েছিল। এতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ উদ্বেগ জন্মেছিল। বণিকদের দলবদ্ধ গাড়িতে করে ইউনানের আফিম মান্দালয়ে আনা হত। ব্যবসায়ীরা বার্মার বন্দর রেঙ্গুন দিয়ে চীনা আফিম স্ট্রেটস সেটেলমেণ্টে রপ্তানি করার চেষ্টা করছিলেন (এ যাবৎ এখানে প্রায় একচেটিয়াভাবেই বারাণসীর আফিম সরবরাহ হত)।[১৩৬] ১৮৬৩ সালে A. P. Phayre-র রিপোর্ট অনুযায়ী এই ছিল পরিস্থিতি।

১৮৬৪ সাল থেকে চীনে আফিমের উৎপাদন অত্যন্ত দ্রুত বাড়তে লাগল। চীনে ব্রিটিশ বণিকদের[১৩৭] রিপোর্ট থেকে মনে হয় যে ১৮৬৪ ও ১৮৬৯ সালের মধ্যেকার পাঁচ বছরে আফিম উৎপাদন কেবল পশ্চিমের ইউনান, সেচুয়েন ও কুইচাওতেই বাড়ে নি, পূর্বের কোযাংতুং, হোনান, হুপেতেও প্রসারিত হয়েছিল, এমন কি মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গোলিয়াতে পর্যন্ত পেঁছেছিল। সাংহাই চেম্বার অব কমার্সে ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিবর্গ এবং Sir R. Alcock ১৮৬৯ সালে রিপোর্ট করেন যে সেচুয়েনে চাষযোগ্য জমির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এবং ইউনানের জমির এক-তৃতীয়াংশে আফিমের চাষ চলছে।[১৩৮] আফিম চাষের বিরুদ্ধে সম্রাটের আজ্ঞা অকার্যকর হয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় শাসনকর্তারা রাজস্বের উৎস হিসাবে আফিমকে পাওয়ার প্রতি বিরূপ ছিলেন না। এটা সম্ভব যে চীনা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দেশীয় উৎপাদনে অনুমতি দিয়ে বিদেশী আফিমকে সরিয়ে রাখতে চাইছিলেন।[১৩৯] Sir R. Alcock ও Sir F. Halliday সন্দেহ করেছিলেন যে ভারতীয় বাণিজ্যকে নষ্ট করার জন্য চীনা কর্তৃপক্ষ আফিম চাষ নিরুৎসাহিত করার নীতি শিথিল করেছিলেন।[১৪০] Alcock, Mayo-কে লিখেছিলেন যে চীন সরকারের মতলব হল ভারতীয় উৎপন্নকে কম দরের মারফত হটিয়ে দিয়ে ভারতীয় আফিমকে বাজার থেকে দূর করে দেওয়া, আর তারপর কিছুকাল বাদে চীনে আফিম চাষ বন্ধ করা। Mayo-র মন্তব্য ছিল "এর চেয়ে বেশি হাস্যকরভাবে অবাস্তব কর্মনীতি কল্পনা করা কঠিন, এ ঠিক চীনা মানসিকতারই উপযুক্ত।"[১৪১] সে যাই হোক নীতি পরিবর্তন এবং চীনে আফিম চাষে উৎসাহদানের পিছনে মতলব যাই থাকুক না কেন, ভারতের ভবিষ্যত সম্ভাবনা অন্ধকারই মনে হচ্ছিল। কলকাতার মুখ্য আফিম

ব্যবসায়ীরা মন্দা বাজারের আশঙ্কা করছিলেন।[১৪২] কলকাতার ব্যবসায়ী মহলে হ্রাসের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল যদিও আফিমের বিক্রি লক্ষ্যণীয়ভাবে কমে নি।[১৪৩] Argyll Mayo-কে বলেছিলেন "এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে চীনের আফিম সংক্রান্ত পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নতুন এবং আফিম নিয়ে হ্রাস মাঝে মাঝেই দেখা দেয় এই পুরানো ভারতীয় প্রবাদ প্রযোজ্য হচ্ছে না।"[১৪৪] বস্তুতঃ মনে হচ্ছে ভারত সরকার "ভারতীয় অর্থ-বিষয়ক ব্যাপারে কঠিন অবস্থায় পড়তে যাচ্ছে (কারণ) আফিমকে এত খারাপ কখনও দেখা যায় নি।"[১৪৫]

চীনা আফিম এত জনপ্রিয় হল তার প্রধান কারণ অত্যন্ত সস্তা হওয়া। একেবারে অভ্যন্তরে, আফিম উৎপাদনের কেন্দ্রগুলির কাছাকাছি, বিদেশী আফিমের দর অত্যন্ত বেশি হত কারণ বন্দর থেকে অভ্যন্তরে আসতে গিয়ে তার অনেক চলাচল শুল্ক দিতে হত। "চুক্তিবদ্ধ বন্দরগুলিতে (Treaty Ports) দেশীয় (আফিমের) দর বিদেশী আফিমের দরের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, আর এই দরে তারা ন্যায্য শর্তে প্রতিযোগিতা করে। হ্যাঙ্কাওতে যেখানে দেশীয়ের পক্ষে দরের তফাত এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি, সেখানে দেশীয়েরই সুবিধা হয়। একেবারে অভ্যন্তরে......বিদেশীর দাম বেশি (নানাবিধ চলাচল শুল্ক দিতে হবার দরুন), আর দেশীয়ের সুবিধা হয়।"[১৪৬] কিন্তু সস্তা চীনা আফিম বারাণসী বা বংলার আফিমের চেয়ে অনেক নিরেস জাতের। ১৮৭১ সালে চীনের আফিমের নমুনা বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছিল যে মরফিয়ার পরিমাণ, স্বাদ ও গন্ধের দিক থেকে বাংলার ও বারাণসীর আফিম উচ্চতর গুণসম্পন্ন। তবে চীনা আফিম পাইপের মধ্যে অনেক বেশিক্ষণ টিঁকত এবং ছাই থেকেও দ্বিতীয় বার ধূমপান করা যেত, সেই কারণেই দরিদ্রতর শ্রেণীগুলি ভারতীয় আমদানির চেয়ে সেইগুলিই পছন্দ করত বেশি।[১৪৭] এ কথা বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে যাদের দামী ভারতীয় আফিম কেনার সামর্থ্য ছিল তারা সেই আফিমই ব্যবহার করতে থাকবে।[১৪৮] উপরন্তু চীনা উৎপাদন অনেকটা হলেও চাহিদার তুলনায় ঢের পিছিয়ে থাকত, চাহিদাও ক্রমাগত বাড়ছিল।[১৪৯] বস্তুতঃ হংকং-এর ব্রিটিশ কন্সালের আন্দাজ অনুযায়ী দেশীয় আফিমের বর্ধিত ব্যবহার ভারতীয় ব্যবসায়ের উপর হয়তো অনুকূল প্রভাবই ফেলতে পারত, কারণ চীনা মাদকের সস্তা দর "ধূমপায়ীদের সংখ্যা বাড়ায়, আর একবার মাদকের

স্বাদ পেয়ে গেলে (তারা) শেষ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ যা যোগাড় করতে পারে তার দিকেই ঝোঁকে, তা অবশ্যই ভারতীয় আফিম।"[১৫০] চীনের সরকারি মনোভাব সম্পর্কে ১৮৭১ সালে কন্সাল লিখেছিলেন : "স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট-দের কাছ থেকে অবশ্য দানাশস্য চাষ করার জন্য, আফিম ছেড়ে অপেক্ষাকৃত প্রয়োজনীয় ফসল ধরার জন্য লোককে উপদেশ দিয়ে ঘোষণা অবিরতই বেরোচ্ছে, কিন্তু কর্মকর্তারাই যেহেতু প্রধান মাদক ব্যবহারকারী, উপরন্তু তা থেকে উল্লেখযোগ্য রাজস্ব পান, এই সব ঘোষণা কেবল চাষীদের কাছ থেকে আরও অর্থ আদায় করে নেওয়ার জন্যই ব্যবহৃত হয়।"[১৫১]

Sir Rutherford Alcock একটা বেশ চতুর পরিকল্পনা উপস্থিত করলেন। তিনি মনে করলেন চীন সরকার চীনে আফিম উৎপাদন সীমিত করতে রাজী হবে যদি ভারত সরকার চীনে রপ্তানি সীমাবদ্ধ করে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে প্রস্তুত হয়। ১৮৭০ সালে Alcock এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন।[১৫২] সে বছরে চীনের আফিম পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য তিনি স্বয়ং ভারতে আসেন। Mayo-র মত হল যে এ রকম একটা ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, কিন্তু তাঁর সন্দেহ ছিল যে চীনারা সত্যিই এ রকম একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে রাজী আছে কিনা।[১৫৩] Argyll Mayo-র সঙ্গে একমত ছিলেন : "তিনি (R. Alcock) আমাদের অনুরোধ করছেন চীন সরকারকে এ কথা জানাতে যে আমরা অন্ততঃ উৎপাদন 'স্বাভাবিক-ভাবে কমানোর কর্মনীতি বিবেচনা করতে রাজী আছি। এই বিষয়ে তারা আমাদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিতে পারে তা রাখবে বলে কতটাই বা তাদের আমরা বিশ্বাস করতে পারি, আর আমার ভয় যে রাখবার কতটা ক্ষমতাই বা তাদের আছে তাতেও সন্দেহ। অপর দিকে আমরা আমাদের উৎপাদন সীমিত করতে রাজী হলে তারা যদি সত্যিই দেশীয় উৎপাদন নিরুৎসাহিত করে, তা হলে সেই মর্মে কিছু বাধ্যবাধকতায় আসা আমাদের পক্ষে হয়তো শ্রেষ্ঠ পথ হতে পারে।"[১৫৪] Argyll উল্লেখ করেন যে "চীন সরকার আমাদের সঙ্গে মাঝামাঝি এসে মীমাংসা করতে ইচ্ছুক হবে" এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।[১৫৫] উপরন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ভয় পেলেন যে ভারতীয় আফিম রপ্তানি যদি কমিয়ে দেওয়া যায় তা হলে এতদিন ভারতীয় আফিমের সঙ্গে যেসব বিদেশী উৎপন্ন প্রতিযোগিতায় সুবিধা করতে পারে নি তারা এসে ফাঁকটা ভরিয়ে দেবে। ভারত যদি তার আফিম রপ্তানি

কমায় বা বন্ধ করে দেয় তা হলে সে বস্তুতঃ "যে লক্ষ লক্ষ (মুদ্রা) আমরা এখন হিন্দুস্তানের জনগণের কল্যাণের জন্য ব্যয় করছি তা পারসিকদের, আমেরিকানদের বা অন্য কারও হাতে তুলে দেবে।"[১৫৬] কাজেই Mayo তড়িঘড়ি কোনও চুক্তিতে আবদ্ধ হতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সর্বোপরি এ ব্যাপারে কোনও "ভাবপ্রবণতা"র তিনি বিরুদ্ধে ছিলেন ঃ "আমরা যদি চীনাদের বিষাক্ত করার পাপ থেকে মুক্তি পেতে চাই তা হলে তা কেবল অতি মন্থর প্রক্রিয়াতেই করা যায়।"[১৫৭] Alcock-এর পরিকল্পনা শিকেয় তোলা হল এই সব বিবেচনা থেকেই—চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চীনাদের ইচ্ছুক থাকা সম্বন্ধে সন্দেহ, নিজেদের ঘোষিত নীতি কার্যকর করতে চীন সম্রাটের সরকারের অক্ষমতা, ভারতের প্রতিযোগীদের কাছে চীনের বাজার সমর্পণের অনিচ্ছা। উপরন্তু এ কথাও বোঝা গিয়েছিল যে এখনও বহু বছর ভারতীয় আফিম চীনে টিঁকে থাকতে পারবে—ভারতীয় আফিম উচ্চ জাতের, চীনে মোট ব্যবহার দ্রুত বাড়ছিল এবং চীনের সরকার দেশীয় উৎপাদন বন্ধ করতেও যেমন অক্ষম ভারতীয় আফিমকে হটিয়ে দিতেও তেমনি অক্ষম। বস্তুতঃ ১৮৬০ সালের শেষদিকে আফিম রাজস্ব আশু বিপদের সম্মুখীন বলে যে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল তা যদি মিথ্যা ত্রাস না হয়েও থাকে, তা হলেও অপরিণত বটে।

॥ ৩ ॥

শুল্ক কর্মনীতির (tariff policy) পিছনে পরিচালক নীতি ছিল এই যে বহির্বাণিজ্যের উপর শুল্ক কেবল রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে এবং শুল্ক কোনও মতেই রক্ষামূলক চরিত্রের হতে পারবে না। তুলোর তন্তু ও সুতোর উপর থেকে আমদানি শুল্ক কমানোর ঘোষণা করে Samuel Laing যেমন বলেছিলেন "অবাধ বাণিজ্যের নীতি হল কেবল রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে কর ধার্য করা", এবং বহিঃশুল্কের দ্বারা কোনও মতে "সংরক্ষিত স্বার্থের বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা চলবে না।"[১৫৮] বস্তুতঃ "চড়া শুল্কের জোরে" ভারতে সুতোকল খোলা শুরু হচ্ছে শুনে Laing এমন আতঙ্কিত হয়েছিলেন যে তিনি ঘোষণা করেছিলেন "সুতো যদি কর ধার্যের পক্ষে উপযুক্ত বস্তু হয়

তা হলে দেশীয় (সুতো) তৈরির উপর একটা অন্তঃশুল্ক (excise duty) থাকা উচিত—তৈরী জিনিসের উপর বহিঃশুল্কের সমপরিমাণে।" সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে পাটের তৈরী জিনিসের উপর শুল্ক সম্বন্ধে ভারত সরকার যে বার্তা পাঠিয়েছিল তাতে এই নীতি আবার সুস্পষ্ট করে বিবৃত করা হয়েছিল ঃ "নিছক রাজস্বের উদ্দেশ্য ছাড়া ভারতে কোনও শুল্ক বসানো হয় না। আমাদের আমদানির উপর বহিঃশুল্ক নির্ধারণ করতে গিয়ে আমরা দেশীয় শিল্পোৎপাদকদের—সে চট, সুতো কি অপরাপর যে বস্তুরই হোক না কেন—রক্ষা করার ইচ্ছা দ্বারা সামান্যতম মাত্রাতেও প্রভাবিত হইনি।"[১৫৯] ব্রিটেনের শিল্পোৎপাদক স্বার্থগুলি অবশ্যই এই নীতি অনুমোদন করত, তবে ভারত সরকার সব সময়ে এই নীতি অনুযায়ী চলছে কিনা সে বিষয়ে তারা নিশ্চিন্ত বোধ করত না। অধীরভাবে তারা যুক্তি দিয়ে যাচ্ছিল সমস্ত শুল্ক রহিত করার পক্ষে ঃ ১৮৬২ সালে ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার অব কমার্স এবং ১৮৬৯ সালে ডাণ্ডি চেম্বার অব কমার্স ভারতে বিনা শুল্কে আমদানির সুবিধা দাবি করেছিল।[১৬০] ১৮৮২ সাল পর্যন্ত অবশ্য সমস্ত ভারতীয় আমদানি শুল্ক রহিতের আন্দোলন সফল হয় নি কারণ ভারতীয় সরকারের আর্থিক ঘাটতির ফলে ভারত সরকার বহিঃশুল্কের দরুন পাওনা মোটা রাজস্ব ছাড়তে অপারগ ছিলেন।

ব্রিটিশ শিল্পোৎপাদক স্বার্থসমূহ কেন যে ভারতীয় শুল্ক কর্মনীতির উপর এত সতর্ক নজর রাখছিল তা বোধগম্য। ল্যাঙ্কাশায়ারের শিল্পোৎপাদকদের পক্ষে ভারতই ছিল সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাজার। ইংল্যাণ্ড থেকে ল্যাঙ্কাশায়ারের তৈরী কাপড় ইত্যাদির মোট রপ্তানির ২৯.৭ শতাংশ ১৮৬০ সালে ভারতে এসেছিল, ১৮৭০ সালে এসেছিল প্রায় ২৮.৪ শতাংশ।[১৬১] বিদ্রোহোত্তর অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময়কার একটি অল্পকাল ছাড়া আলোচ্য পর্যায়ের গোটা সময়টাতে ব্রিটিশ কাপড় ইত্যাদির উপর অতি অল্প শুল্ক ছিল—৫ শতাংশ। ১৮৫৯-৬০ এবং ১৮৬১-৬২ সালের মধ্যবর্তী অল্প সময়ের জন্য এই শুল্ক বাড়িয়ে ১০ শতাংশ করা হয়েছিল। সুতীবস্ত্রের আমদানি নিয়মিত বাড়ছিল। ১৮৫৮/৫৯-১৮৬১/৬২ সালের মধ্যে সুতীবস্ত্রের গড় বাৎসরিক আমদানি ছিল ৮৯ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড মূল্যের। ১৮৬২/৬৩-১৮৬৬/৬৭ সালের মধ্যেকার পাঁচ বছরে এই অঙ্ক ছিল ১ কোটি ৮ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড এবং ১৮৬৭/৬৮-১৮৭১/৭২

সালের মধ্যে ছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড।[১৬২] ব্রিটিশ তুলোর তন্তু ও সুতোর ক্ষেত্রে শুল্ক ছিল ১৮৫৯-৬০ সালে ৫ শতাংশ, ১৮৬০-৬১ সালে ১০ শতাংশ ১৮৬১-৬২ সালে ৫ শতাংশ এবং ১৮৬২-৬৩ সালের পর থেকে ৩½ শতাংশ। পাকানো সুতো ও অন্যান্য সুতোর গড় বাৎসরিক আমদানির মূল্য ছিল ১৮৫৮/৫৯-১৮৬২/৬৩ সালের মধ্যবর্তী পাঁচ বছরে ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড (২ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড ওজনের), ১৮৬৭/৬৮-১৮৭১/৭২ সালের মধ্যে এটা বেড়ে বাৎসরিক গড় দাঁড়িয়েছিল ২৮ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড (৩ কোটি ১৪ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড ওজনের)। ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার অব কমার্সের সতর্ক দৃষ্টির কল্যাণে ভারতে ল্যাঙ্কাশায়ারের বাণিজ্য নিয়মিত বাড়ছিল, আর বহিঃশুল্কও অল্প ছিল।

Redford মন্তব্য করেছেন "১৮৫৮ সাল থেকে প্রায় বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে ল্যাঙ্কাশায়ারের বাণিজ্যে ভারতীয় আমদানি শুল্কগুলিই সব চেয়ে বড় বিপদস্বরূপ (অন্ততঃ ম্যাঞ্চেস্টারের চেম্বার অব কমার্সের মত অনুযায়ী)"[১৬৩] ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থকে ভারত সরকারের শুল্ক কর্ম-নীতির চেয়ে ঢের বেশি করে যা বিপন্ন করেছিল এবং যাকে প্রভাবিত বা প্রতিরোধ করা ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার অব কমার্সের পক্ষে কঠিন হচ্ছিল, সে বিপদ হল ভারতীয় বয়ন শিল্পের বৃদ্ধি। বম্বে প্রেসিডেন্সিতে ১৮৫৯ সালে দুটি কাপড়ের কল ছিল, একটি শুরু হয়েছিল ১৮৫৩ সালে, অপরটি ১৮৫৪ সালে। ১৮৭৪ সালের মধ্যে বম্বে প্রেসিডেন্সিতে সুতোকলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৪টিতে, তাদের মোট মূলধন ছিল ১৯ কোটি ৭৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, তকলি ছিল ৪ লক্ষ ৩৫ হাজারের উপর, আর তাঁত ছিল ৪,৮৮৩ ; তাদের মাসিক উৎপাদন ছিল ২৬ লক্ষ ১৪ হাজার পাউণ্ডের উপর সুতো এবং ১২ লক্ষ ৩০ হাজার পাউণ্ডের উপর কাপড়।[১৬৪] কলকাতায় ছিল ৬টি কল (১ লক্ষ ৭ হাজার ১৩০টি তকলি এবং ২০০ তাঁত), এবং উত্তরের দিকে ছিল ৪টি কল (৫৮ হাজার ৮৮২টি তকলি ও ৩৮৭টি তাঁত)। অর্থাৎ মোট ২৪টি কল ছিল যাদের তকলির সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ১ হাজার ৭৩৮ এবং তাঁতের সংখ্যা ৫,৪৬০। কলে সুতো ও কাপড় প্রস্তুত শিল্প অবশ্য তখনও নিতান্ত শিশু শিল্প ছিল, তখনও পর্যন্ত ম্যাঞ্চেস্টারের ভারতে বা অন্য কোনও বাজারের সঙ্গে বাণিজ্যকে সে বিপন্ন করছিল না।

১৮৫০ সাল পর্যন্ত কুটির শিল্প যদিও অনেক দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, তবু গ্রামীণ জনসংখ্যা একটা বড় অংশকে তখনও কাপড় সরবরাহ করছিল। কলকাতার চেম্বার অব কমার্স ১৮৬৩ সালে সরকারকে অনুরোধ করেছিল উত্তর ভারতের তুলো বয়ন শিল্পের অবস্থা সম্বন্ধে একটা জরীপ করার জন্য। সর্বদাই ইংরাজ বণিকদের আশঙ্কা যে "ম্যাঞ্চেস্টারের মালের জন্য যা দাম দেওয়া হয় তার চেয়ে কম খরচে ভারতে কাপড় তৈরি হবার অবকাশ আছে, এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ থেকে যে অত্যন্ত দুর্বল চাহিদা আসে ব্যাপকতর পরিসরে স্থানীয়ভাবে তৈরি হওয়াই তার কারণ।"[১৬৫] ১৮৬৩-৬৪ সালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে, অযোধ্যা, বাংলা ও মধ্যপ্রদেশ-সমূহে জেলার কর্মকর্তারা একটা ব্যাপক তদন্ত করেন তদন্তে ধরা পড়ে যে তুলোর দর বৃদ্ধির দরুন (আমেরিকার গৃহযুদ্ধ যখন ল্যাঙ্কাশায়ারে 'তুলোর দুর্ভিক্ষ' সৃষ্টি করেছিল এবং ভারত থেকে তুলো রপ্তানিতে তেজীভাব এনেছিল সেই সময়ে) ভারতীয় তাঁতীরা কাঁচামাল কিনতে অসমর্থ হয়েছিলেন এবং আমদানি কাপড়ের চেয়ে অনেক কম দামে নিজেদের মাল নিতেও পারেন নি। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে দেশীয় তুলো বয়ন শিল্প "ক্রমাগত অধঃপতিত হচ্ছিল—এতদিন যাঁরা কাজ করছিলেন তাঁরা শিল্পের অপরাপর বিভাগের চালু উচ্চতর মজুরির দ্বারা আকৃষ্ট হচ্ছিলেন ; ·· ···দেশে তৈরী অপেক্ষাকৃত মোটা জিনিসের দাম ইংল্যাণ্ডের জিনিসের চেয়ে নাকি বৃহত্তর অনুপাতে বেড়েছিল— পূর্বোক্ততে বৃদ্ধি হয়েছিল ২০০ থেকে ৩০০ শতাংশ এবং শেষোক্ততে মাত্র ১৫০ থেকে ২০০ শতাংশ।"[১৬৬] উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির পশ্চিমী জেলাগুলিতে এক-ষষ্ঠাংশ কিংবা এক-চতুর্থাংশ তাঁত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আর পূর্বের জেলাগুলিতে "ব্যবসা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল", এক-তৃতীয়াংশ কিংবা অর্ধেক তাঁত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[১৬৭] "তাঁতীরা কৃষি সংক্রান্ত অথবা অপরাপর শ্রমের, লোকের বাড়তি কাজ করার, মরিশাস বা অন্যান্য জায়গায় চলে যাওয়ার এবং এমন কি ভিক্ষারও আশ্রয় নিয়েছিলেন।[১৬৮] অযোধ্যা, বিহার ও বাংলার জেলাগুলিতে এবং মধ্য প্রদেশগুলিতেও অবস্থা এই রকমই ছিল। বয়ন (সমৃদ্ধ তুলো উৎপাদক অঞ্চলগুলিতে বাড়িতে ব্যবহারের জন্য ছাড়া) খুব কমে গিয়েছিল কারণ তাঁতীরা তৎকালে চালু চড়া দরে তুলো কিনতে ও লাভ রেখে বিক্রি করতে পারতেন না।[১৬৯] প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও

এই কুটির শিল্প যে টিঁকে ছিল তার অন্যতম কারণ হল যে এর তৈরী জিনিস গ্রামীণ ক্রেতাদের উপযুক্ত ছিল। দেশীয় বয়ন কি ভাবে টিঁকে ছিল সে প্রশ্নের "উত্তর এই যে এ দেশে রপ্তানির জন্য তৈরী ইংল্যাণ্ডের কাপড়ের চেয়ে দেশীয় কাপড় অপেক্ষাকৃত শক্ত, দৃঢ় ও টেঁকসই ছিল এবং শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির কঠোর ও বাড়ীর বাইরের কাজের পক্ষে অপেক্ষাকৃত উপযুক্ত ছিল। মেহনতী মানুষ......অপেক্ষাকৃত হাল্কা ও যন্ত্রে বোনা মিহি ইংল্যাণ্ডের কাপড়ের চেয়ে এই কাপড় কেনা আর্থিক দিক থেকে অধিকতর সুবিধা-জনক......মনে করেন......।"[১৭০] তবে আশা করা হত যে ব্যবহারের অভ্যাস বদলাতে পারে এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের কলগুলি দেশীয় কাপড়ের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কাপড় তৈরি করতে পারে ও তা সস্তা দরে বিক্রি করতে পারে। Sir Charles Travelyan ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন : "যখন ম্যাঞ্চেস্টার আবার কাজ শুরু করবে সে তার প্রাক্তন প্রতিদ্বন্দ্বী স্থানীয় বয়ন শিল্পীকে অপ্রত্যাশিতভাবে নগদ টাকার খরিদ্দারে পরিণত হতে দেখতে পাবে।" বেশিরভাগ তাঁতী ফের জমি চাষ করতে লেগে গিয়েছিলেন। "আমাদের নিজেদের তাঁতীদের মতই এখানকার বেশিরভাগই আগে আধা-কৃষক ছিলেন, তাঁরা যে কৃষিজীবী শ্রেণীর মধ্যে এখন মিশে গেল এটা ইংল্যাণ্ড ও ভারত উভয়ের পক্ষেই উপকারী হয়েছে। ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা এমন চমৎকার, কৃষি সর্বদাই তার প্রধান শিল্প হয়ে থাকবে। সেই লক্ষের দিকে আর একটা বৃহৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।"[১৭১]

শেষোক্ত বিবৃতিটি একটা পরিচিত প্যাটার্নের চিন্তাধারার নমুনাস্বরূপ, এই চিন্তাধারা একটা সরল 'শ্রম বিভাগের' ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত—তাতে ভারত কাঁচামাল সরবরাহকারী, আর ইংল্যাণ্ডে তৈরী মালের উৎপাদক। ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের অধিকাংশের কাছে বাণিজ্যের যে প্যাটার্নটি স্বাভাবিক বলে মনে হত[১৭২] গভর্নর-জেনারেলের কাছে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের একটি দরখাস্তের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে তার আভাস পাওয়া যায় : "ওই সব দেশের (ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি) জলবায়ু, মূলধন ও শিল্প তাদের যা কম খরচে উৎপাদন করতে সমর্থ করে সেই সব তৈরী জিনিসের সঙ্গে এ দেশের যা উৎপাদনে বিশেষ সুবিধা আছে সেই সব প্রধান কাঁচামালের লাভজনক বিনিময়ের বাণিজ্য অবাধ হওয়া চাই।"[১৭৩] ইংল্যাণ্ডের শিল্পোৎপাদকদের কাছে ভারত কতকগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সরবরাহকারী হিসাবে বড়ই

পর্যবেক্ষণে ছিল বাজার হিসাবেও ততটাই ছিল। ১৮৬০ সালে ম্যানচেস্টার চেম্বার অব কমার্স ও কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন তথাকথিত কটন এম.পি.-দের সাহায্যে ভারত সরকারের উপর তুলোর সরবরাহ গড়ে তোলার জন্য এবং কাঁচামালের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত (বিশেষ করে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে) ল্যাঙ্কাশায়ারে অবাধ সরবরাহের পথে সমস্ত বাধা দূর করার জন্য চাপ দিচ্ছিল। বস্ত্র প্রস্তুতকারকরা কাঁচা পাট, শন ও মেস্তা সরবরাহেও আগ্রহান্বিত ছিল। James Wilson তাঁর প্রথম বাজেট বিবৃতিতে (১৮৬০ সালে) এই নীতি উপস্থাপিত করেছিলেন যে ইংল্যাণ্ডে যেসব কাঁচামাল ব্যবহৃত হত এবং যেগুলিকে বিদেশে অপরাপর দেশের উৎপন্নের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হত সেগুলির উপর যত কম সম্ভব কর ধার্য করা উচিত।[১৭৪] "আমদানি শুল্ক সম্বন্ধে সাধারণভাবে আপনারা যা কিছু বলতে পারেন তা হল এ দাম বাড়ায় এবং এ কর ব্যবহারকারীদের উপর (চাপে)। কিন্তু রপ্তানি শুল্কের ব্যাপারে......আপনাদের শুল্ক হয়তো জিনিসটাকে বিদেশী বাজার থেকে সম্পূর্ণ বের করে দেবে।" সে একটা বিরাট লোকসান হবে, কারণ চট, তুলো, শণ, চামড়া, পশম ইত্যাদি হল "ইউরোপের প্রধান শিল্পোৎপাদক দেশগুলির কাঁচামাল এবং এদের বাজার অসীম সম্প্রসারণে সক্ষম।" Wilson ঘোষণা করেন কাঁচামাল রপ্তানিতে উৎসাহ দান "আমাদের আভ্যন্তরীণ সম্পদ উন্নত করার শ্রেষ্ঠ উপায়।" এটাই রাজস্ব কর্মনীতির গৃহীত স্বতঃসিদ্ধ নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৬৫ সালে যখন Sir Charles Travelyan চট, পশম, চামড়া, রেশম, চা, কফি ও চিনির উপর রপ্তানি শুল্ক বসালেন সেক্রেটারি অব স্টেট ভারত সরকারকে এই মর্মে সতর্ক করেছিলেন যে এই সব শুল্ক "ভারত ও এই দেশের মধ্যেকার বাণিজ্যের উপর দুর্ভাগ্যজনক প্রভাব" সৃষ্টি করবে।[১৭৫] স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেলকে তিনি জানিয়েছিলেন যে তিনি প্রস্তাবিত রপ্তানি শুল্কগুলি মঞ্জুর করবেন না, যদিও এ এমন একটা কর্মধারা "যা সম্ভাব্য ঘাটতি মঞ্জুর করে।"[১৭৬] সেক্রেটারি অব স্টেট Charles Wood গভর্নর-জেনারেল Lawrence-এর কাছে একটা ব্যক্তিগত চিঠিতে লিখেছিলেন যে Travelyan-এর বাজেটে ভারতে আয়কর রহিত করা এবং রপ্তানি শুল্ক বসানো ভুল হয়েছিল; তিনি লিখেছিলেন যে ভারত সরকার যে সিদ্ধান্ত করেছে "এই (আয়) কর তুলে নিতে এবং ইংরেজ বাগিচা মালিক ও ইংরাজদের বাণিজ্যের উপর চাপাতে......" তা

দুর্ভাগ্যজনক।[১৭৭] যে বাগিচা মালিকদের কথা উল্লেখ করা হল তাঁরা ছিলেন কফি ও চা শিল্পে ইংরেজ পুঁজিপতিরা : ১৮৬০ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় মূলধন আকর্ষণের একটা উপায় হিসাবে তাঁদের বিনা শুল্কে রপ্তানি করতে অনুমতি দেওয়া হত। এ কথা বলা কঠিন যে অনুরূপ বিবেচনাই কাঠ, কয়লা ও লোহা সম্বন্ধীয় কর্মনীতিকেও প্রভাবিত করেছিল কিনা : বার্মার কাঠ ব্যবসায় ও ভারতের কয়লা খনিতেও উল্লেখযোগ্য ইংরেজ মূলধন ছিল। কাঁচা কাঠ ও তৈরী কাঠ (১৮৬০) এবং কয়লা ও লোহা (১৮৬২) শুল্ক মুক্ত তালিকায় (free list) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।[১৭৮]

আভ্যন্তরীণ সম্পদ উন্নত করার কর্মনীতির অংশ হিসাবে বিশেষ করে খনিজ সম্পদ উদ্ধার করা, কৃষি উৎপাদন ও কৃষিজ দ্রব্যের প্রাথমিক প্রস্তুতকরণ (processing) এবং আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কর্মনীতির অংশ হিসাবে ইউরোপ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানিতে উৎসাহ দেওয়া হল। ১৮৪৫ সালের গোড়াতেই ভারত সরকার স্টীমারের কাঠামোর জন্য প্লেট, লোহা এবং নানারকমের যন্ত্রপাতিকে শুল্ক মুক্ত করার সিদ্ধান্ত করেছিল। ১৮৫৭ সালে ভারত সরকার স্টীমারের জন্য প্লেট লোহার ক্ষেত্রে ও কেবল কৃষি, নৌ-পরিবহন, খনি ও শিল্পোৎপাদন এবং নতুন নির্মীয়মান রেলপথের প্রয়োজনে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রেই শুধু শুল্ক ছাড়ের ব্যবস্থা রেখে এক নির্দেশ জারি করল।[১৭৯] ১৮৫৯ সালের ৭ নং আইন নিম্নোক্ত ধারায় রচিত ছিল : উপরোক্তভাবে নির্দিষ্ট ছাড় দেওয়া যন্ত্রপাতি ছাড়া অন্যান্যগুলির উপর একটা শুল্ক (মূল্যানুসারে ১০ শতাংশ) ধার্য থাকবে। ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত গোটা সময়টাতে উপরোক্ত নিয়মই সাধারণভাবে চালু ছিল—কেবল ১৮৬০-৬২ সালের মধ্যে একটা অল্প সময়ে সমস্ত যন্ত্রপাতিই শুল্ক মুক্ত ছিল ; ১৮৬৩-৬৪ সালে এই শুল্ক কমিয়ে ৭½ শতাংশ করা হয়েছিল। ১৮৬৭ সালে ভারত সরকার যন্ত্রপাতি আমদানির উপর তার শুল্কনীতির পর্যালোচনা করল। দেখা গেল যে কৃষি, খনি ও অপরাপর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শুল্ক আইন অনুযায়ী শুল্কযোগ্য যন্ত্রপাতিকে তফাত করা কঠিন। সরকার সমস্ত রকম যন্ত্রপাতিকেই শুল্ক মুক্ত করার সিদ্ধান্ত করল কারণ সেগুলি "সবই দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধির পক্ষে অল্পবিস্তর সহায়ক উদ্দেশ্যেই আমদানি হয়।"[১৮০]

কতকগুলি পণ্যের ব্যাপারে শুল্ক সম্পর্কিত কর্মনীতির উপর বিশেষ

মন্তব্যের প্রয়োজন। অত্যধিক শুল্ক ধার্যের দরুন ষাটের দশকের গোড়ায় ভারতের শোরা ব্যবসা বস্তুতঃ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় রপ্তানি শুল্ক প্রতিযোগিতামূলক দরে ইউরোপে শোরা বিক্রি অসম্ভব করে তুলেছিল, এবং কৃত্রিম শোরা উৎপাদনের কৃৎকৌশলের বিকাশ শেষ আঘাত দিয়ে সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়েছিল। শোরা রপ্তানি ১৮৬২-৬৩ সালে ২০,২৫৩ টন থেকে নেমে ১৮৬৩-৬৪ সালে ১৬,৮০৫ টনে দাঁড়িয়েছিল, আর ১৮৬৪-৬৫ সালে ১১,০৪৩ টন হয়েছিল। ১৮৬৫ সালে শুল্ক হ্রাস করা সত্ত্বেও রপ্তানি কমতেই থাকল। সেক্রেটারি অব স্টেট অনুমান করেছিলেন যে এ ঘটনার প্রধান কারণ ছিল "ইউরোপে নতুন তৈরী জিনিসের সঙ্গে তৎকালে কষ্টকর প্রতিযোগিতায় রত মোটা শুল্কওয়ালা ভারতীয় জিনিসের অক্ষমতা।"[১৮১]

বাংলা ও মাদ্রাজ থেকে আফ্রিকায় ও এসিয়ায় রপ্তানির জন্য তুলোর উপর অল্প কিছু শুল্ক দিতে হত, ১৮৫৯ সালে তুলোকে শুল্ক মুক্ত-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হল। ১৮৫৬/৫৭-১৮৬০/৬১ সালের মধ্যে গড়ে ৩০ কোটি পাউণ্ড রপ্তানি হয়েছিল, গড় দাম ছিল প্রতি পাউণ্ড ৫ পেন্সের কম। আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সময়ে দাম দ্রুত বেড়ে গেল (১৮৬৪-৬৫ সালে ১৭ পেন্সে উঠল)। রপ্তানি ক্রমে ক্রমে বেড়ে ১৮৬৫-৬৬ সালে ৮০ কোটি পাউণ্ড হল। ১৮৬৫ সাল থেকে দর পড়তে শুরু করল, ১৮৬৬-৬৭ সালে দর ছিল পাউণ্ড পিছু ৯½ পেন্স, ১৮৭০-৭১ সালে দাঁড়াল ৬½ পেন্স। তুলোর তেজীভাব একটা সাময়িক ঘটনা ছিল, আর যেই আমেরিকার গৃহযুদ্ধ থেমে গেল ল্যাঙ্কাশায়ারে ভারতীয় চাহিদা পড়ে গেল এবং বাজারে দারুন মন্দা দেখা দিল। বস্তুতঃ পঞ্চাশ বছর ধরে উন্নয়নের চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয় তুলো আমেরিকান তুলোর চেয়ে নিকৃষ্ট ছিল, আমেরিকান তুলোর আঁশ অপেক্ষাকৃত লম্বা হত। পাট রপ্তানির ব্যাপারে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময়ে রাশিয়ার শণ সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় একটা নতুন সুযোগ এল। রপ্তানি ১৮৬০-৬১ সালে ৪ লক্ষ ৯ হাজার পাউণ্ড মূল্যের থেকে ১৮৭০-৭১ সালে ২৫ লক্ষ ৭৭ হাজার পাউণ্ড মূল্যে উঠল। স্কটিশ ব্যবস্থাপনায় কলকাতার কাছে গড়ে ওঠা চট শিল্প বিদেশের বাজারে—অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাণ্ডির সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু করল।[১৮২]

পাটের তৈরী জিনিসের উপর ৭½ শতাংশ আমদানি শুল্ক ছিল। ১৮৬৯ সালে ডাণ্ডি চেম্বার অব কমার্স আণ্ডার সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে এ বিষয়ে বিবেচনার জন্য অনুরোধ করল: "৭½ শতাংশ আমদানি শুল্ক কেবল রাজস্বের জন্য আদায় করা হয় না, দেশীয় শিল্পের একটা রক্ষামূলক ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায়, ভারতে অনুরূপ তৈরী জিনিসের সঙ্গে ডাণ্ডিকে প্রতিযোগিতা করতে বাধা দেয় এবং সেই সঙ্গে ভারতের শিল্পোৎপাদকদের সুযোগ দেয় ডাণ্ডির শিল্পোৎপাদকদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিযোগিতা করতে।...... ডিরেক্টররা (ডাণ্ডি চেম্বার অব কমার্সের) বিশ্বাস করেন...... পাটের তৈরী জিনিস ভারতে নিয়ে যাওয়ার উপর আমদানি শুল্ক তুলে নেওয়া হবে।"[১৮৩] ভারতীয় চট শিল্পকে রক্ষা করার কোনও উদ্দেশ্য আছে এ কথা ভারত সরকার অস্বীকার করল এবং স্বীকার করল যে পাটের তৈরী জিনিসপত্রকেও ন্যায্যভাবে সুতোর তৈরী কাপড় ইত্যাদির সঙ্গে ন্যায়ত একই শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে এবং তারও উপর নিম্নতর হারে, অর্থাৎ ৫ শতাংশ হারে কর ধার্য করা যেতে পারে। স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল সেক্রেটারি অব স্টেটকে জানালেন যে এর পরে যখন শুল্ক হার সংশোধিত হবে তখন "পাটের তৈরী জিনিসপত্রের উপর শুল্ককে সুতীবস্ত্রের উপর শুল্কের সঙ্গে একইভাবে দেখার ন্যায্যতা" বিবেচনা করা হবে।[১৮৪] পাটের তৈরী জিনিসপত্রের উপর শুল্ক ১৮৭০ সালে একেবারে তুলে দেওয়া হল (১৭ নং আইন)।

খাদ্যশস্যের উপর রপ্তানি শুল্ক ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত মণ পিছু ২ আনা মাত্র ছিল। এই শুল্ক বাড়ানোর পক্ষে দুই দিকে যুক্তি ছিল: এতে রাজস্ব বেশি আসবে এবং জনসাধারণের প্রধান খাদ্য রপ্তানির নিয়ন্ত্রণের একটা উপায় হবে। এই বিষয়ের উপর একটি প্রশংসনীয় মন্তব্যে বাংলার লেফটেনান্ট গভর্নর লিখেছিলেন "এ একটা বাস্তব ও অনস্বীকার্য সত্য যে গত কয়েক মাসে বাংলায় ও উড়িষ্যায় হাজার হাজার গরীব মানুষ যখন অনাহারে ছিলেন ......তখন লক্ষ লক্ষ মণ খাদ্যশস্য লাভের বিনিময়ে বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে।...... এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ভারত দরিদ্র দেশ, আর যেসব দেশে শস্য রপ্তানি হচ্ছে তারা ধনী। ভারতের চাল তারা শুধু খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে না, শিল্পদ্রব্য তৈরির জন্যও ব্যবহার করে এবং বিলাস দ্রব্য হিসাবে তার দাম দেবারও সামর্থ্য রাখে, সে দাম ভারতে

দরিদ্রতর শ্রেণীগুলি—যাদের পক্ষে এ একটা সর্বোচ্চ ও জরুরী প্রয়োজন তাদের পক্ষে ভয়ঙ্কর।"[১৮৫] বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্নর মণ পিছু ৬ আনা শুল্কের প্রস্তাব করেন। বাস্তবিকই এর চেয়ে কম শুল্ক রপ্তানি বাণিজ্যের উপর কোনও প্রভাবই বিস্তার করতে পারত না এবং খাদ্যশস্য রপ্তানি ঠেকাতে পারত না। স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল অত্যন্ত কম শুল্ক বৃদ্ধি করার স্থির করলেন (২ আনা থেকে ৩ আনা)। মনে হয় এ সিদ্ধান্ত কেবল রাজস্ব বৃদ্ধির বিবেচনা দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল, রপ্তানি নিরুৎসাহিত করার যুক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি। বর্ধিত শুল্ক থেকে ভারত সরকার ১৬ লক্ষ টাকার রাজস্ব বৃদ্ধির আশা করেছিল এবং সেক্রেটারি অব স্টেটকে আশ্বস্ত করেছিল যে "এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে এত কম বর্ধিত শুল্ক রপ্তানির জন্য হাজির করা শস্যের সম্ভাব্য পরিমাণকে সামান্যতমও প্রভাবিতকরবে।"[১৮৬] শস্য রপ্তানিতে নিযুক্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির চাপে সরকারকে শুল্ক বৃদ্ধির অল্পকালের মধ্যেই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে হল। লিভারপুলের ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাশোসিয়েশন ও ভারতস্থ বণিকেরা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলেন।[১৮৭] খাদ্যশস্যের উপর শুল্কের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেক্রেটারি অব স্টেট মন্তব্য করলেন যে "দেশের সাধারণ স্বার্থের পক্ষে ব্যবসায়টা টিঁকিয়ে রাখা রাজস্ব বজায় রাখার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ—দুটি উদ্দেশ্য যদি পরস্পরে অসঙ্গতিপূর্ণ নাও হয় তবুও।"[১৮৮] ১৮৭৩ সালে গমের উপর রপ্তানি শুল্ক তুলে দেওয়া হল।[১৮৯]

১৮৬০-৬১ সালে ভারতের মোট রপ্তানির ২৮.১ শতাংশ ছিল বস্ত্র (সুতী, চটের, রেশমের ও পশমের); ১৮৭০-৭১ সালে এই রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩.৩ শতাংশ হল। চাল, অপরাপর শস্য এবং বীজও রপ্তানির উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল (১৮৬০-৬১ সালে মোট রপ্তানির ১৫.৫৭ শতাংশ এবং ১৮৭০-৭১ সালে ১৪.৪৩ শতাংশ)। বাগিচাজাত জিনিস যথা নীল, চা ও কফি ছিল ১৮৬০-৬১ সালে মোট রপ্তানির ৭.২ শতাংশ এবং ১৮৭০-৭১ সালে ৯.২৩ শতাংশ। ১৮৬০-৬১ সালে শিল্পজাত বা তৈরী জিনিস মোট রপ্তানির এক ক্ষুদ্র অংশ ছিল, যথা পাটজাত জিনিস ১.০৯ শতাংশ, শোরা ২.০১ শতাংশ, চিনি ২.৯৯ শতাংশ এবং তেল ০.৭৬ শতাংশ; ১৮৭০-৭১ সালেও পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয় নি।

১৮৬০-৬১ এবং ১৮৭০-৭১ সালে আমদানির গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র সংক্রান্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে বেশিরভাগ আমদানি জিনিস ছিল তৈরী শিল্পজাত জিনিস। ১৮৬০-৬১ সালে মোট আমদানির ৩৯·৬৩ শতাংশ এবং ১৮৭০-৭১ সালে ৪৬·৮২ শতাংশ ছিল সুতীবস্ত্র ইত্যাদি। সুতীবস্ত্র, তুলোর তন্তু ও সুতো, রেশমজাত জিনিস ও পশমজাত জিনিস মিলে ১৮৬০-৬১ সালে ছিল মোট আমদানির ৪৯·১৩ শতাংশ আর ১৮৭০-৭১ সালে ছিল ৬০ শতাংশ। যন্ত্রপাতি, রেলের মালমসলা এবং ধাতু (তৈরী অথবা পিণ্ড অবস্থায়) মিলে ১৮৬০-৬১ সালে ছিল মোট আমদানির ২০·৮১ শতাংশ আর ১৮৭০-৭১ সালে ছিল ১১·৩১ শতাংশ। কমার কারণ হল প্রথম চোটের পর রেলপথ তৈরিতে শিথিলতা। মাদক পানীয় দ্রব্যের অর্থাৎ মল্ট মদ, সুরা ও স্পিরিট ১৮৬০-৬১ সালে মোট আমদানির ১৫·৩ শতাংশ ছিল, আর ১৮৭০-৭১ সালে ছিল ৬·৯৩ শতাংশ। ১৮৭০ সালে ব্রিটেন ভারতীয় রপ্তানির ৫০ শতাংশ নিত এবং ভারতীয় আমদানির ৮০ শতাংশ সরবরাহ করত।[১৯০] শুল্ক নীতির সর্বোচ্চ নীতি ছিল কাঁচামাল সরবরাহে উৎসাহ দান। ১৮৮০-র দশকে উৎপন্ন জিনিসের উপর আমদানি শুল্ক কমানো অথবা একেবারে রহিত করার জন্য ব্রিটিশ শিল্পোৎপাদক স্বার্থগুলির চাপের কাছে ভারত সরকার বেশি নতিস্বীকার করেছিল। কেবল শিল্পনীতিই অবশ্য শিল্পজাত সামগ্রী প্রস্তুতকারক ইংল্যাণ্ড এবং কাঁচামাল সরবরাহকারী ভারতের মধ্যে বাঞ্ছিত "শ্রম বিভাগ" প্রতিষ্ঠা করতে পারত না। কিন্তু যে সমস্ত শুল্ক নীতি প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে দেশীয় শিল্পকে রক্ষামূলক ব্যবস্থা দিতে পারে তা সযত্নে পরিহার করা ভারত সরকারের কর্তব্য বলে গণ্য করা হত। Wilson ও Samuel Laing এইভাবেই কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। ১৯২০-র দশক পর্যন্ত এই কর্মনীতির ধারাবাহিকতা এবং শুল্ক নীতির আর কতকগুলি দিক আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি।

॥ ৪ ॥

লবণ শুল্ক ছিল সেই সব অপ্রত্যক্ষ করের (indirect tax) অন্যতম যা গরীবের উপর পড়ত। ভারত সরকারের সরকারি মুখপাত্ররা প্রায়ই দাবি

করতেন যে ভূমি রাজস্ব ছাড়া এই-ই একমাত্র কর যা জনসাধারণ সরকারকে দিতেন। এই যুক্তিতে আলোচ্য সময়ে এই শুল্ক ক্রমশঃ চড়াতে চড়াতে এমন এক স্তরে ওঠানো হল যেখানে লবণ শুল্ক রীতিমত পীড়াদায়ক হয়ে উঠল এবং লবণের ব্যবহারই কমিয়ে দিল। ১৮৫৯/৬০-১৮৬২/৬৩ সালের মধ্যেকার বছরগুলিতে এই উৎস থেকে গড় বাৎসরিক রাজস্ব ছিল প্রায় ৩.৮ কোটি টাকা : এ ছিল ভারতের মোট রাজস্বের প্রায় ১০ শতাংশ। ১৮৬৬/৬৭-১৮৭১/৭২ এই পাঁচ বছরের মধ্যে লবণ শুল্ক থেকে গড়ে. বাৎসরিক আয় ৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাকায় চড়ে গিয়েছিল, এ ছিল সমস্ত উৎস থেকে পাওয়া মোট বাৎসরিক রাজস্বের ১২ শতাংশ।

বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ব্যবস্থায় এই শুল্ক সংগৃহীত হত। বাংলায় লবণ রাজস্বের দুটি উৎস ছিল : প্রথমতঃ, বোর্ড অব রেভিনিউ কর্তৃক (সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তৈরি) লবণ বিক্রি ; দ্বিতীয়তঃ, লবণের উপর আমদানি শুল্ক। বাংলায় আর্দ্র জলবায়ু এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির নদীগুলি থেকে তাজা জল সমুদ্রে পড়ার দরুন এখানে ব্যাপকভাবে লবণ তৈরী হতে পারত না, তবে মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায় অনেকগুলি প্রস্তুত-কারক ছিল যাদের তৈরী লবণ সরকারি গুদামে জমা করা হত এবং বাংলায় বোর্ড অব রেভিনিউ কর্তৃক তৈরির খরচ এবং চালু আমদানি শুল্কের ভিত্তিতে স্থিরীকৃত একটা দামে বিক্রি করা হত।[১১১] ১৮৬৩ সালে বাংলার সরকারি নিয়ন্ত্রণে লবণ তৈরি তুলে দেওয়া হল : লবণ প্রস্তুতকারকদের আর দাদন দেওয়া হল না এবং বাংলায় লবণ তৈরি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল।[১১২] পাইকারি দর ৫০ শতাংশ কমে গেল, আমদানিকৃত বিদেশী লবণ অনেক সস্তা ছিল, কিন্তু লবণ তৈরির উপর যেসব লোকের জীবিকা নির্ভর করত তাঁদের জীবিকা গেল।[১১৩] ১৮৫৭-৫৯ সালে লবণের উপর আমদানি শুল্ক মণ পিছু ২ টাকা ৮ আনা ছিল। ১৮৫৯ সালে সরকার সারা ভারতে লবণ শুল্ক বাড়িয়ে দিল ; বাংলায় শুল্ক মণ পিছু ৩ টাকায় তোলা হল। ১৮৬১ সালে শুল্ক আবার বাড়িয়ে মণ পিছু ৩ টাকা ৪ আনা করা হল।[১১৪] Fawcett উল্লেখ করেছেন যে ১৮৭০ সালে আমদানি শুল্ক উৎপাদনের খরচের প্রায় ৭০০ শতাংশ ছিল। কিন্তু Sir Cecil Beadon বলেছিলেন যে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল "কোনও করের যুক্তিযুক্ততা লোকের বহন করার ক্ষমতা দিয়েই বিচার করতে হয়", এই রকম শতাংশের হিসাবের দ্বারা

নয়।[১৯৫] সরকার সম্ভবতঃ ব্রিটেনের প্রস্তুতকারক স্বার্থদের দ্বারাই প্রভাবিত হত। নর্থউইচের সল্ট চেম্বার অব কমার্স ব্রিটেন থেকে আমদানি করা লবণকে বিশেষ সুবিধা দিতে রাজী করানোর জন্য ভারত সরকারের উপর চাপ দিচ্ছিল।[১৯৬] চেশায়ারের লবণ ভারতে আমদানি করার ব্যাপারে তথাকথিত বাধা দূর করার জন্য নর্থউইচ চেম্বার সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছেও আবেদন করেছিল।[১৯৭] সরকার যদিও বাংলায় লবণ তৈরি বন্ধ করেছিল ভারতের জনগণের মধ্যে বিদেশী লবণ সম্বন্ধে কিছু বিরূপতা ছিল। বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত তাঁরা "ইংল্যাণ্ডের লবণের সঙ্গে মানিয়ে নিতে" পারেন নি।[১৯৮] ১৮৬২ সাল নাগাদ ভারত সরকার সন্তোষের সঙ্গে সেক্রেটারি অব স্টেটকে রিপোর্ট দিতে পারল যে ইংল্যাণ্ডের লবণ সম্পর্কে বিরূপতা কমে যাচ্ছে।[১৯৯] সরকারের মাথাব্যথা ছিল না রাজস্ব দেশীয় লবণ বিক্রি থেকে এল কি বিদেশী লবণের উপর আমদানি শুল্ক থেকে এল, কিন্তু বাংলার স্থানীয় উৎপাদকদের পক্ষে সরকারি লবণ এজেন্সি বন্ধ হয়ে যাওয়াটা সর্বনাশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[২০০]

বোম্বাইতে লবণ শুল্ক বাংলার থেকে অনেক অন্যরকম ছিল। সমুদ্রোপকূল ধরে সূর্যের তাপে যে লবণ তৈরি হত তার উপর একটা অন্তঃশুল্ক ছিল। প্রেসিডেন্সির উত্তরাংশে সরকারি মালিকানায় কয়েকটি লবণের কারখানা ছিল যেখান থেকে সরকার-নির্ধারিত দরে লবণ বিক্রি হত, এই দর নির্ধারিত হত তৈরির খরচ ও অন্তঃশুল্কের ভিত্তিতে। তবে বোম্বাই-এর তৈরী লবণের অধিকাংশ উৎপাদিত হত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিগত প্রস্তুতকারকদের দ্বারা এবং তা আভ্যন্তরীণ কাস্টমস বিভাগের তত্ত্বাবধানে ছিল। বোম্বাইতে অন্তঃশুল্কও অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে অনেক কম ছিল। ১৮৫৭-৫৯-এ হার ছিল মণ পিছু ১২ আনা মাত্র। ১৮৫৯ সালের আগস্ট মাসে বাড়িয়ে করা হল মণ পিছু ১ টাকা, আর ১৮৬১ সালের এপ্রিলে আবার আরও ৪ আনা বাড়ানো হল। ১৮৬৫ সালে ভারত সরকার বোম্বাই সরকারের পরামর্শ চাইল যে লবণের উপর অন্তঃশুল্ক আর বাড়ানো চলতে পারে কিনা ঃ বোম্বাই সরকার মনে করল "বিরোধিতা জাগিয়ে তোলার খুব বেশি ঝুঁকি ছাড়াই" শুল্ক বাড়ানো যায়, যদিও "গরীবের উপর করের বোঝা বাড়ানোর" চেয়ে ধনীর উপর কোনও এক রকম আয়করই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। ভারত সরকার শুল্ক বাড়িয়ে মণ পিছু ১ টাকা ৮ আনা করার ঠিক করল। ১৮৬৯ সালের

অক্টোবর মাসে শুল্ক আবার সংশোধিত হল এবং ৫ আনা করে বাড়ানো হল এইভাবে ১০ বছরের মধ্যে বোম্বাইতে লবণ শুল্ক ৮০ শতাংশ বাড়ল।[২০১]

মাদ্রাজের ব্যবস্থাটা ঠিক সরকারি একচেটিয়া কারবারের। স্থানীয় প্রস্তুতকারকদের দ্বারা সমুদ্রোপকূলে সূর্যের তাপে তৈরী লবণ একটা ঠিকা চুক্তির ভিত্তিতে সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হত, সরকার একটা বাঁধা দরে লবণ বিক্রি করত, আর আসলে লবণ বিক্রি থেকে একচেটিয়া মুনাফাই ছিল সেখানে লবণের উপর 'শুল্ক'।[২০২] লবণের বিক্রয় দর ক্রমে ক্রমে বাড়ানো হতে থাকল। ১৮৫৭-৫৯ সালে দর ছিল ১ টাকা, ১৮৫৯-৬০ সালে হল ১ টাকা ২ আনা, ১৮৬০-৬১ সালে ১ টাকা ৬ আনা, ১৮৬১-৬৪-তে ১ টাকা ৮ আনা, ১৮৬৫-৬৯ সালে ১ টাকা ১১ আনা, অবশেষে ১৮৬৯ সালে হল ২ টাকা। শুল্ক দ্রুত হারে বাড়ানোটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছিল কিনা সন্দেহজনক। কারণ বাঁধত দরে সঙ্কুচিত বাজারের কাছে বিক্রি করার বদলে সস্তা দরে অনেক বেশি লোকের কাছে বিক্রি করলে বোধ হয় লবণ শুল্কের রাজস্ব আরও বাড়ানো যেত। ভারত সরকার মাদ্রাজে লবণের দর বৃদ্ধি এই বলে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করার চেষ্টা করল যে সমস্ত প্রদেশে লবণ শুল্ক সমান করার পথে এ একটা পদক্ষেপ।[২০৩]

পাঞ্জাবের নিজস্ব লবণের খনি ছিল। সরকারি খনি থেকে লবণের বিক্রয় দর ছিল ১৮৫৭-৫৯ সালে ২ টাকা, ১৮৬০-৬১ সালে ২ টাকা ২ আনা, ১৮৬১-৬৯ সালের মধ্যে ৩ টাকা এবং ১৮৭০ সালের জুলাই মাসের পর থেকে ৩ টাকা ১ আনা। সম্বর হ্রদকে লবণ সরবরাহের উৎস হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল। Mayo সম্বরের হ্রদগুলি লীজ নেন; যোধপুরের রাজার উপর চুক্তি সম্পাদনের জন্য চাপ দেওয়া হয়।[২০৪]

লবণ শুল্কের হারে যেহেতু এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে তফাত ছিল কাজেই আভ্যন্তরীণ পাচার একটা সমস্যা ছিল। রাজস্ব আদায় এবং পাচার অথবা বেআইনী লবণ তৈরি বন্ধ করার জন্য লবণ বিভাগের মস্ত এক কর্মচারীদল ছিলেন। আভ্যন্তরীণ কাস্টমস কমিশনারের অধীনে থাকতেন ইউরোপীয় সহকারী কমিশনারগণ এবং বিভিন্ন দেশীয় কর্মকর্তাগণ, যথা সির কারকুন (যাঁরা অন্তঃশুল্ক নিতেন এবং লবণ কারখানার হিসাব পরীক্ষা করতেন), সাজেদার (যাঁরা লবণ ওজন করতেন এবং মজুতের হিসাব রাখতেন), দারোগা (পাচার নিরোধ বাহিনীর প্রধান), নাকেদা (দারোগার

সহকারী পিওন), ইত্যাদি। আভ্যন্তরীণ শুল্ক প্রাচীর পাহারা দেবার জন্যও একটা বড় কর্মচারী বাহিনী রাখা হত : প্রত্যেক কাস্টমস চৌকিতে তত্ত্বাবধায়ক সংগ্রাহকরা, দারোগারা, লাইন পাহারা দেবার জন্য দারোগা, কোটেগুশৎ ও জমাদাররা, আর 'রওয়ানা' বা ছাড়পত্র দেবার জন্য কেরানী ও মুন্সেফরা। ১৮৬৯ সালে সিন্ধু থেকে মাদ্রাজের মহানদী পর্যন্ত ২,৩০০ মাইল জুড়ে একটি শুল্ক প্রাচীর (customs barrier) ছিল, আর একটি ছিল বোম্বাইতে দোহাদ থেকে কচ্ছের রান পর্যন্ত ২৮০ মাইল জুড়ে। এই শুল্ক প্রাচীর চালু রাখার জন্য ১২,০০০ প্রহরী ও ছোটখাট অফিসাররা কাজ করতেন।[২০৫]

এ কথা অনুভূত হচ্ছিল যে অন্তর্দেশীয় শুল্ক প্রাচীর আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পক্ষে বাধাস্বরূপ ছিল এবং এর দরুন খরচ সরকারের উপর একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যতক্ষণ বিভিন্ন প্রদেশের শুল্কের হারের মধ্যে লক্ষ্যণীয় তারতম্য থাকছিল ততক্ষণ চোরাই চালান লাভজনক হচ্ছিল এবং শুল্ক ফাঁকি ঠেকানোও শক্ত হচ্ছিল। সেই কারণে সরকারের নীতি ছিল সকল প্রদেশের লবণ শুল্ককে সমস্তরে তোলা, লবণ শুল্কের সমতা আনার মধ্যে দিয়েই কেবল সরকারের পক্ষে প্রতিরোধক কর্মচারীদের বিরাট বাহিনীকে তুলে দেওয়া সম্ভব ছিল। সম্বর হ্রদের লীজ নিয়ে জয়পুর ও যোধপুরের সঙ্গে ভারত সরকারের সম্পাদিয় চুক্তির দরুন এই সব এলাকা থেকে ব্রিটিশ ভারতে লবণ যাওয়া ঠেকানোর জন্য এতদিন পর্যন্ত যে শুল্ক প্রাচীর রেখা চালু রাখতে হত ১৮৭৪ সালে তা ৮০০ মাইল কমানো সম্ভবপর হল।[২০৬] ১৮৭৭-৭৯ সালে রাজপুতনাব ও মধ্যভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির (আলোয়ার, ভাওয়ালপুর, ঝালোয়ার, কোটা, নরসিংগড়, রাজগড়, রাতলাম, ক্যাম্বে, টঙ্ক, ভূপাল, বরোদা, গোয়ালিয়র ইত্যাদি) সঙ্গে পর পর অনেকগুলি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল এই সব রাজ্যে লবণ তৈরি নিয়ন্ত্রণের জন্য।[২০৭] এ করতে পারার আগে পর্যন্ত এই সব রাজ্য থেকে ব্রিটিশ ভারতে লবণ চোরাই চালান বন্ধ কবার জন্য শুল্ক প্রাচীর রেখা বজায় রাখতে হত। লবণ শুল্কের সমতা আনয়নের কর্মসূচীতে শুল্কের হার সব সময়েই উঁচুর দিকেই সংশোধিত হত কারণ রাজস্ব কমানো সরকারের সইত না। বস্তুতঃ লবণ শুল্কের সমতা আনয়নের ইচ্ছা যতটা প্রবল ছিল, রাজস্ব বৃদ্ধির মতলবটাও ততটাই প্রবল ছিল।[২০৮]

লবণ শুল্ক ছিল একমাত্র অপ্রত্যক্ষ কর যা ব্যাপক জনগণের উপর পড়ত। বস্তুতঃপক্ষে এটা ছিল মাথাপিছু করের মত। সরকারি মত ছিল এই যে লবণ যেহেতু সার্বজনীন ব্যবহারের সামগ্রী কাজেই কর ধার্যের পক্ষে সে-ই সব চেয়ে উপযুক্ত, উপরন্তু এই কর যেহেতু ক্রেতা যে দর দিয়ে লবণ কিনতো তার মধ্যেই অপ্রত্যক্ষভাবে থাকত তাই সরাসরি কর ধার্য হলে লোকে যতটা প্রতিরোধ করত এক্ষেত্রে ততটা করত না। বস্তুতঃ সরকারের পক্ষে সংগ্রহের স্বাচ্ছন্দ্যই ছিল অপ্রত্যক্ষ করের পক্ষে সব চেয়ে জোরাল যুক্তি। কেবল লবণ নয়, দেশের কিছু কিছু অংশে চিনির উপরও শুল্ক ছিল; ১৮৬১-৬৩ সালে সরকার তামাকের উপর শুল্ক বসানোর কথা বিবেচনা করেছিল, কিন্তু এ পরিকল্পনা বর্জিত হল কারণ আফিমের মত সরকারি একচেটিয়া কারবার কিংবা তামাকের ব্যাপারী বা চাষীর উপর লাইসেন্স কর ধার্য করা কোনোটাই বাস্তবে চালু করা সম্ভব বলে মনে হল না।[২০৯]

লবণ করের মত অপ্রত্যক্ষ কর সহজে সংগ্রহ করা যায় এই কারণেই ভারত সরকারের উচিত ছিল লবণ শুল্ক বৃদ্ধির ব্যাপারে সতর্কভাবে এগোন। সেক্রেটারি অব স্টেট Argyll ভারত সরকারকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে লবণ কর "যাদের উপর পড়ছে তাদের কাছে ব্যাপারটা বোধগম্য বা অনুভূত না হয়েও (এ কর) অত্যন্ত ভারী ও অন্যায্য হতে পারে।"[২১০] মনে হয় লবণ শুল্ক লবণের ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছিল। ১৮৭০ সালের একটা হিসাব অনুযায়ী লবণের গড় ব্যবহার বাংলায় ৯ পাউণ্ডের কম, মাদ্রাজে প্রায় ১২ পাউণ্ড, বোম্বাইতে প্রায় ১৫ পাউণ্ড ছিল; ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে এই অঙ্কগুলি তুলনা করা যেতে পারে, ওই দুই জায়গার গড় বাৎসরিক ব্যবহার ছিল যথাক্রমে ২২ পাউণ্ড ও ১৮ পাউণ্ড।[২১১]

লবণ শুল্কের দ্বারা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন শ্রেণীগুলি সাধারণ মানুষের মত অতটা উদ্বিগ্ন হন নি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যারা যাতে আয়কর কমানো যায় বা রদ করা যায় তার জন্য সরকারকে লবণ কর বাড়াতে অনুরোধ করেছিলেন।[২১২] বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের মতও এই ছিল যে লবণ শুল্ক বাড়িয়ে আয়করের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাঁদের মতে লবণ শুল্ক "কৃষিজীবী ও অপরাপর শ্রমজীবী শ্রেণীর গড় বাৎসরিক আয় থেকে অতি সামান্য কেটে নেওয়া।"[২১৩] ভারত সরকার এ কথা উল্লেখ করেছিল যে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি শ্রেণীস্বার্থের দ্বারা

প্রবলভাবে প্রভাবিত। "এ প্রস্তাবটা হল যে শ্রেণী বস্তুতঃ কর থেকে ছাড় পেয়ে আছে সেই শ্রেণীর উপর থেকে একটা অতি লঘু ভার সরিয়ে নেওয়া; এবং আর একটা শ্রেণীর ঘাড়ে চাপানো যে শ্রেণী, যদি অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত নাও হয়ে থাকে তবু বর্তমান বণ্টন অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় খরচের বোঝার ন্যায্য অনুপাতের চেয়ে বেশিই বহন করে থাকে।"[২১৪] Richard Temple লিখেছিলেন, "একদিকে সারা ভারতে সম্পন্ন লোকেদের উপর বর্তাবে এমন একটা আয়কর এবং (অপরদিকে) গরীবের উপর বর্তাবে এমন লবণ শুল্কের মধ্যে আমি কোনও প্রকৃত বা ন্যায়সঙ্গত সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি না। সারা ভারতে ধনী আয়কর দাতাদের রেহাই দেবার জন্য বোম্বাই ও মাদ্রাজের গরীবদের উপর কর চাপানো যায়।"[২১৫]

॥ ৫ ॥

ভারত সরকার যে আয়কর ও অপরাপর প্রত্যক্ষ কর বসিয়েছিল তা থেকে মোট রাজস্বের অতি সামান্য অনুপাত (৫ শতাংশেরও কম) উসুল হত। তবে আয়করের নীতির নিজস্ব একটি আকর্ষণ আছে কারণ এই করটি ভারতে একটা নতুন ব্যাপার ছিল। উপরন্তু আয়করের প্রশ্নটি রাজস্ব সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক নীতির কতকগুলি ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সঙ্গে জড়িত ছিল।

James Wilson যখন ভারতে এলেন কর্তৃপক্ষ তখন প্রত্যক্ষ করের ধারণাটি নিয়ে কেবল নাড়াচাড়া শুরু করেছিলেন। মাদ্রাজের লাইসেন্স কর মোতুর্ফা ছাড়া তখন অন্য কোনও প্রত্যক্ষ কর ছিল না। বিগত কয়েক বছর ধরে লাইসেন্স করের ব্যাপারটি উঠছিল। ১৮৫৯ সালের ১৩ই আগস্ট Henry Harington ভারতে ব্যবসায় ও বৃত্তির উপর লাইসেন্স বসানোর জন্য একটা খসড়া আইন এনেছিলেন, কিন্তু পরিষদের ভিতরে ও বাইরে উভয় জায়গাতেই এই খসড়া আইনকে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, James Wilson না পৌঁছানো পর্যন্ত সেটা কোনও চূড়ান্ত ও গ্রহণযোগ্য রূপ নিতে পারে নি। Lord Canning Wilson-কে লিখেছিলেন যে লাইসেন্স করের উপর খসড়া আইনটি "এখনও যথাযথ রূপ নেয় নি",

আর Wilson এসে এই খসড়াকে সম্পূর্ণ বর্জন করার এবং লাইসেন্স কর ও আয়কর সংক্রান্ত দুটি পৃথক খসড়া আইন নতুন করে পেশ করার সিদ্ধান্ত করলেন।[২১৬]

Wilson-এর লাইসেন্স কর সংক্রান্ত খসড়া আইনের দুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমতঃ এই করটি এমন একটি শ্রেণীর উপর ছিল যাঁরা এতকাল করের আওতার বাইরে ছিলেন। এঁরা হলেন কারিগর, খুচরো ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী, ছোট ছোট শিল্পোৎপাদক, বৃত্তিতে নিযুক্ত লোক ইত্যাদি। Wilson-এর ধারণা হল যে এতকাল জমি থেকেই রাজস্বের একটা বিরাট অংশ আদায় করা হয়েছে অথচ অন্য যেসব শ্রেণী প্যাক্স ব্রিটানিকার (ব্রিটিশরাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শান্তি) অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করেন তাঁরা তাঁদের পুরো ভাগ বহন করেন না।[২১৭] লাইসেন্স কর এমনভাবে উদ্ভাবিত হয়েছিল যাতে এর বোঝাটা সেই সব শ্রেণীর উপর পড়ে যাদের অবস্থা কৃষিজীবীদের মত নয়, অর্থাৎ যাঁরা উল্লেখযোগ্য কোনও করভার থেকে মুক্ত। এই কর যে লোকেদের উপর বসবে তাঁদের অধিকাংশই আয়ের স্বল্পতাব দরুন আয়করের আওতার বাইরে থাকবেন।

দ্বিতীয়তঃ Wilson ক্রমবর্ধমান কর ধার্যের বিপক্ষে ছিলেন—"উচ্চ ও নীচ প্রত্যেক শ্রেণীর বণিকের উপরই একটি অল্প কিন্তু সমপরিমাণ লাইসেন্স শুল্ক ধার্য করা উচিত, কিন্তু ক্রমবর্ধমান হার করার চেষ্টা ব্যতিরেকে।"[২১৮] তিনটি গোষ্ঠী ছিল : প্রথমটি ছিল পাইকারি ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী শিল্পোৎপাদক, বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত শ্রেণীদের নিয়ে গঠিত, এঁদের উপর কর ছিল বছরে ১০ টাকা হারে। দ্বিতীয় গোষ্ঠীতে ছিলেন খুচরো দোকানি, ছোট ছোট শিল্পোৎপাদক যাঁরা স্থানীয় খুচরো বিক্রির জন্যই কাজ করতেন, তাঁদের উপর কর বছরে ছিল ৪ টাকা হারে। বাকিদের অর্থাৎ তাঁতী, চর্মকার, প্রভৃতি কারিগরের উপর করের হার ছিল বছরে ১ টাকা। Wilson সযত্নে কথাটা ধরিয়ে দেন যে এটা ক্রমবর্ধমান হারের কর নয়, কারণ এই কর আয়ের বা ব্যবসায়ের বা উৎপাদনের পরিমাণ নির্বিশেষে প্রতিটি গোষ্ঠীর সকলের উপর সমপরিমাণে প্রযোজ্য হবে।

লাইসেন্স করের উপর খসড়া আইন ১৮৬০ সালের ৪ঠা মার্চ প্রবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু প্রথম পাঠ থেকে পাস হওয়া পর্যন্ত প্রায় দেড় বছর লেগেছিল, এবং ১৮৬১ সালের জুলাই মাসে পাস হওয়া এই ১৮ নং আইন অনেক

বিষয়ে Wilson-এর আদি খসড়া থেকে পৃথক ছিল। সেই খসড়ার মত না হয়ে এই লাইসেন্স ট্যাক্স অ্যাক্ট একটা নিছক সাময়িক করের প্রবর্তন করল, এই আইনে পাস হওয়া করের হারও (৩ টাকা, ২ টাকা ও ১ টাকা) অনেক কম ছিল। নিজের পরিকল্পনার এই অংশের রূপায়ন দেখার জন্য Wilson জীবিত ছিলেন না।

লাইসেন্স করের খসড়া আইনের সঙ্গে একত্রে যে আয়করের খসড়া আইন উপস্থাপিত হয়েছিল তা অবশ্য পাস হল এবং জনসাধারণের মনোযোগ এই ব্যবস্থার দিকেই কেন্দ্রীভূত হল। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক চলতে লাগল : করযোগ্য আয়ের সর্বনিম্ন সীমা কি হওয়া উচিত? ক্রমবর্ধমান হারে করের নীতি কি গ্রহণ করা উচিত? কিছু বিশেষসুবিধা-ভোগী শ্রেণীকে কি আয়কর থেকে রেহাই দেওয়া উচিত? কর ধার্যের কি পদ্ধতি বের করা যায় যা লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে? শেষতঃ বিদ্রোহোত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কি এ রকম একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা চলে, না কি ভারতস্থিত ইংরাজদের সমালোচনা এবং দেশীয় শত্রুতার সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে বরং এটা স্থগিত রাখাই অধিকতর নিরাপদ হবে?

করযোগ্য আয়ের একটা উপযুক্ত সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করাটা Wilson-এর পক্ষে বেশ কঠিন হয়েছিল। Lord Canning-এর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্র থেকে মনে হয় যে তিনি গোড়ায় মনে করেছিলেন ১০০ টাকার উপর বাৎসরিক আয়কে করের আওতায় আনা উচিত। এই সীমা যুক্তিযুক্ত কিনা সে সম্বন্ধে Canning সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে কিছু জেলা বেছে নিয়ে সেখানে পরীক্ষা করে দেখা হোক ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে। "আমার মনে হয় যে করের চাপ নিম্নতর শ্রেণীর উপর পড়বে বলা হচ্ছে তার সর্বনিম্ন সীমা ১০০ টাকাব মত এত কম করার পক্ষে যাতে যুক্তি দেওয়া যায় এবং এতে কতখানি বিরূপতা সৃষ্টি করতে পারে তা যাতে আমরা হিসাব করতে পারি—এই উভয়ের জন্যই ওই খবরগুলি দরকার।"[২১৯] Lord Canning শেষ পর্যন্ত ১০০ টাকার সর্বনিম্ন সীমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত করলেন, Wilson-এর অর্থ-বিষয়ক বিবৃতি প্রদানের এক সপ্তাহ আগে Canning প্রস্তাব করলেন যে নতুন কর ধার্য আরম্ভ করতে ২০০ টাকা আয় একটা যুক্তিযুক্ত সীমা হতে পারে।[২২০] Wilson তাঁর অর্থ-বিষয়ক বিবৃতিতে (১৮৬০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি) ঘোষণা করলেন যে ২০০ টাকার কম

বাৎসরিক আয়কে ছাড় দেওয়া হবে। ১৮৬০ সালের ৪ঠা মার্চ যখন লেজিস-লেটিভ কাউন্সিলে আয়কর বিল আনা হল তখন ২০০ টাকার সর্বনিম্ন সীমা অতিরিক্ত কম এই যুক্তিতে ব্যাপক বিরোধিতা এল। Sir C. Wood ভারত সরকারকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন "অতিরিক্ত কম পরিমাণ আয়ের উপর এই কর বসানোর বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনা সেনা বাহিনী ও পুলিস বাহিনীর কমিশন প্রাপ্ত নয় এমন ইউরোপীয় অফিসার সহ জীবনযাত্রার নিম্নতর স্তরের বহু শ্রেণীকে করের আওতায় আনবে। এ ভয় আমি না করে পারছিনে যে এই সব শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছয় যে কর তা সুস্থ নীতির সঙ্গে যতটা সঙ্গতিপূর্ণ তার চেয়েও নীচে নিয়ে যাওয়া হবে।"[২২১] Wood যেসব শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছিলেন, অর্থাৎ সামরিক, নৌবাহিনী সংশ্লিষ্ট এবং পুলিসের নিম্নপদস্থ অফিসার—আইনে এঁদের নির্দিষ্টভাবে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হয়েছিল Canning সভায় যাব উল্লেখ করেছিলেন সেই বিক্ষুব্ধ "ব্যারাক-ঘরের গুঞ্জরন"-এর দ্বারা।[২২২] Canning পরামর্শ দিয়েছিলেন যে কমিশন প্রাপ্ত নয় এমন সব সৈনিকের ক্ষেত্রেই এই ছাড় দেওয়া হোক।[২২৩]

লাইসেন্স করের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি খসড়া আয়কর আইনের ক্ষেত্রেও ক্রমবর্ধমান হারের (progressive) করের ধারণাকে দৃঢ়ভাবে বর্জন করা হয়েছিল। খসড়া অাইনের দ্বিতীয় পাঠ যখন এল সেই সময়ে (১৪ই এপ্রিল) লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সামনে একটি দরখাস্ত এল। সরকারি ও বাণিজ্যিক দপ্তরের কেরানীদের এই দরখাস্তে সমান হারের বদলে একটা ক্রমবর্ধমান হারের জন্য (আয়ের পরিমাণ অনুযায়ী ১ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশ পর্যন্ত) আবেদন করা হয়েছিল। প্রত্যাশিতভাবেই Wilson জবাব দিয়েছিলেন যে করের উদ্দেশ্য "সকল মানুষের পরিস্থিতি সমান করে দেওয়া" নয়।[২২৪] খসড়া আয়কর আইনে দুটি হারের প্রস্তাব করা হয়েছিল : ৫০০ টাকার কম বাৎসরিক আয়ের উপর ২ শতাংশ ও তার বেশি আয়ের উপর ৪ শতাংশ। এটা ক্রমবর্ধমান হারে করের প্রবক্তাদের কাছে নতি স্বীকার নয়। "এটা আমরা করছি কারণ একই হারে হলে পাছে এই (নিম্নতর) শ্রেণীর আয়ের উপর লাইসেন্স শুল্ক ও আয়করের দ্বিগুণ ক্রিয়া অন্য ক্ষেত্রের চেয়ে বেশি কঠোর হয়ে যায়।"[২২৫]

খসড়া আয়কর আইন একটা বিতর্কিত প্রশ্ন তুলে দিল। দাবি করা

হল যে ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী জমিদাররা যে-কোনও ধরনের কর থেকে মুক্ত থাকার অধিকারী। জমিদারদের স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, সেক্রেটারি অব স্টেট ও ভারত সরকারের কাছে প্রদত্ত দরখাস্তে, এই মত উপস্থিত করল।[২২৬] কিন্তু ভারত সরকার এ মত প্রত্যাখ্যান করল এবং সেক্রেটারি অব স্টেট সে কাজ অনুমোদন করলেন।[২২৭] Wilson বললেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্রষ্টা Lord Cornwallis কখনও জমিদারদের কর ধার্যের আয়ত্তে আসার দায়-দায়িত্বের সঙ্গে ভূমি রাজস্বের বন্দোবস্তকে ঘুলিয়ে ফেলেন নি।[২২৮] Wilson আরও উল্লেখ করলেন যে Pitt যখন ইংল্যাণ্ডে আয়করের প্রবর্তন করেন তখন সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে জমিদারদের জন্য ছাড়ের কোনও প্রশ্নই নেই, এমন কি যেখানে ভূমিকর একটা স্থির হারে দেবার কায়দা ঠিক হয়েছে বা তুলে দেওয়া হয়েছে সেখানেও নয়। "জমিদারদের বাজে ওজর" সম্পর্কে Wilson-এর যুক্তি আরও জোরালো হল যখন জমিদারদের মধ্যে থেকেই তিনি একজন মিত্র পেলেন। ইনি হলেন বর্ধমানের মহারাজা, Wilson-এর "প্রশংসনীয় কর ব্যবস্থা'কে সমর্থন করে মহারাজা তাঁকে চিঠি লিখলেন। আয়করের যাঁরা বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের থেকে নিজেকে তফাত করে মহারাজা লিখলেন "এই বিরোধিতা……একটা মিথ্যা ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যে এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লঙ্ঘন।"[২২৯] Sir Charles Wood ও James Wilson এই চিঠির উপর বিরাট গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, যদিও এ চিঠি জমিদার শ্রেণীর সাধারণ মতের প্রতিনিধিত্ব করেছিল বলে ধরা কঠিন ছিল।[২৩০]

জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীরা একটা প্রভাবশালী শ্রেণী ছিলেন। Canning Wilson-কে লিখেছিলেন "লাইসেন্স কর দিয়ে আমরা শহরগুলোকে বিরক্ত করতে চলেছি। কাজেই এ বিষয়ে আমাদের দ্বিগুণ সতর্ক হতে হবে যাতে কৃষিজীবী শ্রেণীর কেবল সাধারণ লোকেরা নয়, সাধারণের একটু উপরে হবার দরুন যাঁরা গ্রামের মধ্যে অনেকখানি প্রভাব ফেলেন, তাঁরা আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেতে প্ররোচিত না হন।"[২৩১] Wilson চেষ্টা করলেন আদায়ের এমন একটা পদ্ধতি উদ্ভাবন করার যা ভারতীয় অনুভূতিকে আঘাত করবে না। আশঙ্কা ছিল যে দেশীয় লোকেরা "সরকারি তদন্তের ব্যবস্থায়" বিরক্ত হবেন। ইংল্যাণ্ডের আইনের মত

Wilson-এর খসড়া আইনে গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, অফিসারদের উপর গোপনীয়তা রক্ষার শপথ গ্রহণের নির্দেশ ছিল এবং একটা বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা ছিল যার কাছে যাঁদের উপর কর ধার্য হল তাঁরা আবেদন করতে পারবেন। সরকার আশা করেছিলেন যে পঞ্চায়েতের সাহায্যে এবং "শহরের ও ব্যবসায়ের মুখ্য লোকদের" ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে এই কর কার্যক্ষেত্রে চালু করার নীতি নির্ধারণ করা যাবে। বছর বছর করের পরিমাণ নির্ধারণের বিরক্তি এড়ানোর জন্য কমিশনারদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল এক একটা গোটা পাঁচ বছরের জন্য এক সঙ্গে একটা অঙ্ক ধরে দিতে। আইনের এসব ধারা ছাড়াও আয়করের ব্যবস্থাপনা, কর ধার্য করা ও আদায় করার কমিশনারদের প্রতি নির্দেশগুলির মধ্যে "বিরক্তিকর তদন্ত, অসুবিধাজনক তথ্য উদ্ঘাটন এবং ফলস্বরূপ দুর্নীতি" সম্পর্কে জনসাধারণের আশঙ্কা কমানোর প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষতঃ বলা ছিল।[২৩২] "একটা বিরক্তিকর ব্যাপারকে এত কম বিরক্তিকর" করতে পারায় Charles Wood Wilson-কে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।[২৩৩] Wilson সম্ভবতঃ জানতেন যে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরাই এই নতুন করের প্রতি সব চেয়ে বিরূপ হবেন—কিন্তু তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে "লণ্ডনে লম্বার্ড স্ট্রীটের লম্বার্ড ইহুদিদের যখন রাষ্ট্রকে বাধ্যতামূলক অর্থ দেওয়ার সম্মুখীন হতে হত তখন তাঁদের সম্পর্কে যেমন হত, ভারতেও তেমনি বড় বড় পুঁজিপতি, মহাজন, ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে সামান্যই সহানুভূতি ছিল।"[২৩৪] মহাজন ও ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিলের ফর্মগুলিকে পরিবর্তিত করা হয় (Harington, Temple এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুরকে নিয়ে গঠিত একটি বিশেষ কমিটির প্রস্তাব অনুসারে)।[২৩৫] কিন্তু এতে তাঁরা সন্তুষ্ট হন নি। বোম্বাই থেকে দেওয়া একখানি দরখাস্তে ভারতীয় ব্যবসায়ী মহাজনদের মন্তব্য বিবৃত হয়েছিল। "একদিকে আয় ও জমা এবং অপরদিকে পড়ে থাকা দাবি ও দেনার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে।...... মহাজনেরা পরস্পরের অবস্থা সম্পর্কে এই ধরনের খবরাখবর হস্তগত করার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী।"[২৩৬] এই ধরনের খবরাখবর বেরিয়ে গেলে অনেক মহাজনের কুঠি বা ব্যবসা ফেল পড়ে যেতে পারে। কলকাতাতেও এই একই ধরনের অভিযোগ পেশ করা হয়েছিল : মাড়ওয়াড়ি ব্যবসায়ীদের একটা প্রতিনিধি দল ভারত সরকারের কাছে

বলেছিলেন যে "তাঁদের দ্বারা নিয়োজিত অর্থের কতখানি তাঁদের নিজেদের এবং কতখানি অন্যদের সম্পত্তি" এ কথা যদি তাঁরা প্রকাশ করেন তা হলে ব্যবসায়ে দুর্নাম হবে।[১৩৭] আয়কর কমিশনের সভাপতি Mr. A. Grote স্বীকার করেছিলেন যে "তাঁদের (মাড়োয়ারীদের) কুঠিগুলির অংশীদারি অত্যন্ত জটিল চরিত্রের" এবং প্রকাশ্য তদন্ত উদ্বেগজনক।[১৩৮] বোম্বাইয়ের বুদ্ধিজীবী মহাজনেরা ও ব্যবসায়ীরা আয়করের বিরোধিতায় জমিদারদের মত এত সোচ্চার ছিলেন না। আত্মরক্ষার জন্য তাঁদের নিজস্ব সুচতুর ও বিবেকবোধশূন্য পদ্ধতি ছিল। বোম্বাইয়ের ব্যাঙ্ক মালিকরা তাঁদের দরখাস্তে খোলাখুলিই বলেছিলেন "স্বার্থবুদ্ধি প্রণোদিত লোকেরা এখন থেকে মিথ্যা হিসাব রাখতে শিখবে……।"[১৩৯]

সারা ভারতে আনুমানিক ১৩ কোটি লোকের মধ্যে Wilson-এর আয়করের রিটার্ন অনুযায়ী ৫৩ হাজার ছিল ১,০০০ টাকা বা তদূর্ধ্বে আয়ের, ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৭০ ছিল ৫০০ থেকে ১,০০০ টাকা আয়ের, ৫ লক্ষ ছিল ২০০ থেকে ৫০০ টাকা আয়ের। বাংলার ৪ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ২১ হাজার আয়ের রিটার্ন ছিল বছরে ১,০০০ টাকার উপর। এ যুক্তি উঠতে পারত যে ভারতের মত একটা দরিদ্র দেশে যদি নিম্ন-আয়ের লোকেদের উপর পড়ে তা হলে সে কর হয়ে ওঠে একটা অসহ বোঝা, অপরদিকে উচ্চ-আয়বিশিষ্ট একটি অতি ক্ষুদ্র শ্রেণীর মধ্যে কর যদি আবদ্ধ থাকে তা হলে তা ধার্য করার ও সংগ্রহ করার খরচের কথা বিবেচনা করলে সে কর আর্থিক দিক থেকে অ-লাভজনক।[১৪০]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে আয়কর ধার্য করা হয়েছিল বাৎসরিক ২০০ থেকে ৫০০ টাকা আয়ের উপর ২ শতাংশ হারে এবং ৫০০ টাকার ঊর্ধ্বে ৪ শতাংশ হারে; এই সীমার উপরে আর ক্রমবর্ধমান কর ধার্যের চেষ্টা করা হয় নি। এ কথা শীগগিরই বোঝা গেল যে ২০০ টাকার মত কম আয়ের উপর কর বসানো নিরর্থক কারণ মোট আদায়ের তুলনায় আদায়ের খরচ পোষাবে না, উপরন্তু নীচের দিকে ফাঁকির সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল। আয়কর দাতাদের দুই-তৃতীয়াংশ এই শ্রেণীতে পড়তেন (অর্থাৎ ২০০ থেকে ৫০০ টাকা আয়ের মধ্যে), অথচ মোট কর আদায়ের মাত্র এক-পঞ্চমাংশ তাঁদের কাছ থেকে আসত। এই সমস্ত বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সরকার নিম্নতর স্তরের কর দাতাদের কর থেকে ছাড় দেবার

এবং করের হার ৪ থেকে ৩ শতাংশে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত করছিল।[২৪১] Samuel Laing-এর পীড়াপীড়িতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, অর্থ-বিষয়ক সর্বরোগহর হিসাবে আয়করের যোগ্যতা সম্বন্ধে তিনি বরাবর সন্দিহান ছিলেন। Wilson কর্তৃক বিরচিত আয়কর আইন পাস হবার (Wilson তার পর অল্পকালের মধ্যেই মারা যান) কয়েক মাস পরেই ১৮৬১-৬২ সালের অর্থ-বিষয়ক বিবৃতিতে Samuel Laing বলেছিলেন যে আয়কর থেকে যত বেশি রাজস্ব আসবে বলে Wilson মনে করেছিলেন ততটা আসবে বলে মনে হয় না।[২৪২] পরের বছর Laing ২০০ থেকে ৫০০ টাকা আয়ের গোষ্ঠীকে ছাড় দিয়ে দিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী Sir Charles Trevelyan বরাবরই আয়করের একজন কড়া সমালোচক ছিলেন, ১৮৬০ সালে James Wilson-এর সঙ্গে বিতর্কের ফলে Trevelyan-কে ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তাঁকে সাময়িকভাবে হৃতমান হতে হয়েছিল সেই বিতর্কের অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল এই আয়কর। Trevelyan প্রথম হারটা কমিয়ে দিলেন[২৪৩], তারপর ১৮৬৪-৬৫ সালের অর্থ-বিষয়ক বিবৃতিতে পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হলে আয়কর তুলে দেবার জন্য ভারত সরকারের সুদৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন।[২৪৪] সরকারের কিছু সদস্য এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত অফিসাররা এই পরিকল্পনার পক্ষে ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে গভর্নর-জেনারেল Lord Lawrence-এর সন্দেহ ছিল রাজস্বের এই উৎসটি ছেড়ে দিলে সরকারের সাশ্রাই চলবে কিনা।[২৪৫] Sir Bartle Frere এক সুচতুর যুক্তি হাজির করলেন (Wilson-এর আয়কর কেবল পাঁচ বছরের জন্য পাস হয়েছে এই ধারণার বিপক্ষে) যে ৩ শতাংশ হারে করটা পাঁচ বছরের একটা স্বল্প মেয়াদের জন্য এবং তার পরে উঠে যাবে, কিন্তু ১ শতাংশ হারে কর স্থানীয় পূর্তকর্মের জন্য নির্দিষ্ট এবং সেটা স্থায়ী করা হবে।[২৪৬] তবু স্থায়ী আয়করের প্রবক্তারাও প্রত্যক্ষ করের বিরুদ্ধে এবং ফলস্বরূপ সরকারি আয়-বিষয়ক তদন্তের মত উৎপাতের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত অগ্রাহ্য করতে পারলেন না। কাজেই ১৮৬৫ সালের ৩১শে জুলাই থেকে এই কর তুলে নিতে দেওয়া হল। পাঁচ বছরে আয়কর থেকে মোট আদায় হয়েছিল প্রায় ৮ কোটি টাকা, আর আদায়ের জন্য দপ্তর খরচ ইত্যাদি বাদ দিয়ে ছাঁকা পাওয়া গিয়েছিল ৭·৬ কোটি টাকা।

আয়করের অন্যতম ত্রুটি ছিল করের পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যাপারে দক্ষতার

অভাব। ১৮৬০ সালের আইনে প্রতি বছর নূতন করে পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আইন চালু হবার এক বছর শেষ হবার আগেই গোড়ায় নির্ণীত পরিমাণ আরও এক বছরের জন্য চালু রাখার অধিকার স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেলের উপর ন্যস্ত করে আবার একটি আইন পাস হল; ১৮৬২ সালের মে মাসে এই অধিকার আরও তিন বছরের জন্য সম্প্রসারিত হল। এ রকম একটা সিদ্ধান্ত নিতে সরকার বাধ্য হল কারণ দেখা গেল যে আয়ের ও করের পরিমাণ নির্ণয়ের প্রক্রিয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য।[২৪৭] ফল এই হল যে ১৮৬৫ সালে করদাতাব পুরানো আয়ের হিসাবের ভিত্তিতেই কর দিতে লাগলেন। এই পরিমাণের হিসাব পুরানো এবং অব্যবহারযোগ্য হয়ে গেল।[২৪৮]

প্রথম ভারতীয় আয়করের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণ হল যে কিছু কর্মকর্তা ও সংবাদপত্রের হতাশাব্যঞ্জক ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও ভারতে প্রত্যক্ষ কর অসম্ভব কিছু নয়। সেই সঙ্গে অভিজ্ঞতা এও প্রমাণ করল যে আয়করের বিরুদ্ধে জনমত এত প্রবল যে অসাধারণ অবস্থা ছাড়া অর্থাগমের এই কৌশলের আশ্রয় নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। উপরন্তু দক্ষভাবে আয়করের পরিমাণ নির্ণয় এবং আদায়ের জন্য একটা প্রশাসনিক যন্ত্রের প্রয়োজন। সরকারের ধারণা ছিল[২৪৯] এই করের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিক্রিয়া করের চরিত্রের জন্য ততটা ছিল না, যতটা ছিল যাঁরা কর নির্ণয়ের কাজটা করতেন সেই সামান্য মাইনের দেশীয় কর্মচারীদের দুর্নীতির জন্য।[২৫০] এই সব কর্মচারীরা কাজ করতেন অতিরিক্ত কর্মভার পীড়িত ব্রিটিশ অফিসার, যাঁদের আবার অপরাপর দায়িত্বও ছিল, তাঁদের তত্ত্বাবধানে এবং সে তত্ত্বাবধানও যথোপযুক্ত ছিল না। সংবাদপত্রগুলি আয়করের বিরুদ্ধে ছিল, ব্যবসায়ী, সম্পত্তিবান এবং বৃত্তিতে নিযুক্ত শ্রেণীগুলি যাঁরা এই প্রথম অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে প্রত্যক্ষ করের আওতায় পড়লেন[২৫১]—তাঁদের মতামতই সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হত। এই শ্রেণীই করের বিপক্ষে সব চেয়ে সোচ্চার ছিলেন। অধিকাংশ জনগণ বিশেষতঃ নিম্নতর আয়বিশিষ্ট গোষ্ঠীর (২০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকার মধ্যে) উপর থেকে কর তুলে নেবার পর থেকে, এই করের আওতায় প্রায় পড়তেনই না।

আয়করের যতই ত্রুটি থাকুক এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে কোনও না কোনও রকমের প্রত্যক্ষ কর ছাড়া সরকার ঘাটতি পূরণ করে উঠতে পারবে

না। সরকারের পক্ষে লাইসেন্স কর (১৮৬৭) ও সার্টিফিকেট করের (১৮৬৮) মত প্রত্যক্ষ কর বসানোর দরকার হল, এবং শেষ পর্যন্ত আবার আয়করে ফিরে আসতে হল (১৮৬৯)। আয়করের সমাপ্তির বছরে ফিনান্স মেম্বার বললেন ঃ 'একে দেশের মস্ত একটা আর্থিক সংরক্ষিত ভাণ্ডার বলে গণ্য করা উচিত, এর সমস্ত যন্ত্রব্যবস্থা ঠিক করে তাকে তুলে রাখা হল, যে কোনও নতুন জরুরী অবস্থা এলে যাতে চালু করা যায়।'[২৫১]

ধার্য নানারকম কর, যথা আয়কর, লাইসেন্স কর ও সার্টিফিকেট কর মিলিয়ে আসলে রাজস্বের সামান্য অংশই উঠত।

ধার্য করগুলি থেকে পাওয়া রাজস্ব, ১৮৫৮/৫৯-১৮৭২/৭৩

শুরুর বছর	পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১৮৫৮ মোতুর্ফা	১.১
১৮৫৯ মোতুর্ফা	২.২
১৮৬০ আয়কর (১৮৬০ সালের ৩২ নং আইন) ৩ শতাংশ হারে	১১.০
১৮৬১ আয়কর (১৮৬০ সালের ৩২ নং আইন এবং ১৮৬১ সালের ১৮ নং আইন) ৩ শতাংশ হারে ও লাইসেন্স কর	২০.৫
১৮৬২ আয়কর (১৮৬০ সালের ৩২ নং আইন) ৩ শতাংশ হারে	১৮.৮
১৮৬৩ আয়কর (১৮৬৩ সালের ২৭ নং আইন) ২ শতাংশ হারে	১৪.৮
১৮৬৪ আয়কর ,,	১২.৮
১৮৬৫ আয়কর ,,	৬.৯
১৮৬৬ আয়কর রদ	০.২
১৮৬৭ লাইসেন্স কর (১৮৬৭ সালের ২১ নং আইন) (ক)	৬.৫
১৮৬৮ লাইসেন্স কর (১৮৬৮ সালের ৯ নং আইন) (খ)	৫.১
১৮৬৯ ক্রমবর্ধমান আয়কর (১৮৬৯ সালের ৯ নং আইন) (গ)	১১.১
১৮৭০ আয়কর (১৮৭০ সালের ১৬ নং আইন) (ঘ) টাকায় ৬ পয়সা হারে	২০.৭
১৮৭১ আয়কর (১৮৭১ সালের ১২ নং আইন) টাকায় ২ পয়সা হারে (ঙ)	৮.২

টীকা : (ক) সর্বনিম্ন ২০০ টাকা
(খ) ,, ৫০০ টাকা
(গ) ,, ৫০০ টাকা, বেতনের উপর ১ শতাংশ হারে, পরবর্তীকালে বাড়িয়ে ২½ শতাংশ হারে
(ঘ) টাকায় ৬ পয়সা সর্বনিম্ন ৬০০ টাকা
(ঙ) সর্বনিম্ন ৭৫০ টাকা।

ধার্য করগুলি থেকে আদায়ের পরিমাণের স্বল্পতা ছাড়া আরও যে কথাটা নজরে পড়ে তা হল ঘন ঘন করের রূপ পরিবর্তন। এ থেকে বোঝা যায় যে এই সময়ে বসানো করগুলি নিয়ে সরকার বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না।

যদিও ক্রমবর্ধমান হারে করের নীতি সরকার কর্তৃক দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল তথাপি ন্যায্যভাবে বণ্টিত করের কথাটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা যায় নি। জীবনধারণের জন্য সর্বনিম্ন স্তরকে ছাড় দেওয়ার নীতিকে সরকার স্বীকার করেছিল। Wilson-এর ১৮৬১ সালের আইনে (৩২ নং) কর ধার্যের যোগ্য সর্বনিম্ন আয় ২০০ টাকায় স্থিরীকৃত হয়েছিল। Laing ১৮৬২ সালে ৫০০ টাকার নীচে সমস্ত আয়কে রেহাই দিয়েছিলেন : তিনি দেখেছিলেন যে ১৮৬১-৬২ সালে ২০০ থেকে ৫০০ টাকা আয়বিশিষ্ট প্রায় ৬ লক্ষ লোকের উপর কর ধার্য হয়েছিল, আর এই গোষ্ঠীর কাছ থেকে মোট আদায় হয়েছিল মাত্র ৩৫ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে আদায়ের খরচেই অন্ততঃ ১০ লক্ষ টাকা খেয়ে গিয়েছিল। আদায়ের মোটা খরচ এবং এত বেশিসংখ্যক স্বল্প আয়বিশিষ্ট লোকের উপর কর ধার্য করা থেকে সামান্য প্রাপ্তি—কেবল এই প্রশাসনিক যুক্তিতেই বাৎসরিক ২০০ টাকার কম আয়-বিশিষ্ট লোকেদের ছাড় দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে ধার্য করগুলি (১৮৬৭ সালের লাইসেন্স কর ছাড়া) কোনওটাই ৫০০ টাকার তলায় যায় নি ; ১৮৭০ সালে (১৮৭০ সালের ১৬ নং আইন) এই সীমা বাড়িয়ে ৬০০ টাকা করা হয়েছিল এবং ১৮৭১ সালে (১২ নং আইন) এই সীমা আবার বাড়িয়ে ৭৫০ টাকা করা হয়েছিল।

সমদর্শিতার নীতির মানে এও ছিল যে কোনও বিশেষ শ্রেণীর বিরুদ্ধে বৈষম্য এড়াতে হবে। এই যুক্তিতেই Temple লাইসেন্স করকে (ব্যবসায়ী ও বৃত্তিতে নিযুক্ত শ্রেণীগুলির উপরে) আয়করে রূপান্তরিত করাকে সমর্থন করেছিলেন।[২৫৩] এই প্রসঙ্গে সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে প্রদত্ত

ক্যালকাটা ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশনের স্মারকলিপিতে বিবৃত একটা বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। "স্থাবর সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় এবং সমাপনীয় উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় (income derived from terminable sources) এবং বৃত্তি থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপর সমানভাবে চাপ দেয় এমন আয়করকে ন্যায্য ও সমদর্শী কর বলে বর্ণনা করা যায় না", দরখাস্তে বলা হয়েছিল যে অর্থনীতিতে খাজনাভোগীদের (rentiers) অবদান যেখানে সব চেয়ে কম সেখানে খাজনাভোগীদের উপর কারিগর বা ব্যবসায়ীদের সমহারে কর ধার্য করা অন্যায়।[২৫৪] কলকাতার আর একটি স্মারকলিপিরও এটাই ছিল মূল কথা ঃ যাঁরা "নিজেদের পরিশ্রমের ফল ভোগ করেন" আয়করটা তাঁদের উপরই সব চেয়ে কঠোর ; এঁরা আয়করের ক্ষেত্রে সম্পত্তিবান শ্রেণী থেকে নিজেদের পৃথক করে দেখার দাবি করেছিলেন।[২৫৫] বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স ও মূলতঃ এই যুক্তির উপরই দাঁড়িয়েছিল।[২৫৬] কিন্তু আয়ের উৎস অনুযায়ী পার্থক্য করার নীতি প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক দর্শনের প্রতিপন্থী ছিল।

উল্লেখিত পুস্তকাদি (References)

১ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Revenue Despatch ১৪ নং, ৯ই জুলাই ১৮৬২।

২ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, I evenue Despatch ২৪ নং, ২৮শে মার্চ ১৮৮৩।

৩ Thomas Babington Macaulay-র 'Critical and Historical Essays' (London 1967), ভল্যুম I, পৃষ্ঠা ৫৬১।

৪ Home (Revenue) Progs. সেপ্টেম্বর ১৮৬২, ২৯ নং, S. Laing-এর Minute, ৭ই এপ্রিল ১৮৬২।

৫ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

৬ Sir J. Lawrence কর্তৃক প্রদত্ত মতামত, ৫ই জুলাই ১৮৬২, Parliamentary Papers, House of Lords, ১৮৬৩, ভল্যুম ২২, কোড ৮৭, পৃষ্ঠা ১৮৭ ও পরবর্তী।

৭ Eric Stokes-এর 'The English Utilitarians and India' (Oxford, 1959), পুস্তকের ১১৭ পৃষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করুন।

৮ আর. সি. দত্তের 'The Peasantry of Bengal' (Calcutta, 1875)।

৯ জে. সি. দত্তের নিকট আর. সি. দত্ত (তারিখ নেই), জে. এন. গুপ্তের 'Life and Work of Romesh Chandra Dutta C.E.I., (London, 1911), পৃষ্ঠা ৫৬।

১০ 'পূর্বোক্ত', পৃষ্ঠা ৫৮, ৫৬। ১৮৮৪ সালে বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট রচনাকালে রায়তি স্বত্বাধিকারীদের পদমর্যাদা ও অধিকার উন্নত করার জন্য রমেশ দত্ত প্রদত্ত বহু প্রস্তাব একই ধরনের চাপের ফলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ১৮৮৪ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখে জে. সি. দত্তের নিকট রমেশ দত্তের চিঠি দেখুন ঃ আর. দত্তের নিকট A. P. MacDonnel. ১লা ডিসেম্বর ১৮৮৪, 'পূর্বোক্ত', পৃষ্ঠা ১০১-৩।

১১ জে. এন. গুপ্তের পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৮৫-৭, ২৮৯, ২৯১-২। Prince Kropotkin-এর কাছ থেকে চিঠি দেখুন, 'পূর্বোক্ত' পৃষ্ঠা, ২৮৫।

১২ ভবতোষ দত্তের 'The Evolution of Economic Thinking in India' (Calcutta, 1962), পৃষ্ঠা ১২।

১৩ Rev. Progs. এপ্রিল ১৮৬৭, ২০ নং, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ক্যালকাটা ট্রেডস এসোসিয়েশনের মাস্টার, কমিটি ও সদস্যদের পক্ষ থেকে দরখাস্ত, ২২শে এপ্রিল ১৮৬৭। 'পূর্বোক্ত', মার্চ ১৮৬৭, ৩৫ নং, ভাইসরয়ের নিকট ক্যালকাটা ট্রেডস এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দরখাস্ত, ১৫ই মার্চ ১৮৬৭।

১৪ Rev. Progs. এপ্রিল ১৮৬৭, ৭ নং, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারির নিকট বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি H. W. I. Wood, ২২শে মার্চ ১৮৬৭।

১৫ বোম্বাই শহর ও দ্বীপের ৩৬৪৬ জন দেশীয় বণিকদের দরখাস্ত, ১২ই অক্টোবর ১৮৫৯, 'Correspondence on Direct Taxation' (Calcutta 1882), ভল্যুম I, পৃষ্ঠা ৩০।

১৬ কলকাতা (১৮৫৯ ও ১৮৬৭), বোম্বাই (১৭ই অক্টোবর ১৮৫৯), মাদ্রাজ (২২শে সেপ্টেম্বর ১৮৫৯), আমেদাবাদ (৩১শে অক্টোবর ১৮৫৯) থেকে দরখাস্তগুলি দেখুন। 'পূর্বোক্ত', I, পৃষ্ঠা ২৫-৩০।

১৭ তুলনা করুন F. Shehab-এর 'Progressive Taxation : A Study

in the development of the progressive Principle in the British Income Tax' (Oxford 1953), পৃষ্ঠা ১০৪, ১১৫ ও পরবর্তী।

১৮ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ১৪৪ নং, ২৯শে জুন ১৮৬০। J. Lawrence-এর নিকট Cranborne, ৩রা নভেম্বর ১৮৬৬, সেক্রেটারিজ অব স্টেটের কাছ থেকে চিঠিপত্র, ভল্যুম III, ৩৯ নং। Argyll-এর নিকট Mayo, ৮ই মার্চ ১৮৬৯, বাণ্ডিল ৩৪, ৭৬ নং, Mayo Papers।

১৯ জে. পি. নিয়োগীর 'Evolution of Indian Income Tax' (London, 1929), পরিচ্ছেদ I-II।

২০ W. T. Thornton-এর নিকট J. S. Mill, ২৮শে জানুয়ারি ১৮৬২, 'The letters of John Stuart Mill' (সম্পাদিত, H. S. R. Elliot London, 1910), ভল্যুম I, পৃষ্ঠা ২৫৮। H. S. Maine-র নিকট J. S. Mill, ১লা জানুয়ারি ১৮৬৯, 'পূর্বোক্ত', ভল্যুম II, পৃষ্ঠা ১৬৯। ঊনবিংশতি শতাব্দীতে উপযোগবাদী (Utilitarian) অর্থনীতিবিদদের প্রভাব অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফিজিওক্র্যাটদের (Physiocrats) প্রভাবের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, শুধু এটি ছিল আরও সর্বব্যাপক। রঞ্জিৎ গুহের 'A Rule of Property for Bengal (Paris, 1963)-এর সঙ্গে তুলনা করুন।

২১ Col. Baird Smith কর্তৃক রিপোর্ট, ১৪ই আগস্ট ১৮৬১। P.P.H.C. ভল্যুম ৪০, কোড ২৯, পৃষ্ঠা ৩০১, Home Progs. ৭ই অক্টোবর ১৮৬১, Public ·০-৬ নং। রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুপারিশ করে Baird Smith-এর রিপোর্টের ৬২-৮২ প্যারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে Lord Canning-এর স্মারকলিপি, ৩রা অক্টোবর ১৮৬১ (K.W.)।

২২ Home Rev. Progs. ফেব্রুয়ারি ১৮৬২, ২ নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারি W. Grey-র নিকট উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলির সেক্রেটারি Sir G. Souper, ২৭শে জানুয়ারি ১৮৬২।

২৩ B. D. Mangles-এর মতভেদের বিবরণী, ৩রা জুলাই ১৮৬২, P.P.H.L. ১৮৬৩, ভল্যুম ২২, কোলাম ৮৭, পৃষ্ঠা ১৮১-৬।

২৪ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Rev. Despatch ১৪ নং, ৯ই জুলাই ১৮৬২।

২৫ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Rev. Despatch ২ নং, ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৫৮।

২৬ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Rev. Despatch, ১৪ নং, ৯ই জুলাই ১৮৬২।

২৭ Sir J. Lawrence-এর নথিভুক্ত মতামত, ৫ই জুলাই ১৮৬২, P.P H L. ১৮৬৩, ভল্যুম ২২, কোড ৮৭, পৃষ্ঠা ১৮৭-৯২। ভূস্বামীদের ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বাঁধা যাবে এই কারণে Canning-ও Wood-এর নিকট চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুপারিশ করেছিলেন: "এটি হবে একটি ইউরোপীয় সৈন্য বাহিনীর তুল্য।" Wood-এর নিকট Canning, ৮ই অক্টোবর ১৮৬১, Wood Papers, S. Gopal-এর 'British Policy in India 1858-1905' (Cambridge, 1965), পৃষ্ঠা ১১ দেখুন।

২৮ সিন্ধুর কমিশনার S. Mansfield-এর রিপোর্ট, ১৮৮ নং, ৩রা জুলাই ১৮৬৩, H.C. ১৮৬৩, ভল্যুম ৪৩, কোড ১৬৪, পৃষ্ঠা ৬১৭-৯।

২৯ Home Rev. Progs. সেপ্টেম্বর ১৮৬২, ৩৭ নং, W. Muir-এর Minute, ৫ই ডিসেম্বর ১৮৬১।

৩০ Home Rev. Progs. সেপ্টেম্বর ১৮৬২, ২৯ নং, S. Laing-এর Minute, ৭ই এপ্রিল ১৮৬২।

৩১ Home Rev. Progs. সেপ্টেম্বর ১৮৬২, ২২ নং, ভারত সরকারের নিকট ফোর্ট সেণ্ট জর্জ সরকারের সেক্রেটারি, ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬২, 'পূর্বোক্ত', ৩৭ নং, W. Muir-এর Minute, বোর্ড অব রেভেনিউ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, ৩রা ডিসেম্বর ১৮৬১।

৩২ T. J. Hovell-Thurlow-এর 'The Company and the Crown' (London, MDCCCLXVI), পৃষ্ঠা ২০৯।

৩৩ Edward West-এর 'Emigration to British India Profitable investment for Joint Stock Companies and for emigrants who possess capital……' (London, 1857)। ঔপনিবেশিকরণের মারফত উন্নয়নের জন্য E. G. Wakefield-এর কর্মসূচীর প্রভাব

সম্পর্কে Brinley Thomas-এর 'Migration and Economic Development' (Cambridge, 1954), পৃষ্ঠা ১-১৪ দেখুন।

৩৪ পেট্রল সম্পদ ব্যবহারের পরিকল্পনার সব চাইতে পুরাতন যেসব উল্লেখ আছে তার মধ্যে অন্যতম হল Argyll-এর নিকট লেখা Mayo-র চিঠি, ৮ই আগস্ট ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৬, ১১২ নং।

৩৫ ভারত সরকারের নিকট কোর্ট অব ডাইরেক্টরস, ৬নং, ৬ই মে ১৮৫৭।

৩৬ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Rev. Despatch ২ নং, ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৫৮।

৩৭ 'Annual Reports of Cotton Supply Association' ২ নং, ১৮৫৯ এবং ৫ নং, সেপ্টেম্বর ১৮৬২। Isaac Watts-এর 'The Origin and Progress of the Cotton Supply Association' (Manchester 1871), পৃষ্ঠা ১১৯, ১২৫, ১৩১।

৩৮ Home Rev. Progs. ৬ই জুলাই ১৮৬১, ৭ নং, ভারত সরকারের নিকট কটন সাপ্লাই এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি, ১৫ই মে ১৮৬১।

৩৯ Home Rev. Progs. ৯ই ডিসেম্বর ১৮৬১, ২ নং, ঐ একই, ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৬১।

৪০ কাছাড়ের সুরশীপুর টী কোম্পানীর ডিরেক্টরদের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি, ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬১, ইণ্ডিগো প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, ২০শে নভেম্বর ১৮৬০ ; কুর্গের কফি প্ল্যান্টার্স, ২৫শে জুন ১৮৬২, P.P.H.L. ১৮৬৩, ভল্যুম ২২, কোড ৮৭, পৃষ্ঠা ১৬০-১। 'পূর্বোক্ত', পৃষ্ঠা ১৬২, ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাণ্ড কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি, ৩১শে মে ১৮৬১।

৪১ Home Rev. Progs. ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬১, ২৬ নং, ভারত সরকারের প্রস্তাব, 'পূর্বোক্ত', আগস্ট ১৮৬২, ১২-৫ নং।

৪১ক Home Rev. Progs. ২৬শে জুলাই ১৮৬১, ২ নং বাংলা সরকারের সেক্রেটারির নিকট রেভিনিউ বোর্ডের R. Thompson, ৩১শে মে ১৮৬১।

৪২ Home Rev. Progs. ১লা অক্টোবর ১৮৬১, ১ নং, P. Saunders-এর রিপোর্ট, ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৬১।

৪৩ Home Rev. Progs. ফেব্রুয়ারি ১৮৬২, ২ নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সরকারের সেক্রেটারি, ২৭শে জানুয়ারি ১৮৬২।

৪৪ 'পূর্বোক্ত'।

৪৫ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Rev. Despatch, ১৪ নং, ৯ই জুলাই ১৮৬২।

৪৬ Edward West-এর 'Emigration to British India' (London, 1857)।

৪৭ বোম্বাই-এর গভর্নরের Minute, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬০, P.P H.L. ১৮৬৩, ভল্যুম ২২, কোড ৮৭, পৃষ্ঠা ৩২।

৪৮ Home Rev. Progs. ১লা অক্টোবর ১৮৬১, ১ নং, তুলো চাষ সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য কমিশনার P. Saunders-এর রিপোর্ট, ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৬১।

৪৯ Home Rev. Progs. সেপ্টেম্বর ১৮৬২, ২৮ নং, C. Beadon-এর Minute, ১৩ই মার্চ ১৮৬২।

৫০ Home Rev. Progs. ফেব্রুয়ারি ১৮৬২, ২ নং। ভারত সরকারের সেক্রেটারি W. Grey-র নিকট উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির সরকারের সেক্রেটারি Sir G. Couper, ২৭শে জানুয়ারি ১৮৭২।

৫১ Home Rev. Progs. সেপ্টেম্বর ১৮৬২, ৩৭ নং, W. Muir-এর Minute, ১৫ই ডিসেম্বর ১৮৬১।

৫২ 'পূর্বোক্ত'।

৫৩ Home Rev. Progs. সেপ্টেম্বর ১৮৬২, ২৪ নং, E. Maltby-র Minute, ২৪শে ডিসেম্বর ১৮৬১ এবং ২২ নং। ভারত সরকারের সেক্রেটারির W. Grey-র নিকট ফোর্ট সেন্ট জর্জের সেক্রেটারি, ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬২।

৫৪ Home Rev. Progs. সেপ্টেম্বর ১৮৬২, ২৯ নং, S. Laing-এর Minute, ৭ই এপ্রিল ১৮৬২।

৫৫ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Revenue Despatch, ১৪ নং, ৯ই জুলাই ১৮৬২।

৫৬ J. Lawrence-এর নিকট C. Wood, ১৫ই অক্টোবর ১৮৬৪,

Lawrence Papers, সেক্রেটারি অব স্টেটের চিঠিপত্র, ভল্যুম III, ৩৯ নং।

৫৭ J. Lawrence-এর নিকট C. Wood ১২ই আগস্ট ১৮৬৫, 'পূর্বোক্ত', ভল্যুম II, ৪৩ নং।

৫৮ Lawrence-এর নিকট Cranborne, ৩রা নভেম্বর ১৮৬৬, Lawrence Papers, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট চিঠিপত্র, ভল্যুম III, ৩৯ নং।

৫৯ C. Wood-এর নিকট Lawrence, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৮৬৫, Lawrence Papers, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট চিঠিপত্র, ভল্যুম IV, ৪৭ নং।

৬০ Argyll-এর নিকট Mayo, ২রা জুন ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৩,১২৫ নং।

৬১ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

৬২ B. Frere-র নিকট Mayo, ৩রা জুন ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৯, ১৫৬ নং।

৬৩ Mayo-র নিকট Argyll, ২৮শে এপ্রিল ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৯, ৯ নং, বাঁকা হরফ মূল গ্রন্থে।

৬৪ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Rev. Despatch, ১৪ নং, ৯ই জুলাই ১৮৬২।

৬৫ Home Rev. Progs. সেপ্টেম্বর ১৮৬২, ২৮ নং, C. Beadon-এর Minute, ১৩ই মার্চ ১৮৬২।

৬৬ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Rev Despatch, ১১ নং, ২৪শে মার্চ ১৮৬৫।

৬৭ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Rev Despatch, ১৭ নং, মার্চ ১৮৬৬।

৬৮ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Rev. Despatch, ২৯ নং, ২০শে নভেম্বর ১৮৬৬।

৬৯ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Rev. Despatch, ১৫ নং, ২৩শে মার্চ ১৮৬৭।

৭০ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Rev. Despatch, ৭ নং, ২৬শে মে ১৮৭১।

৭১ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Rev. Despatch, ২৪ নং, ২৮শে মার্চ ১৮৮৩।

৭২ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Rev. Despatch, ২৬ নং, ২৭শে জুলাই ১৮৭১।

৭৩ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Rev. Despatch ১৪ নং, ৯ই জুলাই ১৮৬২।

৭৪ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

৭৫ Lawrence-এর নিকট Cranborne, ২রা জানুয়ারি ১৮৬৭, Lawrence Papers, সেক্রেটারি অব স্টেটের চিঠিপত্র, ভল্যুম IV, ২ নং।

৭৫ক ১৮৫৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি, কমন্সসভায় প্রদত্ত অর্থ-বিষয়ক বিবৃতিতে Lord Stanley ১৮০০ সাল থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যেকার আফিম রাজস্ব পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করেছিলেন। 'Financial Statement relating to India……reprinted from Hansard's Perliamentary Debates' (Calcutta, 1871), পৃষ্ঠা ১৩৬-৭ দেখুন। সর্বমোট আফিম রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৮১০ সালে ৯ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯ শত ৯৬ পাউণ্ড, ১৮২০ সালে ১৪ লক্ষ ৩৬ হাজার ৪ শত ৩২ পাউণ্ড, ১৮৩০ সালে ১৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮ শত ৯৫ পাউণ্ড, ১৮৪০ সালে ১৩ লক্ষ ৪১ হাজার ৯৩ পাউণ্ড এবং ১৮৫০ ৩৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৯৪ পাউণ্ড।

৭৬ সিলেক্ট কমিটির সামনে Cecil Beadon এর সাক্ষ্য (১৮৭১) প্রশ্ন ৩১৯৮, ৩১৯৯। পাটনা এজেন্সিব অন্তর্ভুক্ত ছিল বিহারের সকল জেলা ও ছোটনাগপুরের অংশ। বেনারস এজেন্সির অধীনে ছিল বেনারস ও এলাহবাদ ডিভিসন এবং অযোধ্যা।

৭৭ Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬৪, Accts. নং ১০৭, পরিশিষ্ট A, M. H. Foster এবং H. W. Whiffin-এর রিপোর্ট, (৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৪), পৃষ্ঠা ২২।

৭৮ J. Strachey, R. Strachey পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৪২।

৭৯ Fin. Progs. সেপ্টেম্বর ১৮৭১, Sep. Rev. ১১ নং, আফিম বিভাগের প্রশাসনের ব্যবস্থা পরিবর্তনের যৌক্তিকতা বিবেচনা করার জন্য নিযুক্ত কমিটির রিপোর্ট।

৮০ Home Progs. ২১শে অক্টোবর ১৮৬১, Sep. Rev. ৩ নং, বোর্ড অব রেভিনিউ-এর সেক্রেটারির নিকট বাংলা সরকারের সেক্রেটারি E. H. Lushington, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৮৬১।

৮১ Home Progs. ১লা জুলাই ১৮৬১, Sep. Rev. ১ নং, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারির নিকট বাংলা সরকারের সেক্রেটারি, ২৫শে জুন ১৮৬১। 'পূর্বোক্ত' ৪ নং, অর্থ দপ্তরের প্রস্তাব, ২৯শে জুন ১৮৬১।

৮২ Fin. Progs. Accts. মার্চ ১৮৬০, ৪ নং, বাংলা সরকারের সেক্রেটারির নিকট ভারত সরকারের অর্থ দপ্তরের সেক্রেটারি, ৭ই মার্চ ১৮৬০।

৮৩ Home Progs. Sep. Rev. ১লা জুলাই ১৮৬১, ১ নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট বাংলা সরকারের সেক্রেটারি, ২৫শে জুন ১৮৬১।

৮৪ Home Progs. Sep. Rev. ২ নং, লোয়ার প্রভিন্সেস-এর বোর্ড অব রেভিনিউ-এর সেক্রেটারির নিকট বিহারের আফিম এজেন্ট, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬১। ১৯৫৭-৫৮ সালে বাংলায় পপি চাষের জমির আয়তন ছিল ৩৪৭,৬৫০ বিঘা, ১৮৫৮-৫৯ সালে ৩৪১,৪৯৮ বিঘা, ১৮৫৯-৬০ সালে ৩১২,৭০৭ বিঘা এবং ১৮৬০-৬১ সালে ২৮১,১২৬ বিঘা।

৮৫ Leg. Council A. Progs. (১৮৬৫), ভল্যুম IV (নিউ সিরিজ), পৃষ্ঠা ১৬৪।

৮৬ Home Progs. Sep. Rev. ২৭শে জুলাই ১৮৬০, ২৮ নং, ভারত সরকারের (স্বরাষ্ট্র) সেক্রেটারির নিকট বাংলা সরকারের সেক্রেটারি, ১৪ই জুলাই ১৮৬০। ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট Sir Robert Hamilton, ৪৬০ নং, ৪ঠা অক্টোবর ১৮৫৮, আফিম সম্পর্কে Sir R. Hamilton-এর টীকা, ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৫৮।

৮৭ Home Progs. Sep. Rev. ২৭শে জুলাই ১৮৬০, ২৮ নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির (স্বরাষ্ট্র) নিকট বাংলা সরকারের সেক্রেটারি, ১৪ই জুলাই, ১৮৬০।

৮৮ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

৮৯ Home Progs. Sep. Rev. ২৯ নং, বাংলা সরকারের সেক্রেটারির

নিকট বোর্ড অব রেভিনিউ-এর অস্থায়ী সেক্রেটারি, A. Eden, ২১শে নভেম্বর ১৮৬১।

৯০ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

৯১ Home Progs. Sep. Rev. ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৬০। লোয়ার প্রভিন্সেস-এর বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নিকট বিহারের আফিম এজেণ্ট, R. N Farquaharson, ১৪ই এপ্রিল ১৮৫৯।

৯২ সিলেক্ট কমিটির সামনে C. Beadon-এর সাক্ষ্য (১৮৭১), প্রশ্ন ৩,৪১৪-৮।

৯৩ Home Progs. Sep. Rev. ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৬০। লোয়ার প্রভিন্সেস-এর বোর্ড অব রেভিনিউ-এর সেক্রেটারির নিকট বিহারের আফিম এজেণ্ট, ১৪ই এপ্রিল ১৮৫৯।

৯৪ Home Progs. Sep. Rev. ২৭শে জুলাই ১৮৬০, ২৯ নং, বাংলা সরকারের সেক্রেটারির নিকট বোর্ড অব রেভিনিউ-এর সেক্রেটারি, ২১শে নভেম্বর ১৮৫৯।

৯৫ Home Progs. Sep. Rev. ২৬ নং, বিহারের আফিম এজেণ্টের নিকট অলিগঞ্জের সাব-ডেপুটি আফিম এজেণ্ট, J. G. Pughe, ১০ই মার্চ ১৮৫৯।

৯৬ Home Progs. Sep. Rev. ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৬০, ২৩ নং, বিহারের আফিম এজেণ্টের নিকট পাটনার সাব-ডেপুটি আফিম এজেণ্ট, R. King, ১০ই মার্চ ১৮৫৯।

৯৭ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

৯৮ সিলেক্ট কমিটির সামনে Sir R. Hamilton-এর সাক্ষ্য (১৮৭১), প্রশ্ন ৫,০০৮-২৪।

৯৯ Sir C. Beadon-এর সাক্ষ্য, 'পূর্বোক্ত' প্রশ্ন ৩,৩১৪-২১, ৩,৫১৬-৩৪, ৩,৫৭৩-৫। Sir F. Halliday-র সাক্ষ্য, 'পূর্বোক্ত' প্রশ্ন ৫,১২৫-৩২, ৫,২৯০-২।

১০০ সিলেক্ট কমিটির নিকট R. N. Hamilton-এর সাক্ষ্য (১৮৭১) প্রশ্ন ৪,৮৮৯-৯০৯, ৪,৮৮৬-৭, ৪,৮৯৮-৯০৩।

১০১ Home Progs. Sep. Rev. ৪ঠা জুন ১৮৬০, ৪ নং, ভারত

সরকারের (স্বরাষ্ট্র) সেক্রেটারির নিকট বোম্বাই সরকারের সেক্রেটারি, ১৬ই মে ১৮৬০।

১০২ Home Progs. Sep. Rev. ৪ঠা জুন ১৮৬০, ৮ নং, বোম্বাই সরকারের নিকট ভারত সরকারের সেক্রেটারি (স্বরাষ্ট্র), ৪ঠা জুন ১৮৬০।

১০৩ Home Progs. Sep. Rev. ৪ঠা জুন ১৮৬০, ১ নং, বোম্বাই সরকারের নিকট ভারত সরকার, ১০ই মে ১৮৬০।

১০৪ Home Progs. Sep. Rev. ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৬০, ১৮ নং, বোম্বাই-এর স-পরিষদ গভর্নরের নিকট David Sassoon & Co. এবং অপরাপর আফিম ব্যবসায়ীদের স্মারকলিপি, ১৫ই আগস্ট ১৮৬০।

১০৫ Home Progs. Sep. Rev. ২২শে অক্টোবর ১৮৬১, ১১ নং, বোম্বাই সরকারের নিকট ভারত সরকারের তারবার্তা, ২২শে আগস্ট ১৮৬১, Home Progs. Sep. Rev., এপ্রিল ১৮৬১, ১-৩ নং।

১০৬ Home Progs. Sep. Rev. অক্টোবর ১৮৬১, ১১ নং, লবণের কমিশনারের নিকট মালওয়ার এজেন্ট, Opium a Customer, বম্বে, ৮ই জুলাই ১৮৬১ এবং ১১ই জুলাই ১৮৬১।

১০৭ Home Progs. Sep. Rev. ২২শে অক্টোবর, ১৮৬১, ১০ নং, বহিঃশুল্কের কমিশনারের নিকট Forbes & Co. ১৭ই জুলাই ১৮৬১, ১৬ নং, বোম্বাই-এর গভর্নর, Sir C. R. Clerk-এর নিকট D. Sasson & Co. ও অপরাপর আফিম ব্যবসায়ী, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৬১।

১০৮ Home Progs. Sep. Rev. অক্টোবর ১৮৬১, ১৭ নং, বোম্বাই সরকারের সেক্রেটারির নিকট ভারত সরকারের সেক্রেটারি, ২২শে অক্টোবর ১৮৬১।

১০৯ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Financial Despatch, ১৪৪ নং, ২০শে জুন ১৮৬০।

১১০ J. Strachey ও R. Strachey পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৪০ দেখুন।

১১১ L.C.A. Progs. (১৮৭০), ভল্যুম IX (নতুন সিরিজ), পৃষ্ঠা ২০৭।

১১২ L.C.A. Progs. (১৮৬৬) ভল্যুম V (নতুন সিরিজ), পৃষ্ঠা ১০৩।

১১৩ Fin. Progs. মে ১৮৭১, Sep. Rev. ১৬ নং, Major-General H. D. Daly, স্বরাষ্ট্র দপ্তর, ভারত সরকার (৪ঠা এপ্রিল ১৮৭১)।

১১৪ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

১১৫ L.C.A. Progs. (১৮৬৮), ভল্যুম VII (নতুন সিরিজ), পৃষ্ঠা ১৪৯।

১১৬ J. Strachey ও R. Strachey-র পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৪৫।

১১৭ J. Lawrence-এর নিকট Northcote ২৬শে মার্চ ১৮৬৮ (Lawrence Papers, Lawrence-এর কাছে লেখা সেক্রেটারি অব স্টেটের চিঠিপত্রের ভল্যুম V, ১৫ নং), এবং Lawrence-এর নিকট Northcote, ৮ই মে ১৮৬৮ (পূর্বোল্লেখিত স্থানে, ২৩ নং), ও ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৮ (পূর্বোল্লেখিত স্থানে, ৪৭ নং)।

১১৮ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. Despatch, ২৪৫ নং, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৮।

১১৯ Fin. Progs. সেপ্টেম্বর ১৮৬৮, Accts. নং ১৬৬-৮৫। একটি আফিম সংরক্ষিত তহবিল গঠন সম্পর্কে ভারত সরকারের মতামত।

১২০ Fin. Progs. সেপ্টেম্বর ১৮৬৮, Accts. নং ১৬৩। H. M. Durand-এর Minute (১৭ই আগস্ট ১৮৬৮)। Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬৮, Sep. Rev. ৩২ নং, W. R. Mansfield-এর Minute (২৮শে আগস্ট ১৮৬৮)।

১২১ সিলেক্ট কমিটির নিকট Sir C. Beadon-এর সাক্ষ্য (১৮৭১), P.P.H.C. ১৮৭১, ভল্যুম ৮, কোড ৩৬৩, প্রশ্ন ৩,২৪০-৫, ৩,২৫৩-৬৯।

১২২ J. Strachey ও R. Strachey-র পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৪৫-৭।

১২৩ L.C.A. Progs. (১৮৬৯), ভল্যুম VIII, পৃষ্ঠা ১১৯।

১২৪ Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৮, Sep. Rev. ৬ নং, ভারত সরকারের

অর্থ দপ্তরের সেক্রেটারির নিকট Messrs. Jardine Skinner & Co. ও অন্যান্যরা (৩রা এপ্রিল ১৮৬৮)।

১২৫ J. Strachey ও R. Strachey-র পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৪৭।

১২৬ L.C.A. Progs. (১৮৭২) ভল্যুম XI (নতুন সিরিজ), পৃষ্ঠা ২৬৩।

১২৭ Home Progs. Sep. Rev. ২১শে অক্টোবর ১৮৬১, ২ নং, বোম্বাই সরকারের সেক্রেটারির নিকট পারস্য উপসাগরে ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি Capt. F. Jones (১৬ই জুলাই ১৮৬১)।

১২৮ Home Progs. Sep. Rev ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৬২, ২ নং, বোম্বাই সরকারের সেক্রেটারির নিকট Capt. F. Jones (৯ই ডিসেম্বর ১৮৬১)।

১২৯ Fin. Progs. Sep. Rev. ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮, ১০১-১০ নং, তুরস্ক ও পারস্য উপসাগর এলাকায় বাণিজ্য করার প্রশ্নে আফিম সরকারি রাজস্বের উৎস হতে পারে।

১৩০ Parl-এর সিলেক্ট কমিটির নিকট Cecil Beadon-এর সাক্ষ্য, ১৮৭১, প্রশ্ন ৩,০৪৪-৫১।

১৩১ Fin. Progs. Sep. Rev. অক্টোবর ১৮৭১, ৪১ নং, বোম্বাই সরকারের সেক্রেটারির নিকট পারস্য উপসাগরে ব্রিটিশ রাজের রাজনৈতিক প্রতিনিধি Lt. Col. Lewis Pelly (১৭ই জুলাই ১৮৭১)।

১৩২ Fin. Progs. জুলাই ১৮৭১, পরিশিষ্ট, চীনে আফিম চাষের উপর স্মারকলিপি, অর্থ দপ্তরে প্রস্তুত (২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭১)।

১৩৩ Home Progs. Sep. Rev. ১৯শে আগস্ট ১৮৬১, ২১ নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট হংকং-এর ঔপনিবেশিক সেক্রেটারি (১৭ই জুলাই ১৮৬১), ক্যান্টনস্থ ব্রিটিশ কন্সাল W. S. F. Mayers কর্তৃক সুপারিশযুক্ত স্মারকলিপি।

১৩৪ Home Progs. Sep. Rev. ২১শে অক্টোবর ১৮৬১, ৬নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট হংকং-এর ঔপনিবেশিক সেক্রেটারি (১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৬১), Lt. Col. Sarel-এর রিপোর্ট।

১৩৫ Fin. Progs. জুলাই ১৮৭১, স্মারকলিপি, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭১।

১৩৬ Home Sep. Rev. ২২শে জুলাই ১৮৬৩, Foreign (Political) Progs. থেকে উদ্ধৃতাংশ, ৩০শে জুন ১৮৬৩, ৩১৯ নং, ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারির নিকট ব্রিটিশ বার্মার চিফ কমিশনার A. P. Phayre, চিঠিপত্র, ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩; ১লা মে ১৮৬৩; ২০শে নভেম্বর ১৮৬২; ১২ই ডিসেম্বর ১৮৬২।

১৩৭ Jardine Skinner & Co.-এর Mr. Ezra, Jardine Matheson & Co.-এর Mr. Keswick, Apcar & Co., Fin. Progs. July ১৮৭১ দেখুন। স্মারকলিপি, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭১।

১৩৮ Fin. Progs. জুলাই ১৮৭১। পরিশিষ্ট, অর্থ দপ্তরের স্মারকলিপি, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭১।

১৩৯ এই ছিল Sir R. Alcock-এর মত। সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য (১৮৭১), প্রশ্ন ৫,৬৯৬।

১৪০ সিলেক্ট কমিটির সামনে F. J. Halliday-র সাক্ষ্য (১৮৭১), প্রশ্ন ৩,৬৬০-১, ৩,৬৭৭-৯।

১৪১ Argyll-এর নিকট Mayo, ১৭ই অক্টোবর ১৮৬৯ (Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৭, ২৮৫ নং)।

১৪২ 'Friend of India'-র সম্পাদকীয়, ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৬৯। 'পূর্বোক্ত', "সঙ্কটের মধ্যে আফিম রাজস্ব", ৩০শে ডিসেম্বর ১৮৬৯। Arbuthnot-এর নিকট Mayo, ২৩শে আগস্ট ১৮৬৯ (Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৬, ২১০ নং), Messrs. Jardine Skinner Co.-র Skinner-এর মত উল্লেখ করে।

১৪৩ R. Alcock-এর নিকট Mayo, ১৭ই অক্টোবর ১৮৬৯ (Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৭, ২৮৬ নং)।

১৪৪ Argyll-এর নিকট Mayo, ২৩শে জানুয়ারি ১৮৭০, (Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৫, ২৮ নং)।

১৪৫ Earl of Derby-র নিকট Mayo, ৩০শে জানুয়ারি ১৮৭০ (Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৫, ৪০ নং)।

১৪৬ Fin. Progs. জুলাই ১৮৭১, পরিশিষ্ট, অর্থ দপ্তরের স্মারকলিপি, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭১।

১৪৭ Fin. Progs. জুলাই ১৮৭১, Sep. Rev. ২১ নং, বোর্ড অব

রেভিনিউ-এর জুনিয়র সেক্রেটারির নিকট লোয়ার প্রভিন্সেস-এর আফিম পরীক্ষক, ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭০, ২৫ নং, বেনারস আফিম এজেন্টের নিকট Sheppard, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৭০।

১৪৮ Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৭১। Sep. Rev. ৩৯ নং, ভারত সরকারের অর্থ দপ্তরের সেক্রেটারির নিকট Hankow-র কন্সাল G. W. Caine, ৩১শে জুলাই ১৮৭১।

১৪৯ 'পূর্বোক্ত', ১৮৬৯ সালে Szechuen, Yunnan ও Keweichow যথাক্রমে ৬,০০০, ২০,০০০ ও ১৫,০০০ পিকাল [Picul (এক পিকাল ওজনে ১৩৩⅓ পাউণ্ডের সমান)]।

১৫০ Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৭১, Sep. Rev. ২৯ নং, ভারত সরকারের অর্থ দপ্তরের সেক্রেটারির নিকট Hankow-তে এসেছিল, ৩১শে জুলাই ১৮৭১।

১৫১ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

১৫২ Argyll-এর নিকট Mayo, ৩১শে জানুয়ারি ১৮৭০ (Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৫, ৪১ নং)।

১৫৩ B. Frere-র নিকট Mayo, ৩রা জুন ১৮৭০ (Mayo Papers, ৩রা জুন ১৮৭০, ১৫৬ নং)।

১৫৪ Mayo-র নিকট Argyll, ৫ই মে ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৮, ১৪ নং।

১৫৫ Mayo-র নিকট Argyll, ১লা জুলাই ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৮, ১৯ নং।

১৫৬ B. Frere-র নিকট Mayo, ৩রা জুন ১৮৭০ (Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৯, ১৫৬ নং)।

১৫৭ পূর্বোল্লেখিত স্থানে।

১৫৮ L.C. Progs. (পুরানো সিরিজ), ভল্যুম VII, ১৮৬১, পৃষ্ঠা ৩৫১-২, S. Laing-এর অর্থসংক্রান্ত বিবৃতি।

১৫৯ Fin. Progs. জুলাই ১৮৬৯, S.R. ৫৪ নং, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, ২২শে জুলাই ১৮৬৯।

১৬০ ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার অব কমার্স Progs. ১৩ই মার্চ ১৮৬২, Bedford-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, পৃষ্ঠা ২৫, Fin. Progs.

জুলাই ১৮৬৯, S.R. ৫১ নং, ভারতের জন্য আণ্ডার সেক্রেটারির নিকট ডাণ্ডি-র চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি, ৫ই মার্চ ১৮৬৯।

১৬১ ইংল্যাণ্ড থেকে বস্ত্রাদির রপ্তানি (১০ লক্ষ গজের হিসাবে):

	মোট	ভারত
১৮৫০	১,৩৫৮	৩১৪ (২৩·১%)
১৮৬০	২,৭৭৬	৮২৫ (২৯·৭%)
১৮৭০	৩,২৫৩	৯২৩ (২৮·৪%)
১৮৮০	৪,৪৯৬	১,৮১৩ (৪০·৩%)

(বন্ধনীর মধ্যে ৩য় ও ২য় কলামের অনুপাত) Redford-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থে ২২ পৃষ্ঠা দেখুন। অবশ্য এ কথা মনে রাখতে হবে যে এই সংখ্যাগুলি মূল্য প্রকাশ করছে না, পরিমাণ প্রকাশ করছে। দামী ভাল জিনিসপত্র ইয়োরোপ ও আমেরিকার বাজারে রপ্তানি হত।

১৬২ এই সংখ্যার মধ্যে 'বিদেশী' অর্থাৎ অ-ব্রিটিশ জিনিসপত্রও অন্তর্ভুক্ত, এই কালপর্যায়ে 'বিদেশী' বস্ত্রাদি আমদানি ছিল খুবই নগণ্য। উপনিবেশ ও ব্রিটিশ শাসিত এলাকায় ব্রিটিশ সুতীবস্ত্র রপ্তানি সম্পর্কে W. Schlote-র 'British Overseas Trade 1700-1930', পৃষ্ঠা ৯৭ এবং সারণী ২৫, পৃষ্ঠা ১৭২-৪ (অনুবাদ করেছেন W. O. Henderson ও W. H. Chaloner) দেখুন।

১৬৩ Redford পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৬।

১৬৪ Fin. Progs. আগস্ট ১৮৭৫, ১৯-২৭ নং, K.W., পৃষ্ঠা ২০-১। Redford (পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ২৯)। ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার অব কমার্সের কার্য-বিবরণী থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছে: "এখন (১৮৭৪) বোম্বাই-এ ও আশেপাশে ২০টির বেশি সুতোকল ছিল।" মনে হয় এটা ভুল। বোম্বাইতে ১৪টির বেশি সুতোকল ছিল না।

১৬৫ Rev. Progs. ১লা ডিসেম্বর ১,৮৬৩, ২ নং।

১৬৬ Rev. Progs. জুন ১৮৬৪, ২২ নং, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সেক্রেটারির নিকট সদর বোর্ড অব রেভিনিউ-এর সেক্রেটারি, G. M, Batten, ৬ই জানুয়ারি ১৮৬৪।

১৬৭ Rev. Progs. জুন ১৮৬৪, ২৩ নং, ঐ একই, ১৬ই মার্চ ১৮৬৪।

১৬৮ 'পূর্বোক্ত', ১৮৬২-৬৪ সালে নানা কারণের জন্য ইংল্যাণ্ডের কাপড়ের চাহিদা সাময়িকভাবে হ্রাস পেয়েছিল : আভ্যন্তরীণ মুদ্রা বাজারে সংকোচন, "তুলো রপ্তানির আরও লাভজনক ফটকাতে পুঁজির চলে যাওয়া", সূতীবস্ত্রের স্থলে পশম ও শণের কাপড়ের প্রচলন, পূর্বোল্লেখিত স্থানে। জেলা থেকে বিস্তারিত রিপোর্টের ভিত্তিতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের রেভিনিউ বোর্ডের মন্তব্য : Rev. Progs. জানুয়ারি ১৮৬৪, ২৩ নং, (১২ই জানুয়ারি তারিখের সদর রেভিনিউ বোর্ডের সার্কুলার অর্ডার 'এ'-র উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ) এবং Rev. Progs. নভেম্বর ১৮৬৪, ২৪ নং, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের সরকারের সেক্রেটারির নিকট উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারি, W. C. Plodwen, ২৪শে অক্টোবর ১৮৬৪।

১৬৯ Fin. Progs. ডিসেম্বর ১৮৬৪, Sep. Rev. Misc. ৫৭৪ নং, বাংলা সরকারের জুনিয়র সেক্রেটারির নিকট লোয়ার প্রভিন্সেস-এর রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারি, ২৮শে নভেম্বর ১৮৬৪, 'পূর্বোক্ত', ৫৭৫ নং। ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট অযোধ্যার চিফ কমিশনারের সেক্রেটারি, ২২শে ডিসেম্বর ১৮৬৪। Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৬৫, Sep. Rev. Misc. ৫৩ নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট মধ্যপ্রদেশের চিফ কমিশনারের সেক্রেটারি, ২১শে ডিসেম্বর ১৮৬৪।

১৭০ Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৬৫, Sep. Rev. Misc. ৫৩ নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট মধ্যপ্রদেশের চিফ-কমিশনারের সেক্রেটারি, ২১শে ডিসেম্বর ১৮৬৪।

১৭১ L.C.A. Progs. ১৮৬৩, ভল্যুম II (নতুন সিরিজ), পৃষ্ঠা ৮২।

১৭২ কলিকাতার নিকটে পাটকল পরিচালনায় রত স্কটল্যাণ্ডের লোকেদের মত কতিপয় মালিকদের ভিন্ন মত ছিল।

১৭৩ Home S.R. ৩১শে মার্চ ১৮৬২, ৭নং, স-পরিষদ গভর্নর জেনারেলের নিকট বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি W.S. Fitzwilliam, ২৭শে মার্চ ১৮৬২।

. Progs. (পুরানো সিরিজ), ভল্যুম VI. ১৮৬০, পৃষ্ঠা ১১৫-১২।

১৭৫ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ৬৬নং, ৬ই এপ্রিল ১৮৬৫। ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ১১৪ নং, ৯ই মে ১৮৬৫।

১৭৬ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin- ১১৪ নং, ৯ই মে ১৮৬৫। ভারত সরকার নিজেই রপ্তানি শুল্ক বাতিল করার পর সেক্রেটারি অব স্টেট স্বস্তি বোধ করলেন। Lawrence-এর নিকট Wood ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৫, Lawrence Papers, সেক্রেটারি অব স্টেটের চিঠি, ভল্যুম II, ৫০ নং।

১৭৭ Lawrence-এর নিকট Wood, ১২ই আগস্ট ১৮৬৫, Lawrence Papers, সেক্রেটারি অব স্টেটের চিঠিপত্র, ভল্যুম II, ৪৫ নং। Wood লিখেছিলেন যে তিনি নীতিগতভাবে রপ্তানি শুল্কের বিরোধী নন, কিন্তু আয়কর তুলে নেওয়া এবং ক্ষতিপূরণের জন্য রপ্তানি শুল্ক চালু করা ভুল হয়েছিল।

১৭৮ ১৮৬০ সালের অ্যাক্ট X, ১৮৬২ সালের অ্যাক্ট XI এবং XXIII।

১৭৯ Home S.R. ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮৬২, অর্থসংক্রান্ত দপ্তরে ভারত সরকারের মন্তব্য, ৯ই এপ্রিল ১৮৬১। যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক-নীতি পর্যালোচনা করার সময় ভারত সরকার এ কথা বিবেচনা করেছিল যে যন্ত্রপাতিকে সম্পূর্ণ রেহাই দেওয়া হবে (১৮৪৫ সালের সিদ্ধান্ত অনুসারে) না কতকগুলি নির্দিষ্ট ধরনের যন্ত্রপাতিকে রেহাই দেওয়া হবে (১৮৫৯ সালের অ্যাক্ট VII-এর অধীনে যেমন ছিল)। ১৮৬০ সালের অ্যাক্ট X সকল যন্ত্রপাতিকে রেহাই দিয়েছিল এবং ১৮৬০ সালের জুলাই মাসে এক হুকুমনামা বলে জাহাজের হালের লৌহ প্লেটকে রেহাই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু Spooner শুল্ক কমিটি (Home S.R. সেপ্টেম্বর ১৮৬২, ১৩ নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট R. Spooner, ১৩ই জানুয়ারি ১৮৬১) প্রস্তাব করেন যে শুল্ক রেহাইকে নির্দিষ্ট ধরনের যন্ত্রপাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে হবে। এই প্রস্তাব গৃহীত হয় (Home S.R. এপ্রিল ১৮৬১, ১৪নং, অর্থসংক্রান্ত দপ্তরে ভারত সরকারের প্রস্তাব, ৯ই

এপ্রিল ১৮৬১) কৃষি, জাহাজ চলাচল, খনির যন্ত্রপাতি ও রেলপথের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিকে শুধুমাত্র রেহাই দেবার জন্য ১৮৬২ সালের অ্যাক্ট XI সংশোধিত হয় (Home S.R. আগস্ট ১৮৬২, ২৬ নং, ভারত সরকারের প্রস্তাব, ১৮ই আগস্ট ১৮৬২)।

১৮০ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ৭৩ নং, ৮ই মার্চ ১৮৬৭। ১৮৭৫ সালে শুল্ক কমিটি যন্ত্রপাতির উপর শুল্ক বসাবার প্রস্তাব দিয়েছিল। একটি চিত্তাকর্ষক আলোচনা আরম্ভ হয়েছিল। শুল্ক কমিটি এই যুক্তি দিয়েছিল যে ইউরোপীয় যন্ত্রপাতি আমদানিতে উৎসাহ দেবার জন্য গোড়ায় যে 'প্রশ্রয়' দেওয়া হয়েছিল তা অব্যাহত রাখার কোনও কারণ নেই। এর বিরুদ্ধ মত ছিল যে "অতিরিক্ত জনাধিক্য থেকে উদ্ভূত যেসব সামাজিক অসুবিধা দেখা দিতে পারে তার মোকাবিলা করার জন্য অপরাপর জিনিসের চেয়ে বেশি করে কোনও একটা জিনিসের প্রতি যদি আমাদের নজর দিতে হয় তা হল একটা শিল্পোৎপাদক শ্রেণীর সৃষ্টি এবং জমি যথাযথ-ভাবে যত লোক প্রতিপালন করতে পারে তার চেয়ে দ্বিগুণ লোককে খাওয়ানোর থেকে তাকে রেহাই দেওয়া।" (Fin. Progs. ১৮৭৫ সালের আগস্ট, ২০ নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট শুল্ক কমিটির সেক্রেটারি, ১৮৭৫ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি, এবং Ashley Eden-এর নোট, তারিখ বিহীন, K.W. পৃষ্ঠা ৯, Fin. Progs. আগস্ট ১৮৭৫, ১৯-২৭ নং)।

১৮১ Fin. Progs. ১৮৬৭, শুল্ক কমিটির রিপোর্ট, ৭ই জানুয়ারি ১৮৬৭, Minute-এ J. A. Crawford-এর মতভেদ লিপিবদ্ধ। Fin. Progs. S.R. মার্চ ১৮৬৬, ৪৮২ নং, ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. S.R. ১৫ নং, সেপ্টেম্বর ১৮৬৫।

১৮২ S. B. Saul-এর 'Studies in British Overseas Trade 1870-1914' (Liverpool, 1960), পৃষ্ঠা ১৯২।

১৮৩ Fin. Progs. জুলাই ১৮৬৯, S.R. ৫১ নং, ভারতের জন্য আণ্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট-এর নিকট ডাণ্ডির চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি R. Sturrock, ৫ই মার্চ ১৮৬৯।

১৮৪ Fin. Progs. জুলাই ১৮৬৯, S.R. ৫৪ নং, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, ২২শে জুলাই ১৮৬৯।

১৮৫ Fin. Progs. S.R. জানুয়ারি ১৮৬৭, ১১ নং, বাংলার লেফট্যানাণ্ট গভর্নরের Minute, ২৮শে নভেম্বর ১৮৬৬, ১৮৬৭ সালের ১৬ই জানুয়ারি ভারত সরকারের নিকট প্রেরিত। Fin. Progs. S.R. মার্চ ১৮৬৭, ১০ নং, ভারত সরকারের অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারির নিকট বাংলা সরকারের জুনিয়র সেক্রেটারি, ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭।

১৮৬ Fin. Progs, S.R. মার্চ ১৮৬৭, ৪ নং, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, ২১শে ডিসেম্বর ১৮৬৬।

১৮৭ Fin. Progs. S.R. এপ্রিল ১৮৬৭, ২৬ নং, ব্রিটিশ বার্মার চিফ কমিশনারের নিকট ব্রিটিশ বার্মার বণিকবৃন্দ, ২০শে মার্চ ১৮৬৭, 'পূর্বোক্ত' ২৭ নং, টেনাসেরিম ডিভিশনের কমিশনারের নিকট মৌলমিন-এর বণিকবৃন্দ। Fin. Progs. S. R. মার্চ ১৮৭১, ২৫ নং, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট লিভারপুলের ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাশোসিয়েশনের সেক্রেটারি, ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৭১।

১৮৮ Fin. Progs. S.R. মার্চ ১৮৭১, ২৩ নং, ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, ১০ই মার্চ ১৮৭০।

১৮৯ Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৭৩, ৪ নং, স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেলের হুকুমনামা, ৪ঠা জানুয়ারি ১৮৭৩।

১৯০ S. B. Saul-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ১৯৭-৮।

১৯১ ভারতীয় অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির সামনে Sir Cecil Beadon-এর সাক্ষ্য, P.P.H.C. ১৮৭১, ভল্যুম ৮, কোড ৩৬৩, ২,৮৭৪-৯০১।

১৯২ 'পূর্বোক্ত', ২৯০৪-০৪, Home Progs. ১০ই জুন ১৮৬৩, Sep. Rev. ৮ নং, রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারির নিকট বাংলা সরকারের সেক্রেটারি, ১৬ই এপ্রিল ১৮৬৩।

১৯৩ P.P.H.C. ১৮৭১, ভল্যুম ৮, কোড ৩৬৩, ২,৯২৬-৮।

১৯৪ Home Progs. ১৮ই মার্চ ১৮৬১, Sep. Rev. ২০ নং, বাংলা

সরকারের সেক্রেটারির নিকট ভারত সরকারের সেক্রেটারি W. Grey, ১৮ই মার্চ ১৮৬১।

১৯৫ P.P.H.C. ১৮৭১, ভল্যুম ৮, কোড ৩৬৩, ২,৯৮১-৯৯।

১৯৬ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Sep. Rev. Despatch ২০ নং, ১৫ই আগস্ট ১৮৫৯।

১৯৭ Home Progs. ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৮৬০, Sep. Rev. ২ নং, ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট। Sep. Rev. Despatch ১৬ নং, ১৯শে ডিসেম্বর ১৮৫৯।

১৯৮ Home S.R. Progs. ১১ই এপ্রিল ১৮৬২, ৬ নং, বাংলা সরকারের সেক্রেটারির নিকট রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারি, A. Eden, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬২।

১৯৯ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ৩৮ নং, ৭ই মার্চ ১৮৬২।

২০০ P.P.H.C. ১৮৭১, ভল্যুম ৮, কোড ৩৬৩, ৩,১৭০-৫।

২০১ ভারতীয় অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির সামনে W. G. Pedder-এর সাক্ষ্য, P.P.H.C. ১৮৭১, ভল্যুম ৮, কোড ৩৬৩, ৪,১৪০-৭। Home Progs. ২০শে এপ্রিল ১৮৬১, Sep. Rev. ২০ নং, বোম্বাই সরকারের সেক্রেটারির নিকট ভারত সরকারের সেক্রেটারি, ২০শে এপ্রিল ১৮৬১। Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৬৫, Sep. Rev. ৩০৯ নং, ভারত সরকারের অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারির নিকট বোম্বাই সরকারের সেক্রেটারি, ৭ই জানুয়ারি ১৮৬৫। Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬৯। Sep. Rev. ৬ নং, পূর্বোক্ত ৩৮ নং, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ২৪৯ নং, ৪ঠা অক্টোবর ১৮৬৯।

২০২ ভারতীয় অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির সামনে Sir T. Pycroft-এর সাক্ষ্য, P.P.H.C. ১৮৭১, ভল্যুম ৮, কোড ৩৬৩, ৩,৬৮৯-৯৭।

২০৩ Home Progs. ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৯, Sep. Rev. ২৯ নং, মাদ্রাজ রেভিনিউ বোর্ডের কার্য-বিবরণী থেকে উদ্ধৃতাংশ, ২৭শে [illegible] ১৮৬৩, Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬৯, Sep. Rev. ৩৩ নং, ভা [illegible]

সরকারের সেক্রেটারির নিকট মাদ্রাজ সরকারের সেক্রেটারি, ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৯। Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬৯। Sep. Rev. ৩৮ নং, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ২৪৯ নং, ৪ঠা অক্টোবর ১৮৬৮।

২০৪ J. Strachey-র নিকট Mayo, ১০ই জানুয়ারি ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৫, ১০ নং, Mayo যোধপুরের উপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করবেন স্থির করেছিলেন এবং তিনি ভেবেছিলেন যে লবণের দর কমিয়ে বিক্রি করবেন ও যোধপুরের লবণ ব্রিটিশ-ভারতীয় রেলপথে বহন করতে অস্বীকার করবেন। A. O. Hume লবণ হ্রদ লীজ নেবার ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৭০, Exp. ৪ নং, ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট আভ্যন্তরীণ শুল্ক কমিশনার, A. O. Hume।

২০৫ লবণ বিভাগের প্রশাসন সম্পর্কে W. G. Pedder-এর রিপোর্ট দেখুন, ৩০শে জুলাই ১৮৭০। Fin. Progs. জুন ১৮৭১, Sep. Rev. ৮০ নং, Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৬৬, ৪৫ নং, লবণ ও চিনি শুল্ক সংগ্রহের জন্য নিয়মাবলী। J. ও R. Strachey-র 'Finances & Public Works of India 1869-81' (London, 1881), পৃষ্ঠা ২১৯।

২০৬ Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬৮, Sep. Rev. ১৯ নং, R. Temple-এর Minute, ১১ই আগস্ট ১৮৬৮। Mansfield, Durand, Maine ও Strachey Temple-এর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন, আর Lawrence ছিলেন পক্ষে। সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Sep Rev. Despatch ২৫ নং, ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৮। Temple-এর পরিকল্পনা বাংলায় শুল্ক কমিয়ে দেবে এবং ফলস্বরূপ রাজস্বের ক্ষতি হবে এই তথ্যই ছিল এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি, Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬৮, S.R. ২১ নং, H. M. Durand-এর Minute, ১৭ই আগস্ট ১৮৬৮; 'পূর্বোক্ত' ২৭ নং, H. S. Maine-র Minute, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৮।

২০৭ Fin. Progs. নভেম্বর ১৮৭৮। Sep. Rev. ৩৫০-৭৭ নং,

পার্ট বি, Fin. Progs. Feb. ১৮৭৯, Expend. ২৯২-৩।

২০৮ Mayo-র নিকট J. Strachey দেখুন, ৩রা জুলাই ১৮৬৯, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৬, ১৪১ নং (enclosure)।

২০৯ Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬৮, ২৩ নং, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি থেকে রাজপুতানায় অথবা শুল্ক সীমারেখা পেরিয়ে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলে চিনি রপ্তানির ব্যাপারে শুল্ক সম্পর্কে ১৮৬৮ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরে লেখা J. Strachey র Minute। Fin. Progs. মার্চ ১৮৭১। Sep. Rev. ১৪-২২ নং এবং পাঞ্জাবে চিনির উপর শুল্ক সম্পর্কে কৃষি, রাজস্ব ও বাণিজ্য দপ্তরের কার্য-বিবরণী, নভেম্বর ১৮৭১, ১-৩ নং। Home Progs. ১১ই অক্টোবর ১৮৬১। Sep. Rev. ৪১ নং। সকল প্রাদেশিক সরকারের নিকট C. Beadon-এর সার্কুলার, ২১শে মার্চ ১৮৫৯। Fin. Progs. ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩, Accts. নং ২, তামাকের উপর শুল্ক বসানোর পরিকল্পনা পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারত সরকারের ১৮৬৩ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারির প্রস্তাব। Fin. Progs. ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮। Sep. Rev. ২৬ নং। তামাক কর চাপাবার বিরুদ্ধে J. Strachey-র স্মারকলিপি, ২১শে অক্টোবর ১৮৬৫।

২১০ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ২ নং, ২১শে জানুয়ারি ১৮৬৯।

২১১ Fin. Progs. জুন ১৮৭১, Sep. Rev. ৮০ নং, বোম্বাই সরকারের সেক্রেটারির নিকট W. G. Pedder (লবণ বিভাগের রিপোর্ট), ৩০শে জুলাই ১৮৭০।

২১২ Fin. Progs. জুন ১৮৬১। Accts. নং ৬১। গভর্নর-জেনারেলের নিকট কলকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যাবৃন্দ, ৫ই জুন ১৮৬১।

২১৩ Rev. Progs. জুন ১৮৬৭, ৫০ নং, অর্থ দপ্তরের সেক্রেটারির নিকট বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি, H. W. I. Wood, ৩১শে মে ১৮৬৭।

২১৪ Fin. Sep. Rev. Progs. ২১ নং, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, ২০শে এপ্রিল ১৮৬৭।

২১৫ Mayo-র নিকট R. Temple, ২০শে অক্টোবর ১৮৭১। Mayo Papers, বাণ্ডিল ৬১ (সংখ্যার উল্লেখ নেই)।

২১৬ James Wilson-এর নিকট Lord Canning (২২শে নভেম্বর ১৮৫৯), Barrington II, পৃষ্ঠা ২০৬। Walter Bagehot-এর নিকট J. Wilson, (১৫ই নভেম্বর ১৮৫৯), Barrington II, পৃষ্ঠা ১৯৪-৫।

২১৭ J. Wilson-এর 'Financial Statement' (Calcutta, 1860), পৃষ্ঠা ১৫।

২১৮ 'পূর্বোক্ত', পৃষ্ঠা ৩১।

২১৯ J. Wilson এর নিকট Canning, ৩১শে জানুয়ারি ১৯৬০, Barrington-এর পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থ, II, পৃষ্ঠা ২২৩-৪।

২২০ J. Wilson-এর নিকট Canning, ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬০, 'পূর্বোক্ত', পৃষ্ঠা ২২৫-৭।

২২১ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, ৩রা এপ্রিল ১৮৬০, Fin. ৫৫ নং।

২২২ J. Wilson-এর নিকট Lord Canning, ১৮ই মার্চ ১৮৬০, Barrington পূর্বোল্লখিত গ্রন্থ, II, পৃষ্ঠা ২৭৪-৫।

২২৩ J. Wilson-এর নিকট Lord Canning, ১৩ই মার্চ ১৮৬০, Barrington, II, পৃষ্ঠা ২৭২। ১৩ই মার্চ তারিখে J. Wilson-এর নিকট Canning-এর তারবার্তা: "সৈন্য বাহিনীর উপর আয়করের ফলাফল সম্ভবতঃ গুরুতর সমস্যা হয়ে উঠবে। এ ব্যাপারে সরকারকে কতটা অঙ্গীকারবদ্ধ করবেন সে বিষয়ে সাবধান থাকবেন", 'পূর্বোক্ত', পৃষ্ঠা ২৭২।

২২৪ Legislative Council Progs. ১৪ই এপ্রিল ১৮৬০, ভল্যুম VI (পুরানো সিরিজ)।

২২৫ J. Wilson-এর 'Financial Statement' (Calcutta, 1860), পৃষ্ঠা ২০।

২২৬ 'Petition against Income Tax of Zaminders of Bengal, Bihar and Orissa to Parliament (Calcutta, 1861)। ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, ২রা আগস্ট ১৮৬১,

Fin. ১২১ নং। সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, ৬ই জুন ১৮৬১, Fin. ১০৬ নং।

২২৭ ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেট, ২রা আগস্ট ১৮৬১, Fin. ১২১ নং।

২২৮ ১৭৯৩ সালের রেগুলেশন XIX-এর প্রথম বাক্যটি নিম্নরূপ : "দেশের প্রাচীন আইন অনুযায়ী দেশের রাজশক্তি প্রতি বিঘার ফলনের একটা নির্দিষ্ট অংশ পাবার অধিকারী, স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী তা ফসলে অথবা মুদ্রায় দাবি করা যেতে পারে।" ১৭৯৩ সালের VIII রেগুলেশন-এ একটি অংশ (৭৫ তম) ছিল, তাতে বিধান দেওয়া হয়েছিল যে এমনভাবে এর পরিমাণ ধার্য করতে হবে যাতে সরকারকে জমির মালিক যা দেবে তার প্রায় ১০ শতাংশের সমপরিমাণ মালিকের নিজের জন্য থাকতে পারে। এই ব্যবস্থা ও বিবৃতির ব্যাখ্যা করা হত এইভাবে যে ভূমি থেকে রাজস্বের অধিকার রাষ্ট্রের পক্ষে সহজাত ছিল, অর্থাৎ ভূমি রাজস্ব কোনও কর ছিল না।

২২৯ Home Rev. Progs. ১৮৬০ জুলাই ২৪, ৪১ নং, বর্ধমানের মহারাজার নিকট থেকে চিঠি, ৩রা মে ১৮৬০। Rev. Progs. ১৮৬০, ১৮ই মে, ৬ নং, বর্ধমানের মহারাজাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভারত সরকারের প্রস্তাব। ১৮৬০ সালের ২৬শে জুলাই ভারত সরকারের নিকট সেক্রেটারি অব স্টেটের পক্ষ থেকে সরকারি বার্তা। বর্ধমানের মহারাজাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে Fin. ১১৫ নং।

২৩০ Wilson ছিলেন অতিরিক্ত আশাবাদী এবং বাধাকে খাটো করে দেখেছিলেন। W. Bagehot-এর নিকট Wilson, ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬০, Barrington II, পৃষ্ঠা ২৩২-৩।

২৩১ J. Wilson-এর নিকট Lord Canning, ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬০, Barrington II, পৃষ্ঠা ২২৫-৭।

২৩২ Home Rev. Progs. ১০ই আগস্ট ১৮৬০, ৯ নং।

২৩৩ James Wilson-এর নিকট Charles Wood ২৬শে মার্চ ১৮৬০, Barrington II, পৃষ্ঠা ২৩৮।

২৩৪ Walter Bagehot-এর নিকট James Wilson, ১৫ই নভেম্বর ১৮৫৯, 'পূর্বোক্ত', II, পৃষ্ঠা ১৯৪-৫।

২৩৫ Home Rev. Progs. ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৬০, ৩৯ নং, কমিটি নিয়োগ করে ভারত সরকারের প্রস্তাব। Rev. Progs. অক্টোবর ২০, ১৮৬০, ৩৫ নং। কমিটির রিপোর্ট।

২৩৬ Home Rev. Progs. ৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৬০, ১৫ নং, (পার্সি বিভাগ)। ভারতের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যদের নিকট নোরয়াদ জেলা কয়রার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে দরখাস্ত, ১৫ই জুন ১৮৬০।

২৩৭ Home Rev. Progs. ২০শে অক্টোবর ১৮৬০, ৪২ নং। ভারত সরকারের নিকট বাংলা সরকারের সেক্রেটারি, ২রা অক্টোবর ১৮৬০।

২৩৮ Home Rev. Progs. ২০শে অক্টোবর ১৮৬০, ৪৪ নং।

২৩৯ Home Rev. Progs. ৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৬০, ১৫ নং।

২৪০ Robert Knight F.S.S.-এর 'Financial Science in India as illustrated by the Income Tax' (Bombay, 1870)।

২৪১ Fin. Progs. ৯ই মে ১৮৬৩, Accts. নং ২৬৫।

২৪২ S. Laing-এর 'Financial Statement' (Calcutta. 1861)।

২৪৩ Fin. Progs. ১৮৬৪, জুলাই। Accts নং ১৬৪।

২৪৪ 'হিন্দু পেট্রিয়ট', ২০শে জুলাই ১৮৬৪।

২৪৫ গভর্নর-জেনারেলের Minute (তারিখ দেওয়া নেই) Fin. Progs. মে ১৮৬৪, Accts. নং ৫৬।

২৪৬ B. Frere-র Minute, ৮ই ডিসেম্বর ১৮৬৪, Fin. Progs. ডিসেম্বর ১৮৬৪, Accounts নং ৪।

২৪৭ কর নিরূপণ করার প্রক্রিয়াটি ছিল বহু ব্যয়সাপেক্ষ : এই পরিচ্ছেদের শেষে দেখুন।

২৪৮ ১৮৬০ সালে নিরূপিত করের হার পাঁচ বছর পরে অচল হয়ে গিয়েছিল, এর বিশেষ কারণ ছিল ১৮৬১-৬৪ সালে তুলার হঠাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি।

২৪৯ Fin Progs. ১৮৬৫ এপ্রিল, Accounts ৬৭ নং।

২৫০ Napier-এর নিকট Mayo, ১৬ই জানুয়ারি ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৯, ২৩৪ নং।

২৫১ Argyll-এর নিকট Mayo, ৫ই জুলাই ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৯, ৪৫৩ নং।

২৫২ অর্থসংক্রান্ত বিবৃতি। L.C.A. Progs. ১৮৬৫, ভল্যুম IV (নতুন সিরিজ) পৃষ্ঠা ১৬৯। Charles Wood আয়কর বাতিল করার বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু তাঁর তারবার্তা সময়মত কলকাতায় পেঁছিয় নি। J. Lawrence-এর নিকট C. Wood, ১০ই এপ্রিল ১৮৬৫। সেক্রেটারি অব স্টেটের পক্ষ থেকে চিঠিপত্র, ভল্যুম II, ২৭এ নং।

২৫৩ L.C.A. Progs. ভল্যুম VIII (নতুন সিরিজ), পৃষ্ঠা ১০৫।

২৫৪ Home Rev. Progs. এপ্রিল ১৮৬৭, ২০ নং, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ক্যালকাটা ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দরখাস্ত, ২২শে এপ্রিল ১৮৬৭।

২৫৫ Home Rev. Progs. এপ্রিল ১৮৬৭, ১৯ নং, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট কলকাতার অধিবাসীদের স্মারকলিপি, (তারিখ নেই)।

২৫৬ Home Rev. Progs. এপ্রিল ১৮৬৭, ৭ নং, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারির নিকট বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি, ২২শে মার্চ ১৮৬৭।

৫

অলক্ষ্মীর ছদ্মমুখ

জাতটার হাল কেমন হল ?
আর করেই বা কি ?
ওহে, এসো, জলদি বল,
খবর কিছু আছে নাকি ?

—রুডিয়ার্ড কিপলিং

'অলক্ষ্মীর ছদ্মমুখ'
(Departmental Ditties and Barrackroom Ballads)

জননেতাদের ভাষণ অথবা রচনা থেকে বিচ্ছিন্ন টুকরো ও সংবাদপত্র থেকে টুকিটাকি বেছে নেওয়া এবং চিন্তার একটা ছককে "জনমত" বা "জাতীয়তা-বাদী ভাবধারা" হিসাবে উপস্থিত করাটা বিপজ্জনকভাবে সহজ। এই রকম একটা প্রয়াস বিপজ্জনক এই দিক থেকে যে তাতে আমরা বিভিন্ন ভাবধারা ও মতামতের জগাখিচুড়ির উপর মিথ্যা সঙ্গতি আরোপ করে ভুল করে ফেলতে পারি। আলোচ্য সময়ে জাতীয়তাবাদী বলে আখ্যা দেবার মত কোনও একটা সঙ্গতিপূর্ণ ভাবধারা ছিল না এ একটা সম্ভাব্য উপপাদ্য। তথাপি "দেশীয়" বা ভারতীয় মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলিতে অথবা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন কিংবা ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের মত বেসরকারি সংস্থাগুলি কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা অথবা সভাগুলিতে প্রজাপুঞ্জের কাছ থেকে শাসকদের কাছে মাঝে মাঝে পেস করা স্মারকলিপি ও দরখাস্ত-গুলিতে এবং দাদাভাই নওরোজি, কৃষ্টদাস পাল, হরিশ মুখার্জি ও জনগণের অপরাপর মুখপাত্রদের রচনায় প্রকাশমান ভাবধারা ও মতামতগুলির ভিতর দিয়ে একটা ছক যে জেগে উঠেছিল তা আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি নে। ওয়াকিবহাল জনমত তখনও অঙ্কুরোদ্গমের স্তরে। বোম্বাই ও বাংলার সামান্য কয়েকটি পত্রিকা বাদে দেশীয় সংবাদপত্র ওয়াকিবহাল সমালোচনা উপস্থিত করতে পারত না। রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থার মত এ রকম একটা

প্রায়োগিক এবং সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য বিষয় সম্পর্কে এ কথা বিশেষ করে সত্য। তথাপি মতামতের কতকগুলি প্রধান ঝোঁক ছিল যা সংবাদপত্র-গুলিকে বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত করত এবং অর্থ-বিষয়ক ও অর্থনীতি-বিষয়ক কর্মনীতি সম্পর্কে কিছু-কিছু ধারণা রূপ নিতে শুরু করেছিল—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অস্তিত্বের গোড়ার দিককার ভাবধারাগুলির সঙ্গে যেগুলির পারিবারিক সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

আলোচ্য সময়ে অর্থ-বিষয়ক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কয়েকটি সমস্যাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত। প্রথমতঃ করভারের প্রশ্ন এবং ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্পর্কিত জীবনযাত্রার মান, কর দেবার ক্ষমতা, করের পরিমাণ, ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, কর ধার্যের সঙ্গে 'প্রতিনিধিত্বকে' যুক্ত করার শ্লোগানের মধ্যে মূর্ত বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রশ্নগুলিও ছিল।

যদিও সমসাময়িক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রচনায় আমরা জনগণের কর দেবার ক্ষমতা, অতিরিক্ত করভার, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি বিষয়ে ভাসা ভাসা সাধারণ বিবৃতি দেখতে পাই, কিন্তু এই সব সাধারণ বিবৃতির সত্যতাকে পরিসংখ্যান দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার সামান্যই চেষ্টা দেখা যায়। জাতীয় আয়ের কোনও সঠিক হিসাবের অভাবে কর দেবার ক্ষমতার হিসাব (মাথা-পিছু গড় আয় এবং গড় করভারের তুলনার ভিত্তিতে) আন্দাজি হতে বাধ্য। এই সময়ে গড় জাতীয় আয় সংক্রান্ত একমাত্র সরকারি বিবৃতি পাওয়া গিয়েছিল ভারতের জন্য আণ্ডার-সেক্রেটারি অব স্টেট Mr. Grant Duff-এর কাছ থেকে। ১৮৭১ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি হাউজ অব কমন্স-এ অর্থ-বিষয়ক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন যে "ব্রিটিশ-ভারতের বাৎসরিক আয় ৩০ কোটি পাউণ্ড বলে অনুমিত হয়েছে।" গড় জাতীয় আয় মাথাপিছু ২ পাউণ্ড (=২০ টাকা)।[১] প্রায় দু বছর পরে দাদাভাই নওরোজি ১৮৬৭-৬৮ সালের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে জাতীয় আয়ের একটা হিসাব তৈরী করেন।[২] নওরোজি "প্রত্যেক প্রদেশের বাৎসরিক কৃষি উৎপাদনের হিসাব করেন এবং চলতি দরের ভিত্তিতে তার বর্তমান মূল্য বের করেন, তার সঙ্গে অ-কৃষিজাত আয়ের একটা অত্যন্ত আনুমানিক হিসাব যোগ দেন—কম করে ধরার ভুল এড়ানোর জন্য বেশ খানিকটা বেশি করে ধরেন।" যান-বাহন, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক ইত্যাদির আয় ধরতে তিনি অস্বীকার করেন এই যুক্তিতে যে সে (আয়) প্রকৃত আয় নয়, ইতিমধ্যে সৃষ্ট আয় আত্মসাৎ

করা। তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ব্রিটিশ-ভারতে ১৭ কোটি লোকের দরুন মোট জাতীয় আয় হল ৩,৪০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাথাপিছু গড় আয় হল ২০ টাকা। নওরোজির এই পদ্ধতি যদিও কেতাদুরস্ত ছিল না এবং জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা সম্বন্ধে তাঁর ধারণাগত একটা বৈশিষ্ট্য ছিল (যথা সার্ভিস সেক্টরকে বাদ দেওয়া) তবু তাঁর এই হিসাবই হল আমরা যা পাচ্ছি তার মধ্যে সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য।[৩] 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট'-এর সম্পাদক Robert Knight ১৮৭১ সালে বললেন যে গড় জাতীয় আয় বছরে প্রায় ৬ পাউণ্ড (=৬০ টাকা)।[৪] কিন্তু এই অঙ্কে কি করে পেঁছিলেন তা তিনি বলেন নি। সুপরিচিত ব্রিটিশ র‍্যাডিকাল রাজনীতিবিদ Hyndman ১৮৮৬ সালে পাঁচ জনের একটা পরিবারের বাৎসরিক আয় ধরেছিলেন ৮ পাউণ্ড, তাঁর এই দাবির ভিত্তি কি ছিল তাও সমানই অনিশ্চিত।[৫]

জনসংখ্যার মাথাপিছু গড় করভারের হিসাবের মধ্যে ব্যাপক তারতম্য দেখা যায়। 'টাইমস অব ইণ্ডিয়ার' মতে ১৮৬৩ সালে মাথাপিছু বাৎসরিক কর ১০ থেকে ১২ আনার মধ্যে থাকত।[৬] ১৮৬১ সালে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' হিসাব করেছিল যে সারা ভারতের জন্য মাথাপিছু গড় করভার হল ৫ শিলিং ৩ পেন্স (=২ টাকা ১০ আনা), প্রদেশ থেকে প্রদেশে অনুপাতের তফাত ছিল—বাংলায় ৩ শিলিং ৬ পেন্স (=১ টাকা ১২ আনা) থেকে পেগুতে ৯ শিলিং (=৪ টাকা ৮ আনা) পর্যন্ত।[৭] ১৮৬৮ সালে এই একই পত্রিকা হিসাব করেছিল যে বাৎসরিক মাথাপিছু করভার হল ৬ শিলিং (=৩ টাকা)।[৮] বোম্বাইয়ের 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট' অনুমান করেছিল যে ১৮৭১ সালে করভার ছিল মাথাপিছু মাত্র ১ শিলিং ১০ পেন্স (=১৫ আনা)।[৯] প্রায় এক দশক পরে Hyndman প্রায় সমানই আনুমানিক একটা হিসাব করেন, তা হল পাঁচ জন লোকওয়ালা একটা গড় ভারতীয় পরিবার কর ও রাজস্ব মিলিয়ে সরকারি খরচের জন্য প্রায় ২ পাউণ্ড (=২০ টাকা) করে দিয়ে থাকে।[১০] এই সব অনুমানের মধ্যে এত তারতম্য যে প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলোর উপর নির্ভর করা যায় বলে মনে হয় না। তারতম্যের কারণ হল ধারণাগত পার্থক্য। কেউ কেউ ভূমি রাজস্বকে খাজনা বলে এবং ফলতঃ সরকারি আয়ের করবহির্ভূত উৎস বলে গণ্য করেছেন। আবার অপর দিকে অন্য কিছু লোক সরকারি কাজের জন্য

বাৎসরিক জাতীয় আয় থেকে যে কোনও বিয়োগকেই কর বলে গণ্য করেছেন; এই সংজ্ঞা অনুযায়ী ভূমি রাজস্বকে কর বলে ধরা হয়েছে। কাজেই ভূমি রাজস্বের চরিত্রের সংজ্ঞা নির্ণয়ে পার্থক্যই এই সব হিসাবগুলিকে গোলমাল করে দিয়েছিল, কারণ করভারের হিসাব থেকে ঐ খাতটির বাদ দেওয়া (বা যোগ করা) অনুমিত হিসাবকে বিপুল পরিমাণে কমিয়ে (বা বাড়িয়ে) দিতে বাধ্য।

গড় জাতীয় আয়ের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে গড় করভারের কোনও নির্ভরযোগ্য হিসাব না থাকায় সমসাময়িক ভাষ্যকারদের জনগণের জীবন-যাত্রার মান ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর উপর রাজস্বের ভার কতটা পড়েছিল সে বিষয়ে সাধারণ বর্ণনার উপর নির্ভর করতে হত। সরকারি মত ছিল যে দেশটা একটা দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং জাতীয় আয়ে রাষ্ট্রের অংশ আপনা থেকে বাড়বে। ১৮৬০ সালে সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে প্রেরিত বার্তায় ভারত সরকার জোর দিয়ে বলেছিল যে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার, পাব্লিক কোম্পানিগুলিতে ইউরোপীয় ও দেশীয় উভয় ধরনের মূলধন নিয়োগ, ভূমিজাত সামগ্রীর পরিমাণ ও মূল্যে বৃদ্ধি, মজুরির হার বৃদ্ধি ইত্যাদি "অভূতপূর্ব সমৃদ্ধির অবস্থা" সূচিত করছে।[১১] কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের আশ্রয়ে এই নতুন সমৃদ্ধির দ্বারা যে শ্রেণী প্রধানতঃ উপকৃত হয়েছিল কর দেওয়ার ব্যাপারে তারা করভারের যথাযোগ্য অংশ বহন করছে না। "নিঃসন্দেহে সব শ্রেণীই উপকৃত হয়েছে এবং এদের মধ্যে কৃষি উৎপাদন থেকে আয় যাদের তারা বেশ উপকৃত হয়েছে, কিন্তু তুলনাতীতভাবে প্রধান উপকার বর্তেছে পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর কাছে। আর তাই যদি হয় তা হলে—অবিচার না-ও যদি বলা হয়—কি রকম একটা অনিয়ম আমাদের ব্যবস্থাকে ছেয়ে ফেলেছে। বহু খরচ করে সরকার তাদের যেসব সুবিধা দিয়েছে তার জন্য এই শ্রেণী রাষ্ট্রকে সামান্যই দেয় শুধু তাই নয়, তাদের এমন কোনও ব্যবস্থার অধীনে আনারও চেষ্টা হয় নি যাতে এই সব সুবিধার খরচের ন্যায্য অংশ তাদের বহন করতে হয়।" সরকার এমন একটা রাজস্ব ব্যবস্থার প্রয়োজন বোধ করত "যা সমগ্র (সমাজের) উপর করের ভার আরও সমভাবে ফেলবে এবং এমন এক ধরনের রাজস্ব নিশ্চিত করবে যা দেশের সম্পদ ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে।"[১২] এ কথা লেখা

হয়েছিল ১৮৬০ সালে, James Wilson নিজের সুদৃঢ় হস্তাক্ষরে ইণ্ডিয়া হাউসের উদ্দেশ্যে এই চিঠি রচনা করেছিলেন। ১৮৬৯ সালে ভারত সরকার আবার এই একই মত প্রকাশ করেছিল। "সাম্রাজ্যের চমৎকার রাজস্ব আসে এমন একটা জনসমষ্টির কাছ থেকে যার উপর অপরাপর দেশের তুলনায় করভার কম।...... বিগত কুড়ি বছরের মধ্যে যেসব বিরাট রেলপথ ও সেচ প্রকল্প নির্মিত হয়েছে তার সমৃদ্ধি ও সভ্যতা বিস্তারক প্রভাব দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে অনুভূত হতে শুরু করেছে।...... শ্রমের বেতনের যে ক্রমাগত বৃদ্ধি হয়েছে বেশিদিন যেতে না যেতেই তা জনগণের সমৃদ্ধি ও সন্তোষ বৃদ্ধি করবে।......"[১৩] নানাবিধ "অর্থ-বিষয়ক বিবৃতিতে" এবং নৈতিক ও বৈষয়িক প্রগতির উপর রিপোর্টে (Report on Moral and Material Progress) অসংখ্য বার যেসব কথা বলা হয়েছিল উপরোক্ত বক্তব্যটি তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে, সেগুলি হল: (ক) ১৮৬০-৭০-এর দশকে ভারতের জাতীয় সম্পদ দ্রুত হারে বাড়ছিল এবং ব্রিটিশ শাসনের (Pax Britanica) ফলেই কেবল তা সম্ভবপর হয়েছে; (খ) ভারত তুলনামূলক-ভাবে কম করভার প্রপীড়িত, বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধির দরুন যাদের লাভ হয়েছে তারা করভারে তাদের যথাযথ অংশ বহন করার দায় এড়িয়ে যাচ্ছে।

ইংরাজি সংবাদপত্রগুলি মোটামুটি পরিস্থিতির এই সরকারি পরিমাপকে মেনে নিয়েছিল। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এই করকে অত্যন্ত লঘু বলে গণ্য করেছিল—বলা হয়েছিল সারা পৃথিবীতে সব চেয়ে লঘু করভার।[১৪] কিন্তু 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এ কথা উল্লেখ করেছিল যে যদিও গড় করভার সামান্যই ছিল তবু একটা শ্রেণীর লোকেদের উপর বোঝাটা পীড়াদায়ক ছিল। "সাম্রাজ্যের ভার বিত্তবান শ্রেণীগুলি বহন করার পরিবর্তে তা প্রায় একান্তভাবেই শ্রমিকদের উপর পড়ত।" শেষোক্তরা দিতেন ভূমি কর, আবগারি, মোতুর্ফা এবং লবণ শুল্কের দশ ভাগের নয় ভাগ আর বিত্তবান শ্রেণীগুলির দিতে হত বহিঃশুল্ক, বিচার সংক্রান্ত ফি, স্ট্যাম্প-ডিউটি ইত্যাদি। বিত্তবান ও ব্যবসায়ী শ্রেণী করভারের অল্প অংশই বহন করত।[১৫] অপ্রিয় আয়কর 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' এই কারণে মেনে নিয়েছিল যে এতে করের বোঝা "পরিশ্রমী ও খেটে খাওয়া মধ্যবিত্ত" ও দরিদ্রের উপর থেকে সরিয়ে "ব্যাঙ্কব্যবসায়ী, মজহান, বানিয়া—কর দেবার ক্ষমতার তুলনায় যাদের প্রায়

ছাড় দেওয়া ছিল অথবা খুব কম কর দিতে হত—তাদের উপর" ফেলার প্রতিশ্রুতি ছিল।[১৬] "শেষোক্ত শ্রেণীগুলি সম্পদ ও সংখ্যার জন্য আমাদের (অর্থাৎ ইংরাজদের) কাছেই ঋণী ছিল" কিন্তু কর ব্যবস্থায় তাদের অতি লঘুভার দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত, আবার "রায়তদের ঘাড় ভেঙ্গে আমরা তুলনামূলকভাবে করভার মুক্ত থাকি, অন্তঃশুল্ক, বহিঃশুল্ক এবং লবণ শুল্কের ভার আমরা সবাই যতটা অনুভব করি তারা তার চেয়ে অনেক বেশি করে।"[১৭] 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া' মনে করেছিল যে যদিও "ভারতীয় সম্পদের মোট বৃদ্ধি" হয়েছে কিন্তু সমস্ত শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি হয় নি।[১৮] কৃষিজাত উৎপন্নের দর বৃদ্ধি জমির মালিকদের উপকার করেছে কিন্তু শ্রমিক-দের নয় এবং মজুরি দরের অনুপাতে বাড়ে নি। কাজেই "ভারতীয় জন-সংখ্যার ভূমিহীনশ্রেণী শ্রেণী হিসাবে ক্রমশঃ আরও দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে।"[১৯] 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' জোর দিয়ে বলেছিল যে শিল্প ও বাণিজ্যের তুলনায় কৃষিক্ষেত্রে বেশি কর ধার্য হয়েছিল।[২০] কিন্তু 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'র মতে কৃষি আয়ের উপরও তেমন বেশি কর বসানো হয় নি। বোম্বাইয়ের দৈনিক পত্রিকাটি দাবি করেছিল যে ভূমি রাজস্ব কোনও কর নয়, কাজেই আসল করের অঙ্ক অতি ক্ষুদ্রই ছিল, বছরে মাথাপিছু প্রায় ১০ থেকে ১২ আনা করে।[২১] 'মাদ্রাজ টাইমস' কলকাতার কাগজটির সঙ্গে একমত ছিল: ভূমি কর, লবণ শুল্ক, আবগারি (বিলাস দ্রব্যের উপর কর, কিন্তু অতি দরিদ্রের বিলাস দ্রব্য), স্ট্যাম্প শুল্ক ও বহিঃশুল্ক—এইগুলি প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে দরিদ্রদের কাছে আসত, অথচ বিত্তবান দেশীয় ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি শ্রেণীগুলি "অন্যায়ভাবে করমুক্তি" উপভোগ করত।[২২] অতএব অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি এ বিষয়ে প্রায় ঐক্যমত ছিল যে গড় মাথাপিছু করভার লঘু ছিল; John Wilson যে সমস্যাটি তুলে ধরেছিলেন অর্থাৎ জমিওয়ালা শ্রেণী ছাড়া বিত্তবান দেশীয় লোকেরা করের ন্যায্য অংশ বহন করছেন না—সে বিষয়ে অনেকখানি মতৈক্য ছিল; শেষতঃ এ রকম একটা ভাসা ভাসা আশঙ্কা ছিল যে দরিদ্রতর শ্রেণীগুলি করভারকে কিছুটা পীড়াদায়ক মনে করছে। শেষোক্ত শ্রেণীর প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু জানা ছিল না। এ রকম আশঙ্কা ছিল যে করের চাপই দুর্ভিক্ষের কারণ। হাউজ অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটির কাছে একজন সিভিল সার্ভিসের চাকুরে এই কথাই বলেছিলেন যে করের দরুনই

উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। "খাদ্যের সংরক্ষিত ভাণ্ডার কর যোগানোর জন্য দিয়ে দেওয়া হয়েছিল", আর করের চাপে সমস্ত খাদ্যশস্য রপ্তানি করতে হয়েছিল ও ফলে দুর্ভিক্ষ এসেছিল।[২৩] কয়েকবছর পরে Hyndmanও অনুরূপ অভিমতই প্রকাশ করেছিলেন। "যে সব দুর্ভিক্ষ ভারতকে বিধ্বস্ত করছে সেগুলি প্রধানতঃ অর্থসংক্রান্ত দুর্ভিক্ষ। নরনারী খাদ্য পেতে পারছে না। কারণ তারা টাকা বাঁচাতে পারে নি করের চাপের দরুন।"[২৪] কিন্তু এই সমস্ত বিপজ্জনক ধারণা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রে শুধু তখনই উল্লেখিত যখন তা খণ্ডন করার চেষ্টা করত, নচেৎ নয়।

ভারতীয় অথবা দেশীয় সংবাদপত্রগুলি রাজস্ব ভারের পরিসংখ্যান ভিত্তিক অনুমানের কোনও চেষ্টা করত না। তারা বলত কর ভার "বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত" হয়ে গিয়েছে ;[২৫] নানাপ্রকার কর ও তাদের ভার থেকে বোঝা যেত যে অধীনস্থ জাতিগুলি সম্পর্কে ব্রিটিশ উৎকণ্ঠা কপট ছিল ;[২৬] কর ভার ন্যায্য সীমার সর্বোচ্চে পৌঁছে গিয়েছিল ;[২৭] করগুলো সূচ হয়ে ঢুকত, লাঙ্গলের ফলা হয়ে বেরুত ;[২৮] দেশীয় রাজাদের অধীন লোকেদের চেয়ে ব্রিটিশ শাসনের অধীনস্থদের উপর কর ভার বেশি ছিল ;[২৯] ব্রিটিশরা যত শক্তিমান বোধ করছে তত অত্যাচারমূলকভাবে কর বাড়াচ্ছে[৩০]— ইত্যাদি। কিন্তু পরিমাণগত কোনও বিবৃতি মোটেই পাওয়া যায় না। সাধারণভাবে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাশোসিয়েশন জাতীয় আয়ের বিরাট অংশ সরকার আত্মসাৎ করছে বলে নিন্দা করেছিল: "বিগত দশ বছরে রাজস্বের যে বিরাট বৃদ্ধি ঘটেছে……তার মধ্যে নিহিত আছে জনগণের উপর সেই অনুযায়ী বাড়তি বোঝা……। ভারতীয় রাজস্বের কিছু কিছু উৎসের স্থিতিস্থাপকতা অথবা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ নতুন কর—যেখান থেকেই এই বাড়তি আসুক না কেন—কার্যক্ষেত্রে জাতির মোট আয় থেকেই এবং ফলতঃ তার টিকে থাকা ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপায়গুলি থেকেই তা কেটে নেওয়া হয়েছে।"[৩১]

১৮৮০ সালে ফিনান্স কমিশনের কাছে এক স্মারকলিপিতে দাদাভাই নওরোজি এই একই বিষয় তুলেছিলেন।[৩২] তিনি অনুমান করেছিলেন যে ভারতের মোট আয় ৩৪ কোটি পাউণ্ডের মত, আর সরকারি রাজস্ব আদায় ৬ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড।[৩৩] "ইংল্যাণ্ড সরকারের প্রয়োজনে মাত্র ৮½ শতাংশ নেয়, অথচ……ভারতে, এই একই উদ্দেশ্যে ২২ শতাংশ নেওয়া হয় ;

তবু লোকে দিব্যি ঠাণ্ডা মাথায় ও নিষ্ঠুরভাবে লিখে যায় যে ভারতের উপর কর ভার লঘু।"[৩৪] নওরোজি স্বীকার করেছিলেন যে এই অনুমান সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ছিল না, কিন্তু তাঁর কোনও সন্দেহ ছিল না যে জাতীয় আয়ের যে অনুপাত রাজস্ব হিসাবে সরকার ইংল্যাণ্ডে গ্রহণ করত ভারতে তার চেয়ে বেশি অনুপাতে নেওয়া হত।[৩৫] নওরোজির কাছে মূল সমস্যা ছিল ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতা এবং নীতি-নির্দ্ধারক সরকারি সংসদগুলিতে ভারতীয় প্রতিনিধিত্বের অভাব।

* * *

"প্রতিনিধিত্ব ছাড়া কর ধার্য অত্যাচারে পর্যবসিত হয়—এই নীতি বহু-সংখ্যক এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামের পর ইংরেজ রাজনীতিতে একটা দৃঢ়তা অর্জন করেছে—যা সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে একটা নির্ভরযোগ্য রক্ষাকবচ।······ ভারতে জনগণের মতামত সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে বা তা অগ্রাহ্য করে কর ধার্যের ভয়ানক সব পরিকল্পনা কেবল সে বিষয়ে আমলাশ্রেণীর মতামতের জোরেই কার্যকর করা হয়।"[৩৬] ১৮৬০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বরের 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর এই সম্পাদকীয় মন্তব্য ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক মনোভাব এবং ভারতে অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের অভাব সম্পর্কে অধীর ক্রোধ উভয়কেই প্রতিফলিত করে। ১৮৬০ সালের গোড়ার দিকে অবশ্য ভারতীয় মনোভাবের প্রতিনিধিত্বের জন্য কোনও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা (লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে "অতিরিক্ত সদস্য" হিসাবে কিছু গোষ্ঠীপতি ও চাঁইদের মনোনয়ন ছাড়া) উপস্থাপিত হয় নি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাশোসিয়েশন ভাসা ভাসা কথাবার্তার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল, যথা সরকার জনমতের সঙ্গে পরামর্শ করতে ব্যর্থ হয়েছে, অর্থ-বিষয়ক ব্যাপারে খবরাখবর সরবরাহ অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ও মন্থর হয়েছে, ইত্যাদি।[৩৭] সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে স্মারকলিপিরূপে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা পেশ করার জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাশোসিয়েশন ১৮৬৮ সালে কলকাতায় মিলিত হয়েছিল। এই স্মারকলিপিতে অ্যাশো-সিয়েশন ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল যে "অর্থ-বিষয়ক ব্যবস্থাপনায় মত প্রকাশের অথবা যথাসময়ে অর্থ-বিষয়ক ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে আলোচনারও যথেষ্ট সুযোগ ভারতীয় জনগণের নেই।"[৩৮] বাজেট উপস্থিত করার প্রায় অব্যবহিত পরেই কর ধার্যের ব্যবস্থাগুলি পাস করিয়ে নেওয়া হয় যাতে জনমত

প্রকাশের কোনও সুযোগ না থাকে। "ভারতের করদাতাদের অন্ততঃ কিছুটা সন্তোষ হত যদি রাষ্ট্রীয় আয়-উপায়ের বিলি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে তাঁদের মতামত দেবার কোনও অধিকার থাকত। সমস্ত ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে কর ধার্য ও প্রতিনিধিত্ব একসঙ্গে চলে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের বিশেষ সম্পর্কের কথা বিবেচনা করে স্মারকলিপিদাতারা মনে করেন যে অপরাপর ব্যাপার ছাড়াও কেবল রাজনৈতিক কারণেই এটা প্রয়োজন যে অর্থ-বিষয়ক ব্যাপারে স-পরিষদ গভর্নর জেনারেলের পূর্ণতম কর্তৃত্ব থাকবে। কিন্তু এই নীতি মেনে নিয়েও তারই সঙ্গে চলতে পারে অর্থাদির নিয়ন্ত্রণে এবং নতুন কর ধার্য করার বিষয়ে জনগণের কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ করা এবং তাঁদের মতামত ও ইচ্ছা জানার চেষ্টা।"[৩৯] এই স্মারকলিপিতে "যথেষ্ট লোকবহুল এবং সাম্রাজ্যের সকল অংশ থেকে নেওয়া দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্রলোকদের নিয়ে গঠিত একটি পরামর্শদাতা কাউন্সিলের" প্রস্তাব করা হয়েছিল। প্রস্তাবিত কাউন্সিলের জন্য এই অধিকার চাওয়া হয়েছিল যে অর্থ-বিষয়ক ব্যাপারে কাউন্সিল খবরাখবর ও কাগজপত্র চাইতে পারবে এবং সরকার কর্তৃক গৃহীত হবার আগে বাজেট নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করতে পারবে। তবে সে কাউন্সিল কেবল আলোচনার জন্যই হবে, ভোটের অধিকার তাকে না-ও দেওয়া যেতে পারে ঃ তার সকল সদস্যই সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। এই প্রস্তাব সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। সরকারের মতে এ রকম একটা কাউন্সিল "জনগণের ইচ্ছার যথাযথ প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।[৪০] 'হিন্দু পেট্রিয়ট' মন্তব্য করল "আমাদের মনে হচ্ছে সরকার বেশিদিন জোগার ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, চাপ তার উপর বাড়ছে।"[৪১] আরও কিছু দেশীয় সংবাদপত্র করদাতাদের প্রতিনিধিত্বের দাবি তুলেছিল। বাংলার "সোমপ্রকাশ" এবং বোম্বাইয়ের "জাম-এ-জামশেদ" এ আওয়াজ তুলেছিল।[৪২] ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাশোসিয়েশন স্মারকলিপি পেশ চালিয়ে যাচ্ছিল। ১৮৬৯ সালে সেক্রেটারির কাছে প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে "হোম চার্জ"-এর বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশের দাবি জানানো হয়েছিল (যাতে করদাতারা তাঁদের মতামত ও ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন)।[৪৩] ১৮৭১ সালে দাবি করা হয়েছিল যে অর্থ-বিষয়ক বিকেন্দ্রীকরণের পর ভারতীয়দের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ভার দেওয়া উচিত।[৪৪] এই বিষয়ে Lord Mayo-র ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশিত মতও

লক্ষণীয়ভাবে এই একই রকম ছিল। "লোকে বলে ও প্রক্রিয়া অনেক দীর্ঘ হবে—হয়তো হতে পারে—আমার ধারণা অনেকে যতটা কল্পনা করছে তার চেয়ে এ হ্রস্বতর হবে, তবে সে যাই হোক না কেন শুরু করার সময় এসে গিয়েছে এবং প্রশাসনের এমন একটা ব্যবস্থা চালু করার (সময় এসে গিয়েছে) যা স্থানীয় ব্যাপারের পরিচালনায় আমাদের সঙ্গে দেশীয় লোকেদের এতদিন যেমন হয়েছে তার চেয়ে বেশি করে সংশ্লিষ্ট করার দরজা খোলে।"[৪৫] কিন্তু শিক্ষিত ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন শ্রেণী, অগ্রগতির মন্থর পদক্ষেপ এবং অর্থ-বিষয়ক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত সাংবিধানিক বিধানের অপ্রতুলতা সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট ছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখেছিল "ইংল্যাণ্ডের সাংবিধানিক বিধানগুলির অনুকরণ করা, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে বাজেট পেশ করা, বিতর্কের একটা ভড়ং করা তো বেশ হচ্ছে, কিন্তু এ সবই হল তাৎপর্যহীন প্রদর্শনী ও বাগাড়ম্বর।...... দ্বিতীয় আবদ্ধ রাজা ও গোষ্ঠীপতিরা এক হিসেবে সহায়ক বটে, কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ইংল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষের যতটা প্রতিনিধিত্ব লুই নেপোলিয়ন অথবা ভিক্টর ইমানুয়েল করতে পারতেন (এঁরা) মহামান্যা মহারাণীর ভারতীয় প্রজাদের তার বেশি (প্রতিনিধিত্ব) করেন না।"[৪৬] "জনগণের স্বাভাবিক নেতাদের" সঙ্গে শাসনের দায়িত্ব ভাগ করে নেবার জন্য সরকারকে অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে।[৪৭] এ কথা স্বীকার করা হয়েছিল যে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে "ব্যক্তির চিন্তার ও ভাষণের স্বাধীনতা" অর্জিত হয়েছে। "কিন্তু এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে..... যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল একটা প্রহসন, সরকারি ও বেসরকারি অতিরিক্ত সদস্যারা নিতান্ত শূন্যগর্ভ, আইনে যদিও কাউন্সিলে দেশীয় সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা আছে, (তবু) শিক্ষিত শ্রেণীগুলিকে এ ব্যাপারে সচরাচর অগ্রাহ্য করা হয়......।[৪৮]

এ কথা মনে করা ভুল হবে যে সরকার জনমতের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিল। যদিও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের নানাবিধ অনুরোধ (লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে দেশীয় অতিরিক্ত সদস্য মনোনয়নের ব্যবস্থায় যতটা হত তার চেয়ে বেশি করে ভারতীয় সমাজের ব্যাপকতর অংশের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করার জন্য) সরকার কর্তৃক বারংবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, তবু বুদ্ধিমান আমলারা জনমতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারছিলেন না। উদাহরণস্বরূপ Bartle Frere জনমতের

প্রবণতা অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রীতিমত সচেতন ছিলেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের একটি সভায় (১৮৭১ সালের ৯ই জুন) Frere বলেছিলেন: লোকে কখনও কখনও ভারতীয় জনমতকে অগ্রাহ্য করে বা এমন কি তার অস্তিত্বও অস্বীকার করে, এই মনোভাব কিন্তু Malcom, Munro, Metcalf ও Elphinstone-রা যাঁরা "জনগণের নাড়ি বুঝতেন" তাঁদের মত পুরানো দিনের লোকদের ছিল না।[৪৯] তা ছাড়া Frere-র মতে আর্থিক সঙ্কট আর একটা বাড়তি কারণ যে জন্য দেশীয়দের মনোভাবের প্রতি সরকারের নজর রাখা উচিত। Lord Mayo লক্ষ্য করেছিলেন যে "খরচের বিভিন্ন খাত সম্বন্ধে ভারতের জনগণ ক্রমশঃ সজাগ হয়ে উঠছে।"[৫০] আর একজন পর্যবেক্ষক লিখেছিলেন: জনগণের ক্রমবর্ধমান সম্পদ ও শিক্ষা স্বাধীনতার মনোভাব ও বুদ্ধির জন্ম দিয়েছে যা অগ্রাহ্য করা বিজ্ঞজনোচিত নয়। সরকারি ব্যবস্থাবলী এখন আমাদের প্রজাদের ক্রমশঃ বেশি সংখ্যকের দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে।·· ··· শাসনকর্তাদের বিজ্ঞতার প্রতি একান্ত বিশ্বাসপরায়ণ, অজ্ঞান ও যুক্তিতর্ক-বিহীন হয়ে থাকার ভাব লোকের দ্রুত কেটে যাচ্ছে।"[৫১]

ভারতের জনমত গড়ে ওঠা সম্পর্কে সরকার যদি অবহিত থেকে থাকে তবে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ও অপরাপরদের দ্বারা উত্থাপিত দাবিগুলিকে তারা মেনে নিচ্ছিল না কেন? প্রথমতঃ ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী 'জনমত' ব্যাপারটা ভারতে নতুন ঘটনা ছিল; জিনিসটা তখনও স্ফুরণের স্তরে ছিল এবং এ কথা বলা হত যে এখানে অর্থ-বিষয়ক ও আর্থিক নীতিগুলি সম্বন্ধে কোনও ওয়াকিবহাল সমালোচনা হত না। দ্বিতীয়তঃ একথা মনে করা হত যে সংবাদপত্রে যা কিছু লেখা হত সেইটাই যে জনমতকে সত্যিকারের প্রতিফলিত করত তা নয়। Bartle Frere-র ভাষায় সংবাদপত্রের মত সব সময়ে জনমত নয়। ইংরেজী ও দেশীয় সংবাদপত্রগুলি জনগণের অতি ক্ষুদ্র অংশের মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করত।[৫২] Mayo মন্তব্য করেছিলেন যে সংবাদপত্র কিছু সরব ব্যক্তির মতামত প্রতিফলিত করত, "নীরব বহু"-র মতামত জানার কোনও উপায় ছিল না। ইংরেজ মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলি সম্বন্ধে Mayo তাচ্ছিল্যের মনোভাব পোষণ করতেন, তাঁর মতে সেগুলি 'বেসরকারি ইউরোপীয়দের' মতামত প্রতিফলিত করত (অর্থাৎ ব্যবসায় ও শিল্পে নিযুক্ত ইউরোপীয়দের—যাঁরা "কালা আদমিদের

কাছ থেকে যত পারেন টাকা নেওয়ার জন্যই এদেশে আসতেন"), আর দেশীয় সংবাদপত্রগুলি সম্বন্ধে তাঁর মত ছিল এই যে সেগুলি বাবুদের দ্বারা পরিচালিত হত, যাঁরা জনগণের স্বার্থের চেয়ে নিজেদের স্বার্থই বেশি দেখা-শোনা করতেন।[৫৩] গভর্নর-জেনারেল Lewrence-ও মনে করতেন যে "যেসব শ্রেণীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়" তাঁদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ যারা কোনও মতে "জীবনধারণ করে" তাদের বিরাট পার্থক্য রয়েছে।[৫৪] সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে প্রেরিত একটি বার্তায় ভারত সরকার "উচ্চ শ্রেণীগুলির" ও "জনগণের" মতামতের মধ্যে একটা পার্থক্য টেনেছিল। জনমত "শুধু সেসব শ্রেণীগুলির মতামত হওয়া উচিত নয় যারা জনসভায় সমবেত হয়, বরং মহামান্য মহারাণীর যে লক্ষ লক্ষ প্রজা রাজকোষে অর্থ যোগায় তাদের মতামত (হওয়া উচিত)......।"[৫৫] ১৮৬৮ সালে যখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন "উপযুক্ত দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্রলোকদের নিয়ে গঠিত" পরামর্শদাতা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছিল তখন ভারত সরকার মন্তব্য করেছিল যে এ রকম একটা সংস্থা কেবল "কয়েকটি শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করবে যার সুস্পষ্ট আগ্রহটা থাকবে নিজেদের উপর কর ধার্য এড়ানো।"[৫৬] একজন সফররত ইংরেজ সাংবাদিকের জোরালো ভাষায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়ে-শনকে সাধারণভাবে "সংগঠিত স্বার্থপরতার একটা ব্যবস্থা" বলে গণ্য করা যেত।[৫৭] এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে ইউরোপীয় চেম্বার অব কমার্সের মত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনেরও একটা সুস্পষ্ট শ্রেণী চরিত্র ছিল, এটি মূলতঃ ছিল জমিদারদের সমিতি। এ কথাও সত্য যে এই অ্যাসোসিয়েশন এবং অধিকাংশ দেশীয় সংবাদপত্র সাধারণ লোকের স্বার্থের চেয়ে জমিদার, বৃত্তিতে নিযুক্ত বিত্তবান শ্রেণী, অফিস কর্মচারি স্বার্থ সম্বন্ধেই অত্যন্ত সজাগ ছিল। যাতে সম্পন্নতর শ্রেণীগুলি আয়কর, বৃত্তির উপর লাইসেন্স কর এবং বিত্তবান ও পেশায় নিযুক্ত শ্রেণীগুলির উপর অপরাপর প্রত্যক্ষ কর এড়াতে পারে তার জন্য লবণ শুল্কের (ও জনগণের উপর পড়ে এমন অপরাপর পরোক্ষ করের) উচ্চতর হারের পক্ষে ওকালতি থেকে এ কথা বেশ বোঝা যায়। তা সত্ত্বেও ভারতের একমাত্র রাজনীতি-সচেতন এবং মুখর শ্রেণীকে প্রতিনিধিত্ব দিতে অস্বীকার করাটা রাজনীতির দিক থেকে স্পষ্টতঃই অ-বিজ্ঞোচিত হয়ে যাচ্ছিল।

নীতি নির্ধারণের উপর এই শ্রেণীর যদি নিয়ামক প্রভাব থাকত তা হলে

অর্থ-বিষয়ক নীতিগুলি কি হত সেটা কেবল জল্পনা-কল্পনার বিষয়বস্তু হতে পারে। কতকগুলি নীতিসংক্রান্ত প্রশ্নে ভাবতে "জনমতের" প্রবণতা কোন দিকে ছিল তার একটা পরিমাপ করাই বর্তমানে বেশি কাজে লাগবে।

* * *

দেশীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র উভয়েই আশ্চর্যজনক ঐক্যমত নিয়ে সকলরূপে প্রত্যক্ষ করের বিরোধিতা করত। অপরদিকে তারা লবণশুল্ক বৃদ্ধির সুপারিশ করেছিল। সমস্ত রকম অপ্রত্যক্ষ করের মধ্যে লবণশুল্কই দরিদ্রতম শ্রেণীর উপর পড়ত ঃ প্রত্যক্ষ কর কেবল মাঝারি ও উচ্চ-আয়বিশিষ্ট গোষ্ঠীগুলির উপর পড়ত। আমরা আগে James Wilson-এর আয়কর নিয়ে যে বিতর্কের উল্লেখ করেছি তা প্রত্যক্ষ করের বিরোধিতায় বা সমর্থনে যেসমস্ত যুক্তি বারংবার উঠত তার সব কটিকেই জন সমক্ষে তুলে এনেছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিক্রিয়াটা ছিল বিত্তবান ও 'আলোকপ্রাপ্ত" শ্রেণীর প্রতিক্রিয়ার খাঁটি নমুনা ঃ লবণ শুল্ক হল করের "সব চেয়ে কম আপত্তিজনক" রূপ এবং "এই ধরনের কর সম্বন্ধে যতই আপত্তি থাকুক না কেন, আয়কর অথবা প্রত্যক্ষ করের উৎ-পীড়ন, বিপদ ও মনোবল হানিকর প্রভাবের তুলনায় এর নিকৃষ্টতম উৎপাতও আশীর্বাদস্বরূপ।"[৫৭ক] অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি এবং চেম্বার অব কমার্স ষাটের দশকে অনবরতই এই ধরনের যুক্তি হাজির করছিল ঃ জনগণ "সানন্দে" অপ্রত্যক্ষ কর ভার বহন করবেন (মাদ্রাজ এক্সামিনার) ; আয়কর যেখানে "অত্যধিক বিরক্তিকর" লবণশুল্ক সেখানে "কৃষি-সংশ্লিষ্ট ও মেহনতী শ্রেণীগুলির বাৎসরিক আয় থেকে অতি সামান্য বিয়োগ" (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স) , আয়কর ব্রিটিশ ভারতের "সকল শ্রেণী ও জাতকে" ঐক্যবদ্ধ করবে যারা সকলেই একটা অন্যায় বিচার হচ্ছে বলে মনে করে (পাইও-নিয়ার) ; "দরিদ্রতর শ্রেণীগুলির" উপর ভূমি কর ও লবণ শুল্কের মত কর ভার সামান্য (টাইমস অব ইণ্ডিয়া) ; লাইসেন্স শুল্ক ও আয়করের ভিতর দিয়ে অপেক্ষাকৃত উদ্যোগী শ্রেণীগুলি "তাদের পরিশ্রমের ফল" থেকে বঞ্চিত হচ্ছে (ক্যালকাটা ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন) ; আয়কর একটা অনুন্নত শ্রেণীর উপর সব চেয়ে বড় অবিচার করে সব চেয়ে কম রাজস্ব" উসুল করে (ইংলিশম্যান)।[৫৮] এই সব ভুয়ো যুক্তির পিছনকার মতলব সুস্পষ্ট। Mayo উপযুক্ত ঘৃণার সঙ্গেই সেই সব "ইউরোপীয় কর্মকর্তা যারা ভারতকে

নিজেদের জন্য দুগ্ধবতী গাভী হিসাবে দেখে", ইংরেজ বণিকেরা "যারা দেশে গিয়ে অলস জীবনযাপনে সক্ষম হবার মত টাকা দ্রুত করায়ত্ত করা ছাড়া আর কোনও লক্ষ্য আছে বলে ভান করে না" এবং "শাঁসালো দেশীয় লোকেরা কর ধার্য সম্বন্ধে যাদের একমাত্র ধারণা হল দরিদ্রকে বিধ্বস্ত করা" তাদের "অজ্ঞতা স্বার্থপরতা ও ঈর্ষাপরায়ণতা"র কথা লিখেছিলেন।[৫৯] বিত্তবান দেশীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শ্রেণীগুলির প্রত্যক্ষ করের উপর সমবেত আক্রমণের স্বার্থপর চরিত্র উদ্ঘাটিত করার এই সুযোগ Canning গ্রহণ করলেন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের রাজা রাধাকান্ত দেবকে তিনি লিখলেন "আয়করের বদলে লবণ শুল্ক বসানো গরীবের ঘাড় দিয়ে ধনীকে স্বস্তি দেওয়া হবে।"[৬০] বোম্বাইয়ের 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট' এবং শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ছাড়া অপর কেউ নিম্নতর আয়বিশিষ্ট লোকেদের নানাবিধ অপ্রত্যক্ষ করের বোঝা থেকে খানিকটা রেহাই দেবার জন্য প্রত্যক্ষ করের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে নি।[৬১] প্রত্যক্ষ করের প্রতিক্রিয়া এত প্রবল হয়েছিল কারণ এই প্রথম সরকার "মূক জনতার বদলে মুখর স্বল্পসংখ্যকের" উপর কর বসানোর চেষ্টা করেছিল।[৬২]

প্রত্যক্ষ করের বিরুদ্ধে যেসব শ্রেণী একত্রিত হয়েছিল তাদের সকলের স্বার্থ আদৌ সমপ্রকৃতির ছিল না। প্রত্যক্ষ করের নিন্দায় সকলে একমত থাকলেও প্রত্যেক গোষ্ঠীই নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করছিল। নিম্নতর আয়বিশিষ্ট গোষ্ঠীগুলি ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্যের সুপারিশ করছিল : সরকারি ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কেরানীরা সমহারের বদলে ক্রমবর্ধমান (progressive) হারের প্রয়োজন বলে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন।[৬৩] বেতনভোগী শ্রেণীগুলির দেয় কর অপেক্ষাকৃত কঠোরভাবে নির্ধারিত হত, তারা "বেনিয়ান, সাউকার ও পারসী লাখপতি"—যারা ব্রিটিশ শাসনের সুবিধা ভোগ করত অথচ কর এড়াতো, তাদের সমৃদ্ধির প্রতি ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে চাইত।[৬৪] পেশায় নিযুক্ত ও শিল্পোদ্যোগী শ্রেণীগুলি করের এই অসম বিচারে বিরক্ত বোধ করত যে "তাদেরই পরিশ্রমের ফল" প্রসূত আয়ের সঙ্গে খাজনাভোগী, মহাজন, জমিদার এবং বিত্তবান অলস ধনীদের আয়ের তফাত করত না।[৬৫] ব্যবসায়ীরা বিক্ষুব্ধ বোধ করত যে "অলস পড়ে থাকা সম্পত্তি—যা মালিক ছাড়া আর কারও উপকারে লাগে না—তাকে ছাড় দেওয়া হয়েছে, অথচ যেই তাকে উৎপাদনক্ষম খাতে ফেলা হচ্ছে যাতে মালিকের এবং সঙ্গে সঙ্গে

দেশেরও সম্পদ এবং সমৃদ্ধিতেও অবদান করে অমনি তাকে করের আওতায় আনা হচ্ছে।"[৬৬] অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মতামত হয় আয়করের বদলে অথবা আয়করের উপরেও একটা উত্তরাধিকার শুল্কের (succession duty) পক্ষে ছিল ঃ উত্তরাধিকার শুল্ক প্রধানতঃ স্থাবর সম্পত্তির মালিক ভারতীয়দের উপর ধার্য হবে, বিস্তর আয় করে দেশে ফিরে যেত যেসব ইংরেজরা তাদের উপর নয়।[৬৭] এই সব স্বার্থ-গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি যুক্তির যে স্বতন্ত্র ধারা অনুসরণ করত তা একটা বিন্দুতে এসে একত্রিত হত, তা হল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা যেভাবে বলেছিলেন ঃ তাঁদের আয়ের উপর প্রত্যক্ষ কর "অবিজ্ঞজনোচিত ও নীতিশাস্ত্রবিগর্হিত"।

আলোচ্য সময়ে নীতিশাস্ত্র ও অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি কতবার পরস্পরে মিশে যেত ও অবিচ্ছেদ্য হয়ে পড়ত তা লক্ষ্য করার মত মজার ব্যাপার। এর একটা বড় উদাহরণ হল আফিম সংক্রান্ত প্রশ্ন। নৈতিক ও অপরাপর যুক্তিতে ইংল্যাণ্ডে এবং ভারতে বেশ একটি মত ছিল আফিম ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে। একবার Bright বলেছিলেন "বোধ হয় আফ্রিকানদের তাদের নিজের দেশ থেকে আমেরিকা মহাদেশে নিয়ে যাওয়া ছাড়া এর চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর ব্যবসা অথবা কুফলের দিক থেকে এর চেয়ে জঘন্য জিনিস আর কখনও ছিল না।"[৬৮] বছরের পর বছর Col. Sykes Kinnaird, R. N. Fowler, Sir W. Lawson, Stephen Cave, M. Fowler, ইত্যাদি পার্লামেণ্ট সদস্যরা আফিম ব্যবসার, বিশেষতঃ সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকার দরুন তার নৈতিকভাবে নিন্দনীয় চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাচ্ছিলেন।[৬৯] ভারতীয় ব্যাপার নিয়ে বিভিন্ন রচনার মধ্যে দুটির প্রতি এখানে নজর আকর্ষণ করা যেতে পারে। একটি Donald Matheson-এর লেখা 'What is Opium Trade'। এতে লেখা হয়েছিল যে "চীনাদের খৃষ্টান ধর্ম বরণের পক্ষে সব চাইতে বড় বাধাগুলির মধ্যে একটি হল আফিমের অভিশাপ।"[৭০] কখনও কখনও এ যুক্তি দেওয়া হত যে ভারতের আফিমের একচেটিয়া ব্যবসা ইংল্যাণ্ডে সুরার উপর করের চেয়ে বেশি খারাপ কিছু নয়। Matheson লিখেছিলেন "কিন্তু এ তুলনা সম্পূর্ণ নয়। যত রকম (রাজস্ব) আদায় করে যেতে পারে মদ থেকে রাজস্ব তার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট, কারণ এতে সরকারের সম্পদ বৃদ্ধি হয় আবার একটা বিপজ্জনক সামগ্রীর দর বাড়িয়ে তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণও করা হয়।

আফিম থেকে সরকারের রাজস্ব প্রাপ্তি ঘটে প্রথমতঃ এই ধ্বংসাত্মক বস্তুটির উৎপাদন করে, আর তার পর একটা দুর্বল ও পৌত্তলিক জাতির নিষেধ ও নিন্দা সত্ত্বেও তার ব্যবহারে উৎসাহ দিয়ে, যদিও আমাদের কর্মের দ্বারা সে জাতির নৈতিক অনুভূতি গুরুতরভাবে আহত হয় তথাপি।"[৭১] 'Government of East India Company and its Monopolies or the Young India Party and Free Trade' পুস্তিকায় আফিমের একচেটিয়া ব্যবসা বর্তমানের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ অতীতের এক অবশেষ বলে নিন্দিত হয়েছিল। লেখক Malcolm Lewin বলেছিলেন সব একচেটিয়া ব্যবসাই খারাপ আর আফিমের একচেটিয়া ব্যবসা নিকৃষ্টতম।[৭২] ১৮৭০-এর দশকে সরকারের আফিম ব্যবসার বিরুদ্ধে জনমত অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং ১৮৭৪ সালের মধ্যে আফিম ব্যবসায় দমন করার আন্দোলন পুরোপুরি সংগঠিত হয়ে উঠেছিল। সেই বছরের হেমন্তকালে অ্যান্টি-অপিয়াম সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৭৩]

ভারতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের একাংশ আফিমে সরকারের একচেটিয়া ব্যবসার বিরুদ্ধে ছিল। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লিখেছিল এইরকম একচেটিয়া ব্যবসা মহামান্য মহারাণীর মালিকানায় বাজে মদের দোকান চালানোর মতই মর্যাদাহানিকর।[৭৪] একচেটিয়া ব্যবসাগুলির মধ্যে শেষতম—আফিমের একচেটিয়া ব্যবসা "আমাদের প্রশাসনের কলঙ্ক"।[৭৫] এই অভিযোগ তোলা হয়েছিল—আর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনভাবে নয়—যে সরকার কেবল আফিম তৈরিই করছে না, তা নিয়ে ফাটকাও খেলছে।[৭৬] এই একচেটিয়া ব্যবসা "আগেকার কালের বাণিজ্যিক দুর্নীতি"র একটি অপ্রীতিকর স্মারক।[৭৭] নৈতিক যুক্তির উপর অর্থনৈতিক যুক্তিও উপস্থাপিত হত। "অবাধ বাণিজ্যে"র প্রচলিত যুক্তি তোলা হত এবং বলা হত যে একচেটিয়া ব্যবসায়ের জায়গায় আবগারি শুল্কের ব্যবস্থাও সমানই লাভজনক হবে।[৭৮] বাংলার একচেটিয়া ব্যবস্থা তার নিজস্ব অনতিক্রম্য সমস্যাবলীসহ একটা কৃত্রিম ব্যাপার ছিল। "সাধারণতঃ সমাজে যেমন চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে স্বাভাবিক যোগাযোগ থাকে এবং সরকারি হস্তক্ষেপ না থাকলে বজায় থাকে ..... প্রত্যক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থার অধীনে সে রকম থাকে না।"[৭৯] কিন্তু আফিম ব্যবসায়ে সরকারি হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মূল যুক্তি ছিল নৈতিক, অর্থনৈতিক নয়। আর অধিকাংশ অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান তথা ভারতীয় মালিকানাধীন

সংবাদপত্র এ প্রশ্নের নৈতিক দিক সম্পর্কে উদাসীন ছিল ; এ কথা ভুললে চলবে না আফিমের ধূমপান করার অনিষ্টকর প্রভাবের যে অভিযোগ উঠত তা ভারতের চেয়ে চীনেই বেশি দেখা যেত। 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট' লিখেছিল "ভারত সরকার একচেটিয়া অধিকার নিজের হাতে রেখেছে কেবল এই কারণেই যে এর অবসানের জন্য কোনও রাজনীতিবিদের মনোযোগের যোগ্য কোনও পরিকল্পনা হাজির করতে কেউ পারে নি।...... আফিম খাবার অভ্যাস সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়া ঠেকানোর পবিত্র ও সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে, অথচ সেই সঙ্গে যাতে যত কম সম্ভব উৎপাদন থেকে যত বেশি সম্ভব রাজস্ব আদায় হয় তার জন্য সরকার নিজের হাতে একচেটিয়া অধিকার বজায় রেখেছে।"[৮০] আফিম ব্যবসায় দমন সমিতিকে (Society for the supression of Opium Trade) দাদাভাই নওরোজি খোলাখুলিভাবেই বলেছিলেন যে "এ বিষয়ে ভারতের দেশীয় লোকেদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আপনাদের পক্ষে নেই" ; তিনি জানতেন যে বহু ভারতীয় সংবাদপত্র এই অভিমত প্রকাশ করেছিল যে আফিম রাজস্ব ছেড়ে দেওয়া চলে না।[৮১] নওরোজি ব্যক্তিগতভাবে আফিম ব্যবসায়কে নৈতিক দিক থেকে ঘৃণ্য মনে করতেন ; ১৮৫৫ সালে যখন তিনি বোম্বাইয়ের একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন তখন তাঁর একটি সুস্পষ্ট শর্ত ছিল যে আফিমের ব্যবসার সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক থাকবে না।[৮২] কিন্তু বহু ভারতীয় তাঁর এ মতের সমর্থক ছিলেন না।[৮৩] কয়েকটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া ভারতীয় মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলি আফিম সংক্রান্ত প্রশ্নে নীরব ছিল।[৮৪]

আফিম ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ অনবহিত ছিলেন না। এই মাদক ওষুধের চাষ ও বিক্রয় নীতি-বিগর্হিত এই যুক্তি সম্পর্কে Lord Stanley সরকারি মনোভাব বিবৃত করেছিলেন : "আমি মনে করি এই যুক্তি অসার এবং সরকারের কর্তব্য সম্পর্কে একটা ভুল তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত......।"[৮৫] আফিম বিরোধী বিক্ষোভকারীদের যুক্তির কাটান দেবার জন্য কিছু-কিছু প্রচেষ্টা হয়েছিল। 'The Opium Revenue in India' নামক লেখকের নামহীন একটি রচনায় অর্থনৈতিক যুক্তির ভিত্তিতে আফিমের একচেটিয়া ব্যবসা বজায় রাখার পক্ষে বলা হয়েছিল ; এতে দাবি করা হয়েছিল যে আফিমের ধূমপান করার ক্ষতিকর প্রভাবকে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত করা হয়।[৮৬] আর প্রচার পুস্তিকায় আফিম রাজস্বকে এই যুক্তিতে

সমর্থন করেছিল যে এ ভারতীয়দের উপর কর ভার লাঘব করে।[৮৭] আর একজন লেখক প্রশ্ন করেছিলেন "এই সব জোলোমার্কা ইভানজেলিস্টরা যদি তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে পারে তবে ভারত তার আফিম রাজস্ব বাদ দিয়ে চালাবে কি করে?"[৮৮] S. Laing যুক্তি দিয়েছিলেন যে ইংল্যাণ্ডে জিন ও মদের উপর কর থেকে আয়ের চেয়ে আফিম রাজস্ব কিছু বেশি ভালও নয় খারাপও নয়।[৮৯] Sir Charles Trevelyanও এই একই যুক্তি ব্যবহার করেছিলেন। "আফিম রাজস্বের নৈতিক যুক্তি দেশে (ইংল্যাণ্ডে) মদের উপব আবগারি শুল্কের সঙ্গেই তুলনীয়। যতদূর সম্ভব বেশি কর ধার্য করে আফিমের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করাই সব চেয়ে ভাল, না কি চীনাদের প্রিয় মাদক অবাধ সেবনের উপায় যোগানোর জন্য চাষ ও রপ্তানি সম্পূর্ণ ছেড়ে রেখে দেওয়া ভাল?"[৯০] প্রশ্নটা আলঙ্কারিক মাত্র, বোঝাই যাচ্ছে যে Trevelyan-এর মতে এর একমাত্র জবাব ঃ প্রথম বিকল্পটি সব দিক দিয়েই অনেক ভাল।[৯১] আফিমের চাষ ও ব্যবহার সম্পূর্ণ দমন করা যদি বাঞ্ছনীয় বলে ধরে নেওয়া যায় তবু তা অসম্ভব ছিল। Sir John Strachey ও Col. Richard Strachey দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেছিলেন যে আফিম খাওয়া কিছু লোকের কেবল বদ্ধমূল অভ্যাসই নয়, বরং পরিমিত খেলে ফল ভালই হয়—যেরকম শিখ ও রাজপুতদের মধ্যে চালু আছে (তারা পোস্ত বা পপিফুলের মাথাব রস করে খেত)[৯২] তাঁরা এ কথাও তুলেছিলেন যে ভারত থেকে আফিম রপ্তানি বন্ধ হলেই যে চীনাদের উপকার হবে তা নয় কারণ ভারতই সরবরাহের একমাত্র উৎস নয়। প্রকৃতপক্ষে চীনের অভ্যন্তরে সাধারণ লোক দেশজ আফিমের উপর নির্ভরশীল ছিল, উপকূলবর্তী প্রদেশগুলির সচ্ছল লোকেরাই কেবল উৎকৃষ্টতর ভারতীয় আফিম কিনতে পারত।[৯৩] উপরন্তু ভারতের স্বার্থও বিবেচনার প্রয়োজন ছিল। নিজের দেশের লোকের উপর কর না বসিয়ে নিজের উৎপন্ন একটি জিনিস থেকে অনেকটা রাজস্ব পাবার বিরল সৌভাগ্য ভারতের ছিল, R. Strachey কোনও কারণ দেখেন নি কেন "অপরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ঠেকানোর আশায়, যাদের (ভারতীয়দের) উপকার করতে সর্বোচ্চ কর্তব্য অনুযায়ী আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাদের স্পষ্ট ও জরুরী স্বার্থ বিসর্জন দিতে" হবে।[৯৪] এমন কি আফিম ব্যবসা নৈতিকভাবে অন্যায় বলেও যাঁরা স্বীকার করতেন তাঁরাও রাজস্বের এরকম একটা লোভনীয় ও অপরিহার্য উৎস ছেড়ে দেবার উপায় খুঁজে

পেতেন না। Mayo যিনি আফিমের প্রশ্নে "বিশ্ব প্রেমিকের প্রলাপ" সম্বন্ধে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের ভাব পোষণ করতেন[৯৫]—তিনিও এ কথা স্বীকার করেছিলেন যে "আফিমের পরিস্থিতি" "আমাদের মর্যাদায় গভীরতম কলঙ্করেখার মধ্যে অন্যতম"।[৯৬] কিন্তু বাংলার একচেটিয়া ব্যবস্থাকে একটা আবগারি শুল্ক বাবস্থায় পরিবর্তিত করাটা কি "আমাদের কিছু হাঁটুগাড়া ভাইদের বিবেকে একটু প্রলেপ ছাড়া আর কিছু" হবে?[৯৭] "কিন্তু সরাসরি বেনাবেচার বদলে ছাড়পত্র ও আবগারি শুল্কের মারফত রাজস্ব তুলে আমাদের দায়িত্ব এড়াতে পারি মনে করা আমার মতে একটা প্রবঞ্চনা। কর্নিশ ও আইরিশ উপকূলের পুরানো জমিদাররা নিজেরা কদাচিৎ চোরা চালান করত, কিন্তু তাতে উৎসাহ দিত, এবং প্রজাদের দ্বারা পাচার করা মালের উপর মোটা শুল্ক নিত, আমরাও সেই রকম প্রস্তাব করছি নিজেদের জড়াতে রাজী হব না, কিন্তু আমাদের প্রজাদের সেই কাজ করতে অনুমতি দিয়ে ও উৎসাহিত করে তাদের উপর একটা মোটা কর ধার্য করে তা থেকে লাভ করব। এ তর্ক এক মিনিটও টিকবে না, আর একটা সূক্ষ্ম নীতিশাস্ত্রসম্মত পার্থক্য যেটা বুঝতে সাধারণ মানুষের—নিজেকে সবিনয়ে যে শ্রেণীতে আমি ফেলতে চাই—ভাগ্যে যতটা জোটে তার চেয়ে সূক্ষ্মতর মনের প্রয়োজন হয়—কেবল তার জন্য একটা মোটা রাজস্ব বিসর্জন দেওয়া—পশ্চিমী (বোম্বের) ব্যবস্থা বাংলায় যদি আমরা গ্রহণ করি তা হলে আমাদের তাই করতে হবে—আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি নে।"[৯৮]

আফিম বিরোধী বিক্ষোভকারীদের সরকারের আফিম নীতিকে যে নারকীয় বলে আখ্যা দেবার অভ্যাস ছিল, সেবকম চরিত্রায়ণ করাটা উদ্ভট হবে। ইভানজেলিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ নীতি সমর্থনের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল, কিন্তু ভারতের প্রয়োগ-সর্বস্ব প্রশাসকরা কেবল ভাবপ্রবণতা দিয়ে প্রভাবিত হতেন না।[৯৯] নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি এই প্রশ্নে প্রয়োগ-সর্বস্ব সরকারি মনোভাবের সার কথাকে প্রকাশ করে: "এ দেশের ভাল ও সস্তা আফিমের স্বাভাবিক একচেটিয়া আছে। যদি কেউ সত্যই এ কথা দাবি করেন যে চীনাদের খাতিরে ভারত ভগবদ্দত্ত এই স্বাভাবিক সুবিধা ছেড়ে দেওয়া উচিত এ দেশে আফিম চাষ নিষিদ্ধ করে, তা হলে সেরকম যুক্তি টিকবে না।...... ভারত সরকারের নীতি হল ব্যাপারটাকে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক গতিপথ ধরে এগোতে দেওয়া, যেহেতু স্বাভাবিক একচেটিয়া ব্যবসার ফলে রাজস্ব আসছে

এবং বিরক্তিকর কোনও অন্য ধরনের কর এড়ানোর সুযোগ দিচ্ছে।”[১০০]

আবগারি শুল্কের আলোচনাতেও দুই দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ দেখা যায় : কেউ বলেন করের কাজ হল রাজস্ব বাড়ানো এবং কেউ বলেন করকে অসামাজিক ও নীতি-বিরোধী বিলাসকে নিরুৎসাহিত করার একটা নৈতিক শৃঙ্খলা হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

আবগারি শুল্ক সংগৃহীত হত (ক) গাঁজা, আফিম প্রভৃতি মাদক দ্রব্য থেকে (খ) ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ভারতে তৈরী মদের উপর শুল্ক থেকে (গ) “দেশী মদের” উপর শুল্ক থেকে। আমরা অন্যত্র দেখিয়েছি যে মালওয়া ও বাংলায় আফিম এজেন্সিগুলি আফিম ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত। বাংলায় আফিম ছিল সরকারি একচেটিয়া ব্যবসা, আর মালওয়াতে বোম্বাইয়ের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে একটা ছাড়পত্রের শুল্ক আদায় করা হত। বাংলায় লবণের একচেটিয়া কারবারের মতই ভাবতে ব্যবহৃত আফিমের উপর আবগারি রাজস্ব ছিল আসলে সরকারের একচেটিয়া কারবারের মুনাফা : লাইসেন্স প্রাপ্ত বিক্রেতা মারফত সরকার জনসাধারণের কাছে আফিম বিক্রি করত এবং আবগারি রাজস্বের উপর লাইসেন্স ফিও যুক্ত হত। গাঁজা বিক্রির জন্য লাইসেন্স শুল্ক দিতে হত এবং এর চাষের জন্যও লাইসেন্স লাগত। চাষের উপর নিষেধাজ্ঞা ও লাইসেন্সের ব্যবস্থা এই সব মাদক সেবনের অভ্যাস ছড়িয়ে পড়া ঠেকাতে সাহায্য করত। ১৮৭৯ সালে “কৃষি, রাজস্ব ও বাণিজ্য বিভাগ” মাদক দ্রব্যের ক্ষতিকর ফলাফল সম্পর্কে একটা তদন্ত করেছিল, তাতে দেখা গিয়েছিল এগুলি উন্মাদরোগ সহ বিভিন্ন গুরুত্বের ক্ষতিসাধন করে।[১০১] ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ভারতে প্রস্তুত মদের উপর শুল্ক বিদেশ থেকে আমদানি অনুরূপ মদের উপর বহিঃশুল্কের সমান ছিল।

দেশী মদের উপর শুল্ক দুটি ব্যবস্থার মারফত সংগৃহীত হত। এর একটি চোলাইয়ের উপর শুল্ক ব্যবস্থা বলে পরিচিত। এই ব্যবস্থা বলে চোলাইয়ের উপর দৈনিক শুল্ক নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত এবং মদের খুচরো বিক্রেতাকে লাইসেন্স ফি দিতে হত যার পরিমাণের সঙ্গে লাইসেন্সের সময়ের মধ্যে কত মদ বিক্রি হত তার কোনও সম্বন্ধ ছিল না।[১০২] ভেণ্ডার জেলা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিলামে একচেটিয়া অধিকার কিনে নিত। বস্তুতঃ এই ব্যবস্থা ছিল মদ বিক্রির অধিকারের ইজারা দেওয়া। ইজারাদার যে

শহরের জন্য ইজারা পেত শুধু সেই শহরেই দোকান খুলতে পারত। ধারণা ছিল যে এই ব্যবস্থায় মদের দোকান ও শুঁড়িখানা ছড়িয়ে পড়া ঠেকানো যাবে। এই ব্যবস্থার ত্রুটি ছিল এই যে এ লাইসেন্স প্রাপককে যত বেশি সম্ভব মদ বেচতে উৎসাহিত করত ঃ লাইসেন্স ফি যেহেতু আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে যেত এবং মদ বিক্রির পরিমাণের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক থাকত না, কাজেই স্বাভাবিকভাবেই বিক্রেতা যত বেশি সম্ভব মদ বেচে যতখানি মুনাফা করা যায় তার চেষ্টা করত। বাংলা সরকার আতঙ্কিতভাবে লক্ষ্য করল যে মদ্য পানের অভ্যাস ছড়িয়ে পড়ছে এবং তার জন্য দায়ী হল বিক্রেতারা ("যাদের মুনাফা পুরোপুরি নির্ভর করে তারা মদ্য পান কতটা বাড়াতে পারে তার উপর")।[১০৩] বাংলা সরকারের মতে এ হল "এ দেশে আমাদের প্রশাসনের উপর অন্যতম কলঙ্ক।"[১০৪] আবগারি শুল্কের অপর ব্যবস্থাটি সদর (অর্থাৎ সদর বা কেন্দ্রীয়) চোলাইখানা ব্যবস্থা নামে পরিচিত ছিল।[১০৫] এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে মদ আসলে কতটা বিক্রি হত তার উপর শুল্কের পরিমাণ নির্ভর করত।[১০৬] এই ব্যবস্থা সদর চোলাইখানা ব্যবস্থা বলে পরিচিত ছিল এই কারণে যে সরকারের একটি কেন্দ্রীয় চোলাইখানা ছিল, যেখানে ব্যবসায়ীরা মদ তৈরী করত, চোলাই করা মদের পরিমাণের উপর শুল্ক দিত এবং যে ভেণ্ডারেরা লাইসেন্স ফি দিয়েছে তাদের কাছে পাঠাত।[১০৭] মদ চোলাই ব্যবস্থা মারফত "রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়াসে জোর করে মদ্য পান বাড়ানো হচ্ছে বলে আবগারি প্রশাসনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করার জন্য" ভারত সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল।[১০৮] কিন্তু ঘর-বাড়ি ও দপ্তর খরচের জন্য কেন্দ্রীয় চোলাইখানা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ ছিল এবং সেই কারণেই এই ব্যবস্থা কেবল আস্তে আস্তেই প্রবর্তিত করা গিয়েছিল। মদ্য পানের অভ্যাস ছড়িয়ে পড়া বন্ধ না করতে পারার দরুন দেশীয় সংবাদপত্রগুলি সরকারের সমালোচনা করত। ইভানজেলিস্ট ধারণার সমর্থক সংবাদপত্রগুলিও "সরকার কর্তৃক মাতলামি ছড়ানো"র সমালোচক ছিল।[১০৯]

এ বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের বক্তব্য হাস্যকর এবং ধোঁয়াটে। "ধারণা ছিল যে (আবগারি) প্রশাসনের একটি সঠিক ব্যবস্থার মারফত রাজস্বের লক্ষ্য ও নৈতিক লক্ষ্য একই বিন্দুতে মিলবে।"[১১০] সরকারের লক্ষ্য ছিল মদ ও মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার সঙ্গে সঙ্গে আবগারি

শুল্ক থেকে যত বেশি সম্ভব রাজস্ব তোলা।"[১১১] এই ধারণাকে ব্যবহারিক নীতিতে পরিণত করা অসম্ভব।

সরকারি প্রবক্তাদের মতে স্ট্যাম্প শুল্ক ছিল "বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তদের কাছ থেকে রাজস্বের" একটি উৎস। Wilson অনুভব করেছিলেন যেসব বণিক, ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্ক মালিকেরা আইন ও শৃঙ্খলার ব্যবস্থার দরুন সুবিধা ভোগ করছিলেন এই ব্যয়বহুল ব্যবস্থাটির জন্য খুব ন্যায়সঙ্গতভাবেই তাঁদের উপর কর ধার্য করা উচিত।[১১২] এই কারণেই ১৮৬০ সালে স্ট্যাম্প শুল্ক প্রায় ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং ১৮৬১ সালেও আবার সামান্য বাড়ানো হয়েছিল। এইভাবে স্ট্যাম্প থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব, যা ১৮৫৭-৫৮ সালে ছিল মাত্র ৪৫.৬ লক্ষ টাকা, ১৮৬০-৬১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ১.১৮ কোটি টাকায়। সরকার বাণিজ্যিক লেনদেনের দলিলপত্রের (অর্থাৎ হুণ্ডি, বণ্ড, বিল অব এক্সচেঞ্জ) উপর স্ট্যাম্প শুল্কের মারফত রাজস্ব তুলে ন্যায়সঙ্গত কাজই করেছিল; কিন্তু বিচার ও আইনসম্বন্ধীয় দলিলপত্রের (যেমন অভিযোগপত্র, দরখাস্ত, জমি রেজিষ্ট্রির দলিলপত্র ইত্যাদির) উপর স্ট্যাম্প শুল্ক কার্যতঃ ছিল ন্যায় বিচারের উপর কর।[১১৩] দলিলপত্রাদির সরকারি স্বীকৃতি লাভের জন্য সঙ্গতিপন্ন ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্ক মালিকেরা তাদের দলিলপত্রের উপর স্ট্যাম্প লাগানোর জন্য স্বেচ্ছায়ই অর্থ দিতেন, কিন্তু যে লোকেরা ন্যায় বিচারের জন্য আদালতে যেতেন তাঁদের উপর কর চাপানো আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প অত্যধিক মামলা মোকর্দমা কমাবে ঃ ধারণা ছিল যে এ দেশের লোকেরা খুব মামলাবাজ।[১১৪]

* * *

ভারত সরকারের বিপুল সামরিক ব্যয়ের নিন্দায় ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি প্রায় একমত ছিল। "এক ধরনের ভারতীয় রাজনীতিকদের মতে ভারত সরকারের সামরিক ব্যয় ভারতের দেশীয় লোকদের সমালোচনার এক্তিয়ার বহির্ভূত।"[১১৫] দেশীয় সংবাদপত্রগুলি এ কথা মেনে নিতে রাজী হয়নি। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ সামরিক শক্তি হ্রাস করার প্রচেষ্টায় রত বলে সন্দেহভাজন হতে পারে এই আশঙ্কায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' অত্যধিক সামরিক ব্যয়ের সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে "রাজদ্রোহী মতলবে"-র সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক নেই বলে ঘোষণা করত।[১১৬] ১৮৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল এক সম্পাদ-

কীয়তে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' দেখিয়েছিল যে ১৮৬৩-৬৫ থেকে ১৮৭১-৭২ সালের মধ্যে সামরিক ব্যয় ৪০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১১৭] এই সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিল যে এই বৃদ্ধির বেশির ভাগই ভারতীয় বাহিনীর ও রাজকীয় বাহিনীর "একত্রীকরণের" জন্য হয়েছে। সৈন্য সংগ্রহের খরচের জন্য ভারতীয় রাজস্ব থেকে মোটা ব্যয় হত। প্রতিটি সৈন্যের জন্য গড় খরচ ১৮৫০ দশকের ১৯ পাউণ্ড ১৫ শিলিং থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৭০ সালে দাঁড়িয়েছিল প্রায় ২০৫ পাউণ্ড।[১১৮] দেশীয় সংবাদপত্রগুলি বারংবার সামরিক খরচ কমানোর দাবি জানিয়েছিল।[১১৯] ১৮৬০ সালে তারা ব্যাপক ছাঁটাইয়ের দাবি করেছিল; তাদের মতে সামরিক ফিনান্স কমিশন যে ছাঁটাই করেছিল তা যথেষ্ট ছিল না।[১২০] পরবর্তী দশকে সামরিক ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও অপরাপর ভারতীয় সংবাদপত্র Mayo-র ছাঁটাই প্রস্তাবগুলিকে স্বাগত জানিয়েছিল। 'পাঞ্জাব আকবর' লিখেছিল যে ১৮৭১ সালে ভারত সরকার যে সৈন্যবাহিনী পুষতো তা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল, কিন্তু তাদের জন্য খরচ ছিল বেশি।[১২১] ব্যয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ হিসাবে প্রায়শই রসদ যোগান (Commissariat) বিভাগের কথা উল্লেখ করা হত।[১২২] সেনানিবাস নির্মাণের খরচ ছিল চলতি রাজস্ব থেকে একটি বিপুল বিনিয়োগ (capital expouse)। দেশীয় সংবাদপত্রগুলিতে এর সমালোচনা হত।[১২৩] ৬০-এর দশকের শেষভাগে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধির আর একটি কারণ ছিল আবিসিনিয়ার যুদ্ধের খরচের কিছু অংশ ভারত সরকারের উপর চাপানো। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি লিখছিল—যে যুদ্ধের সঙ্গে ভারতের কোনও সম্পর্ক নেই তার খরচ ভারতের উপর অন্যায়ভাবে চাপানো হয়েছে। এ ধরনের কাজে ভারতীয় রাজস্ব ব্যবহারের বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থিত করার জন্য ১৮৬৭ সালের নভেম্বরে লণ্ডনের ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় দাদাভাই নওরোজি ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে এই ব্যয় ১৮৫৮ সালের গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের পরিপন্থী। আর সেক্রেটারি অব স্টেটের "উচিত ভারতীয় রাজস্ব থেকে ইংরেজ করদাতাদের কোনও উপহার দেবার পরিবর্তে ভারতীয় রাজস্ব অনধিকার অধিগ্রহণ থেকে রক্ষা করা।"[১২৫] 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সেক্রেটারি অব স্টেট Northcote-এর নানা অজুহাতকে কোন আমলই দেয় নি। এই

কাগজটি বলেছিল যে এ কথা সত্য নয় যে ভারতীয় মুসলমানদের আবিসিনিয়ার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আছে। আর ভারত সরকারের উপর আবিসিনিয়া যুদ্ধের খরচের সামান্য অংশই কেবল চাপানো হয়েছে এ তথ্যও প্রাসঙ্গিক নয়। "অর্থের পরিমাণ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি নে, কিন্তু নীতিটাই হল ভারতের পক্ষে বিশেষ জরুরী।······ আমরা শুধু চাই এখানেই এ ধরনের ঘটনা শেষ হোক।"[১২৬] ভারতীয় সমালোচকরা অবশ্য এ কথা জানতেন না যে গভর্নর-জেনারেল Sir John Lawrence নিজেই আরও জোরালো ভাষায় এই একই জিনিসের নিন্দা করছিলেন।[১২৭] এই সব ঘৃণ্য কারবার লোকে সহজে ভোলে নি। Mayo-র আমলের ছাঁটাই ব্যয় কিছু কমিয়েছিল এবং এর জন্য সরকার অভিনন্দনও পেয়েছিল।[১২৮] কিন্তু দেখা গেল যে দেশীয় বাহিনীগুলিকে যখন ভেঙে দেওয়া হচ্ছিল তখন ইউরোপীয়দের স্পর্শও করা হচ্ছিল না। এ কথা সুবিদিত ছিল যে সামরিক ব্যয়ের বেশিটাই হত ইউরোপীয় সৈন্যদের দরুন—তাদেরকে অতিরিক্ত খরচ করে সংগ্রহ করা হত, ভারতে পাঠানো হত, সেনানিবাসে রাখা ও খাওয়ানো হত এবং চাকরির মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে পেন্সন দেওয়া হত। একটি দেশীয় সংবাদপত্র একটা চিত্তাকর্ষক প্রস্তাব দিয়েছিল—ইউরোপীয়দের তুলনায় কম বেতনের দেশীয় অফিসারদের রেজিমেণ্ট পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া উচিত।[১৩১] কিন্তু ওই সময়ে এই ধরনের মতের পক্ষে সরকারের আনুকূল্য লাভ সম্ভব ছিল না। বিদ্রোহ ইংরেজদের মনে দেশীয় সৈন্যদের উপর প্রচণ্ড অবিশ্বাস এবং সৈন্যবাহিনীতে ইউরোপীয়দের প্রাধান্য বজায় রাখার সঙ্কল্প দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিয়েছিল। ১৮৭১ সালে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার উপর তদন্তের জন্য কমন্স সভার সিলেক্ট কমিটি গঠিত হবার পর সামরিক ব্যয় সম্পর্কে ভারতীয়দের মতামত প্রকাশিত হয়েছিল। সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে এক দরখাস্ত বম্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন সিলেক্ট কমিটির তদন্তের আওতার মধ্যে সামরিক ব্যয়কে (যা এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল যে ভারতীয় রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ গ্রাস করছিল) অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছিল।[১৩২] কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারতের উপর এমন সব ব্যয় চাপানো হয়েছিল যা ইংল্যাণ্ডেরই বহন করা উচিত ছিল বলে ভারতীয় সংবাদপত্রে যে মতামত প্রকাশিত হয়েছিল সিলেক্ট কমিটির রায়ে তা অংশত স্বীকৃত হয়েছিল।[১৩৩]

হোমচার্জ অর্থাৎ ভারত সরকারের ইংল্যাণ্ডে খরচ—সমালোচনার লক্ষ্য

হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৮৬৯ সালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাশোসিয়েশন মিনতি করে যে, যদিও "বর্তমান স্মারকলিপি প্রেরকেরা মুহূর্তের জন্যও চায় নি যে সেক্রেটারি অব স্টেট বা তাঁর কাউন্সিল সম্পর্কে ভারত সরকার বিচারকের আসন গ্রহণ করুক বা তাঁর বাজেট সংশোধন করুক", কিন্তু যদি ফিনান্স মেম্বার ও সেক্রেটারি অব স্টেটের বাজেট একই সঙ্গে প্রকাশিত হয় তবে "কর দাতারা প্রকৃত অবস্থা জানার সুযোগ পেতে পারেন।"[১৩৪] সরকার এ ব্যবস্থা চালু করতে অস্বীকার করল। কয়েকটি দেশীয় সংবাদপত্রের দাবির তুলনায় এ অনুরোধ খুবই নরম ছিল। বোম্বাইয়ের বিখ্যাত সংবাদপত্র 'জাম-এ-জামশেদ' দাবি করেছিল যে ভারতীয় অর্থ খরচের ব্যাপারে সেক্রেটারি অব স্টেটের ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে ও তার সীমা বেঁধে দিতে হবে।[১৩৫] 'রাস্ত গফতার' এই ক্ষমতার সীমা নির্দিষ্ট করে দেবার ব্যাপারে একমত ছিল।[১৩৬] 'হিন্দু পেট্রিয়ট'ও দাবি করেছিল হোমচার্জের ক্রমাগত বৃদ্ধির জরুরী প্রতিকার।[১৩৭] সরকারের ইংল্যাণ্ডে খরচ সম্পর্কে আরও বিস্তৃত বিবরণের দাবি উঠেছিল।[১৩৮]

১৮৬৭ সালে লণ্ডনের ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাশোসিয়েশনের সভায় পঠিত দাদাভাই নওরোজিব একটি রচনায় এই হিসাব দেওয়া হয়েছিল যে ১৮২৯ সালের পর ৩৬ বছরে 'হোমচার্জ' বাবদ ১০ কোটি পাউণ্ড ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হয়েছিল। নওরোজির মতে ভারতে সংগৃহীত রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ দেশের বাইরে অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে চলে গিয়েছিল।[১৩৯] এই সব হিসাবের প্রকৃত গুরুত্ব যাই হোক না কেন তা ভারতের জনমতের উপর বিপুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে প্রেরিত এক দরখাস্তে বোম্বাইয়ের ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাশোসিয়েশন হোমচার্জের ব্যাপারে কমন্স সভার সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক তদন্ত দাবি করেছিল।[১৪০] আর. সি. দত্ত ও অপরাপর ব্যক্তিরা আরও বেশি পরিসংখ্যানের সাহায্যে সেই "সম্পদ মোক্ষণের" তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলেন, নওরোজি ও Henry Fawcett তারই পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন। Fawcett ভারতীয় জনমতের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন,[১৪১] "দেশের রাজস্বের ক্রমবর্ধমান অনুপাত দেশের ভিতরেই খরচ হতে না দেওয়ার মধ্যে আশঙ্কার একটা কারণ" তিনি দেখতে পেয়েছিলেন।[১৪২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে সরকারি উপভাষায় "হোমচার্জ" বলতে

বোঝাত বৈদেশিক ব্যয়, অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে স্টার্লিংয়ে খরচ। ১৮৬০-৬৫ সালের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে নীট খরচ হত প্রতি বছরে গড়ে ৯৪ লক্ষ পাউণ্ড এবং ওই দশকের দ্বিতীয়ার্ধে তা ৯৫ লক্ষ পাউণ্ডে দাঁড়িয়েছিল। সেক্রেটারি অব স্টেট হোমচার্জ বাবদ ইংল্যাণ্ডে যে অর্থ খরচ করতেন তার উপর ভারত সরকারের কোনও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আলোচ্য সময়ে দুবার সেক্রেটারি অব স্টেট কর্তৃক প্রদত্ত ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাশিত ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব ভারতীয় বাজেটে হ্রাস করা হয়েছিল। ওই দুবারই সেক্রেটারি অব স্টেট ফিনান্স মেম্বারদের ও ভারত সরকারকে কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করেছিলেন : দুবারই হোমচার্জের বাজেট বাড়ানো হয়েছিল। সেক্রেটারি অব স্টেট ইংল্যাণ্ডের খরচ কিভাবে মেটাতে হবে তার উপায় ও পদ্ধতি নির্ধারণ করতেন : হুণ্ডি এবং লণ্ডনে গৃহীত অর্থ টেলিগ্রাফযোগে ভারতের নামে হস্তান্তর, ভারত থেকে সোনা-রুপোর বাট (বুলিয়ন) প্রেরণ, ইংল্যাণ্ডে সংগৃহীত ঋণ, গ্যারান্টি দেওয়া রেল কোম্পানির কাছ থেকে ইংল্যাণ্ডে প্রাপ্ত অর্থের ব্যবহার, ইত্যাদি।

হোম চার্জের প্রধান খাতগুলি ছিল নিম্নরূপ :

(১) ঋণের সুদ : এর মধ্যে পড়ত ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টকের মালিকদের লভ্যাংশ ; ১৮৩৪ সাল ও '৭৪ সাল পর্যন্ত (যখন স্টকগুলি আবার কিনে নেওয়া হয়েছিল) স্টকের মালিকদের বছরে ৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৯৭০ পাউণ্ড করে দেওরা হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে গৃহীত ঋণের সুদ এবং লণ্ডনে বিল মারফত প্রদত্ত ভারতীয় ঋণের সুদ একটা বড় ব্যয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আলোচ্য সময়ে ভারতের রাষ্ট্রীয় ঋণ কি ভাবে বেড়ে উঠেছিল তা আমরা আগেই দেখেছি। ১৮৫৬-৫৭ সালে ইংল্যাণ্ডে প্রদত্ত সুদের পরিমাণ ছিল মাত্র ৮ লক্ষ ৮৯ হাজার পাউণ্ড ; ১৮৬০-৬৫ সালে বছরে গড়ে সুদ বাবদ ব্যয় ছিল ২০ লক্ষ ৩ হাজার পাউণ্ড এবং ১৮৬৫-৭০ সালে এই গড় দাঁড়িয়েছিল ২০ লক্ষ ৮ হাজার পাউণ্ড।

(২) ভারতের জন্য মালপত্র : বেসামরিক বিভাগ (পূর্তকর্ম বিভাগ, টাঁকশাল এবং ডাক ও তার বিভাগ), সৈন্যবাহিনী, নৌ-পরিবহন বিভাগের জন্য ইংল্যাণ্ডে কেনা মালপত্রের দাম বাবদ ভারতকে সাধারণতঃ ১০ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ পাউণ্ড মত দিতে হত। ইংল্যাণ্ড থেকে মালপত্র সংগ্রহের উপরে নিয়ন্ত্রণ একটা গুরুতর সমস্যা ছিল। ১৮৬২ সালে সরকারের বিভিন্ন

বিভাগকে, ইংল্যাণ্ড থেকে সরাসরি মালপত্রের ফরমায়েশ (requisition) না করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল ঃ সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে মালপত্রের সকল ফরমায়েশ ফিনান্স বিভাগ কর্তৃক খুঁটিয়ে দেখা হত।[১৪৩] ভারত সরকারের অনুরোধে সেক্রেটারি অব স্টেট এই নিয়ম চালু করেছিলেন যে ইণ্ডিয়া অফিসে মালপত্রের ফরমায়েশ খুঁটিয়ে দেখা হবে এবং এই ফরমায়েশ চূড়ান্তভাবে পাস করার আগে বিগত কয়েক বছরে মালপত্র ব্যবহারের সঙ্গে এই দাবির তুলনা করে দেখা হবে।[১৪৪] সামরিক অর্থ-বিষয়ক বিভাগের Col. Balfour সামরিক ব্যয় হ্রাসের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সামরিক মালপত্র সংগ্রহের নিয়মাবলী ঠিক করে দিয়েছিলেন।[১৪৫] কাগজ ও স্টেশনারী জিনিসপত্র যদি ভারতে অপেক্ষাকৃত সস্তায় পাওয়া যায় তবে তা ভারতে ক্রয় করে মালপত্রের দরুন ইংল্যাণ্ডে ব্যয় হ্রাস করার জন্য সেক্রেটারি অব স্টেট ভারত সরকারকে অনুরোধ করেছিলেন।[১৪৬] ১৮৬৬ সালে সেক্রেটারি অব স্টেট ইংল্যাণ্ডে মালপত্রের দরুন ব্যয় হ্রাসের জন্য পুনরায় অনুরোধ জানিয়েছিলেন ঃ তিনি দেখিয়েছিলেন যে পরিবহন খরচ সহ মালপত্রের ব্যয় ১৮৬৪-৬৬ এই তিন বছরে ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৪৭] মালপত্রের দরুন খরচ আগে থেকে স্থির করার জন্য ভারত সরকার আর্থিক বছর শুরু হবার আগেই সেক্রেটারি অব স্টেটকে জিনিসপত্রের ফরমায়েশের আনুমানিক তালিকা পাঠাবার সিদ্ধান্ত করেছিল।[১৪৮] সর্বনিম্ন দরে সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য সেক্রেটারি অব স্টেট টেণ্ডার আহ্বান করে মালপত্র সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন ঃ আগেও সেই ব্যবস্থা চালু ছিল কিন্তু তখন "প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার নীতি" আরও দৃঢ়ভাবে প্রযোগ করা হল।[১৪৯] এই সব পদক্ষেপ মালপত্র বাবদ খরচ কমাতে পারল না। ১৮৬৯ সালে মালপত্রের দরুন ব্যয়ের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রতি সেক্রেটারি অব স্টেট পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। মালপত্রের ফরমায়েশের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ না করার জন্য তিনি ভারত সরকারের উপর দোষারোপ করলেন।[১৫০] পূর্ত বিভাগ, সামরিক ও অর্থ দপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি মালপত্র ফরমায়েশ কমিটি গঠন করার পরিকল্পনা Mayo করেছিলেন।[১৫১] এই রকম একটি কমিটি নিয়োজিত হয়েছিল এবং মালপত্রের দরুন ব্যয়ের বাৎসরিক পর্যালোচনার একটি ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।[১৫২] এই সব ব্যবস্থার ফলে জিনিসপত্রের অপব্যয় এড়াতে সরকার সক্ষম হয়েছিল,

কিন্তু পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে এই খাতে ব্যয় বেড়ে চলেছিল। ডাক ও তার বিভাগ এবং পূর্ত বিভাগের কাজের প্রসার এবং রেলপথ নির্মাণের জন্য ইংল্যাণ্ড থেকে মালপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম আমদানির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

(৩) "ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর জন্য হোমচার্জ" একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত ছিল। ভারতীয় রাজস্বের উপর চাকুরে ও অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যদের ব্যয় সম্পর্কে আমরা আগের পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি।

(৪) সৈন্যবাহিনীকে ভারতে আনয়ন অথবা ইংল্যাণ্ডে ফেরার পরিবহন খরচ ছিল একটি সংশ্লিষ্ট ব্যয়। যাতায়াতের খরচের অর্ধেক ব্রিটিশ রাজ-কোষের দেওয়া উচিত এই মর্মে Welby কমিশনের সুপারিশের (১৯০০ সাল) আগে পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে জাহাজে ওঠার দিন থেকে পরিবহনের সমগ্র খরচ ভারতের উপর চাপনো হত। স্বল্প মেয়াদী কাজের ব্যবস্থা পরিবহন খরচ বাড়িয়ে দিত। এই খাতে ব্যয় বছরে বছরে ওঠা-নামা করত।

(৫) বে-সামরিক কাজে নিযুক্ত অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের পেন্সন ও বার্ষিক বৃত্তি বাবদ ব্যয় ও দীর্ঘকালীন ছুটির সময়কার ভাতা হোম-চার্জকে ফাঁপিয়ে তুলত ঃ এগুলিকে বলা হত অবসরপ্রাপ্তদের দরুন ব্যয় (non-effective charge)।

(৬) রেল কোম্পানীগুলিকে অঙ্গীকার অনুসারে (গ্যারাণ্টি দেওয়া) সুদ একটা বড় দফা ছিল। গ্যারাণ্টি দেওয়া কোম্পানিগুলোকে প্রদত্ত সুদ ১৮৬০-৬৫ সালে বছরে গড়ে ২২ লক্ষ পাউণ্ড থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ওই দশকের শেষভাগে দাঁড়িয়েছিল ৩৩ লক্ষ পাউণ্ড।

১৮৬০ সালে সেক্রেটারি অব স্টেট খুবই স্পষ্টভাবে পরিস্থিতির বিবরণ দিয়েছিলেন। "রেলপথে লগ্নিকৃত গ্যারাণ্টি দেওয়া সুদ বাড়বেই এটা ধরে নেওয়া উচিত। রেল পাতার কাজ ক্রমশঃ শেষ হতে থাকার ফলে পরিবহন থেকে নীট আয় বৃদ্ধির দরুন সুদ বাবদ ব্যয় কিছুটা কমার দিকে ঝোঁক দেখা দেবে, কিন্তু রেলপথের কাজ শেষ করার জন্য ২ কোটি পাউণ্ডেরও বেশি এখনও সংগ্রহ করতে হবে এই তথ্যের দিকে নজর রেখে এ কথা অনুমান করে নিতে হবে যে আগামী কয়েক বছরে সুদ বাবদ ব্যয় আরও বাড়বে। এই সুদের চরিত্র নিঃসন্দেহে অপরাপর সুদ থেকে ভিন্ন, কারণ এই সুদ বাবদ প্রদত্ত অর্থ সরকার আবার ফেরত পাবে এবং যখনই কোনও রেলপথ ৫

শতাংশেরও বেশি লাভ করতে পারবে তখন থেকেই কিছু কিছু করে এই ফেরত দেওয়া শুরু হবে, কিন্তু এটা জানা কথা যে পরিশোধের তারিখ এখনও বহুদূরে······।"[১৫৩] যে গ্যারান্টি দেওয়া চুক্তির বলে সুদ বাবদ ব্যয় করার কথা হয়েছিল আগেকার এক পরিচ্ছেদে তা আমরা আলোচনা করেছি। এ কথা আমাদের খেয়ালে রাখা উচিত যে সুদ বাবদ ব্যয়ই যে কেবল একটা ভারী বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা নয়, সেই সঙ্গে ভারত সরকারের আর্থিক দিক থেকে বিব্রত অবস্থায় আরও একটি অতিরিক্ত উৎস ছিল রেল কোম্পানিগুলি থেকে প্রাপ্য এবং তাদেরকে দেয় অর্থের প্রাপ্তি এবং খরচ কখন হবে তার অনিশ্চয়তা এবং কোম্পানিগুলির নামে জমা অর্থের উপর অতিরিক্ত অর্থ তাদের যখন তখন তোলার অভ্যাস।[১৫৪]

(৭) 'হোম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' (ইংল্যাণ্ডে প্রশাসন) খাতের মধ্যে পড়ত সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার বেতন, আণ্ডার-সেক্রেটারি ও ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্যদের বেতন ইণ্ডিয়া অফিসের দপ্তর খরচ, ভারতীয় ঋণের ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডকে প্রদত্ত অর্থ, হিসাব-পরীক্ষকদের ২১ ও ২২ নং আইনের—Vict. C 106 ৫২ ধারা বলে) খরচ, ডাক খরচ ইত্যাদি। ১৮৬০-৬১ সালে এই খাতে ব্যয় হয়েছিল ১ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউণ্ড এবং ১৮৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত এই খরচ ২ লক্ষ পাউণ্ডের বেশি হয় নি; ১৮৭০-৭১ সালে এই ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২ লক্ষ ১৬ হাজার পাউণ্ড। এই ব্যয় ও বৈদেশিক দূতাবাসের খরচ ভরতে কড়া নজর ও সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল। উদাহরণস্বরূপ, তুর্কীর সুলতানকে স্বাগত জানাবার জন্য সেক্রেটারি অব স্টেটের বলনাচের খরচ ভারতীয় কর দাতাদের অর্থ অপচয়ের একটা কুখ্যাত উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল: Northcote গোপনে Lawrence-কে লিখেছিলেন যে "সুলতানের বল বহু লোকের মুখে কুৎসার বিষয় হয়ে উঠল।"[১৫৫] ১৮৩৪ সালে সম্পাদিত এক চুক্তি বলে ভারত সরকার চীনের দূতাবাসের খরচের এক-তৃতীয়াংশ বহন করত: ১৮৬০-৬১ সালে এই খরচের পরিমাণ ছিল ২৩ হাজার পাউণ্ড, ১৮৬১-৬৩ সালে ১৪ হাজার পাউণ্ড, ১৮৬৩-৬৫ সালে ১৭ হাজার পাউণ্ড এবং ১৮৬৫-৬৭ সালে ১৯ হাজার পাউণ্ড। ১৮৬০, ১৮৬২ এবং ১৮৬৬ সালে লর্ডস অব দা ট্রেজারির কাছে ব্যয় হ্রাসের দাবি জানানো হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা ১৮৩৪ সালের চুক্তিকে

সংশোধন করতে অস্বীকার করেছিলেন।[১৫৬] ১৮৬০ সালে ভারত সরকার এডেনের জন্য দেয় অর্থের পরিমাণ কমাতে বা রদ করতে চেষ্টা করেছিল ঃ সরকার দেখিয়েছিল যে এডেন শুধু ভারতে যাবার পথ নয়, সেই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও সিঙ্গাপুরেরও পথ। কিন্তু এডেনের সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যয় নির্বাহের খরচ কেবল ভারতকেই দিতে হচ্ছে।[১৫৭] সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে উপরোক্ত বার্তায় এ কথাও বলা হয়েছিল যে স্ট্রেট সেটেলমেণ্টের প্রশাসনের জন্য ভারত সরকারকে বছরে ৫ লক্ষ টাকা (৫০ হাজার পাউণ্ড) খরচ করতে হচ্ছে, এবং সেটেলমেণ্টের খরচ হস্তান্তরের জন্য অনুরোধও করা হয়েছিল।[১৫৮] ভারত সরকার এই নীতির উপর জোর দিয়েছিল যে "ভারতের রাজস্ব কেবল ভারতীয় উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করতে হবে" এবং "বাইরের খরচ" থেকে ভারতকে রেহাই দিতে হবে।[১৫৯] সরকারের এই প্রচেষ্টায় কিছু ফললাভ হয়েছিল। এডেনের খরচের অর্ধেক ব্রিটেন দিতে রাজী হয়েছিল এবং ১৮৬৭ সালে স্ট্রেট সেটেলমেণ্টকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার ফলে ব্যয় কিছুটা কমেও গিয়েছিল।[১৬০]

ভারত সরকারের হোমচার্জের উপরও "হোম" (ইংল্যাণ্ডে) লেনদেনের জন্য বিপুল অর্থ দিতে হত ঃ এ 'ইংল্যাণ্ডে প্রেরিত অর্থের মুদ্রা বিনিময় জনিত ক্ষতি' (loss by exchange) নামে পরিচিত ছিল। সরকারি বিনিময় মূল্য ছিল টাকা প্রতি ২ শিলিং। যখনই টাকার বিনিময় মূল্য দু শিলিংয়ের চেয়ে কমে যেত তখন ইংল্যাণ্ডের কোষাগার থেকে স্টার্লিং ব্যয় বাবদ অর্থ মেটানোর জন্য আরও বেশি টাকার প্রয়োজন হত। গ্যারাণ্টি দেওয়া রেল কোম্পানিগুলির সঙ্গে ত্রুটিপূর্ণ চুক্তির জন্য বিনিময়ের দরুন ক্ষতি কি পরিমাণ হত তা আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। স্বভাবতই ব্যয়ের এই খাত বিনিময়ের হারও ইংল্যাণ্ডে প্রেরিত অর্থের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল হবার দরুন বহুল পরিমাণে ওঠা-নামা করত।

সৈন্যবাহিনীর ইংল্যাণ্ডের দপ্তরের ও ইংল্যাণ্ড থেকে মালপত্র আনার খরচ ইত্যাদির জন্য দিলদরিয়া খরচের সঙ্গে ভারতে শিক্ষার জন্য নিতান্ত কৃপণ ব্যয়ের বৈষম্য তীব্রভাবে অনুভূত হত। ১৮৫৭-৫৮ এবং ১৮৭১-৭২ সালের মধ্যে শিক্ষাখাতে খরচ ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ওই একই সময়ের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পাঁচগুণেরও বেশি বেড়েছিল এবং ওই সব প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের হাজিরার সংখ্যা গড়ে ছয়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বৃদ্ধির

হার আশাব্যঞ্জক ছিল। শিক্ষা শুধু সরকারি চাকুরির কাল্পনিক স্বর্গে প্রবেশের জন্যই অপরিহার্য ছিল না, ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির নতুন বৃত্তিগত ক্ষেত্রে প্রবেশের পক্ষেও অপরিহার্য ছিল। শিক্ষার বিকাশের হারে সরকারের সন্তুষ্টি সত্ত্বেও শিক্ষার সুযোগের জন্য উদ্‌গ্রীব মধ্যবিত্ত শ্রেণী সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্রসংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সরকারি মহলে আত্ম-প্রশংসার হেতু হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু এই পরিসংখ্যান ব্যাখ্যার সময়ে সতর্কতার প্রয়োজন। এটা সম্ভব যে আগের বছরগুলিতে সংখ্যা কম করে দেখানোর দরুনই ষাটের দশকের শেষভাগে ও সত্তরের দশকের প্রথমভাগে শিক্ষার দ্রুত বিকাশ সম্বন্ধে একটা অতিরঞ্জিত ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৫৭-৬০ সালে সরকার শিক্ষাখাতে বছরে ২৪ লাখ টাকা ব্যয় করেছিল ঃ ১৮৬০-৬১-র জন্য এই অঙ্ক ছিল ২৯ লক্ষ, এবং ওই দশকের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য ৫৩ লক্ষ। শেষোক্ত অঙ্কটি বিদ্রোহের অব্যবহিত বছরগুলির গড়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল। কিন্তু এমন কি ষাটের দশকের শেষভাগে শিক্ষা খাতে খরচ ভারত সরকারের মোট বাৎসরিক খরচের মাত্র ১ শতাংশ ছিল। শিক্ষা খাতে মঞ্জুরির অপ্রতুলতা সম্পর্কে অবহিত ভারত সরকার স্থানীয় কর ধার্য করে শিক্ষার জন্য তহবিল সংগ্রহের ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অনুরোধ জানিয়েছিল। এটি বিশেষ ভাবে প্রয়োজন ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য, কারণ তার জন্য সাধারণ রাজস্ব থেকে অর্থ বরাদ্দ করা সম্ভব ছিল না।[১৬১]

আলোচ্য পর্যায়ের গোটা সময়টাতেই বাংলা প্রেসিডেন্সি অপরাপর যে কোনও প্রদেশের তুলনায় শিক্ষাখাতে অধিকতর মঞ্জুরি পেয়েছিল।[১৬২] কিন্তু সরকার এর ফলাফল থেকে খুব সন্তুষ্ট হতে পারে নি। Mayo, Sir E. Perryকে লিখেছিলেন "প্রকৃত সত্য এই যে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা এমন সব ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় যাঁরা 'পরিস্রাবণ' (filtration) তত্ত্বের অনুগামী (যা আমার মতে একেবারে বাজে)—অর্থাৎ যদি উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা জ্ঞান অর্জন করেন তবে তাঁদের উদাহরণ থেকে শিক্ষা ক্রমশঃ তলার দিকে যাবে····· (কিন্তু) আপনারা যদি জনগণকে শিক্ষিত করতে চান তবে আপনাদের তলা থেকে শুরু করতে হবে এবং সেখান থেকেই উপরে উঠতে হবে।"[১৬৩] মনে করার কারণ ছিল যে প্রাথমিক শিক্ষা উপেক্ষিত হচ্ছে, এবং নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ঝোঁক হল শিক্ষা ব্যবস্থার আর্থিক কাঠামোকে মাথাভারী করে তোলা। "রাষ্ট্রের বিপুল ব্যয়ে বাংলাদেশে আপনারা কয়েক শত বাবুকে ইংরাজিতে শিক্ষিত করছেন। সরকারি কাজে নিযুক্ত

হবার যোগ্যতা অর্জন ছাড়া তাঁদের অনেকের আর কোনও উদ্দেশ্য নেই—এদিকে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেবার জন্য আপনারা একেবারে কিছুই করেন নি।"[১৬৪] উপরন্তু Mayo-র অনুমান ছিল যে ইংরাজি শিক্ষা "আমাদের প্রতি ও আমাদের শাসনের প্রতি জনগণের বিরাগ কমাচ্ছে না।" "ইংরেজি শিক্ষিত বাবু, যাঁরা সরকারি চাকরি পান নি, তাঁদের চেয়ে অসন্তুষ্ট লোক হিন্দুস্থানে নেই।"[১৬৫] যাই হোক না কেন, ভারত সরকার যেহেতু জনগণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে পারল না, তখন কাজটা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতেই ছেড়ে দিতে হল। ১৮৭১ সালে অর্থব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনা অনুযায়ী যেসব বিভাগ প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে দেওয়া হল শিক্ষা তার অন্যতম।

* * * *

রমেশ দত্ত ও অপরাপর জাতীয়তাবাদী চিন্তানায়কেরা পরবর্তীকালে যেসব যুক্তি ব্যবহার করেছিলেন, দাদাভাই নওরোজি ও 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট'-এর সম্পাদক Robert Knight-এর লেখায় তার পূর্বাভাস ছিল। ১৮৬৯-৭১ সালে Robert Knight পর পর কতকগুলি প্রবন্ধে এই যুক্তির অবতারণা করেছিলেন যে ভারতে ইংরেজ লগ্নীকারীদের অত্যধিক উচ্চহারে সুদ দিচ্ছে "এবং তাঁদের যতটা লাভ ভারতের ঠিক ততটাই ক্ষতি।"[১৬৬] তিনি আরও এগিয়ে গিয়ে ভারতের ঋণকে[১৬৭] "শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিছক ইংরেজদেরই দায়[১৬৮]—যাকে অন্যায়ভাবে ভারতীয় রাজকোষের উপর চাপানো হয়েছে বলে নিন্দা করেছিলেন।"[১৬৯] ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টকের দরুন এবং বিদ্রোহ সংক্রান্ত ঋণের দরুন সুদের খরচকে Knight সমর্থনের সব চেয়ে অযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। নওরোজির কাছে সুদের খরচ ছিল "ব্যয়ের অনিষ্টকর প্রশাসনের দরুন···রাজনৈতিক বোঝা"[১৭০] যা ভারত থেকে সম্পদ মোক্ষণ আরও বাড়িয়েছিল। Knight ও নওরোজি উভয়েই "রাজনৈতিক" ঋণ ও পূর্তকর্মের জন্য ঋণের ক্ষেত্রে একটা পার্থক্য টানতেন। এমন কি পূর্তকর্মের মত উৎপাদনমূলক লগ্নির জন্যও ভারত দুর্ভাগ্যবশতঃ মূলধন যোগাতে পারত না; "ইংরেজ মূলধনের সাহায্য ভারতের দারুন প্রয়োজন কিন্তু", মূলধন ও উৎপন্ন উভয়কেই গ্রাস করার মত ইংরেজ আক্রমণের আগম নয়।"[১৭১]

'ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট'-এর মতে ১৮৭৩ সালে গ্রামাঞ্চলে সুদের হার ছিল ২০ থেকে ৫০ শতাংশের মধ্যে, আর প্রেসিডেন্সির শহরগুলিতে বাণিজ্যিক

সুদের হার ছিল ৯ শতাংশ।[১৭২] সুতরাং সরকারের পক্ষে লণ্ডনে ধার করা অপেক্ষাকৃত সস্তা ছিল। এই যুক্তিতেই ভারত সরকার বিদেশে ধার নেবার নীতি সমর্থন করত তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আভ্যন্তরীণ ঋণের সুযোগ সীমাবদ্ধ ছিল এবং বিদেশী ঋণদাতাদের কাছ থেকে ধার করা সুবিধাজনক ছিল। নওরোজি এ কথা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের ক্রমবর্ধমান স্টার্লিং দেশ সম্বন্ধে তিনি সমালোচনা করতেন: প্রথম কারণ ছিল এ ব্যাপারটা প্রধানতঃ "রাজনৈতিক ঋণ" থেকে উদ্ভূত এবং দ্বিতীয়তঃ ঋণদাতাদের জন্য বিদেশে সুদ পাঠাতে হত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শুল্কনীতি একটি বাস্তব বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী অভিযোগ তালিকার শিল্পকে শৈশবে হত্যার তত্ত্বটির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। ষাটের দশকে শুল্কের প্রশ্নটি ভারতীয়দের চোখে এত গুরুত্ব অর্জন করে নি। বহিঃশুল্কের প্রশাসন সাংগঠনিক সংস্কারকে অনুমোদনের দৃষ্টিতেই দেখা হত, সেগুলি ছিল ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলির ভিতরকার বন্দরগুলির বাণিজ্যের উপর থেকে রাজস্ব সংক্রান্ত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, সারা ভারতে বহিঃশুল্ক নির্ণয়ে সমতা আনার জন্য বহিঃশুল্ক নির্ণয় ব্যবস্থা প্রচলন এবং বহিঃশুল্ক সংগ্রহ পদ্ধতিকে যুক্তিযুক্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা। দেশীয় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সরকারের লক্ষ্য ছিল Strachey-র ভাষায় "এক ধরনের সোলফেরাইন [Zollverein] (নিজেদের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য ও অপরের বিরুদ্ধে একই ধরনের বহিঃশুল্ক প্রবর্তনের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের একত্রিত ব্যবস্থা) বন্দোবস্ত।"[১৭৩] দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে পর পর অনেকগুলি চুক্তি সম্পাদন মারফত অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের উপর থেকে রাজস্ব সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ প্রত্যাহৃত হয়েছিল, যদিও দেশীয় রাজ্যগুলি যাতে ভারত সরকারকে মূল্যের ব্যাপারে ঠকাতে না পারে" এবং অপেক্ষাকৃত কম শুল্ক ধার্য করে ব্রিটিশ-ভারতের বন্দরগুলি থেকে বাণিজ্য কেড়ে না নিতে পারে তার জন্য সতর্কতা অবলম্বিত হয়েছিল।[১৭৪] James Wilson ভারতে পৌঁছে দেখেছিলেন যে প্রত্যেকটি বন্দরে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যানুসারে বহিঃশুল্ক আরোপিত হচ্ছে। তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী বহিঃশুল্ক নিরূপণের সংশোধন শুরু হয়েছিল।[১৭৫] ১৮৬০ সালে সারা ভারতের জন্য সর্বপ্রথম একই রকমের মূল্য নিরূপণ চালু হয়েছিল।[১৭৬] ১৮৫৯ সালের ৭ নং আইন আগের বহুল

সর্বপ্রথম সারা ভারতের জন্য বহিঃশুল্কের সমহার প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৮৬৭ সালে বিনা শুল্কের তালিকা তুলে দেওয়া হয়—এটি ছিল বহিঃশুল্ক মুক্ত মালপত্রের তালিকা। এই তালিকায় উল্লেখ নেই এমন প্রত্যেকটি জিনিসই পরীক্ষার ও শুল্কধার্যের আওতায় পড়ত। এই অযৌক্তিক প্রথার জায়গায় নতুন ব্যবস্থা গৃহীত হল ; তাতে শুল্কযোগ্য মালপত্রের একটি নির্দিষ্ট তালিকা থাকত, আর সেই তালিকার বাইরে সব মালই শুল্কমুক্ত হত।

ব্যবস্থাটিকে যুক্তিযুক্ত ভিত্তিতে দাঁড় করানোর চেষ্টা লোকে অবশ্য পছন্দ করেছিল, কিন্তু শুল্কের পিছনকার নীতিগুলিকে তারা সংশয় ও সন্দেহের চোখে দেখছিল। সুবিদিত দেশীয় পত্রিকা 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ১৮৭০ সালে লিখেছিল "অবাধ বাণিজ্য জিনিসটা ভাল", কিন্তু সব দেশের পক্ষে ভাল নয়। "একদিকে যেমন ইংল্যাণ্ডের স্বার্থ হল ভারতে আমদানিশুল্কের সম্পূর্ণ অবলোপ, অপরদিকে ভারতের স্বার্থ হল তেমনি এমনভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাতে দেশীয় শিল্পের প্রসারের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যে উৎসাহদানকে সংযুক্ত করা যায়।"[১৭৭] বহিঃশুল্ক হ্রাসের জন্য ভারতের ব্রিটিশ বণিকদের চাপ ইংল্যাণ্ডের সরকারের সমর্থনেই প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হয়েছিল, এবং আর্থিক সঙ্কটের সময়েই কেবল তারা এই সমর্থন জানাতো এবং জানাতো এই কারণে যে আর্থিক ঘাটতি মেটানোর জন্য শুল্ক রাজস্বের প্রয়োজন হত। উদাহরণস্বরূপ ১৮৫৯ সালে বিদ্রোহোত্তর আর্থিক সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্য Canning আমদানিশুল্ক বৃদ্ধি করেছিলেন এবং বণিক সম্প্রদায়ের ক্রোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তা চালু করতে পেরেছিলেন।

নতুন শুল্কগুলি "চরিত্রের দিক থেকে পশ্চাদগামী এবং ইংল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক বাণিজ্যিক আইনের সুবিবেচনার মনোভাবে পরিপন্থী" এই মর্মে কলকাতার ব্যবসায়ীদের দরখাস্ত কোনও কাজে লাগে নি।[১৭৮] Canning নিজেই বিলটি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে উপস্থিত করেছিলেন এবং দু দিনের মধ্যে তা পাস করিয়ে নিয়েছিলেন : সেক্রেটারি অব স্টেট Lord Stanley Canning-কে সমর্থন করেছিলেন এবং আর্থিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে বহিঃশুল্ক আরও বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। Charles Trevelyan চামড়া, চিনি, চা, পাট ও শস্যের উপর রপ্তানিশুল্কের প্রস্তাব করলে চেম্বার অব কমার্সগুলি থেকে আবার প্রতিবাদ উঠেছিল।[১৭৯] Trevelyan কাউন্সিলে তাঁর সহকর্মীদের সমর্থন লাভ করেছিলেন, কিন্তু সেক্রেটারি অব স্টেটের

অনুমোদন পান নি। সেক্রেটারি অব স্টেট বলেছিলেন যে ভারত-ব্রিটিশ বাণিজ্যের স্বার্থে নতুন রপ্তানি শুল্কগুলি কোনও মতেই অনুমোদন করা যায় না।[১৮০] অসম্মানজনকভাবে ভারত সরকারকে পশ্চাদপসারণ করতে হয়েছিল এবং রপ্তানি শুল্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১৮৬৫ সালের কাস্টমস অ্যাক্ট (১৮ নং)-এর কয়েকটি ধারা বাতিল করতে হয়েছিল। যে লোকেরা ভারতের শুল্ক নীতি নিয়ন্ত্রণ করতেন তাঁরা ভারতের ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের চাপের দ্বারা প্রভাবিত হতেন, কিন্তু সব সময়ে একেবারে বশংবদ হিসাবে মেনে নিতেন না। তাঁরা কতকগুলি সীমার মধ্যে থেকেই সহানুভূতিশীলতা দেখাতেন। সামগ্রিক আর্থিক অবস্থা, হোম কর্তৃপক্ষের মনোভাব, স্বার্থগোষ্ঠীগুলির চাপের মাত্রা এবং দেশীয় মতামতের উপর সরকারি সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতেই এই সীমা নির্ধারিত হত।

পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদীদের মতই ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি অর্থব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে ছিল। এমন কি Mayo-র অর্থ-বিষয়ক ক্ষমতার ধারাবাহিক অবতরণের বিখ্যাত পরিকল্পনার এক দশক আগেই 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লিখেছিল "আমাদের মতে যথাযথ প্রতিকার হল অর্থ-সম্পর্কিত ব্যাপারে ফেডারেল ব্যবস্থার প্রবর্তন। সাম্রাজ্যিক ব্যয় প্রথমে স্থির করা হোক, প্রত্যেকটি প্রদেশের উপর হারাহারিভাবে অর্থ লেভি করা হোক ......।"[১৮১] এ দাবিও করা হয়েছিল যে হিন্দু ও মোগল অর্থব্যবস্থাও ফেডারেল কায়দায় পরিচালিত হত।[১৮২] মাদ্রাজের গভর্নর Trevelyan যেহেতু James Wilson-এর কেন্দ্রীকরণের নীতির বিরোধিতা করেছিলেন তা Trevelyan-কে পূর্ণ সমর্থন জানানো হয়েছিল।[১৮৩] বিকেন্দ্রীকরণ 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র পছন্দ হয়েছিল কারণ এই পত্রিকার ধারণা ছিল যে সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনের জন্য ন্যায়সঙ্গত অংশের চেয়ে অনেক বেশি বাংলার কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে। বাংলাকে "সমগ্র সাম্রাজ্যের উপকারের জন্য দুগ্ধবতী গাভীর মত ব্যবহার করা হচ্ছে।"[১৮৪] এই সংবাদপত্রের মতে বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনার প্রধান আকর্ষণ হল এই যে এই পরিকল্পনা প্রদেশগুলির মধ্যে বোঝার যথাযথ বণ্টন সুনিশ্চিত করবে।[১৮৫] দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় সরকারগুলির সঙ্গে ভারতীয়দের যুক্ত হবার পথে অন্যতম পদক্ষেপ হিসাবে বিকেন্দ্রীকরণকে স্বাগত জানানো হয়েছিল। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন আশা করেছিল যে স্থানীয় সরকারগুলিকে "প্রত্যেকটি

রাজ্যের জনসাধারণের ধারণা অনুযায়ী কর সংগ্রহের ক্ষমতা দেওয়া হবে", এবং জনগণকে প্রশাসনে যতদূর সম্ভব বাস্তব অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো উচিত।"[১৮৬] 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র মতে Mayo-র পরিকল্পনা সঠিক দিকে একটি পদক্ষেপ, কিন্তু তা যথেষ্ট এগোয় নি।"[১৮৭] এই পত্রিকার ধারণা অনুযায়ী চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন—রাজ্য-সমূহের একটি কনফেডারেশন, যাতে প্রত্যেকটি রাজ্য নিজস্ব আইন সভা ও শাসন সংস্থা (Executive) দ্বারা শাসিত হবে, প্রত্যেকে নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভর করবে। কিন্তু সাম্রাজ্যিক ব্যাপারে সকলেই একটা কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব মানতে বাধ্য থাকবে……।"[১৮৮] এই সব মানদণ্ড বিচার করলে Mayo পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে বিকেন্দ্রীকরণের অতি সামান্য ব্যবস্থাই স্বীকার করেছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের বিবেচনায় এই পরিকল্পনা ছিল "অনিচ্ছায় একটা সুবিধাদান", "সরকারের কাছ থেকে জনমতের জোরে আদায় করে নেওয়া", কিন্তু অন্যথায় একেবারে মূল্যহীন।[১৮৯]

স্থানীয় অর্থ-ব্যবস্থার প্রশাসনে ভারতীয়দের অধিক সংখ্যায় অংশ গ্রহণের সম্ভাবনার দরুন বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনা আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছিল। এই পরিকল্পনা প্রাদেশিক, অথবা প্রায়ই যাকে বলা হত অংশ-ভিত্তিক, সেই মনোভাবের কাছে পছন্দসই হয়েছিল। ভারতীয় ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি প্রতি বছরই বাজেট প্রকাশের পর এক খেলায় মাততো। এই বাজেট ছিল প্রত্যেকটি প্রদেশ যে রাজস্ব ও "রিটান" পেত এবং তার ভিত্তিতে তারা যে অর্থ দিত তার হিসাব-নিকাশ। পূর্তকর্মের জন্য লগ্নির অসম বণ্টন যথেষ্ট ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। উদাহরণস্বরূপ বাংলার সংবাদ-পত্রগুলি অভিযোগ করেছিল যে বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে, আর প্রেসিডেন্সিগুলির মধ্যে সব চেয়ে ধনী (বাংলা) প্রদীপের অতিরিক্ত কাছে থাকার দরুনই আলোর পাওনা অংশ পাচ্ছিল না।[১৯০] বাস্তব তথ্য কি ছিল? ১৮৬২ সাল পর্যন্ত বাংলা সাধারণতঃ পূর্তকর্মে লগ্নির ১৫ শতাংশেরও বেশি পেত, যা প্রায় বোম্বাইয়ের অংশের সমান, যদিও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলি ও মাদ্রাজ যা পেত তার চেয়ে অনেক কম। বিদ্রোহের পর সামরিক অভিযানের জন্য বিদ্রোহের পর ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য অপরাপর যেসব কাজের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল তার দরুন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশগুলিতে ও অযোধ্যায় অতিরিক্ত খরচের দরকার

হয়েছিল। বাংলায় যেহেতু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত ছিল এবং কৃষি থেকে আয় বৃদ্ধি রাষ্ট্রের চেয়ে জমিদার শ্রেণীরই বেশি উপকার করত, সম্ভবতঃ এখানকার সেচ-খাল ও বাঁধ সংরক্ষণের কাজে লগ্নি সম্পর্কিত সরকারি সিদ্ধান্ত তার দ্বারাই প্রভাবিত হত। ১৮৬১-৬২ সাল থেকে পরিস্থিতির মধ্যে এক নতুন উপাদানের আবির্ভাব হয়েছিল। পশ্চিম ভারতের উপর তুলোর তেজী বাজারের প্রভাব এবং আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের দরুন তুলো-দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত ল্যাঙ্কাশায়ারে তুলো সরবরাহের জন্য "তুলো-পথ" নির্মাণের অভিযান হল সেই নতুন উপাদান।[১৯১] তখন থেকেই অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে বোম্বাইয়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হতঃ ইংল্যাণ্ডের তুলা-স্বার্থ এই ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। ১৮৬৩-৬৬ সালের মধ্যে বোম্বাই বছরে গড়ে ১ কোটি টাকা করে পেয়েছিল (সাধারণ পূর্তকর্মে ব্যয়ের ২৪ শতাংশ), সে তুলনায় বাংলায় খরচ হয়েছিল বছরে গড়ে ৮১ লক্ষ টাকা (মোট খরচের ১৭ শতাংশ); মাদ্রাজে ৬৬ লক্ষ টাকা (১৩'৯ শতাংশ) এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে ৬১ লক্ষ টাকা (১২'৯ শতাংশ)।[১৯২] পরবর্তী ৫ বছরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অংশ কিছুটা কমে গিয়েছিল, পাঞ্জাবের দাবি বেড়েছিল। তা সত্ত্বেও ১৮৬৩-৭২ সালে পূর্তকর্মের জন্য প্রতি বর্গ মাইলে বাৎসরিক গড় ব্যয় মাদ্রাজ (৪৫ টাকা বর্গ মাইল পিছু) ও বাংলার (৩৪ টাকা) তুলনায় বোম্বাইয়ের (৭৯ টাকা প্রতি বর্গ মাইলে) এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে (৭৯ টাকা) অনেক বেশি ছিল।[১৯৩] পূর্ববর্তী একটি পরিচ্ছেদে আমরা উল্লেখ করেছি যে ১৮৭১ সালে পূর্তকর্ম বাবদ মাথা পিছু খরচ হত বোম্বাইয়ে ০'৫৩ টাকা এবং বাংলা ও মাদ্রাজে মাত্র ০'০১ টাকা। বোম্বাই শহর ও তার পশ্চাদভূমির দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের অংশত কারণ ছিল কয়েকটি অর্থনৈতিক খাতে লগ্নির বণ্টনে বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রতি পক্ষপাতিত্ব।

এই ব্যাপারের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল ভূমি রাজস্ব বা কর হিসাবে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সি বা প্রদেশ কর্তৃক "প্রদত্ত অর্থের" প্রশ্নটি। যদিও প্রত্যক্ষ কর ও বিভিন্ন ধরনের পণ্যশুল্ক অপরাপর প্রেসিডেন্সির তুলনায় বেশি ছিল, কিন্তু ১৭৭৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য বাংলার ভূমি রাজস্ব প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়েছিল। ১৮৫৬-৫৭ থেকে ১৮৭০-৭১ সালের মধ্যে ভারতে ভূমি রাজস্ব ১৫ শতাংশের মত বেড়েছিলঃ ওই সময়ে

বোম্বাইতে বৃদ্ধির হার ছিল ৩৭ শতাংশ, অযোধ্যায় ৩৬ শতাংশ, মাদ্রাজে ১৬ শতাংশ, পাঞ্জাবে ৭ শতাংশ এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে, বাংলায় ও মধ্য প্রদেশগুলিতে ৬ শতাংশ বা তারও কম।[১৯৪] জমির মূল্যের ধীরে অথচ নিয়মিত বৃদ্ধি, অযোধ্যা ও উড়িষ্যায় করের হার নতুন করে নির্ধারণ ও জরীপ, বিদ্রোহের পর বাজেয়াপ্তকরণ, আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, ১৮৬১-৬৪ সালে হঠাৎ তুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি ইত্যাদির দরুন এই সময়ে রাজস্ব বৃদ্ধির সামগ্রিক হার যথেষ্ট উঁচু ছিল। ১৮৭১ সালে বাংলার বর্গ মাইল পিছু ভূমি রাজস্ব (১২৭ টাকা), বোম্বাই (২০০ টাকা) বা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির (৪৫২ টাকা) তুলনায় অনেক কম ছিল।[১৯৫]

সাময়িক বন্দোবস্তের এলাকায় নতুন করে কর নির্ধারণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মারফত সরকার যা পেতে পারত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন। এলাকায় সরকারের দাবি বেঁধে দেওয়ার ফলে তা থেকে সরকারকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুন সরকারকে যা ছাড়তে হয়েছিল তা কি ভাবে ফেরত পাওয়া যাবে সেটাই ছিল সমস্যা, আমরা দেখেছি যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধাভোগী জমিদার শ্রেণী কি ভাবে তাদের উপর কর চাপানোর বিরোধিতা করত যদিও তাদের উপর প্রধান কর, অর্থাৎ ভূমি রাজস্ব চিরকালের মত স্থির হয়ে গিয়েছিল।

ভূমি রাজস্ব খাজনা, কর নয়—এই ছিল সরকারি তত্ত্ব। John Strachey ১৮৭৪ সালে একটি সুবিদিত অর্থসংক্রান্ত স্মারকলিপিতে লিখেছিলেন "অনাদিকাল থেকে রাষ্ট্রতত্ত্ব ও ব্যবহার উভয়তই ভারতের ভূ-সম্পত্তির বৃহত্তর অংশের মালিক। যতটা খাজনা নেওয়া সম্ভব যা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে (রাষ্ট্র) ততটাই নিয়েছে। ভারতে ভূমি-রাজস্ব কেবল জমির খাজনার এই অংশটি মাত্র।"[১৯৬] ভূমিরাজস্ব যে কর থেকে স্বতন্ত্র তা একটি তত্ত্বমাত্র আদৌ নয়ঃ ব্যাপারটা এই অর্থে ব্যাখ্যা করা হত যে রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মানে সমস্ত প্রজাদের উপর রাষ্ট্রের কর ধার্যের অধিকার ছেড়ে দেওয়া নয়। ভাষান্তরে বললে দাঁড়ায় ভূমি-রাজস্ব বেঁধে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভূমিরাজস্বের উপর সেস বসান অথবা কৃষিজাত আয়ের উপর আয়কর বসান থেকে সরকারকে কিছুতে ঠেকাচ্ছে না। বাংলার জমিদার শ্রেণী কখনই আয়কর বা স্থানীয় সেসের ব্যাপারে খুশি হতে পারে নি। কারণ তারা এই সব করকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের

চুক্তি লঙ্ঘন বলে বিবেচনা করত। James Wilson-এর সময় থেকে শুরু করে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি এই ছিল যে জমিদাররা রাজস্বের স্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে সব রকম কর থেকে অব্যাহতিকে গুলিয়ে ফেলে আইনের ভুল ব্যাখ্যা করছে। প্রায় ১০০ বছর আগে সরকার যেহেতু বাংলায় কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, তাই বাংলার সব চেয়ে ঐশ্বর্যশালী অংশে সব চেয়ে ধনবান স্বার্থকে চিরকালের জন্য কর থেকে অব্যাহতি দিতে হবে—এ কথা বলা স্পষ্টতই মূর্খতা।[১৯৭] এটাই স্বাভাবিক যে বাংলার জমিদার শ্রেণীর "ধৃষ্টতা" সম্পর্কে এই অসহিষ্ণুতায় শুধু বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের মত ভারতের ব্রিটিশ বণিক গোষ্ঠী অথবা ব্রিটিশ প্রভাবিত ক্যালকাটা ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশনই (যাদের সদস্যাদের জমিদারি ব্যবস্থায় কোনও স্বার্থ ছিল না) শরিক ছিল তাই নয়, বাংলার বাইরের ভারতীয় করদাতারাও এতে অংশীদার ছিল। বোম্বাই, আহমেদাবাদ ও মাদ্রাজ থেকে প্রেরিত দরখাস্ত-গুলিতেও কথাটা বার বারই উল্লেখিত হত যে, যেখানে ব্যবসায় ও বৃত্তিগত আয়ের উপর প্রচুর পরিমাণে কর ধার্য হচ্ছে সেখানে ভূসম্পত্তির মালিকেরা সকলে তাদের দেয় অংশ দিচ্ছে না।[১৯৮] বোম্বাইয়ের দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের দরখাস্তে তাঁরা দাবি জানিয়েছিলেন "অলস ও বিত্তবানদের উপকারের জন্য শিল্পোদ্যোগী শ্রেণীগুলির উপর কর না বসাতে······সম্পত্তি থেকে আয়ের করের তুলনায় জীবিতকালের আয় এবং ব্যবসায় ও বৃত্তি থেকে আয়ের উপর কর কম হারে হওয়া উচিত······।"[১৯৯] এর মধ্যে স্বার্থের একটা সংঘাত স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছিল।

* * *

এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনাটি অর্থ-বিষয়ক নিম্নোক্ত ব্যাপারে ভারতের 'জনমতের' প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে তুলে ধরেছে। প্রথমতঃ, জাতীয় আয়ের তুলনায় করভারের প্রশ্ন এবং করদাতাদের পক্ষ থেকে অনুযোগ উত্থাপন; দ্বিতীয়তঃ, অর্থ-বিষয়ক কর্মনীতির সেই সমস্ত আঙ্গিক উপাদান যেগুলি লোকের নজর সব চেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল : আয়কর ও অপরাপর প্রত্যক্ষ কর, আফিম আবগারি এবং স্ট্যাম্প রাজস্ব যেগুলি নীতিশাস্ত্রের কিছু বিড়ম্বিত প্রশ্ন তুলেছিল, সামরিক খরচ ও হোমচার্জেস জাতীয়তাবাদীদের অভিযোগের তালিকায় যেগুলি নাছোড়বান্দাভাবে বরাবর উঠত—এবং ব্রিটিশ মূলধন ও শিল্পজাত সামগ্রী আমদানি সংক্রান্ত প্রশ্নাদি; তৃতীয়তঃ, পূর্তকর্ম বিনিয়োগ,

ভূমি করের মাথা-পিছু ভার ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে কি ভাবে রয়েছে তার নিরিখে ভারত সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত বিভিন্ন অংশের মধ্যে কে কতখানি 'লাভ' করেছে ও কে কত রাজস্ব অবদান করেছে তার বণ্টন। এই প্রসঙ্গে দুটি সমস্যার কথা ইতিমধ্যেই আমরা উল্লেখ করেছি। প্রথমতঃ, সংবাদপত্র প্রচার-পুস্তিকা, স্মারকলিপি, গণসংগঠনগুলির বিবৃতি ইত্যাদি থেকে টুকরো টুকরো সংগ্রহে একটা বিপদ থাকে, তা হল অন্য যে-কোনও ক্ষেত্রে ইতিহাস প্রণয়নের প্রয়াসের চেয়ে এই ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত ধারণা দিয়ে তৈরি ছক অনুসারে ইতিহাস লেখার অধিকতর প্রবণতা। দ্বিতীয়তঃ, 'জাতীয়তাবাদী মতামত' এবং 'জনমত' শব্দগুলির ব্যবহার অনেক প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। আলোচ্য সময়ে কি এ রকম কোনও সুস্পষ্ট ভাবধারা ছিল যাকে জাতীয়তা-বাদী মতাদর্শ আখ্যা দেওয়া যেত? Bartle Frere যে প্রশ্নটি তুলেছিলেন —প্রকাশিত মতই কি জনমত? যে মতটি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হল তা অন্যদের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের দ্বারা কতখানি সমর্থিত? জনমত কি ভাবে যাচাই হবে—দেশের সমগ্র জনসংখ্যার মধ্যে সে মত অভিন্নভাবে কতখানি বিস্তৃত তার নিরিখে, না রাজনৈতিক নিরিখে গণ্যমান্য কেবল 'শিক্ষিত উচ্চশ্রেণী'র (elite) মধ্যে কতখানি বিস্তৃত তার নিরিখে? এই সব শব্দগুলি যতই ভাসা ভাসা হোক আমরা সেগুলিকেই ব্যবহার করা ভাল মনে করেছি। আলোচনার মধ্যে অনেকটা প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন ধরনের মতের উদ্ভব কোথা থেকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে "জনগণ" নামক জিনিসটির উপর একশিল (monolithic) ঐক্য আরোপ না করে নানা ভিন্ন "জনসমষ্টি-সমুদয়ের" বা গোষ্ঠী সমুদয়ের কথাই প্রাসঙ্গিক। আর সাধারণ ইচ্ছার (general will) রহস্যময় প্রকাশ সন্ধানের পরিবর্তে ধারণা ও মতামতের বৈচিত্র্য অনুশীলন করাই বোধ হয় কার্যকর হবে। আমরা বারংবার লক্ষ্য করেছি যে একদিকে 'সাহেব' ও অপরদিকে 'জমিদার', 'বানিয়া' এবং শিক্ষিত 'বাবুদের' মধ্যেই কেবল বিরোধ ছিল না, অধীন জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেও ছিল। এর কতকগুলি উদাহরণ হল: শহুরে বৃত্তিজীবী ও ব্যবসায়ী শ্রেণীগুলির খাজনাভোগী জমিদার শ্রেণীর প্রতি বিরাগ (শেষোক্ত শ্রেণী লাইসেন্স কর থেকে মুক্ত ছিল এবং তাদের অনর্জিত আয়ের উপর তারা সেই হারেই আয়কর দিত যে হারে ব্যবসায়ী ও শিক্ষিত বৃত্তি জীবী শ্রেণীকে দিতে হত); উচ্চ-আয়বিশিষ্ট শ্রেণীগুলির তরফ থেকে

গরীবদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত দুর্বহ অপ্রত্যক্ষ করগুলি (বিশেষ করে লবণ শুল্ক, যা বস্তুতঃ সাধারণ লোকের উপর মাথা পিছু কর ছিল) বৃদ্ধির জন্য ওকালতি যাতে আয়করের বোঝা বড়লোকের উপর থেকে কমে যায় ; সরকারি বিনিয়োগের অঞ্চলওয়ারি বণ্টনের ব্যাপারে প্রাদেশিক ঈর্ষা ও খেয়োখেয়ি ইত্যাদি। ভূমিকার পরিচ্ছেদে আমরা স্বার্থগোষ্ঠীগুলির ভিতরে এই বিরোধের আলোচনা করেছি, দেখেছি প্রত্যেকেই অর্থ-বিষয়ক কর্মনীতিগত সিদ্ধান্তগুলিকে নিজের অনুকূলে আনার চেষ্টা করছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার উন্মেষের বছরগুলিতে কি করে প্রধান স্বার্থগুলির প্রতিনিধিত্ব করানো যায় সেই প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত ছিল। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে K. T. Telang চেম্বার অব কমার্স, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাশোসিয়েশন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও মিউনিসিপ্যালিটিগুলির আইন প্রণয়ন সংস্থায় প্রতিনিধিত্বের জন্য একটি পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি রাজেন্দ্রলাল মিত্র মন্তব্য করেছিলেন যে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের বেসরকারি সদস্যরা "নিজেদের স্বার্থ" ছাড়া আর কারও প্রতিনিধিত্ব করেন না, আর কংগ্রেস 'গোষ্ঠী ভিত্তিক' প্রতিনিধিত্বের (sectional representation) প্রস্তাব করেছিল। যাতে সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায় এবং "সমস্ত বড় বড় স্বার্থ যথাযথ প্রতিনিধিত্ব পায়" তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কলকাতা কংগ্রেসে Telang-এর ধাঁচে একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব করেছিলেন। তার কিছু দিন পরে ১৮৮৮ সালে Duffrin কর্তৃক নিয়োজিত লেজিসলেটিভ কাউন্সিল সংস্কার কমিটি নিম্নোক্ত 'নির্বাচক বর্গ' থেকে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করলেন : বংশানুক্রমিক অভিজাত সম্প্রদায় ও ভূস্বামী শ্রেণী, ব্যবসায়ী, বৃত্তিজীবী ও কৃষিজীবী শ্রেণীগুলি এবং ইউরোপীয় বাগিচা ও ব্যবসায়ী স্বার্থসমূহ। পরবর্তীকালে ১৮৯২ সালের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট পাস হলে এই সব স্বার্থের কিছু কিছুর প্রতিনিধিত্ব সম্ভবপর করেছিল।[২০০]

সেই সঙ্গে আবার 'স্বার্থভিত্তিক' নীতিকে অতিক্রম করে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের কিছু কিছু উপাদানেরও উন্মেষ হচ্ছিল। বিভিন্নমুখী স্বার্থের উল্টোপাল্টা চাপের মধ্যেও কতকগুলি প্রশ্নে কিছুটা সামগ্রিক মতৈক্যের উদ্ভব হচ্ছিল ; যথা আমলাতন্ত্রের ব্যয়বহুল ব্রিটিশ কর্মচারীদের বদলে ভারতীয় কর্মচারী বসানো, ক্রমাগত বেড়ে চলা সামরিক ও ইংল্যাণ্ডের

খরচ সম্বন্ধে বিরক্তি, সাধারণভাবে সরকারি খরচ কমানো যাতে করের বোঝা কমানো যায়, শুল্কনীতি সম্পর্কে সমসাময়িক প্রথাগত প্রজ্ঞার নির্দেশাবলী সম্বন্ধে সন্দেহ, কর দেবার সর্ত হিসেবে প্রতিনিধিত্বের আকাঙ্ক্ষা এবং এমনি আরও কিছু ব্যাপার যেগুলোকে অধীন জাতির অভিন্ন ক্ষোভ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা যায়। এই সময়ে যেসব মতামত প্রকাশিত হত সেগুলির সঙ্গে কংগ্রেসের প্রথম বছরগুলির প্রস্তাবের মধ্যে নিহিত ভাবনার সাদৃশ্য ছিল। নওরোজির প্রধান কৃতিত্ব ছিল এই সব ভাবনাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা, সেগুলিকে একত্রে গ্রথিত করা এবং কতকগুলি জরুরী ব্যাপারকে বিশেষভাবে তুলে ধরা; যথা ভারতে সরকারি খরচের আয় ও কর্মসংস্থান বর্ধক প্রভাব করভারের পীড়নকে সহনীয় করে তোলে কি না; পারত কি না, ক্রমবর্ধমান স্টার্লিং দেনা এবং ভারতের বাইরের সরকারি ব্যয় কি ভাবে হোম চার্জেস বাড়িয়ে তুলত, কর বহনের ক্ষমতা ও মাথা পিছু আয়ের তুলনায় করভার কতটা ছিল এবং সর্বোপরি "জনগণের কাছ থেকে যে রাজস্ব তোলা হচ্ছিল তা তাদের ফিরিয়ে দেওয়া যায় কি ভাবে।" নওরোজির তদন্ত রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্র পেরিয়ে অনেকদূর প্রসারিত হয়েছিল; পার্লামেন্টের কাগজপত্র থেকে সংগৃহীত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে তিনি আন্তর্জাতিক লেনদেনের সম্বন্ধে বিস্তারিত অনুশীলন করেছিলেন। পরবর্তীকালে, আশি ও নব্বই-এর দশকে এর থেকেই 'অর্থনৈতিক মোক্ষণ' (economic drain) সংক্রান্ত সমস্যাবলীর বিস্তারিত ব্যাখ্যার উদ্ভব হয়েছিল। নওরোজি ধন বিদেশে পাচার করার সমস্ত সম্ভাব্য রাস্তা হিসাবের মধ্যে ধরেছিলেন। রাষ্ট্রীয় অর্থব্যবস্থার প্রশ্নাবলীর মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখার দরুন আমরা (তৃতীয় ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে) নওরোজি যাকে 'সরকারি লেনদেন' আখ্যা দিয়েছিলেন কেবল তার আলোচনাতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছি; এর মধ্যে আছে "রাজনৈতিক ঋণসমূহের" দরুন স্টার্লিং দেনা শোধের খরচ, প্রশাসনিক, রেলপথ ও পূর্তকর্ম বাবদ ইংল্যাণ্ডে খরচ, সামরিক খরচ, সরকার কর্তৃক মালমশলা কেনার খরচ ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে কথাটা আমরা উল্লেখ করতে পারি যে রাজনৈতিক ব্যবহারের জন্য নওরোজির ভাবধারার কোনটা কতটা গ্রহণ করার যোগ্য বলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জাতীয়তাবাদী মুখপাত্ররা মনে করতেন তার একটা তাৎপর্যপূর্ণ দিক আছে। গাঙ্গুলি উল্লেখ করেছেন যে নওরোজির উপপাদ্যের মধ্যে কতকগুলি প্রগতি-

শীল উপাদান ছিল, যেমন ক্রমক্ষীয়মান করভারের (regressive) কাঠামোয় নিন্দা ; যাঁদের উপর লবণ শুল্কের চাপ উচ্চতর আয়-বিশিষ্ট গোষ্ঠীগুলির চেয়ে অনেক বেশি ছিল সেই "সাধারণ কুলি বা শ্রমিকে"র স্বার্থের প্রতি দৃপ্ত সমর্থন ; "অপেক্ষাকৃত বিত্তশালী স্বার্থগুলি যেহেতু বিক্ষোভ প্রদর্শনের আশ্রয় নিতে পারে এবং নিজেদের কথা শোনাতে পারে অথচ দরিদ্র শ্রমিক ও কৃষক পারে না" কাজেই শেষোক্তদের করের মারফত শোষণের শিকার হতে হয় এই ইঙ্গিত ; 'আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক মোক্ষণের' ধারণা, অর্থাৎ করের মারফত গ্রামীণ দরিদ্রদের কাছ থেকে সম্পদ হস্তান্তর এবং শহুরে বুর্জোয়াদের অনুকূলে আয়ের পুনর্বণ্টন।[২০১] এ কথা তাৎপর্যপূর্ণ যে নওরোজির উপপাদ্যের মধ্যেকার এই সব উপাদান সোৎসাহ সমর্থন পায় নি, এমন কি মনোযোগও আকর্ষণ করে নি ('বিদেশগামী অর্থনৈতিক মোক্ষণ' সংক্রান্ত তাঁর ধারণাগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় নি)। বস্তুতঃ নওরোজি নিজেই তাঁর 'আভ্যন্তরীণ মোক্ষণের" ধারণাকে জোর করে তুলে ধরা থেকে বিরত ছিলেন। আগে একবার আমরা রমেশ দত্তের কথা উল্লেখ করেছি— ১৮৭৫ সালে তিনি রায়তদের উৎপন্নের উপর জমিদারের দাবি চিরস্থায়ী ভাবে স্থির করার প্রয়োজনীতা সাহসের সঙ্গে উপস্থিত করেছিলেন, কিন্তু "প্রগতিশীল মনোভাবের" জন্য 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর কাছ থেকে তিরস্কৃত হয়ে তাঁর পরিণত ও বহুল প্রচারিত রচনায় তিনি জমিদার ও রায়তদের মধ্যেকার সম্পর্কের শোষণমূলক দিকগুলি থেকে নজর সরিয়ে রেখেছিলেন।[২০২] হয়তো নওরোজি ও দত্তের মত চিন্তানায়কেরা মনে করেছিলেন যে তাঁদের আগের কর্তব্য হল যাকে তাঁরা "বাইরের শোষণ" বলে ভাবতেন তার বিরুদ্ধে লড়াই করা। বাংলার জমিদার, বোম্বাইয়ের বানিয়া, শহরের শিক্ষিত বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়, এই বিদেশী শোষণ সম্পর্কে ডাক দিলে তা শোনার জন্য খুব তৈরি ছিল, কিন্তু তেমন হয়তো তৈরি ছিল না সেই ধরনের শোষণের কথায় কান দিতে যেই শোষণে প্রত্যক্ষভাবে বা অপরের সহযোগে অপ্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত থাকায় তাঁরা নিজেরাই অভিযুক্ত।

সংক্ষেপে বলতে হয় যে একদিকে ছিল পরস্পর বিরোধী অঙ্গীকার, স্বার্থগ্রন্থি ও আনুগত্যের উল্টোপাল্টা চাপ, অপরদিকে চিন্তাধারার আর একটা ছকও রূপ নিচ্ছিল যা জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়েছিল। স্বার্থগোষ্ঠীগুলির খেলার তাৎপর্য কেবল পরবর্তী ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকেই সুস্পষ্ট

হয়ে ওঠে। যে সময়টা সম্বন্ধে আমরা পর্যালোচনা করেছি তখন ছিল মূলতঃ আধা-রাজনৈতিক (sub-political) স্তরের কূট চালের খেলা। এই খেলা খেলতে খেলতে শহুরে শিক্ষিত বৃত্তিজীবী শ্রেণীগুলি অর্থনৈতিক স্বার্থের বিভিন্ন সংঘাতের মধ্যে একটা মুখ্য স্বার্থ সংঘাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল ঃ এই ধারণাই অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। মতামত গঠনের চেষ্টা অথবা ক্ষোভ অথবা দাবি প্রচারের প্রয়াস অথবা লবি করা, ইত্যাদি হল এমন ক্রিয়াকলাপ যা রাজনৈতিক মানসিকতাকে তৈরি করে তোলে। এই সব কাজের ফলাফল ক্রিয়ার অব্যবহিত ক্ষেত্র ছাড়িয়ে অনেক দূর বিস্তৃত হয়েছিল। এই খেলায় তাদের পক্ষে সদ্যপ্রসূত ফল বা লাভ সামান্যই ছিল। কিন্তু একটা জাতীয় রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের পথ সুগম হয়েছিল। উচ্চতর পণ নিয়ে এক নতুন খেলা শীঘ্রই আরম্ভ হল।

উল্লেখিত পুস্তকাদি (References)

১ 'Financial Statements Relating to India……Reprinted from Hansard's Parliamentary Debates' ৯৮০ পৃষ্ঠা। Grant Duff ভারতীয় অঙ্ককে গ্রেট ব্রিটেনের মাথা পিছু বাৎসরিক আয় ৩০ পাউণ্ডের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

২ দাদাভাই নওরোজির 'The Poverty of India' (Bombay 1876), ১-১৪২ পৃষ্ঠা।

৩ D. Thorner-এর ধারণা অনুযায়ী একটা পশ্চাদপদ অর্থনীতিতে জাতীয় আয় হিসাব করার সময়ে "চাকরির ক্ষেত্রে" (Service Sector) বাদ দেবার পক্ষে প্রবল যুক্তি আছে। S. S. Kuznets-এর 'Economic Growth' (1955), পৃষ্ঠা ১০। সুরেন্দ্র জে. প্যাটেলের 'Long Term Changes in Output and Income in India 1896-1960' 'The Indian Economic Journal', ১৮৫৮ সালের জানুয়ারি, ভল্যুম V, ৩ নং, ২০৩-৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

৪ 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট' ২১শে অক্টোবর ১৮৭১।

৫ H. M. Hyndman-এর 'Bankruptcy of India' (London 1886), পৃষ্ঠা ১৫৭।

৬ 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' ১৩ই নভেম্বর ১৮৬৩।

৭ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ২৭শে জুন ১৮৬১।

৮ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স-এর মতে সংখ্যাটি ছিল মাত্র ২ শিলিং। Rev. Progs. জুন ১৮৬৭, ৫০নং।

৯ 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট' ২১শে অক্টোবর ১৮৭১।

১০ H. M. Hyndman-এর 'Bankruptcy of India' (London, 1886), পৃষ্ঠা ১৫৭।

১১ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, 'Financial Despatch, ১৪৪ নং, ২৯শে জুন ১৮৬০।

১২ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, 'Financial Despatch, ১৪৩ নং, ২৯শে জুন ১৮৬০।

১৩ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. Despatch, ২৪০ নং, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৯।

১৪ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (২৭শে জুন ১৮৬১ এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮) ১৮৬৮ সালে হিসাব করেছিল যে ভারতে মাথা পিছু করভার ছিল ৬ শিলিং, এই অঙ্ক গ্রেট বিটেনে ছিল ২ পাউণ্ড ১৬ শিলিং ৩ পেন্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২ পাউণ্ড ১৬ শিলিং ১ পেন্স এবং ফ্রান্সে ১ পাউণ্ড ১৯ শিলিং ১ পেন্স। ১৮৭৩ সালের ৩১শে অক্টোবরের 'দা ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট' বলেছিল যে মাথা পিছু ১ শিলিং ৬ পেন্স গড় করভার সহ "এ দেশ পৃথিবীতে খুবই কম করভারওয়ালা দেশগুলির অন্যতম।"

১৫ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', ১৮৬০ সালের ২২শে মার্চ।

১৬ 'পূর্বোক্ত', ১৮৬১ সালের ২৬শে মার্চ।

১৭ 'পূর্বোক্ত', ১৩ই ডিসেম্বর ১৮৬৬।

১৮ 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া', ১৫ই আগস্ট ১৮৬৫।

১৯ 'পূর্বোক্ত'।

২০ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', ১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৬৬।

২১ 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া', ১৩ নং, ১৮৬৩।

২২ 'মাদ্রাজ টাইমস' ২৪ই অক্টোবর—'টাইমস অব ইণ্ডিয়া', ৩০শে অক্টোবর ১৮৬৩ কর্তৃক উদ্ধৃত।

২৩ 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট', ২১শে আগস্ট ১৮৭১, কর্তৃক উদ্ধৃত J. C. Geddes-এর সাক্ষ্য। সম্পাদক Robert Knight-এর ধারণা ছিল যে এ তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুল।

২৪ H. M. Hyndman-এর 'The Bankruptcy of India' (London 1886), ৪১ পৃষ্ঠা।

২৫ 'বেলগাঁও সমাচার', ২০শে এপ্রিল ১৮৬৮, R.N.P. (বোম্বে), ২১ পৃষ্ঠা।

২৬ 'রাস্ত গফতার', ২৪শে মে ১৮৬৮, R.N.P. (বোম্বে), ৭৯ পৃষ্ঠা।

২৭ 'হিন্দু হিতৈষিণী', ২৮শে মার্চ ১৮৬৮, R.N.P. (বাংলা), ১৫০ পৃষ্ঠা।

২৮ 'সুধাবর্ষণ গেজেট', ১৪ই মার্চ ১৮৬৮, R.N.P. (বাংলা), ১৩০ পৃষ্ঠা।

২৯ 'সোমপ্রকাশ', ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৬৭, R.N.P. (বাংলা), ৫ পৃষ্ঠা।

৩০ 'খান্দেশ ভাইভাওয়া', ৪ঠা মার্চ ১৮৭০, R.N.P. (বোম্বে), ১৩৩ পৃষ্ঠা।

৩১ Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৮, ৩৫ নং। ভারতের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি অব স্টেট Sir. Stafford Northcote-র কাছে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতার সভা থেকে প্রদত্ত বিনীত স্মারকলিপি। ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮।

৩২ দাদাভাই নওরোজির 'Poverty and Un-British Rule in India' (দিল্লী, ১৯৬২), ১৯৩ ও পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ।

৩৩ 'পূর্বোক্ত', ১৯৫ পৃষ্ঠা।

৩৪ পূর্বোল্লিখিত স্থানে।

৩৫ 'পূর্বোক্ত', ১৯৪ পৃষ্ঠা।

৩৬ 'হিন্দু পেট্রিয়ট', ৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৬০।

৩৭ Fin. Progs. জুলাই ১৮৬০, Accts. ২৬ নং, ভারত সরকারের ফিনান্স বিভাগের সেক্রেটারির কাছে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বাবু ঈশ্বর চন্দ্র সিং, ২২শে মে ১৮৬০, (Rev. Despatch, ২১ নং, ২০শে এপ্রিল ১৮৬৭) সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার।

৩৮ Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৮, ৩৪ নং। বাংলা সরকারের সেক্রেটারির কাছে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাশোসিয়েশনের সেক্রেটারি বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮, ৩৫ নং। কলকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাশোসিয়েশনের সভা থেকে Sir Stafford Northcote-র কাছে বিনীত স্মারকলিপি, ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ তারিখের। ১৮৬৮ সালের ২৩শে মার্চের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' কর্তৃক কাউন্সিলের বিতর্ককে 'তামাশা' বলে অভিহিত করা দেখুন।

৩৯ 'পূর্বোক্ত'।

৪০ সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে ভারত সরকার, Fin. Despatch, ৮৬ নং, ৩রা এপ্রিল ১৮৬৮।

৪১ 'হিন্দু পেট্রিয়ট', ৬ই এপ্রিল ১৮৬৮, 'পূর্বোক্ত', ৬ই মার্চ ১৮৬৮।

৪২ 'সোম প্রকাশ', ৯ই মার্চ ১৮৬৮ R.N.P. (বাংলা), ১০৭ পৃষ্ঠা। 'জাম-এ-জামশেদ', ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯, ১০ই মার্চ ১৮৬৯, R.N.P. (বোম্বে), ৯৪ ও ১৩৩ পৃষ্ঠা, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৭০, R.N.P. (বোম্বে), ৪৪২ পৃষ্ঠা।

৪৩ Fin. Progs. জুলাই ১৮৬৮, S. R. ১৪ নং। সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাশোসিয়েশনের কলকাতার সভা প্রদত্ত বিনীত স্মারকলিপি, ৩১শে মে ১৮৬৯।

৪৪ Fin. Progs. মার্চ ১৮৭১, Accts. ৯০ নং, ভারত সরকারের অর্থ বিভাগের সেক্রেটারির কাছে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাশোসিয়েশনের সেক্রেটারি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ১০ই মার্চ ১৮৭১।

৪৫ Napier-এর কাছে Mayo, ২০শে নভেম্বর ১৮৭০, ৩২৫ নং, Mayo Papers, ৪১ নং বাণ্ডিল।

৪৬ 'হিন্দু পেট্রিয়ট', ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭০।

৪৭ 'হিন্দু পেট্রিয়ট', ১১ই জুলাই ১৮৭০।

৪৮ 'হিন্দু পেট্রিয়ট', ১০ই এপ্রিল ১৮৭১।

৪৯ Sir Bartle Frere-র "The means of ascertaining public opinion in India" (১৮৭১), 'Journal of East India Association', ভল্যুম V, অংশ IV, ১০২-৭২ পৃষ্ঠা।

৫০ W. Arbuthnot-এর কাছে Mayo, ১৫ই মার্চ ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪২, ৬৮ নং।

৫১ Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৮, ৪৮ নং, বোর্ড অব রেভিনিউ-এর সেক্রেটারি কর্তৃক ফোর্ট সেণ্ট জর্জ-এর সরকারের চিফ সেক্রেটারির নিকট, ২৭শে জানুয়ারি ১৮৬৮।

৫২ B. Frere, পূর্বোল্লিখিত স্থানে।

৫৩ Argyll-এর নিকট Mayo, ৯ই নভেম্বর ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪১, ৩০০ নং।

৫৪ Cranborne-এর নিকট J. Lawrence, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৬, Lawrence Papers, সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে চিঠিপত্র ১৮৬৬, ভল্যুম ৩, ৩৫ নং।

৫৫ Revenue Despatch, ২১ নং, ১৮৬৭ সালের; ভারতের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে ভারত সরকার, ২০শে এপ্রিল ১৮৬৭।

৫৬ ভারতের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে ভারত সরকার, Fin. Despatch ৮৬ নং, ৩রা এপ্রিল ১৮৬৮।

৫৭ James Routledge-এর 'English Rule and Native Opinion in India' (London, 1878), পৃষ্ঠা ২১৯-২০।

৫৭ক Fin. Progs. (Accts), জুন ১৮৬১, নং ৬১, গভর্নর-জেনারেলের কাছে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাশোসিয়েশনের স্মারকলিপি, ৫ই জুন ১৮৬১।

৫৮ 'মাদ্রাজ এক্সামিনার', ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৩, Rev. Progs. জুন ১৮৬৭, ৫০ নং। অর্থবিভাগের সেক্রেটারির কাছে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সেক্রেটারি, ৩১শে মে ১৮৬৭; 'পূর্বোক্ত', আগস্ট ১৮৬৭, ২০ নং, সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ক্যালকাটা ট্রেডস অ্যাশোসিয়েশনের স্মারকলিপি, ২২শে এপ্রিল ১৮৬৭। 'পাইওনিয়ার' ২রা জানুয়ারি ১৮৭১, 'ইংলিশম্যান', ১১ই এপ্রিল ১৮৬৬।

৫৯ Napier-এর নিকট Mayo, ৬ই আগস্ট ১৮৭০, বাণ্ডিল ৪০, ২২৫ নং।

৬০ Fin. Progs. (Accts), জুন ১৮৬১, ৬২ নং, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাশোসিয়েশনের কাছে গভর্নর-জেনারেল।

৬১ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', ২৬শে জানুয়ারি, ১৬ই মার্চ, ২৪শে আগস্ট ১৮৬৫। 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট', ২১শে নভেম্বর ১৮৭১, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৯।

৬২ Lord Napier-এর নিকট Mayo, ১৫ই মে ১৮৭০, বাণ্ডিল ৩৯, ১১৯ নং।

৬৩ L. C. Progs. ১৪ই এপ্রিল ১৮৬০, ভল্যুম VI, old series.

৬৪ 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া', ১০ই নভেম্বর ১৮৬৩।

৬৫ Rev. Progs. এপ্রিল ১৮৬৭, ১৯ নং। কলিকাতাবাসীদের স্মারকলিপি।

৬৬ Rev. Progs. মার্চ ১৮৬৭, ৩৫ নং, ক্যালকাটা ট্রেডস অ্যাশোসিয়েশনের দরখাস্ত, ১৫ই মার্চ ১৮৬৭।

৬৭ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', ১৬ই মার্চ ১৮৬৫, Rev. Progs. নভেম্বর ১৮৮০, ১৯৮৬ নং, B. W. Colvin-এর নোট, ৯১ই সেপ্টেম্বর ১৮৮০।

৬৮ হাউজ অব কমন্স-এ Mr. Bright-এর ভাষণ, ৭ই আগস্ট ১৮৫৫। 'Financial Statements……reprinted from Hansard' (Calcutta 1872), ৬৫ পৃষ্ঠা।

৬৯ হাউজ অব কমন্স-এ Col. Sykes-এর ভাষণ (২৯শে জুন ১৮৬৫), Kinnaird-এর ভাষণ (২৭শে জুলাই ১৮৬৮), R. N. Fowler-এর ভাষণ (৩রা আগস্ট ১৮৬৯, ৫ই আগস্ট ১৮৭০), Sir W. Lawson-এর (৩রা আগস্ট, ১৮৬৯), Stephen Cave-এর (২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭১)। 'পূর্বোক্ত', ৬০৪, ৭৯০, ৭৯৪, ৮৬৮, ৮৮৬, ৯৫৬, ৯৬৯, ৯৯০ ও ৯৯৭ পৃষ্ঠা।

৭০ Donald Matheson-এর 'What is the Opium Trade' (Edinburgh, MDCCCLVII), ১৪ পৃষ্ঠা।

৭১ 'পূর্বোক্ত', ১৫ পৃষ্ঠা।

৭২ M. Lewin-এর 'The Government of East India Co……(London, 1857), ১৪-২২ পৃষ্ঠা।

৭৩ ৬৯ নং পাদটীকা দেখুন।

৭৪ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', ২৯শে অক্টোবর ১৮৬৩।

৭৫ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', ৯ই জুলাই ১৮৬১।

৭৬ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', ১২ই অক্টোবর ১৮৬৫।

৭৭ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', ১৪ই মে ১৮৬১।

৭৮ 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া', ৮ই এপ্রিল ১৮৬৫, 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', ১৪ই মে, ৯ই জুলাই ও ২৯শে অক্টোবর ১৮৬৩।

৭৯ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', ২৭শে এপ্রিল ১৮৬৫।

৮০ 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট', সম্পাদকীয় ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৩।

৮১ ডি, নওরোজির 'Essays, Speeches, Addresses……(বোম্বে ১৮৮৭), ৩৬৩ পৃষ্ঠা।

৮২ পূর্বোল্লিখিত স্থানে।

৮৩ 'রাস্ত গফতার', ২৬শে ডিসেম্বর ১৮৭০ (R.N.P., বোম্বে, ৭ পৃষ্ঠা), 'পূর্বোক্ত, ১২ই জুন ১৮৭০ (R.N.P. বোম্বে, ২৯৩ পৃষ্ঠা)।

৮৪ পূর্বোল্লিখিত স্থানে।

৮৫ Lord Stanley-এর ভাষণ, ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯। 'Financial Statements……(Calcutta, 1872), ১৩৮-৩৯ পৃষ্ঠা।

৮৬ অজ্ঞাতনামা, 'The Opi um Revenue of India' (London, 1857), ২৭-৩২ এবং ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা।

৮৭ অজ্ঞাতনামা, 'Indian Finance Defended' (London, 1878)।

৮৮ J. Hector-এর 'The Underlying Principles of Indian Finance' (London, 1880), ২৩ পৃষ্ঠা।

৮৯ S. Laing-এর 'Financial Statement' 1862-63, পি. এন. ব্যানার্জী কর্তৃক 'A History of Indian Taxation' (Calcutta, 1930), ৯২২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত। হাউজ অব কমন্স-এ ১৯শে জুলাই ১৮৬৬তে S. Laing-এর ভাষণও দেখুন। 'Financial Statements', ৬৫৮ পৃষ্ঠা।

৯০ L. C. Progs. (১৮৬৩), ভল্যুম III (new series), ৭৫ পৃষ্ঠা।

৯১ J. Strachey যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন যে আফিমের একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিলোপ আফিমের সরবরাহ ও তার ব্যবহার বাড়িয়ে দেবে। J. Strachey & R. Strachey-র 'The Finances and Public Works of India' (London, 1882) ২৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা।

৯২ J. Strachey & R. Strachey-র পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ২৫৩ পৃষ্ঠা এবং J. Strachey-র 'India : its administration and progress' (London, 1911) ১৬৪-৬৫ পৃষ্ঠা।

৯৩ J. Strachey & R. Strachey-র পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ২৫৫ পৃষ্ঠা।

৯৪ 'পূর্বোক্ত', ২৬৪ পৃষ্ঠা।

৯৫ R. Bourke, M.P.-র নিকট Mayo, ৭ই জুন ১৮৭১, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৪৩, ১২৯ নং। "এই বিষয়ে বিশ্বপ্রেমিকদের অর্থহীন প্রলাপের কণ্ঠরোধ করা উচিত।"

৯৬ B. Frere-র নিকট Mayo, ৩রা জুন ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৯, ১৫৬ নং।

৯৭ 'পূর্বোক্ত'।

৯৮ 'পূর্বোক্ত'।

৯৯ "আমার এইটুকুই আশা যে আমরা এ বিষয়ে আমাদের কার্য-বিবরণী রচনায় ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হব না। ……'একটা ভাবের' জন্য অনেক ভুলই আমরা করেছি, কিন্তু আমি আশা করি আমরা এ রকম একটা বোকামির কাজ (ন্যক্কারজনক) করে বসব না।" B. Frere-র কাছে Mayo, ৩রা জুন, ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৯, ১৫৬ নং।

১০০ Home Progs. Sep. Rev. ২৭শে জুলাই, ১৮৬০, ২৮ নং। ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট বাংলা সরকারের সেক্রেটারি, ১৪ই জুলাই ১৮৬০।

১০১ Fin. Progs. সেপ্টেম্বর ১৮৭১, Sep. Rev. ১৯ নং। ভারত সরকারের প্রস্তাব, সেপ্টেম্বর ১৮৭১।

১০২ Home S. R. Progs. ২২শে জানুয়ারি ১৮৬১, ২৮ নং। ভারত সরকারের সেক্রেটারির নিকট কাস্টমস কমিটির সভাপতি, ১৮ই জানুয়ারি ১৮৬১।

১০৩ Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৭১, Sep. Rev. ১১ নং, লোয়ার প্রভিন্সেস-এর বোর্ড অব রেভিনিউ-এর সেক্রেটারি কর্তৃক বাংলা সরকারের সেক্রেটারির নিকট, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৭১।

১০৪ Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৬৬, Sep. Rev. ৪১০ অনুযায়ী,

লাইসেন্সিদের কাছে ইজারা দেবার ব্যবস্থার বিবরণের জন্য আবগারি প্রশাসনের উপর রিপোর্ট দেখুন।

১০৫ 'পূর্বোক্ত', ৪৮৬ নং। ভারত সরকারের অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারির কাছে ব্রিটিশ বার্মার চিফ কমিশনার A. B. Phayre, ১০ই জুন ১৮৬৫।

১০৬ Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৫, Exp. নং ২৯০। ভারত সরকারের অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারির নিকট বাংলা সরকারের সেক্রেটারি A. Eden, ৯ই মার্চ ১৮৬৫।

১০৭ 'পূর্বোক্ত'।

১০৮ বাংলা সরকারের সেক্রেটারির কাছে ভারত সরকারের সেক্রেটারি, ৫৬৬ নং, ১৮ই মার্চ ১৮৫৯, A. Eden কর্তৃক উদ্ধৃত ভারত সরকারের সেক্রেটারির কাছে বাংলা সরকারের সেক্রেটারি, ৯ই মার্চ ১৮৬৫।

১০৯ Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৫, Exp. নং ২৯২। বাংলা সরকারের সেক্রেটারির কাছে ভারত সরকারের অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারি, ২৮শে এপ্রিল, ১৮৬৫। শ্রী সি. এন. ভকিল ('Financial Development in Modern India', Bombay 1924, ৪৭০ পৃষ্ঠা) বলেছেন যে কেন্দ্রীয় চোলাই ব্যবস্থার গুণ ১৮৮৯ সালে স্বীকৃত হয়েছিল, বস্তুত এ কথা মনে হয় যে ক্রমে ক্রমে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের কর্মনীতি গৃহীত হয়েছিল। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', ৩০শে সেপ্টেম্বর, '৬৯।

১১০ Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৭১। Sep. Rev. ১২ নং। বাংলা সরকারের সেক্রেটারির নিকট ভারত সরকারের অর্থ-বিষয়ক আণ্ডার-সেক্রেটারি J. Westland, ১৪ই অক্টোবর ১৮৭১।

১১১ Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৬৬, Sep. Rev. ৪৮২ নং। ভারত সরকারের অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারির কাছে ব্রিটিশ বার্মার চিফ কমিশনার, ২৬শে নভেম্বর ১৮৬৪।

১১২ সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে ভারত সরকার। Fin. ১৪৪ নং, ২৯শে জুন ১৮৬০।

১১৩ সি. এন. ভকিলের পূর্বোল্লেখিত গ্রন্থের ৪৮৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

১১৪ Fin. Progs. মার্চ ১৮৬৮, ৩৯ নং। অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারির

নোট, ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮। ডাকিলের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের ৪৮৩ পৃষ্ঠা। Home Progs. Public, এপ্রিল ১৮৭১, ১৩ নং, স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারির স্মারকলিপি, ১৪ই মার্চ ১৮৭০।

১১৫ 'হিন্দু পেট্রিয়ট', ১৫ই মে ১৮৭১।

১১৬ 'পূর্বোক্ত'।

১১৭ 'হিন্দু পেট্রিয়ট', ১৭ই এপ্রিল ১৮৭১।

১১৮ 'হিন্দু পেট্রিয়ট', ১৫ই মে ১৮৭১।

১১৯ 'হিন্দু পেট্রিয়ট', ১১ই এপ্রিল ১৮৭০, ৫ই জুন ১৮৭১, 'রাস্ত গফতার', ১৩ই নভেম্বর ১৮৭০, R.N.P. (বোম্বে) ৫৪৪ পৃষ্ঠা।

১২০ 'হিন্দু পেট্রিয়ট', ১২ই ডিসেম্বর ১৮৬০, ৩০শে জুন ১৮৬০, ১১ই জুলাই ১৮৬০।

১২১ 'পাঞ্জাব আখবর', ৮ই জুন ১৮৭১। S.V.N. (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ), 'প্রয়াগ দূত', R.N.P. (বাংলা), ১৫ই জুলাই ১৮৬৮।

১২২ 'রুই-নূ-মাই পাঞ্জাব', ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭, S.V.N. (N.W.P.), ১০২ পৃষ্ঠা।

১২৩ 'ভাস্কর', ২৮শে মার্চ ১৮৬৮ R.N.P. (বাংলা), ১৮৬৮, ১৫৩ পৃষ্ঠা।

১২৪ 'ভাস্কর', ৪ঠা জুন ১৮৬৮, R.N.P. (বাংলা), ২১ পৃষ্ঠা, 'রাজসাহী পত্রিকা', জানুয়ারি ১৮৬৮, R.N.P. (বাংলা) ১৮৬৮, ৫৯ পৃষ্ঠা, 'আউধ আখবর', ইত্যাদি জুন ১৮৬৮ S.V.N. (N.W.P.), ২৯৮ পৃষ্ঠা।

১২৫ দাদাভাই নওরোজি, 'Essays, Speeches, Addresses, etc.' (বোম্বে, ১৮৮৭), ৫৪ পৃষ্ঠা।

১২৬ 'হিন্দু পেট্রিয়ট', ১৩ই জানুয়ারি ১৮৬৮।

১২৭ Fin. Progs. ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮, Accts. নং ৫৭, গভর্নর-জেনারেলের Minute, ২০শে জানুয়ারি ১৮৬৮।

১২৮ 'বোম্বে সমাচার', ৮ ও ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭০, R.N.P. (বোম্বে), ৮২ পৃষ্ঠা।

১২৯ 'জাম-এ-জামশেদ', ২৩শে নভেম্বর ১৮৬৯, R.N.P. (বোম্বে), ৫৯৬ পৃষ্ঠা।

১৩০ 'জাম-এ-জামশেদ', ১০ই মার্চ ১৮৬৯, R.N.P. (বোম্বে), ১৩৩ পৃষ্ঠা।

১৩১ 'সুকিথ'বচনী', W. F. Right কর্তৃক ১৮৭৩ সালের মার্চের তামিল সংবাদপত্রগুলির রিপোর্ট (১৭ই মে ১৮৭৩)।

১৩২ ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের বোম্বাই শাখার দরখাস্ত, 'Journal of the East India Association', ভল্যুম V, অংশ II (১৮৭১), ১৩০-৩২ পৃষ্ঠা।

১৩৩ ১১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১৩৪ Fin. Progs. জুলাই ১৮৬৯, Sept. Rev. ১৪ নং। সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতার সভার বিনীত স্মারকলিপি, ৩১শে মে ১৮৬৯।

১৩৫ 'জাম-এ-জামশেদ', ৪ঠা আগস্ট ১৮৬৮, R.N.P. (বোম্বে), ২৩০ পৃষ্ঠা, ১৭ই মার্চ ১৮৬৯, R.N.P. (বোম্বে), ১৪৪ পৃষ্ঠা।

১৩৬ 'রাস্ত গফতার', ৩০শে মে ১৮৬৯, R.N.P. (বোম্বে), ২৭৩ পৃষ্ঠা, ১৭ই অক্টোবর ১৮৬৯, R.N.P. (বোম্বে), ৫২৫ পৃষ্ঠা।

১৩৭ 'হিন্দু পেট্রিয়ট', ১১ই এপ্রিল ১৮৭০।

১৩৮ 'পাঞ্জাব আখতার', ১০ই জুন ১৮৭১, S.V.N. (N.W.P.), ৩০৩ পৃষ্ঠা।

১৩৯ দাদাভাই নওরোজি, 'Essays Speeches etc.' (Bombay, 1887), ২৬-৩০ পৃষ্ঠা।

১৪০ ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের বোম্বাই শাখার দরখাস্ত 'Journal of East India Association', ভল্যুম V, অংশ II (১৮৭১), ১৩০-৩২ পৃষ্ঠা।

১৪১ বোম্বাইতে Fawcett স্মরণ সভায় (১৮৮৫ সালে ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে) নওরোজির বক্তৃতা দেখুন। 'Speeches and Writings of Dadabhai Naoroji' (Madras, n.d.), ১৭১-৭৪ পৃষ্ঠা।

১৪২ H. Fawcett-এর 'Indian Finance' (London, 1880), ৫২ পৃষ্ঠা।

১৪৩ সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে ভারত সরকার, Fin. ১৪৯ নং, ২২শে নভেম্বর ১৮৬২।

১৪৪ সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে ভারত সরকার, Fin. ৩৭ নং, ১৩ই মার্চ ১৮৬১। ভারত সরকারের কাছে সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ৫৩ নং, ৮ই এপ্রিল ১৮৬১।

১৪৫ Fin. Progs. সেপ্টেম্বর ১৮৬১, Accts (Stores), ৬৭ নং, ভারত সরকারের অর্থ-বিষয়ক সেক্রেটারির কাছে সামরিক অর্থ বিভাগের সেক্রেটারি, ২৩শে আগস্ট ১৮৬১।

১৪৬ ভারত সরকারের কাছে সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ২১৮, ২৭শে ডিসেম্বর ১৮৬২।

১৪৭ ভারত সরকারের কাছে সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ৭ ও ২৭ নং, ১৬ই জানুয়ারি ও ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬।

১৪৮ সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট ভারত সরকার, Fin. ২২১ নং, ৪ঠা অক্টোবর ১৮৬৭। ভারত সরকারের কাছে সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ৪৬৪ নং, ২৩শে ডিসেম্বর ১৮৬৭।

১৪৯ ভারত সরকারের কাছে সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ৮ নং, ১১ই জানুয়ারি ১৮৭০।

১৫০ ভারত সরকারের কাছে সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ১১৪ নং, ১৮ই মার্চ ১৮৬৯।

১৫১ Mayo-র নিকট J. Strachey, ৪ঠা আগস্ট ১৮৬৯। Mayo Papers, বাণ্ডিল ৬০। Argyll-এর নিকট Mayo, ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৫, ৫৩ নং।

১৫২ Fin. Progs. আগস্ট ১৮৭১, ৭৩ নং। ভারত সরকারের প্রস্তাব, ২১শে জুলাই ১৮৭১। সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে Fin. ৪২২ নং, ১৬ই নভেম্বর ১৮৭১।

১৫৩ ভারত সরকারের কাছে সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ১৩৬ নং, ২২শে আগস্ট ১৮৬০।

১৫৪ ভারত সরকারের কাছে সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ৪ নং, ১৬ই জানুয়ারি ১৮৬৫।

১৫৫ Northcote সুলতানের বলনাচের দরুন খরচের সপক্ষে যুক্তি দেবার

চেষ্টা করেন "কেউ যদিও কথাটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছুক নন তবু এই বলনাচ পুরোপুরি এবং একান্তভাবেই ইণ্ডিয়া অফিসের ব্যাপার ......।" J. Lawrence-এর কাছে S. Northcote, ১লা অক্টোবর ১৮৬৭। Lawrence Papers, সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছ থেকে চিঠিপত্র, ভল্যুম IV, ৪১ নং।

১৫৬ সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে ভারত সরকার Fin. ১৯১ নং, ২৭শে আগস্ট ১৮৬৬। ভারত সরকারের কাছে সেক্রেটারি অব স্টেট, Fin. ২৫ নং, ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭।

১৫৭ সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে ভারত সরকার, Fin. ৩০ নং, ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬১।

১৫৮ 'পূর্বোক্ত'।

১৫৯ 'পূর্বোক্ত'।

১৬০ সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে ভারত সরকার, Fin. ৭৩ নং, ৮ই মার্চ ১৮৬৭।

১৬১ Fin. Progs. জানুয়ারি ১৮৬৭, Accts. নং ৭০, অর্থ বিভাগে ভারত সরকারের প্রস্তাব, ২৬শে জানুয়ারি ১৮৬৭। Fin. Progs. অক্টোবর ১৮৬৯, Accts. নং ৬৩, অর্থ বিভাগে ভারত সরকারের প্রস্তাব, ৬ই অক্টোবর ১৮৬৯।

১৬২ বাংলার শিক্ষাবিভাগে বেতনের হার অন্য যে-কোনও জায়গার চেয়ে বেশি ছিল। সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে Fin. ১১৯ নং, ১৪ই জুলাই ১৮৬৫। Fin. Progs. মার্চ ১৮৬৮, Accts. নং ১১১-১৩। শেষোক্ত কার্য-বিবরণীর মধ্যে বাংলায় মাতৃভাষায় শিক্ষা সম্বন্ধে প্রখ্যাত গ্রন্থকার ভূদেব মুখার্জির একটি চিত্তাকর্ষক রিপোর্ট আছে।

১৬৩ Erskin Perry-র কাছে Mayo, ২৩শে মার্চ ১৮৭০। Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৫, ৮৫ নং।

১৬৪ E. Perry-র কাছে Mayo ২৬শে জুলাই ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৫, নং ২১৩।

১৬৫ Sir William Muir-এর কাছে Mayo, ৪ঠা আগস্ট, ১৮৭০, Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৫, নং ২২২। Argyll-এর কাছে Mayo,

১৭ই অক্টোবর ১৮৬৯। Mayo Papers, বাণ্ডিল ৩৭, নং ২৮৫।

১৬৬ 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট', ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৯, 'পূর্বোক্ত', ২১শে আগস্ট ১৮৭১, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৭১, ডি· নওরোজির পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ২৯৫, ২৯৪ ও ২০১ পৃষ্ঠা।

১৬৭ Robert Knight একজন অর্থনীতিবিদ এবং F.S.S· ছিলেন।

১৬৮ Knight প্রধানতঃ "রাজনৈতিক ঋণগুলির" কথাই বোঝাচ্ছিলেন।

১৬৯ 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট', ২১শে আগস্ট ১৮৭১, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৭১।

১৭০ ডি· নওরোজির পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ২৯৫ পৃষ্ঠা।

১৭১ 'পূর্বোক্ত', ২০১ ও ২৯৪ পৃষ্ঠা।

১৭২ 'ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট', ৩০শে আগস্ট ১৮৭৩।

১৭৩ Mayo-র কাছে J. Strachey, ১৮ই অক্টোবর ১৮৬৯, Mayo Papers, ৬০।

১৭৪ Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৫, S.R. নং ৩০২, বোম্বে সরকারের নিকট ভারত সরকারের সেক্রেটারি, ১৯শে এপ্রিল ১৮৬৫।

১৭৫ L. C. Progs. ১৮৬০, ভল্যুম VI (old series), ১২২ পৃষ্ঠা।

১৭৬ Home Progs. S.R. নং ৭-৮।

১৭৭ 'হিন্দু পেট্রিয়ট', ৪ঠা জুলাই ১৮৭০।

১৭৮ Home (Public) Consultations, ১৫ই এপ্রিল ১৮৫৯, ১০ নং। ৫ই এপ্রিল ১৮৫৯ তারিখে অনুষ্ঠিত কলকাতার ব্যবসায়ীদের এক সভার দরখাস্ত। সেক্রেটারি অব স্টেটের ডেসপ্যাচ, S.R. নং ৪, ৭ই এপ্রিল ১৮৬৯। Home S.R. নং ৩, ১লা অক্টোবর ১৮৬০।

১৭৯ Fin. Progs. এপ্রিল ১৮৬৫। S.R. নং ৩৫।

১৮০ 'পূর্বোক্ত', জুন ১৮৬৫, S.R. নং ২৪৪-৪৫।

১৮১ 'হিন্দু পেট্রিয়ট', ২১শে মার্চ ১৮৬০।

১৮২ 'পূর্বোক্ত', ২৯শে মে ১৮৬৬।

১৮৩ 'পূর্বোক্ত', ২১শে এপ্রিল ১৮৬০।

১৮৪ 'পূর্বোক্ত,' ১১ই জুলাই ১৮৭০।

১৮৫ 'হিন্দু পেট্রিয়ট', ৯ই জানুয়ারি ১৮৭১।

১৮৬ Fin Progs. মার্চ ১৮৭১, Accts. নং ৯০। ভারত সরকারের অর্থ-

বিষয়ক সেক্রেটারির কাছে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি, ১০ই মার্চ ১৮৭১।

১৮৭ 'হিন্দু পেট্রিয়ট', ৯ই জানুয়ারি ১৮৭১।

১৮৮ 'পূর্বোক্ত', ৬ই মার্চ ১৮৭১।

১৮৯ বোম্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের দরখাস্ত, 'Journal of the East India Association', ভল্যুম V, অংশ II, ১৮৭১, পৃষ্ঠা ১৩০-৩২।

১৯০ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৮৬৩।

১৯১ এস. ভট্টাচার্যের "Laissez faire in India", 'Indian Economic and Social History Review', ভল্যুম II, ১-২২ পৃষ্ঠা।

১৯২ পরিসংখ্যানগত পরিশিষ্টে সাধারণ পূর্তকর্মের খরচ সংক্রান্ত সারণীর ভিত্তিতে এবং ১২৭-৩১ পৃষ্ঠার ভিত্তিতে।

১৯৩ M.M.P.R. ১৮৭১-৭২ এবং P.P.H.C. ১৮৭৩, ভল্যুম ৫০, পৃষ্ঠা ১৪৭-এ প্রদত্ত মোটামুটি অনুমিত হিসাবের ভিত্তিতে প্রত্যেক প্রদেশ অথবা প্রেসিডেন্সির এলাকার হিসাব করা হয়েছে।

১৯৪ 'গেজেট অব ইণ্ডিয়া', ৩১শে মার্চ ১৮৮৮ (সাপ্লিমেণ্ট)।

১৯৫ ১৮৭১ সালের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ১৮৭৫ সালে Sir Louis Mallet-কৃত হিসাব। Report of the Famine Commission (১৮৮০), পরিশিষ্ট L, ১৪৩ পৃষ্ঠা।

১৯৬ John Strachey-র স্মারকলিপি, ১৮৭৪, P.P.H.C. ১৮৭৪, কোড ৩২৬, পৃষ্ঠা ১৬-৭।

১৯৭ 'পূর্বোক্ত', ১৮ পৃষ্ঠা।

১৯৮ চতুর্থ অধ্যায়ে দেখুন।

১৯৯ বোম্বাইয়ের ৩৬৪৬ জন দেশীয় ব্যবসায়ীর দরখাস্ত, ১২ই অক্টোবর ১৮৫৯। 'Correspondence on Direct Taxes' (Calcutta, 1882), ভল্যুম I, পৃষ্ঠা ৩০।

২০০ বি. বি. মজুমদার, পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, ৩২০, ৩৩৯, ৩৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা।

২০১ বি. এন. গাঙ্গুলির 'Dadabhai Naoroji and the Drain Theory' (Bombay, 1965), ৮০, ৯৩-৪ পৃষ্ঠা।

২০২ চতুর্থ পরিচ্ছেদ দেখুন।

পরিসংখ্যান সম্পর্কিত পরিশিষ্ট

এ কথা সুবিদিত যে ভারতীয় ইতিহাসের যে কোনও ছাত্রের সামনে প্রধান সমস্যা হল পরিমাণগত পরিসংখ্যানের স্বল্পতা। এই অনুশীলনটি যখন আমি শুরু করি তখন কতকগুলি প্রকাশিত বইতে, বিশেষ করে 'Statistical Abstracts Relating to British India' বইতে ভারতীয় অর্থ-বিষয়ক সংখ্যাতত্ত্বের চিত্তাকর্ষক সুসজ্জিত সারি দেখে অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করেছিলাম। 'Abstract of British Historical Statistics' বইয়ের ভূমিকায় Mitchell ও Deane মন্তব্য করেছেন যে পরিসংখ্যান সিরিজের মুশকিলটা তখনই কেবল বোঝা যায় যখন তার অঙ্কগুলিকে বিশ্লেষণের কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা করা যায়। আমার প্রয়াস যদিও প্রাথমিক ধরনের এবং পরিসরের দিক থেকে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ছিল তথাপি আমি ঐ ধরনের যে সব অপ্রত্যাশিত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলাম তা পাঠকের নজরে আনা উচিত।

দীর্ঘ কালপর্যায়ের বিবরণসহ যেসব সময় সিরিজ (time series) প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি নিয়ে প্রধান প্রধান সমস্যাবলী নিম্নোক্তরূপ: Parliamentary Papers থেকে পাওয়া অনেক পরিসংখ্যান সিরিজ বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল। এ কথা বিশেষতঃ প্রযোজ্য পার্লামেণ্টারি সিলেক্ট কমিটির কাছে যে সমস্ত সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল এবং ওই সব কমিটি যেসব রিপোর্ট তৈরি করেছিল সেগুলি সম্বন্ধে মৌলিক উপাত্তের (data) বদলে সংক্ষিপ্তসার বিবরণগুলি প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেগুলি আবার নানা কারণে তুলনীয় নয়। সেই সব কারণের মধ্যে আছে সংজ্ঞাগত ও ধারণাগত পরিবর্তন, উপাদানগুলির রাজস্বের (অথবা ব্যয়ের) এক দফা (head) থেকে আর এক দফায় সরানো, দফাগুলিকে রাজস্বের হিসাব (revenue account) থেকে মূলধনী হিসাবে (capital account) স্থানান্তরিত করা—তাও আবার অতীতকাল সম্পর্কেও প্রযুক্ত করা (restrospectively), পরিবর্তনশীল নীতি ইত্যাদি অনুযায়ী রাজস্বের (অথবা ব্যয়ের) একটা খাতের

মধ্যে অনেকগুলো দফা একত্র করে রাখা, ইত্যাদি। 'Statistical Abstracts' সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য যখন ফর্মায় বদল করা হয়েছে এবং পূর্ববর্তন 'Abstracts'-এ প্রকাশিত পরিসংখ্যানগুলিকে যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা না দিয়ে সংশোধন করা হয়েছে সেই সমস্ত সময়ে। এই সব মিলে লম্বা লম্বা এক একটা কাল পর্যায়ব্যাপী পরিসংখ্যানের সঙ্গে তুলনীয় সময় সিরিজ খাড়া করা অত্যন্ত কঠিন করে তোলে। নিম্নোক্ত সারণীগুলিতে (tables) সর্বাধুনিক সংশোধনগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে (যদি না সংজ্ঞাগত পরিবর্তন অথবা অঙ্গীভূত দফাগুলির এক খাত থেকে আর এক খাতে স্থানান্তর কোনও সময় সিরিজের তুলনীয়তার পক্ষে বাধা হয়ে না দাঁড়িয়ে থাকে) এবং প্রকাশিত সিরিজগুলিকে বার্ষিক অর্থ-বিষয়ক বিবৃতিগুলি ও অপ্রকাশিত দলিলপত্রের সঙ্গে তুলনা করে পরীক্ষা করে নেওয়া হয়েছে। যেখানে সিরিজে ছেদ পড়েছে তা সংশ্লিষ্ট সারণীর সংযুক্ত টীকায় সূচিত করা হয়েছে। সাধারণভাবে রাজস্ব বা ব্যয়ের একটা বিশেষ খাতের উপযোগী দফাগুলিকে গোটা কালপর্যায়ে সেই খাতেই রাখা হয়েছে। যেখানে প্রাপ্ত হিসাবে অঙ্গীভূত কোনও দফাকে এক খাত থেকে আর এক খাতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং সেগুলিকে পৃথক করা অসম্ভব বলে বোঝা গিয়েছে সে ক্ষেত্রে সে রকম স্থানান্তরের কথা পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে।

অর্থ-বিষয়ক বিভাগের (Finance Department) দলিলপত্র গাদা গাদা (গ্রন্থপঞ্জী সংক্রান্ত টীকা দেখুন)। ১৮৪৩ সালে খরচের হিসাব রাখার অফিস থেকে ১৮৫৯ সালে সরকারের একজন সর্বোচ্চ সদস্য অর্থাৎ ফিনান্স মেম্বারের পরিচালনায় অর্থ-বিষয়ক নিয়ন্ত্রণের এজেন্সি হিসাবে এই বিভাগের ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা, ১৮৫৭ সালে ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের পত্তন এবং এই বিভাগের জন্য কর্মী সংগ্রহ ও প্রশিক্ষণের জন্য Trevelyan-এর প্রয়াসের কথা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে (৫১-৫৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)। অর্থ-বিষয়ক বিভাগ যখন পুনর্গঠিত হচ্ছিল হিসাবরক্ষা ব্যবস্থাও তখন দ্রুত উন্নত হচ্ছিল—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির "ব্যবসায়িক হিসাব-রক্ষা" বলে যা অভিহিত হত তা থেকে সরকারি অর্থব্যবস্থার পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত একটা ব্যবস্থায় পরিণত হচ্ছিল: ১৮৬০ সালে বাজেট ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল (৫৬-৬২ পৃষ্ঠায় দেখুন) এবং হিসাব-রক্ষা ও হিসাব-পরীক্ষা ব্যবস্থায় পর পর অনেকগুলি সংস্কারের পরিণতিতে শেষ

পর্যন্ত Foster ও Whiffen (Trevelyan ও Golstone কর্তৃক ইংলেণ্ডে মনোনীত দুই পরামর্শদাতা) কর্তৃক প্রস্তাবিত ভিত্তিতে ব্যবস্থাটি পুনর্গঠিত হয়েছিল। এইসব পরিবর্তনের ফলে শতাব্দীর শেষার্ধে অর্থ-বিষয়ক উপাত্ত-সংগ্রহ অনেকটা উন্নত হয়েছিল। কিন্তু হিসাব-রক্ষার নীতি, ফর্ম, দফাগুলির ভাগ ইত্যাদির পরিবর্তনের ফলে পুনর্গঠনোত্তর কালের সঙ্গে তার আগেকার কালের তুলনা মুশকিল হয়ে পড়ল, সেই কারণে পরিসংখ্যান সিরিজে কিছু ছেদ পড়েছে। প্রত্যাশিত (anticipation), খসড়া (sketch) এবং নিয়মিত (regular) অনুমিত হিসাব সম্পর্কে সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেলের অর্থ-বিষয়ক বার্তাসমূহ (Financial Despatch) (৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায় দেখুন), ১৮৬০ সাল থেকে ফিনান্স মেম্বার-কর্তৃক প্রতি বছরে প্রদত্ত অর্থ-বিষয়ক বিবৃতি (Financial Statement) (Legislative Council Proceedings, old series, ভল্যুম VI-VII এবং new series, ভল্যুম I-XI) এবং 'Gazette of India'-য় প্রকাশিত অর্থ-বিষয়ক সারসঙ্কলনগুলি (abstract) থেকে প্রত্যেক আর্থিক বছরের হিসাবকে সংক্ষিপ্তসার রূপে উপস্থিত করা হয়েছে।

কতকগুলি ক্ষেত্রে কোনও একটি খাতে মোট রাজস্ব ও ব্যয়ের হিসাব পাওয়া যায় কিন্তু অঙ্গীভূত দফাগুলির বিস্তারিত বিবরণ গোটা সময়টার জন্য পাওয়া সম্ভব হয় নি। উদাহরণস্বরূপ সেনাবাহিনী ও পূর্তকর্ম খাতের ব্যয়ের বিস্তারিত পৃথক পৃথক বিবরণ কেবল ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকেই পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সারণীগুলিতে যে সিরিজ দেওয়া হয়েছে তা সেই সময় থেকেই শুরু করা হয়েছে প্রকাশিত সিরিজগুলি এবং বাৎসরিক হিসাবগুলির সাহায্যে যখন থেকে ছেদবিহীন সিরিজ খাড়া করা গিয়েছে। যেখানে পরিসংখ্যানে মাঝে মাঝে ছেদ পড়েছে এবং আয়ত্তগত প্রধান সিরিজের সঙ্গে সেগুলি তুলনা করা সম্ভব নয়, সেগুলিকে নিম্নোক্ত সারণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, সেগুলি যদি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে তা হলে প্রাসঙ্গিক সারণীর পাদটীকায় উল্লিখিত হয়েছে।

যথাযথ উপাত্তের অভাব সব চেয়ে বেশি অনুভব করা যায় যখন জাতীয় আয় অথবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী বিবেচনা করা যায়। এই বিষয়ের উপর লেখা যত বাড়ছে তত এ কথা স্পষ্টতর হয়ে উঠছে যে জাতীয় আয় সম্পর্কে আন্দাজি হিসাবকে ('guesstimates') ঘিরে রীতিমত

অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে এবং এমন কি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও ভুলের সম্ভাবনা খুব কম নয়, আর আরও আগে তো তা আরও বেশি। আবার ঊনবিংশ শতাব্দীর বেশির ভাগেরই যেসব পরিসংখ্যান আমরা পাই তা আমদানি ও রপ্তানির সরকারি মূল্যেরই কেবল ইঙ্গিত দেয়, তাতে বাণিজ্যের পরিমাণের ওঠাপড়া সম্বন্ধে অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ আন্দাজই পাওয়া যায়। ভারতের জাতীয় আয় সম্পর্কে দাদাভাই নওরোজির অনুমিত হিসাবের মূল্যায়ন অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর বহির্বাণিজ্যের পরিমাণগত সূচক তৈরি এমন কাজ নয় যা অন্য আর একটা গবেষণা প্রয়াসের মধ্যে অপ্রধান হিসাবে, একটা উপজাত কারবার হিসাবে হাল্কাভাবে হাতে নেওয়া যেতে পারে। এই সমস্ত গোলমেলে ক্ষেত্রে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে বর্তমানে যেসব গবেষণা চলছে (যথা, ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্পর্কে ডক্টর কে. এন. চৌধুরীর গবেষণা) সেগুলির সমাপ্তির জন্য।

ব্রিটিশ ভারতের অর্থ-বিষয়ক ব্যাপার সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম-ভাগের পরিসংখ্যানগুলির অন্যতম সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে এই থেকে যে ভূ-খণ্ডের দ্রুত সম্প্রসারণের দরুন বিভিন্ন কালপর্যায়ের মোট অঙ্কগুলির এবং প্রশাসনিক বিভাগসমূহের (যেগুলির আয়তনের বাড়াকমা চলছিল) পরি-সংখ্যানগুলির তুলনা করা এক শ্রমসাধ্য প্রক্রিয়া। ১৮৫৮-৭২ সালের মধ্যে ভূখণ্ডগত পরিবর্তন সামান্যই হয়েছিল। স্ট্রেটস সেটলমেণ্ট (১৯৪১ সাল পর্যন্ত যা রাজকীয় উপনিবেশ রয়ে গিয়েছিল)-এর হিসাব ১৮৬৬-৬৭ সাল পর্যন্ত ভারত সরকারের হিসাব থেকে পৃথক করা হয় নি, হায়দ্রাবাদের মধ্যে যে জেলাগুলিকে ফেলা হয়েছিল সেগুলির সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য। নিম্নে উপস্থাপিত সারণীতে প্রশাসনিক বিভাগগুলির যেসব হিসাব দেওয়া হয়েছে উপরোক্ত দুটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাকে প্রভাবিত করার মত আর কোনও ভূখণ্ডগত পরিবর্তন হয় নি। এ কথা খেয়াল করা দরকার যে এই কাল-পর্যায়ে ভারত সরকারের হিসাবের মধ্যে নিম্নতর ব্রহ্মদেশও (Lower Burma) ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিন্ধু ছিল বোম্বাইয়ের মধ্যে, এবং আসাম ছিল বাংলার মধ্যে (ব্যতিক্রম কেবল ৪ নং সারণী, যেটি ১৮৮৮ সালে রচিত একটি বিবৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত)।

এই সময়কার অর্থ-বিষয়ক যেসব পরিসংখ্যান প্রকাশিত রূপে পাওয়া যায় (যথা সেক্রেটারি অব স্টেট কর্তৃক পার্লামেণ্টের কাছে প্রদত্ত বিবৃতিগুলি,

স-পরিষদ গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে এবং ফিনান্স মেম্বার কর্তৃক লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কাছে প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ), সেগুলি সবই পাউণ্ড স্টার্লিং-এর হিসাবে। অথচ ভারতে যে হিসাব রাখা হত তা ছিল টাকায়। প্রকাশ্য বিবৃতির সময়ে টাকাকে স্টার্লিং-এ পরিণত করে নেওয়া হত (১ পাউণ্ড=১০ টাকা হারে), সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য Rx প্রতীকটি ব্যবহার করাটাকে সুবিধাজনক মনে করা হত, Rx মানে ছিল ১০ টাকা (Rs. 10)। সবটা যাতে এক রকম হয় তার জন্য নিম্নোক্ত সারণীগুলিতে টাকার অঙ্কেই পরিসংখ্যানগুলি দেওয়া হয়েছে (ইংল্যাণ্ডে ব্যয়, গ্যারাণ্টিপ্রাপ্ত ব্রিটিশ কোম্পানিগুলিকে প্রদত্ত সুদ এবং সরকারি ঋণ-সংক্রান্ত সারণীগুলিতে ছাড়া)। সরকারি বিনিময় হারটা যেখানে গোটা কাল-পর্যায়েই অনড় ছিল (১০ টাকা = ১ পাউণ্ড), সেখানে বাজারে বিনিময়ের হারে অবশ্যই ওঠানামা হত, আর ইংল্যাণ্ডে প্রেরিত অর্থের ক্ষেত্রে এর থেকেই বিনিময়ের দরুন লোকসানের উদ্ভব হত (৬০ পৃষ্ঠায় দেখুন)।

শেষতঃ, আর্থিক বছর সম্পর্কে ঃ ক্যালেণ্ডারের বছর ও আর্থিক বছর স্বভাবতই একসঙ্গে পড়ত না। ১৯৫৮-৬৬ সাল পর্যন্ত আর্থিক বছরের শুরু হত ১লা মে থেকে, ১৮৬৭ সালের পর থেকে শুরু হত ১লা এপ্রিল থেকে। (প্রসঙ্গতঃ এর একটা ফল হল ১৮৬৬-৬৭ সালের আর্থিক বছরের অঙ্কগুলি আসলে কেবল ১১ মাসের হিসাব)। আর্থিক বছরের শুরুকে আরও পিছিয়ে দেবার এবং সম্ভব হলে ১লা জানুয়ারিতে আর্থিক বছর শুরু করার প্রস্তাব উঠেছিল যাতে পার্লামেণ্টে ভারতীয় হিসাব আরও আগে উপস্থাপিত করা যায় (২৮৯-৯০ পৃষ্ঠায় দেখুন)। কিন্তু ভারতের ফসল কাটার মরশুম, রাজস্ব আদায়ের কাজ ও টাকার বাজারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দরুন এ প্রস্তাব বাস্তব বলে বিবেচিত হয় নি। ভারতীয় অর্থ-বিষয়ক হিসাবের ক্ষেত্রে যেমন হত নিম্নোক্ত সারণীগুলিতেও তেমনি প্রত্যেক আর্থিক বছরের ক্ষেত্রে যে বছরটা শেষ হতে যাচ্ছে সেইটেই উল্লেখ করা হয়েছে ঃ যেমন ১৮৬০ সাল মানে "১৮৬০-এ যে বছর শেষ হল" অর্থাৎ আর্থিক বছর ১৮৫৯-৬০।

তলাকার পাদটীকাগুলিতে প্রকাশিত উৎস এবং অপ্রকাশিত প্রধান উৎসগুলির উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রী এইচ. সান্যাল অনুগ্রহ করে গোটা পরিসংখ্যানগত পরিশিষ্টের

ছাপাখানার প্রুফ দেখেছেন এবং সারণীগুলিকে পরীক্ষা করে দিয়েছেন, তার জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

উৎস সম্পর্কে টীকা :

১.১-১.৩ : P.P.H.C. ১৮৬৮-৬৯, ভল্যুম ৭০, পৃষ্ঠা ৮, সারণী ৭ ; P.P.H.C ১৮৭০, ভল্যুম ৬৮, পৃষ্ঠা ২৫৫, সারণী ৯ ; P.P.H.C. ১৮৭৭, ভল্যুম ৮৫, পৃষ্ঠা ২৪৭ ; লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের কার্য-বিবরণীতে সংযোজিত অর্থ-বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিবরণ VI-VII (পুরান সিরিজ), I-XI (নতুন সিরিজ)।

২ : P.P.H.C. ১৮৭৬, ভল্যুম ৭৭, পৃষ্ঠা ২৬৪, সারণী ২১ ; P.P.H.C. ১৮৭৪, ভল্যুম ৭০, পৃষ্ঠা ৪, সারণী ৫ ; P.P.H.C. ১৮৭০, ভল্যুম ৬৮, পৃষ্ঠা ২২৫, সারণী ৯ ; Financial Statements (Calcutta), ১৮৬০/৬১-১৮৭১/৭২, L. C. Progs. (পুরান সিরিজ) VI, পৃষ্ঠা ৫৬১ ও পরিশিষ্ট।

৩ : P.P.H.C. ১৮৭৫, কোড ৪০৬, M.M.P.R. ১৮৭৩-৭৪, পৃষ্ঠা ৬৫, সারণী ৩৬ ; L. C. Progs. (পুরান সিরিজ), ভল্যুম VII, পৃষ্ঠা ২০৯, ৩৫৪ ; L.C.A. Progs. (নতুন সিরিজ), ভল্যুম II, পৃষ্ঠা ৭৬, III পৃষ্ঠা ১২৯, IV পৃষ্ঠা ১৫০-৫১, VI পৃষ্ঠা ১৭১, VII পৃষ্ঠা ১৪৫।

৪ : 'Gazette of India', ৩১শে মার্চ ১৮৮৮ (অতিরিক্ত) B.P.I., পৃষ্ঠা ৩৭৮।

৫ : P.P.H.C. ১৮৭৫, কোড ৪০৬, পৃষ্ঠা ৬৪, সারণী ৩৫, Fin. Progs. জুন ১৮৭১, Sep. Rev. ৮০ নং, P.P.H.C. ১৮৭১, ভল্যুম ৮, কোড ৩৬৩।

৬ : P.P.H.C. ১৮৭৫, কোড ৪০৬, পৃষ্ঠা ৪৯, সারণী ৪ ; 'Annual Financial Abstracts, L.C.A. Progs. (নতুন সিরিজ) I-XI।

৭-৮ : L.C. Progs. (পুরান সিরিজ), VI-VII এবং L.C.A. Progs. (নতুন সিরিজ), I XI, Financial Abstracts, Fin. Progs. আগস্ট ১৮৭৫, ১৯-২৭ নং ; P.P.H.C. ১৮৭৫, কোড ৪০৬, M.M.P.R. ১৮৭৩-৭৪, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০ ; 'Statistical Abstracts of British India' (London, 1873)।

৯-১১ : P.P.H.C. ১৮৭৬, ভল্যুম ৭৭, পৃষ্ঠা ২৬৫, সারণী ২২ ; P.P.H.C. ১৮৭৪, ভল্যুম ৭০, পৃষ্ঠা ১১, সারণী ৬, P.P.H.C. ১৮৭০, ভল্যুম ৬৮, পৃষ্ঠা ২২৫।

১২-১৪ P.P.H.C. ১৮৬৮-৬৯, ভল্যুম ৬৩, পৃষ্ঠা ৩৮, সারণী ৪১ ; 'পূর্বোক্ত', ১৮৭০, ভল্যুম ৬৮, পৃষ্ঠা ৪৪, সারণী ৪৯ ; 'পূর্বোক্ত', ১৮৭৩, ভল্যুম ৬৯, পৃষ্ঠা ২০০, সারণী ৫৫ ; P.P.H.C. থেকে পাওয়া এলাকা ও জনসংখ্যা সম্পর্কে উপাত্ত, ১৮৭৩, ভল্যুম ৫০, কোড, ১৭২, পৃষ্ঠা ১৪৭, M.M.P.R. ১৮৭১-৭২।

১৫ : P.P.H.C. ১৮৭৬, ভল্যুম ৭৭, পৃষ্ঠা ৩৪২-৪৩, সারণী ৮২।

১৬-১৭ : P.P.H.C. ১৮৬৮-৬৯, ভল্যুম ৬৩, পৃষ্ঠা ৩৪, সারণী ৩২-৩৩, 'পূর্বোক্ত' ১৮৭০, ভল্যুম ৬৮, পৃষ্ঠা ২৫৬, সারণী ৪০-৪১ ; 'পূর্বোক্ত', ১৮৭১, ভল্যুম ৬৯, পৃষ্ঠা ১৫৮, সারণী ২৮, 'পূর্বোক্ত' ১৮৭৩, ভল্যুম ৬৯, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬, সারণী ৪৫, পৃষ্ঠা ২৭৭-৮ ; 'পূর্বোক্ত', ১৮৭৪, ভল্যুম ৭০, পৃষ্ঠা ৭০, সারণী ৫৭ ; 'পূর্বোক্ত', ১৮৭৬, ভল্যুম ৭৭, পৃষ্ঠা ৩৪০, সারণী ৮১ ; পূর্বোল্লিখিত স্থানে পৃষ্ঠা ৩৪২-৩, সারণী ৮২।

১৮-২০ : P.P.H.C. ১৮৬০, ভল্যুম ৪৯, কোড ৩৩৯, পৃষ্ঠা ৯৯, 'পূর্বোক্ত', ১৮৮৫, কোড ৩৫২, পৃষ্ঠা ২১২-৬ ও পরবর্তী ; Financial Abstract (annual), L.C.A. Progs. (নতুন সিরিজ), I-XI, Statistical Abstracts।

২১ : P.P.H.C. ১৮৭৩, ভল্যুম ৬৯, পৃষ্ঠা ২৮৩, সারণী ৫৬ ; 'পূর্বোক্ত', ১৮৭১, ভল্যুম ৬৯, পৃষ্ঠা ১৬৩, সারণী ৩২ ; 'পূর্বোক্ত, ১৮৭০, ভল্যুম ৬৮, পৃষ্ঠা ২৬১, সারণী ৪৫ ; 'পূর্বোক্ত', ১৮৬৮-৬৯, ভল্যুম ৬৩, পৃষ্ঠা ৩৯, সারণী ৩৭।

সারণী ১.১

সরকারি আয় : ভারত সরকারের মোট রাজস্বের শতাংশের হিসাবে অঙ্গীভূত প্রধান দফাগুলি, কয়েক বছর পরে পরে, ১৮৫৮/৫৯ থেকে ১৮৭১/৭২

	১৮৫৮-৫৯	১৮৬০-৬১	১৮৬৫-৬৬	১৮৬৯-৭০	১৮৭০-৭১
	%	%	%	%	%
ভূমিরাজস্ব	৫০.৩	৪৩.১	৪১.৮	৪১.৪	৪০.১
আফিম	১৭	১৬.৬	১৭.৪	১৫.৬	১৫.৭
লবণ	৭.২	৮.৯	১০.৯	১১.৬	১১.৯
বহিঃশুল্ক	৮	৯.৭	৫.৭	৪.৮	৫.১
অন্তঃশুল্ক	৪.১	৪.১	৫.৩	৫.৪	৫ ৫
আয়/লাইসেন্স কর	০.৩	২.৬	১.৪	২.২	৪
স্ট্যাম্প	১.৬	২.৮	৪.১	৪.৭	৪.৯
পোস্ট-অফিস	১.৬	১.৪	০.৮	১.৪	১.৬
পূর্তকর্ম থেকে আয়	১.৮	২	১.৯	১.৯	১.৮
দেশীয় রাজ্যের দেয় (Tribute)	১.৬	১.৮	১.৫	১.৫	১.৪
অপরাপর খাত	৬.৫	৮	১০.২	৯.৫	৮

টীকা : ২ নং সারণীর নীচের ভিত্তিতে তৈরী। রাজস্বের একটি খাত থেকে অপর খাতে কোনও অঙ্গীভূত দফার স্থানান্তর হয় নি।

সারণী ১.২

সরকারি ব্যয় ঃ ভারত সরকারের মোট ব্যয়ের শতাংশের হিসাবে অঙ্গীভূত প্রধান দফাগুলি, কয়েক বছর পরে পরে।

	১৮৬৩-৬৪	১৮৬৫-৬৬	১৮৬৯-৭০	১৯৭১-৭২
	%	%	%	%
সৈন্যবাহিনী	৩২.৬	৩৬.১	৩০.৬	৩২.৩
রাজস্ব সংগ্রহের ব্যয়	২১.১	১৮.৫	১৭.৩	১৭.৫
আইন ও বিচার	৪.৮	৫.৩	৫.৪	৪.৭
সাধারণ প্রশাসন	২.২	২.৭	২.৭	৩.৭
বার্ধক্য ভাতা	২.১	২	২.৫	২.৯
দীর্ঘ ছুটির সময়ের ভাতা	০.২	০.২	০.৩	০.৪
পূর্তকর্ম (সাধারণ)	১২	১০.৯	১০	৫.১
রাজনৈতিক এজেন্সি	০.৫	০.৫	০.৮	০.৭
ঋণ বাবদ ব্যয়	১১.২	১১.১	১১.৫	১২.৩
অপরাপর খাত	১৩.১	১২.৫	১৮.৯	২০.২

টীকা ঃ ১১ নং সারণীর (নীচের দিকে) ভিত্তিতে তৈরি। ১৮৬৯-৭০ সাল থেকে পূর্তকর্ম 'সাধারণ' থেকে পূর্তকর্ম 'অসাধারণ'-এর পৃথিকীকরণ (১১৯-৩১ পৃষ্ঠা ও সারণী ১১, কলাম ১২-৪ দেখুন) ছাড়া ব্যয়ের একটি খাত থেকে অপর কোন খাতে অঙ্গীভূত কোন দফার স্থানান্তর করা হয় নি।

সারণী ১.৩

ভারত সরকারের ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে মোট রাজস্ব ও ব্যয়
১৮৫৮-৫৯ থেকে ১৮৭১-৭২

	মোট রাজস্ব	মোট ব্যয়	ফিন্যান্স সদস্য	বাজেট বিবৃতির তারিখ
১৮৫৯	৩৬.০৬	৫১.০৬	...	...
১৮৬০	৩৯.৭১	৫১.৮৬	...	...
১৮৬১	৪২.৯	৪৮.১৫	James Wilson	১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬০
১৮৬২	৪৩.৮৩	৪৪.৮৭	Samuel Laing	২৭শে এপ্রিল ১৮৬১
১৮৬৩	৪৫.১৪	৪৪.০৫	Samuel Laing	১৬ই এপ্রিল ১৮৬২
১৮৬৪	৪৪.৬১	৪৪.৫৩	C. E. Travelyan	৩০শে এপ্রিল ১৮৬৩
১৮৬৫	৪৫.৬৫	৪৫.৮৫	C. E. Travelyan	৭ই এপ্রিল ১৮৬৪
১৮৬৬	৪৮.৯৪	৪৬.১৭	C. E. Travelyan	১লা এপ্রিল ১৮৬৫
১৮৬৭	৪২.১২	৪৪.৬৬	W. M. Massey	২৪শে মার্চ ১৮৬৬
১৮৬৮	৪৮.৫৩	৫০.১৪	W. N. Massey	৫ই মার্চ ১৮৬৭
১৮৬৯	৪৯.২৬	৫৩.৪১	W. N. Massey	১৪ই মার্চ ১৮৬৮
১৮৭০	৫০.৯	৫৩.৩৮	Richard Temple	৬ই মার্চ ১৮৬৯
১৮৭১	৫১.৪১	৫১.১	Richard Temple	২রা এপ্রিল ১৮৭০
১৮৭২	৫০.১১	৪৮.৬১	Richard Temple	৯ই মার্চ ১৮৭১

টীকা : ভারত সরকারের ব্যয় সম্পর্কে প্রকাশিত বিবৃতিতে ভুল আছে। এর কারণ হল, (এ) পরিসংখ্যান সংক্রান্ত সংক্ষিপ্তসারের (Statistical abstracts) বিভিন্ন সংস্করণের ফর্মায় ব্যতিক্রম আছে, (বি) পার্লামেণ্টে উত্থাপনের জন্য ইণ্ডিয়া অফিসে পরিসংখ্যানের সংকলনকারকরা বছরে বছরে ভিন্ন ভিন্ন নীতি প্রয়োগ করেছিলেন, এবং (সি) উদ্বৃত্ত না থাকা সত্ত্বেও উদ্বৃত্ত দেখাবার ব্যাপারে কয়েক জন সদস্যের অদ্ভুত ভেলকি প্রদর্শন। Wilson ও Laing-এর তৈরি প্রকাশিত নিয়মিত ও প্রকৃত আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পরবর্তীকালে সংশোধিত হয়েছিল ; ভূখণ্ডগত পরিবর্তন (উদাহরণস্বরূপ, ১৮৬৬-৬৭ সালের পর স্ট্রেট সেটেলমেণ্ট ও হায়দরাবাদের হস্তান্তরিত জেলাগুলির অ্যাকাউণ্টস পৃথক-করণ), ব্যয়ের একটি খাত থেকে আর একটি খাতে অঙ্গীভূত দফার স্থানান্তর, অথবা 'অসাধারণ' পূর্তকর্মের জন্য ব্যয়কে রাজস্ব মূলধনী হিসাবে (capital account) স্থানান্তর (১৮৬৮ সাল থেকে)

ইত্যাদি ক্ষেত্রে এরূপ সংশোধন একই চরিত্রের হয় নি। ১৮৬৬-৬৭ সালে হিসাব রাখার নীতিগুলির দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছিল, কাজেই সমরূপতা আনার জন্য যে পরিবর্তন করতে হয়েছিল তার আগের বছরগুলির হিসাবই তার দ্বারা বিশেষতঃ প্রভাবিত হয়েছিল।

সারণী ২

ভারত সরকারের ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে (১৮৫৭-৫৮ থেকে ১৮৭২ ৭৩ পর্যন্ত) মোট রাজস্ব ও আয়ঃ অঙ্গীভূত প্রধান দফাগুলি।

কোটি টাকায় (টাঃ ০,০০০,০০০)

	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	ভূমিরাজস্ব	দেশীয় রাজ্যের দেয়	শুল্ক ও বন	আয় ও লাইসেন্স কর	বহিঃশুল্ক	লবণ
১৮৫৮	১৫.৩২	০.৫৮	১.২২	০.১১	২.১৫	২.১৩
১৮৫৯	১৮.১২	০.৫৬	১.৪৭	০.১১	২.৮৭	২.৬০
১৮৬০	১৮.৭৬	০.৭৯	১.০৭	০.২২	৩.৮৭	২.৯৩
১৮৬১	১৮.৫১	০.৭৮	১.৭৮	১.০১	৪.১৬	৩.৮১
১৮৬২	১৯.৬৮	০.৭৮	২.২৫	২.০৫	২.৮৮	৪.৫৬
১৮৬৩	১৯.৩৭	০.৭১	২.৪৭	১.৮৮	২.৪৬	৫.২৪
১৮৬৪	২০.৩০	০.৭২	২.৩৬	১.৪৮	২.৩৮	৫.০৩
১৮৬৫	২০.০৯	০.৬৮	২.৫৮	১.২৮	২.২৯	৫.৫২
১৮৬৬	২০.৪৭	০.৭১	২.৬১	০.৬৯	২.২৮	৫.৩৪
১৮৬৭	১১.১৪	০.৬৩	২.৭৩	০.০২	২.০৩	৫.৩৫
১৮৬৮	১৯.৯৯	০.৬৯	২.৫৭	০.৬৫	২.৫৮	৫.৭৩
১৮৬৯	১৯.৯৩	০.৬৯	২.৬৯	০.৫১	২.৬০	৫.৫৯
১৮৭০	২১.০৯	০.৭৬	২.৭২	১.১১	২.৪৩	৫.৮৯
১৮৭১	২০.৬২	০.৭২	২.৮৩	২.০৭	২.৬১	৬.১১
১৮৭২	২০.৫২	০.৭৪	২.৮৭	০.৮২	২.৭৮	৫.৯৭
১৮৭৩	২১.৩৫	০.৭৪	২.৮৯	০.৫৮	২.৬৫	৬.১৭

সারণী ২ (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

	(৮) আফিম	(৯) ষ্ট্যাম্প	(১০) টাঁকশাল	(১১) পোস্ট অফিস	(১২) টেলিগ্রাফ	(১৩) আইন (কোর্ট ফি জরিমানা ইত্যাদি)
১৮৫৮	৬.৮৬	০.৪৬	০.৩৬	০.৩৯	···	০.৩
১৮৫৯	৬.১৫	০.৫৯	০.২৫	০.৫৯	···	০.৪
১৮৬০	৫.৮৯	০.৭৪	০.৩৯	০.৬৬	···	০.৪৪
১৮৬১	৬.৬৮	১.১৮	০.২৯	০.৬১	০.০৫	০.৫২
১৮৬২	৬.৩৬	১.১৭	০.৩৮	০.৪	০.০৭	০.৫১
১৮৬৩	৮.০৬	১.৪৯	০.১৭	০.৪৩	০.০৮	০.৪৯
১৮৬৪	৬.৮৩	১.৭৪	০.১৭	০.৪৬	০.০৯	০.৬৩
১৮৬৫	৭.৩৬	১.৯৭	০.১৮	০.১৬	০.১	০.৬৮
১৮৬৬	৮.৫২	১.৯৯	০.৪৯	০.৪১	০.১৯	০.৭৯
১৮৬৭	৬.৮	১.৮	০.২৪	০.৫	০.২২	০.৮২
১৮৬৮	৮.৯২	২.১৯	০.১২	০.৬৬	০.২৪	০.৯৫
১৮৬৯	৮.৪৫	২.৩১	০.১৯	০.৭১	০.২৭	১.১৭
১৮৭০	৭.৯৫	২.৩৮	০.১৬	০.৭১	২.২৫	১.০৯
১৮৭১	৮.০৪	২.৫১	০.০৩	০.৮১	০.২৪	১.০২
১৮৭২	৯.২৫	২.৪৮	০.০৯	০.৮২	০.২৩	০.৪
১৮৭৩	৮.৬৮	২.৬১	০.০৫	০.৫৮	০.২৫	০.৪

সারণী ২ (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

	(১৪) পূর্তকর্ম থেকে আয়	(১৫) সৈন্যবাহিনী	(১৬) নৌচলাচল	(১৭) ঋণ ও আগামের উপর সুদ	(১৮) মোট আয়
১৮৫৮	0.৪৮	...	0.১৮	...	...
১৮৫৯	0.৬৫	...	0.১৭	...	৩৬.0৬
১৮৬0	0.৭২	...	0.২১	...	৩৯.৭১
১৮৬১	0.৮৫	...	0.২৮	...	৪২.৯
১৮৬২	0.৫৯	...	0.১৬	...	৪৩.৮৩
১৮৬৩	0.৪৪	...	0.১৯	...	৪৫.১৪
১৮৬৪	0.৪৬	0.৭৫	0.৩১	0.0৭	৪৪.৬১
১৮৬৫	0.৫৯	0.৭৪	0.৩১	0.২৫	৪৫.৬৫
১৮৬৬	0.৯২	0.৭৩	0.২	0.২২	৪৮.৯৪
১৮৬৭	0.৫৪	0.৭৪	0.২৩	0.২৩	৪২.১২
১৮৬৮	0.৫৬	0.৭৬	0.৪৬	0.২১	৪৮.৫৩
১৮৬৯	0.৫৫	১.১৩	0.৬৯	0.২২	৪৯.২৬
১৮৭0	0.৯৬	১.0৮	0.৩৩	0.৩৪	৫0.৯
১৮৭১	0.৯২	0.৯৬	0.৩৩	0.৩৪	৫১.৪১
১৮৭২	0.৮৩	0.৯৪	0.২	0.৩৬	৫0.১১
১৮৭৩	0.৭৯	0.৯১	0.২১	0.৫১	৫0.২২

টীকা ঃ (এ) কলাম ৩ ঃ চুক্তির ব্যবস্থাবলে দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে কর ও চাঁদা, (বি) কলাম ৫ ঃ এইসব কর সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য ২৩১-৩২ পৃষ্ঠার সারণীতে দেখুন, (সি) কলাম ১৪ ঃ রেলপথ ও সেচ কার্যের থেকে আয় নিয়ে গঠিত। (ডি) ১৫ ও ১৬ কলাম ঃ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মালপত্র বিক্রয়, যাত্রা বিরতি, ডিসচার্জ, পারচেজ জাহাজের পাইলট-দের দরুন, (ই) কলাম ১৭ ঃ রেল কোম্পানিগুলি কর্তৃক সরকারের নিকট থেকে আগাম হিসাবে প্রাপ্ত অর্থের উপর সুদ দাবি করে আইন পাশ হবার আগে পর্যন্ত এই খাতে আয় ছিল খুবই নগণ্য। (এফ) কলাম ১৮ ঃ মোট

আয়ের মধ্যে বহুবিধ অপরাপর আয় ধরা হয়েছে (কলেজ ফিঃ, সাহায্য তহবিলে চাঁদা ও বিবিধ খাত); রাজস্ব ও আয়ের প্রধান প্রধান খাতগুলি উপরে দফাওয়ারিভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

সারণী ৩

আফিম রাজস্ব ঃ

গড় দর, শুল্কের হার ও বাণিজ্যের পরিমাণ ১৮৫৭-৭২

	(২) বাংলার আফিমের গড় দর (টাকায়)	(৩) পেটির সংখ্যা (বাংলা) হাজারে	(৪) মালওয়া আফিমের শুল্ক হার (টাকায়)	(৫) পেটির সংখ্যা (মালওয়া) হাজারে	(৬) মোট আফিম রাজস্ব (কোটি টাকায়)
১৮৫৭	৮৯০	৪২.৩	৪০০	২৯.২	৫
১৮৫৮	১২৯০	৪০.১	৪০০	৩৯.৭	৬.৮৬
১৮৫৯	১৪৯০	৩০.৯	৪০০	৩৬.৪	৬.১৫
১৮৬০	১৬৭০	২৫.৩	৫০০	৩২.৯	৫.৮৯
১৮৬১	১৯২০	২১.৪	৬০০	৪৬.১	৬.৬৮
১৮৬২	১৬১০	২৪.১	৭০০	৩৭	৬.৩৬
১৮৬৩	১৪৩০	৩২.৮	৬০০	৫১.২	৮.০৬
১৮৬৪	১২২০	৪২.৬	৬০০	২৫.৭	৬.৮৩
১৮৬৫	৯৪০	৫৪.৫	৬০০	৩২.৬	৭.৩৬
১৮৬৬	১১২০	৫৬	৬০০	৩৬.১	৮.৫২
১৮৬৭	১২৫০	৩৮.৭	৬০০	৩০.৬	৬.৮
১৮৬৮	১৩৩০	৪৮	৬০০	৩৯.১	৮.৯২
১৮৬৯	১৩৮০	৪৭.২	৬০০	৩১	৮.৪৫
১৮৭০	১২০০	৪৫.৭	৬০০	৩৯.৪	৭.৯৫
১৮৭১	১১২০	৪৯	৬০০	৩৯.৫	৮.০৪
১৮৭২	১৩৯০	৪৯.৭	৬০০	৩৮.৮	৯.২৫
১৮৭৩	১৩৯০	৪২.৭	৬০০	৪৪	৮.৬৮

টীকা : কলাম ২ কলকাতায় বাংলার আফিমের পেটি প্রতি বাৎসরিক গড় দর সূচিত করছে এবং কলাম ৪-এ আছে ইন্দোরে আফিমের প্রত্যেকটি পেটি প্রতি শুল্ক হার (অর্থাৎ বোম্বাইতে পাঠানোর জন্য মালওয়া আফিমের উপর শুল্ক)। ১৮৫৯-৬০ সালের জন্য শুল্কের নতুন হার কার্যকরী হয় ১লা জুলাই ১৮৫৯, ১৮৬০-৬১-এর জন্য ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৬০, ১৮৬১-৬২-এর জন্য ১লা অক্টোবর ১৮৬১ এবং ১৮৬২-৬৩-এর জন্য ১লা অক্টোবর ১৮৬২।

সারণী ৪

প্রধান প্রধান প্রদেশ/প্রেসিডেন্সিগুলিতে মোট ভূমি রাজস্ব ১৮৫৬-৫৭ ও ১৮৭০-৭১

কোটি টাকায় (টা: ০,০০০,০০০)

	১৮৫৬-৫৭	১৮৭০-৭১	বৃদ্ধির শতকরা হার
বাংলা	৩.৫৪	৩.৭৬	৬
বোম্বাই	২.১৫	২.৯৫	৩৭
মাদ্রাজ	৩.৮	৪.৪	১৬
পাঞ্জাব	১ ৮৪	১.৯৭	৭
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ	৩.৯২	৪.১৩	৫
অযোধ্যা	০.৯৭	১.৩২	৩৬
মধ্য প্রদেশগুলিতে	০.৫৭	০.৬	৫

টীকা : আসাম, নিম্ন বার্মা ও ছোট ছোট প্রদেশগুলির অঙ্ক এই সারণীতে বাদ দেওয়া হয়েছে। ১৮৮৮ সালে ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত এই হিসাব খুবই স্থূল, কিন্তু এই হিসাব কাজে লাগে, সম্ভবতঃ পূর্তকর্মে বরাদ্দের ব্যাপারে সরকারি নীতি অভিজ্ঞতা ও কয়েকটি অঞ্চল থেকে অধিকতর প্রতিদানের আশা দ্বারা প্রভাবিত হত।

সারণী ৫

লবণ থেকে প্রাপ্ত মোট রাজস্ব : আমদানি শুল্ক, আভ্যন্তরীণ শুল্ক এবং বিক্রয় মূল্য, ১৮৫৬-৫৭ থেকে ১৮৭১-৭২।

১ টাকা = ১৬ আনা = ২ শিলিং

৭ নং কলাম কোটি টাকায়, (টাঃ 0,000,000)

	(২) বাংলা মণপ্রতি বহিঃশুল্ক টাঃ-আনা	(৩) মাদ্রাজ মণপ্রতি বিক্রয়মূল্য টাঃ-আনা	(৪) বোম্বাই মণপ্রতি শুল্ক টাঃ-আনা	(৫) পাঞ্জাব মণপ্রতি বিক্রয়মূল্য টাঃ-আনা	(৬) মণপ্রতি আভ্যন্তরীণ শুল্ক টাঃ-আনা	(৭) ভারতে মোট রাজস্ব কোটি টাকা
১৮৫৮	২-৮	১-০	০-১২	২-০	২-০	২.১৩
১৮৫৯	,,	,,	,,	,,	,,	২.৬০
১৯৬০	৩-০	১-২	১-০	২-২	২-৮	২.৯৩
১৮৬১	৩-৪	১-৬	১ ৪	,,	৩-০	৩.৮১
১৮৬২	,,	১-৮	,,	৩-০	,,	৪.৫৬
১৮৬৩	,,	,,	,,	,,	,,	৫.২৪
১৮৬৪	,,	,,	,,	,,	,,	৫.০৩
১৮৬৫	,,	১-১১	১-৮	,,	,,	৫.৫২
১৮৬৬	,,	,,	,,	,,	,,	৫.৩৪
১৮৬৭	,,	,,	,,	,,	,,	৫.৩৫
১৮৬৮	,,	,,	,,	,,	,,	৫.৭৩
১৮৬৯	,,	,,	,,	,,	,,	৫.৫৯
১৮৭০	,,	২-০	১-১৩	,,	,,	৫.৮৯
১৮৭১	,,	,,	,,	৩-১	,,	৬.১১
১৮৭২	,,	,,	,,	,,	.	৫.৯৭

টীকা : (এ) কলাম ২ : ১৮৫৯ সালের ডিসেম্বরে ও ১৯৬১ সালের

মার্চে শুল্কের নতুন হার বলবৎ হয়েছিল, (বি) এই কলামে যে নতুন (কলাম ৩) বিক্রয় মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে তা বলবৎ হয়েছিল ১৮৫৯ সালের আগস্ট, ১৮৬১ সালের এপ্রিলে, ১৮৬১ সালের জুনে, ১৮৬৫ সালের জানুয়ারিতে ও ১৮৬৯ সালের অক্টোবরে, (সি) শুল্কের সংশোধিত হার (কলাম ৪) প্রবর্তিত হয় ১৮৫৯ সালের আগস্টে, ১৮৬১ সালের এপ্রিলে, ১৮৬৫ সালের জানুয়ারিতে এবং ১৮৬৯ সালের অক্টোবরে। (ডি) কলাম ৫ঃ পাঞ্জাব লবণের বিক্রয় মূল্য উপরে উল্লিখিত আর্থিক বছরগুলিতে সংশোধিত হয়েছিল, ১৮৬০ সালেয় এপ্রিলে, ১৮৬১ সালের সেপ্টেম্বরে ও ১৮৭০ সালের জুলাইতে। (ই) কলাম ৬ঃ এই কলামে উল্লিখিত স্তরে আভ্যন্তরীণ বহিঃশুল্ক ১৮৫৯-এর ডিসেম্বরে ও ১৮৬১ সালের মার্চে সংশোধিত হয়েছিল।

সারণী ৬

বৈদেশিক বাণিজ্য ও বহিঃশুল্কঃ ১৮৫৭-৫৮ থেকে ১৮৭১-৭২

(কোটি টাকায়)

	(২) আমদানিকৃত পণ্যের সরকারি মূল্য	(৩) আমদানিশুল্ক থেকে মোট প্রাপ্তি	(৪) রপ্তানিকৃত পণ্যের সরকারি মূল্য	(৫) রপ্তানিশুল্ক থেকে মোট প্রাপ্তি
১৮৫৮	১৫.২৮	০.৭৪	২৭.৪৬	০.২৯
১৮৫৯	২১.৭৩	১.২১	২৯.৮৬	০.৩
১৮৫৫-৫৯	১৫.৫৮	...	২৪.৯২	...
১৮৬০	২৪.২৬	২.২৮	২৭.৯৬	০.৩৬
১৮৬১	২৩.৪৯	২.৪৮	৩২.৯৭	০.৫৪
১৮৬২	২২.৩২	১.৯৩	৩৬.৩২	০.৫৬
১৮৬৩	২২.৬৩	১.৫৪	৪৭.৮৬	০.৬১

সারণী ৬ (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর)

	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৮৬৪	২৭.১৫	১.৪৭	৬৫.৬৩	০.৬
১৮৬০-৬৪	২৩.৯৭	···	৪২.১৫	···
১৮৬৫	২৮.১৫	১.৪১	৬৮.০৩	০.৫৯
১৮৬৬	২৯.৬	১.৪৮	৬৫.৪৯	০.৪৯
১৮৬৭	২৯.০৪	১.৫১	৪১.৮৬	০.৩৪
১৮৬৮	৩৫.৭১	১.৮৩	৫০.৮৭	০.৫২
১৮৬৯	৩৫.৯৯	১.৯	৫৩.০৬	০.৬
১৮৬৫-৬৯	৩১.৭	···	৫৫.৮৬	···
১৮৭০	৩২.৯৩	১.৭৫	৫২.৫৭	০.৫৮
১৮৭১	৫৩.৪১	১.০৬	৫৫.৩৩	০.৬৪
১৮৭২	৩১.০৮	১.৬৫	৬৩.১৯	০ ৬৯
১৮৭০-৭৪	৩২.২৬	···	৫৬.২৪	···

টীকা : (এ) ১৮৫৪/৫৫-১৮৫৮/৫৯, ১৮৫৯/৬০-১৮৬৩/৬৪, ১৮৬৪/৬৫-১৮৬৮/৬৯ এবং ১৮৬৯/৭০-১৮৭৩/৭৪ এই পঞ্চবার্ষিকী কাল পর্যায়গুলিতে সাধারণ ঝোঁক দেখাবার জন্য বার্ষিক গড় উপরে দেখানো হয়েছে। ৩ ও ৪ কলামের বিশাল আভ্যন্তরীণ বহিঃশুল্ক প্রাপ্তি অন্তর্ভুক্ত নয়।

সারণী ৭.১

কয়েকটি প্রধান রপ্তানির সরকারি মূল্য : ১৮৬০-৬১ থেকে ১৮৭০-৭১

	১৮৬০-৬১		১৮৭০-৭১	
	মূল্য কোটি টাকায়	মোট রপ্তানি পণ্যের মূল্যের সঙ্গে অনুপাত	মূল্য কোটি টাকায়	মোট রপ্তানি পণ্যের মূল্যের সঙ্গে অনুপাত
তুলা	৭.৩৪	২২.৩	১৯.৪৬	৩৬.২
পাট	০·৪১	১·২	২.৫৮	৪.৭
রেশম	১·০৪	৩.১	১·২৬	২·৩
পশম	০·৫৮	১·৫	০.৬৬	১·২
চাল	২·৯৬	৯	৪.১৫	৭·৫
অপরাপর শস্য	০·৩৯	১·২	০.৩২	০.৬
বীজ	১.৭৯	৫.৪	৩.৫২	৬.৪
চামড়া	০·৬৬	২	২.০২	৩.৭
তৈল	০·২৫	০·৮	০·১৮	০·৩
নীল	১·৮৯	৫·৭	৩.১৯	৫.৭
চিনি	০·৯৯	৩	০.২৪	০,৪
কফি	০·৩৪	১	০.৮	১·৪
চা	০·১৫	০·৫	১·১২	২
শোরা	০·৬৬	২	০·৪৪	০·৮
পাট থেকে প্রস্তুত দ্রব্য	০·৩৬	১·১	০·৩৪	০·৬

সারণী ৭.২

কয়েকটি প্রধান প্রধান আমদানির সরকারি মূল্য ১৮৬০-৬১ থেকে ১৮৭০-৭১

	১৮৬০-৬১		১৮৭০-৭১	
	মূল্য কোটি টাকায়	মোট আমদানি পণ্যের মূল্যের সঙ্গে অনুপাত	মূল্য কোটি টাকায়	মোট আমদানি পণ্যের মূল্যের সঙ্গে অনুপাত
তুলোর তৈরি জামা কাপড়	৯.৩১	৩৯.৬	১৫.৬৪	৪৬.৮
তুলোর পাকান সুতো, সুতো···	১.৭৫	৭.৪	৩.৪	১০.২
রেশম জাত দ্রব্য	০.২৬	১.১	০.৪৩	১.৩
পশম জাত দ্রব্য	০.২২	১	০.৫৮	১.৭
যন্ত্রপাতি	০.৮৭	৩.৭	০.৪৫	১.৩
রেলপথের জিনিসপত্র	১.৯	৮.১	১.৪৭	৪.৪
ধাতু (তৈরি ও আকর)	২.১২	৯	১.৮৬	৫.৬
মল্ট দ্বারা প্রস্তুত মদ	২.৮৯	১২.৩	১.৩৭	৪.১
স্পিরিট	০.৪১	১.৭	০.৪৬	১.৪
মদ	০.৩৫	১.৫	০.৪৯	১.৫
চিনি	০.২২	১	০.৩৬	১.৭

সারণী ৮.১

তুলোর পাকান সুতো ও সুতোর আমদানি
১৮৫৭-৫৮ থেকে ১৮৭১-৭২

	পরিমাণ	সরকারি মূল্য	শুল্কের হার	রাজস্ব
	পাঃ '000,000	কোটি টাকায়		লক্ষ টাকায়
১৮৫৮	১৭.৭	০.৯৪	৩১/২% ব্রিটিশ, ৭% বিদেশী	৩.৭
১৮৫৯	৩১.১	১.৭১	,, ,,	৬.৬
১৮৬০	৩১.৫	২.০৫	৫%	১১.৮
১৮৬১	২০.৯	১.৭৫	১০%	১৭.৫
১৮৬২	২৩.৯	১.৪৭	৫%	৭.৫
১৮৬৩	১৯.৫	১.২৭	পাকান সুতো ৩১/২%, সুতা ১০%	৪.৬
১৮৬৪	১৯.৬	১.৫৩	,, ,,	৪.৫
১৮৬৫	১৭.৯	২.১৯	,, ,, ৭১/২%	৭.২
১৮৬৬	১৬.৯	১.৯৬	,, ,,	৬.৮
১৮৬৭	৩০.৯	২.৫৭	,, ,,	৯.১
১৮৬৮	২৬.৭	২.৭	,, ,,	৯.৬
১৮৬৯	২৯	২.৭৮	,, ,,	১০
১৮৭০	৩২	২.৭২	,, ,,	৯.৫
১৮৭১	৪০.৪	৩.৪	,, ,,	১০.২
১৮৭২	২৮.৯	২.৪৭	,, ,,	১৮.৬

টীকা : কলাম ৫-এর মধ্যে তুলোর তৈরি 'অপরাপর দ্রব্যের' উপরে প্রদত্ত শুল্ক অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ এমন সব জিনিসপত্র যা বহিঃশুল্ক-এর শ্রেণীভুক্ত নয়, 'তৈরি জামা কাপড়, পাকান সুতো, সুতো'।

সারণী ৮.২

আমদানিকৃত সুতোর তৈরি জামা কাপড় ঃ সরকারি মূল্য ও বহিঃশুল্ক ১৮৫৭-৫৮ থেকে ১৮৭১-৭২

	সরকারি মূল্য কোটি টাকায়	বহিঃশুল্কের হার	রাজস্ব লক্ষ টাকায়
১৮৫৮	৪.৭৮	ব্রিটিশ ৫%, বিদেশী ১০%	২৪.২
১৮৫৯	৮.০৯	,, ,,	৪৬.৭
১৮৬০	৯.৬৫	১০ শতাংশ	৯৬.৯
১৮৬১	৯.৩১	,,	৯২.৮
১৮৬২	৮.৭৭	,,	৮৫.৯
১৮৬৩	৮.৩৬	৫ শতাংশ	৪২.৭
১৮৬৪	১০.৪২	,,	৪১.২
১৮৬৫	১১.০৪	,,	৫০.৪
১৮৬৬	১১,৮৫	,,	৫৭.৮
১৮৬৭	১২.৫২	,,	৬৩.৬
১৮৬৮	১৫	,,	৭৫.২
১৮৬৯	১৬.০৭	,,	৮০.১
১৮৭০	১৩.৬৫	,,	৬৭.৭
১৮৭১	১৫.৬৪	,,	৭৯.৬
১৮৭২	১৫.০১	..	৭৫.৪

টীকা ঃ (এ) কলাম ৪ ঃ বহিঃশুল্ক নির্ণয়ের পরিমাণ হ্রাসের জন্য ১৮৬৯-৭০ সালে এই উৎস থেকে বহিঃশুল্ক থেকে রাজস্ব হঠাৎ কমে গিয়েছিল।

(বি) কলাম ২ ঃ সরকারি মূল্য পরিমাণের অসম্পূর্ণতা সূচক ; যেহেতু জিনিসপত্র বিভিন্ন নামে ঢোকান হত, তাই আমদানিকৃত জামাকাপড়ের মোট পরিমাণ পাওয়া যায় না।

সারণী ৯

প্রধান প্রধান প্রদেশ/প্রেসিডেন্সিতে ভারত সরকারের মোট রাজস্ব ও আয় (১৮৫৮-৫৯ থেকে ১৮৭১-৭২)

কোটি টাকায় (টাকা : 0,000,000)

	(২) বাংলা	(৩) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ	(৪) পাঞ্জাব	(৫) মাদ্রাজ	(৬) বোম্বাই	(৭) মোট রাজস্ব
১৮৫৯	১২.৪৭	৫.৪৭	২.৯	৬.২৬	৬.২	৩৬.০৬
১৮৬০	১২.৮	৫.৭১	৩.০৬	৬.৫৫	৭.২৮	৩৯.৭১
১৮৬১	১৪.০৯	৫.৯২	৩.৪৮	৬.৬৭	৮.৪১	৪২.৯
১৮৬২	১৩.৭৬	৬.৬৫	৩.১	৭.০১	৮.৫১	৪৩.৮৩
১৮৬৩	১৪.৬৩	৫.৭৩	৩.০৪	৬.৯৩	৯.৫৬	৪৫.১৪
১৮৬৪	১৫.০১	৫.৪৬	৩.১৯	৭.০৩	৮.২২	৪৪.৬১
১৮৬৫	১৪.৮৯	৫.৫	৩.১৮	৭.০১	৯.৩৯	৪৫.৬৫
১৮৬৬	১৫.৪৮	৫.৬৯	৩.২২	৭.০৬	৯.৫৩	৪৮.৯৪
১৮৬৭	১৩.৬১	৫.৩৬	৩.২৫	৬.২৫	৭.৮৬	৪২.১২
১৮৬৮	১৬.৭৭	৫.৮৮	৩.৪৬	৭.৫১	৯.২৮	৪৮.৫৩
১৮৬৯	১৬.৫৩	৫.৮২	৩.৪৩	৭.৫১	৯.৪৪	৪৯.২৬
১৮৭০	১৫.৭৭	৬.০৬	৩.৭৯	৮.০৮	৯.৯	৫০.৯
১৮৭১	১৬.৩২	৬.২	৩.৮৫	৮.২১	১০.০৯	৫১.৪১
১৮৭২	১৬.৭৪	৫.৭৭	৩.৬৩	৮.০৯	৯.১	৫০.১১

টীকা : (এ) কলাম ৭ : সারা ভারতের জন্য মোট রাজস্ব ১৮৬৫-৬৬ পর্যন্ত হিসাবে দেখানো হত এবং ইংল্যাণ্ডে প্রাপ্ত রাজস্ব থেকে ইংল্যাণ্ডে খরচ বাদ দেওয়া হত। এই উৎস ও অপরাপর ছোটখাট খাত থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব (অযোধ্যা, ব্রিটিশ বার্মা, মধ্যপ্রদেশসমূহ, স্ট্রেট সেটলমেণ্টস্ ও ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ শাসিত কয়েকটি ভূখণ্ড) নিরবচ্ছিন্ন ও তুলনামূলকভাবে এই হিসাবে দেখানো হয়নি।

সারণী ১০

প্রধান প্রধান প্রদেশ/প্রেসিডেন্সিতে মোট ব্যয় (১৮৫৮-৫৯ থেকে ১৮৭১-৭২)
কোটি টাকায় (টাঃ ০,০০০,০০০)

	(২) বাংলা	(৩) উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সমূহ	(৪) পাঞ্জাব	(৫) মাদ্রাজ	(৬) বোম্বাই	(৭) ভারতে মোট খরচ
১৮৫৯	৪.৩১	২.৬৯	২.০৩	৭.৫১	৮.১৬	৪৩.৫৯
১৮৬০	৪.২	৩.১৬	২.১২	৮.০৫	৯.৫১	৪৪.৬২
১৮৬১	৪.৫৩	৩.৪১	২.১৫	৭.২৫	৭.৭১	৪০.৫১
১৮৬২	৪.৮৪	২.৪৭	১.৬৮	৭.০৬	৬.৩১	৩৭.২৫
১৮৬৩	৪.৯৪	২.০৬	১.৬২	৬.৫৮	৬.৬৭	৩৬.৮
১৮৬৪	৫.৮৭	২.০৯	১.৫৫	৬.২৮	৭.২৬	৩৮.০৯
১৮৬৫	৬.০৩	২.২৪	১.৮	৬.৪৬	৭.৬৯	৩৯.৪৫
১৮৬৬	৫.৩২	২.১৩	১.৬৫	৬.৭১	৭.৯২	৪১.১২
১৮৬৭	৪.৯৯	২.৩৫	১.৮৯	৬.১৮	৭.৫২	৩৭.০৯
১৮৬৮	৬.২১	২.৫৭	২.১১	৬.৭৩	৮.৫২	৪১.৬৫
১৮৬৯	৬.৩৪	২.৯৫	২.৩৭	৬.৬	৮.৪৪	৪৩.২৩
১৮৭০	৬.৮৯	২.৯৫	২.২২	৬.৬	৮.২৯	৪২.৭৯
১৮৭১	৬.৩১	২.৬৮	২.১৩	৬.১৫	৮.১৫	৪১.০২
১৮৭২	৫.৬৬	২.৪৫	২.০৬	৫.৮৩	৭.২৩	৩৮.৭৬

টীকা : কলাম ৭-এ ভারতে মোট ব্যয় দেখান হয়েছে এবং ইংল্যাণ্ডে যে ব্যয় হয়েছে তা এর মধ্যে ধরা হয়নি। প্রকাশিত হিসাব কতকটা অদ্ভুত, কেননা হিসাবে (১৮৬৫-৬৬ পর্যন্ত) সারা ভারতের মোট ব্যয় দেখান হত, আর ইংল্যাণ্ডে প্রাপ্ত অর্থ সেদেশে খরচের থেকে বাদ দেওয়া হত ; নীচের সারণীতে ইংল্যাণ্ডে অর্থ ব্যয়ের হিসাব দেখুন। অযোধ্যা, ব্রিটিশ বার্মা, মধ্যপ্রদেশ সমূহ, স্ট্রেটস্ সেটলমেণ্টস ও ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ শাসিত কয়েকটি ভূখণ্ডের ব্যয় এই সময়কালে নিরবচ্ছিন্ন ও তুলনামূলক ভাবে এই হিসাবে দেখান হয়নি।

সারণী ১১

ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে ভারত সরকারের মোট ব্যয় : প্রধান প্রধান ব্যয়ের খাত (১৮৬৩-৬৪ থেকে ১৮৭২-৭৩)

কোটি টাকায় (টাঃ ০,০০০,০০০)

	(২) সৈন্যবাহিনী	(৩) রাজস্বসংগ্রহ খরচ, ফেরত ইত্যাদি	(৪) সাধারণ প্রশাসন	(৫) আইন ও বিচার	(৬) বার্ধক্য হেতু অবসর ভাতা	(৭) অসামরিক কর্মচারীদের ছুটি ভাতা	(৮) রাজনৈতিক এজেন্সি	(৯) প্রাদেশিক সরকারি কাজ	(১০) সামুদ্রিক জাহাজ
১৮৬৪	১৪.৫১	৯.০৮	০.৯৮	২.১২	০.৯	০.০৭	০.২৩	২.৮২	০.৬৩
১৮৬৫	১৫.৭৭	৯.০৫	০.৯৭	২.২৬	১.২৭	০.০৭	০.২৯	২.৯৬	০.৬৪
১৮৬৬	১৬.৭৫	৮.৫৩	১.২৫	২.৪২	০.৯১	০.০৮	০.২৫	৩.২৫	০.৬৩
১৮৬৭	১৫.৮৩	৭.৬৪	১.২৭	২.০৯	০.৭৭	০.০৮	০.২৭	৩.২৪	০.৭৭
১৮৬৮	১৬.১	৮.৯৬	১.০২	২.৫৪	১.১৬	০.১	০.২৮	৩.৪৮	১.০৯
১৮৬৯	১৬.২৭	৯.২৫	১.৪	২.৮৫	১.৭৫	০.১২	০.৩৫	৩.৭১	১.১৪
১৮৭০	১৬.৩৩	৯.২৩	১.৪৩	২.৯	১.৩৩	০.১৬	০.৪১	৩ ৬৮	১.২৯
১৮৭১	১৬.০৭	৯.২৭	১.৫৭	২.৯৯	১.৪৫	০.১৮	০.৩৫	৩.৫	০.৭৬
১৮৭২	১৫.৬৮	৮.৫২	১.৭৮	২.২৭	১.৪৫	০.১৭	০.৩২	৪.৮৫	০.৫৭
১৮৭৩	১৫.৫	৮.৮৯	১.৮৯	২.২২	১.৫৮	০.১৬	০.৩৯	৫.২২	০.৫৬

টীকা : (এ) কলাম ৩ : রাজস্ব সংগ্রহের ব্যয়কে রাজস্ব ফেরত ও দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকদের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট কাজের ব্যয়ের সঙ্গে একত্রিত করা হয়েছে। (বি) কলাম ৬-এর মধ্যে সহানুভূতি ভাতা অন্তর্ভুক্ত। (সি) কলাম ৯ : ১৮৭১-৭২ সালে Mayo-র বিকেন্দ্রীকরণ পরিকল্পনা রূপায়িত হবার পর প্রাদেশিক সরকারি কাজের (পুলিশ, শিক্ষা, স্টেশনারি ও ছাপা, এবং ছোট খাট মেডিকাল ও পূর্তকর্মের ছোটখাট ব্যয়) বছরে বছরে অর্থ বরাদ্দ হত। আগের বছরগুলির হিসাব নতুন করে সাজানো হয়েছিল। শিক্ষায় ব্যয়ের জন্য সারণী ২০ দেখুন।

সারণী ১১ (শেষ)

	(১১) মেডিকাল	(১২) পূর্তকর্ম	(১৩) পূর্তকর্ম (অসাধারণ) সেচ	(১৪) পূর্তকর্ম (অসাধারণ) রাষ্ট্রীয় রেলপথ	(১৫) ব্যক্তিগত গ্যারাণ্টিকৃত রেলপথ	(১৬) ঋণ বাবদ ব্যয়	(১৭) বিনিময়ের ফলে ক্ষতি	(১৮) মোট ব্যয়
১৮৬৪	০.১৩	৪.৯২	...	...	২.১২	৪.৯৭	০.০১	৪৪.৩০
১৮৬৫	০.১৩	৪.৬১	...	...	২.১১	৪.৯৯	০.০৪	৪৫.৮৫
১৮৬৬	০.২৭	৪.৭৮	...	...	০.৩৪	৫.১৩	০.০৮	৪৬.১৭
১৮৬৭	০.২৬	৫.০৩	...	...	১.১	৪.৮৯	০.১৬	৪৪.৬৪
১৮৬৮	০.৩৫	৫.৬২	০.২২	...	১.৮	৫.৭৩	০.১২	৫০.১৪
১৮৬৯	০.৩৮	৬.২৭	০.৪৭	০.৫৫	২.০১	৫.৬৫	০.১৯	৫৩.৪১
১৮৭০	০.৪৪	৫.০৩	২.০১	০.১১	১.৮৬	৫.৬১	০.২	৫৩.৩৮
১৮৭১	০.৫২	৩.৯৫	০.৭২	০.৪৫	২.১	৫.৮৪	০.৪৭	৫১.১
১৮৭২	০.১৭	২.৪৬	০.৯৮	০.৬৪	১.৮৫	৫.৯৭	০.৪	৪৮.৬১
১৮৭৩	০.১৮	২.৫৩	০.৭৭	১.৪১	২.২৯	৫.৮৬	০.৭৬	৫০.৬৪

আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের পূর্বেকার কালপর্বের 'পুলিশ' খাতে খরচের একটি স্থূল হিসাব তৈরি করা সম্ভব (কোটি টাকায়) :

১৮৬৪	২.৫	১৮৬৬	২.৮	১৮৬৮	২.৯	১৮৭০	৩.০
১৮৬৫	২.৬	১৮৬৭	২.৮	১৮৬৯	৩.১	১৮৭১	২.৮

(ডি) কলাম ১৩ : 'অসাধারণ' কথাটি তৃতীয় পরিচ্ছেদের ১২৯-৩১ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (ই) কলাম ১৮ : মোট ব্যয়ের মধ্যে বহুবিধ অপরাপর ব্যয়ও আছে (উদাহরণস্বরূপ, রাজকীয় দপ্তর, বিভাগীয় হিসাবের মধ্যে যে সব সামগ্রীর খরচ ধরা হয়নি এবং 'বিবিধ' নামক খাতে প্রায়ই বহু ছিদ্র গোপন করা হয়ে থাকে) ; এই সারণী প্রধান প্রধান খরচের খাতগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করেছে। (এফ) কলাম ১৭ : বিনিময় হেতু ক্ষতি সম্পর্কে বাকচাতুরি আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, পৃষ্ঠা ২৮৯। (জি) কলাম ১৬-র মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টকের মালিকদের প্রদত্ত ডিভিডেণ্ড অন্তর্ভুক্ত।

সারণী ১২.১

পূর্তকর্ম বিভাগে কয়েকটি প্রধান খাতে ব্যয় : পূর্তকর্ম 'সাধারণ'
১৮৫৭/৫৮-১৮৭১/৭২
কোটি টাকায় (টাঃ ০,০০০,০০০)

	মোট ব্যয়	সামরিক গৃহ ও রাস্তা	অসামরিক গৃহ	রাস্তা, সেচ উন্নয়ন মূলক কাজ	দফতর খরচ যন্ত্রপাতি ও কারখানা
১৮৫৮	১.৫২	০.৮৩	পাওয়া যায়নি	০.৬৫	পাওয়া যায়নি
১৮৫৯	০.৪১	০.৩৩	,,	০.০৮	,,
১৮৬০	৩.২২	১.২৪	০.২৪	১.০৮	০.৬৭
১৮৬১	৩.৩৭	০.৯	০.৩৯	১.৪২	০.৬৬
১৮৬২	৩.৪	০.৫৪	০.২৯	১.৮৫	০.৭২
১৮৬৩	৩.৯৩	০.৬১	০.৪২	১.৬২	০.৭৪
১৮৬৪	৪.৯২	০.৭১	০.৬২	২.৩১	০.৮২
১৮৬৫	৪.৬১	০.৮৬	০.৭২	২.১৩	পাওয়া যায়নি
১৮৬৬	৪.৭৮	১.০৮	০.৭৪	১.৮৬	০.৯৯
১৮৬৭	৫.০৩	১.৫৪	০.৭৫	১.৮৬	০.৮১
১৮৬৮	৫.৬২	১.৭৪	০.৮৫	১.৭৬	১.০৭
১৮৬৯	৬.২৭	২.১৩	০.৮৪	১.৮৮	১.২৭
১৮৭০	৫.০৩	১.৪৫	০.৬৮	১.৫৫	১.১২
১৮৭১	৩.৯৫	০.৯৯	০.৫১	১.৩২	১.০৮
১৮৭২	২.৪৬	০.৯৮	০.২১	০.৬১	০.৬১

টীকা : এই বিবরণে গ্যারাণ্টিপ্রাপ্ত রেলপথ ও রাষ্ট্রীয় রেলপথকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এবং অবশ্য সেই সঙ্গে 'অসাধারণ' পূর্তকর্ম অর্থাৎ ঋণ সংগ্রহ করে যে পূর্তকর্ম করা হয় (১১নং সারণীর ১২-১৫ কলাম দেখুন) তা এর মধ্যে বাদ আছে। কলাম ৩ থেকে ৬-এ ১৮৫৭/৫৮-১৮৬১/৬২ এই

বছরগুলির যে অঙ্ক দেওয়া হয়েছে তা হল অনুমোদিত ব্যয়ের পরিমাণ, এই অঙ্ক প্রকৃত ব্যয়ের প্রায় কাছাকাছি। কিন্তু অনুমোদিত ব্যয় ও প্রকৃত ব্যয় যে একই তা ধরে নেওয়া যায় না। অর্থ বিষয়ক বিকেন্দ্রীকরণের দরুন ১৮৭২ সালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঙ্কগুলিতে "প্রাদেশিক সরকারি চাকুরি"র জন্য বরাদ্দ অর্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি (কলাম ৪-এ ৫৪ লক্ষ টাকা, কলাম ৫-এ ৬৪.৬ লক্ষ টাকা এবং কলাম ৬-এ ৩৩ লক্ষ টাকা)।

সারণী ১২.২

প্রধান প্রধান প্রদেশ/প্রেসিডেন্সিগুলিতে পূর্তকর্মের (সাধারণ) ব্যয় : সমগ্র ভারতের মোট ব্যয়ের শতাংশের হিসাবে।

	১৮৬৪-৬৬	১৮৬৭-৬৯	১৮৭০-৭২	১৮৭১-৭২
	%	%	%	পূর্তকর্মে (সাধারণ) জনসংখ্যার মাথাপিছু ব্যয় (টাকায়)
বাংলা	১৭	১৫.৭	১৬.৮	০.১০৩
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ	১২.৯	১৩.৩	১৩.৫	০.১৯
পাঞ্জাব	১১.৯	১৪.২	১৩.৩	০.৩৪
মাদ্রাজ	১৩.৯	১৩.৮	১২.২	০.১০৬
বোম্বাই	২৪	২০.৪	৮.৪	০.৫৩

টীকা : একথা উল্লেখ করা দরকার যে উপরের সারণীতে 'সাধারণ' পূর্তকর্মের ব্যয় ধরা হয়েছে এবং 'অসাধারণ' পূর্তকর্ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি ; বিশেষ করে কলাম ৫-এর বেলায় এ বিষয়টির উপর জোর দিতে হবে। এটা নিশ্চিত যে যদি 'অসাধারণ' পূর্তকর্ম, গ্যারান্টিপ্রাপ্ত রেলপথ এবং রাষ্ট্রীয় রেলপথের ব্যয়কে 'সাধারণ' পূর্তকর্মের ব্যয়ের সঙ্গে একত্রে হিসাবের মধ্যে ধরলে একটি আরও অনুকূল চিত্র বেরুবে ; কিন্তু মোটামুটি হিসাব থেকে দেখা যায় যে বণ্টনের প্যাটার্ন (অর্থাৎ মোট ব্যয়ের সঙ্গে প্রত্যেকটি প্রদেশের ব্যয়ের অনুপাত) মোটামুটি একই দাঁড়াবে। এ ধরণের একটি হিসাব উপাত্তিক হতে পারে মাত্র (এবং সেইজন্য সারণীবদ্ধ হিসাবে উপস্থিত করা হয় নি) কারণ বহু পূর্তকর্মকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানোর সময় মাঝে মাঝে 'সাধারণ' থেকে 'অসাধারণে' পরিবর্তিত করা হয়েছে অথবা উল্টোটা করা হয়েছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে নীট খরচ পাওয়া যায় কিন্তু মোট খরচ পাওয়া যায় না, এবং 'সাধারণ' পূর্তকর্ম বাদে অপরাপর কয়েক ধরণের পূর্তকর্মের

জন্য প্রদেশওয়ারি শ্রেণী-বিভাগ পাওয়া যায় না। ১৮৭১-৭২ সালের M.M.P.R.-এ (P.P.H.C., ১৮৭৩, ভল্যুম ৫০, কোড ১৭২, পৃষ্ঠা ১৪৭) প্রদত্ত আয়তন ও জনসংখ্যার অঙ্কগুলির ভ্রম-শূন্যতা স্পষ্টতই সন্দেহাতীত নয়। যে সব উপাত্ত পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে লম্বা সময়ের জন্য পূর্তকর্মে লগ্নির কোন তুলনামূলক বিচারের প্রচেষ্টা হয়নি (১৮৯৮ থেকে ১৯১৪ এই কালপর্বের জন্য M.K. Thavaraj-এর একটি চমৎকার গবেষণা আছে, গ্রন্থপঞ্জী দেখুন)।

সারণী ১৩

পূর্তকর্ম বিভাগে কয়েকটি প্রধান খাতে ব্যয় : রেলপথ ও 'অসাধারণ' পূর্তকর্ম
লক্ষ টাকায় (টাঃ ০০,০০০)

	রেলপথ (সাধারণ)				পূর্তকর্ম (অসাধারণ)			
	মোট রেলপথ (সাধারণ)	তদারকি ও জমি	গ্যারাণ্টিপ্রাপ্ত সুদ	বিনিময়জনিত ক্ষতি	মোট	রাষ্ট্রীয় রেলপথ	সেচ	বোম্বাই বিশেষ তহবিল
১৮৬৬	৩৪.৩	২২.৫	৬.৭	৫.১	...	...	...	...
১৮৬৭	১১০.২	২৫.৯	৭৩.১	১১.২	...	...	...	...
১৮৬৮	১৭৯.৯	১৫.৬	১৫৪	১০.২	৬০.২	০.০১	২১.৯	৩৮.৩
১৮৬৯	২০১.২	২৬.১	১৭০	২.১	১৩৭.১	৫৫.২	৪৬.৯	৩৪.৯
১৮৭০	১৮৫.৭	৯.১	১৫৪.৭	২০.৫	২৫৯.৯	১৯.১	২০০.৭	৪০.১
১৮৭১	২১০.৩	৮.৩	১৮৩.৪	১৭.১	১১৬.৮	৪৪.৯	৭১.৮	...
১৮৭২	১৮৫.১	৬.৬	১৭২.৩	৫.৩	১৬২.৮	৬৪.৪	৯৮.৩	...

টীকা : রেলপথ ও অসাধারণ পূর্তকর্মের হিসাবকে সাধারণ পূর্তকর্ম থেকে আলাদা করার পর এবং এই হিসাবকে এই অনুযায়ী নতুনভাবে ঢেলে সাজাবার পর থেকে এই বিবরণের শুরু। তৃতীয় কলামে রেলপথের জন্য জমি ও তদারকির ব্যয় বর্ণিত হয়েছে : চতুর্থ কলমে আছে রেলপথে পরিবহন বাবদ আয়ের উপরে গ্যারাণ্টিপ্রাপ্ত সুদের জন্য প্রদত্ত অতিরিক্ত অর্থ। ৭নং কলামে বর্ণিত হয়েছে বেঙ্গল নর্দান, নলহাটি, পাঞ্জাব নর্দান, ইণ্ডাস ভ্যালি, রাজপুতনা, হোল্কার, ওয়ার্ধা ভ্যালি, ছুবলি এ্যাণ্ড কারওয়ার এবং কলকাতা এ্যাণ্ড সাউথ-ইস্টান রেলওয়েজ প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় রেলপথ।

সারণী ১৪

পূর্তকর্মে ব্যয় : অঞ্চলওয়ারি বণ্টন ১৮৫৭/৫৮-১৮৭১/৭২ : প্রধান প্রধান প্রদেশ/প্রেসিডেন্সিগুলিতে 'সাধারণ' পূর্তকর্মের জন্য ব্যয় লক্ষ টাকায় (টাঃ ০০,০০০)

	(২) মোট ব্যয়	(৩) বাংলা	(৪) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহ	(৫) পাঞ্জাব	(৬) মাদ্রাজ	(৭) বোম্বাই
১৮৫৮	১৫১.৯	২৩.৫	১১.৪	৪.১	১.৫	১২.৩
১৮৫৯	৪১.১	৭.৪	১৪.৭	০.৮	০.৪	০.৩
১৮৬০	৩২২.২	৩৯.২	৬২.৪	৩৯.৯	৬৫.৪	৪৭.৬
১৮৬১	৩৩৭.১	৫১.৪	৬১	৫১	৬২	৫০.৫
১৮৬২	৩৩৯.৭	৫১	৬৩	৫৪	৬৬	৫২.৫
১৮৬৩	৩৫৬.৫	৫১.৮	৬০.১	৫১	৬৯.৫	৫৭.৯
১৮৬৪	৪৯২.১	৯৬	৬৫.৮	৫২.৫	৬৬.২	১২১.৯
১৮৬৫	৪৬১.৩	৭৬.৪	৬০.৫	৫৭.৭	৭০.৫	১০৪.৭
১৮৬৬	৪৭৮.৪	৭২.১	৫৯.২	৫৭.৩	৬৩.৬	১১৮.২
১৮৬৭	৫০২.৫	৬৯.৪	৬৯	৭১.৩	৬২.৫	১৩২.২
১৮৬৮	৫৬২.২	৮৬.৩	৬২.৭	৭৮.৯	৮২.২	১০৫.২
১৮৬৯	৬২৭.২	১০০.৮	৮৬	৮১.৭	৭৯.৯	৯৪.৬
১৮৭০	৫০৩.৪	৮৬.৬	৬৫.৯	৬০.৯	৬৫.৮	৮৪.৬
১৮৭১	৩৯৪,৬	৬১.৬	৪৯.৭	৪৯.২	৫৮.১	৭৭.৮
১৮৭২	২৪৫.৯	৩৯.৭	৫৫.৪	৩৪.৪	২৪.৩	৪৬.৪

টীকা : যে সব অঞ্চল তালিকাভুক্ত করা হয়নি সেগুলি হল অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশসমূহ, ব্রিটিশ বর্মা, ইস্টার্ন সেটেলমেন্টস্ (১৮৬৬-৬৭ সাল পর্যন্ত) এবং ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ শাসিত অঞ্চলসমূহ ; এই সব অঞ্চলের ব্যয় দ্বিতীয় কলামে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৮৭১-৭২ সালের অঙ্কে 'প্রাদেশিক সরকারি চাকুরি' বাবদ ব্যয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি (মোট ১,৪১৭,৫৭১ টাকা : বাংলার জন্য ২৮৯,৫২৮ টাকা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের জন্য ২২৫,৬০০ টাকা ; পাঞ্জাবের জন্য ২৬০,৭৫৭ টাকা ; মাদ্রাজের জন্য ৮৮,৮৫৮ টাকা ; এবং বোম্বাই-এর জন্য ২৮০,৪০১ টাকা)। ১৮৬৩ সালের আগের বছরগুলির অনুমোদিত ও উপান্তিক ব্যয়ের প্রদত্ত বিবরণ প্রকৃত ব্যয়ের খুবই কাছাকাছি, কিন্তু প্রকৃত ব্যয়ের সঙ্গে একেবারে একই নয়। ১৮৬৪ সাল থেকে হিসাব নতুনভাবে ঢেলে সাজান হয় এবং প্রদত্ত অঙ্কগুলি প্রকৃত ব্যয়। ১৮৫৭-৫৮ সালের অঙ্কগুলি ১৮৫৭ সালের ১লা মে থেকে ১৮৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রকৃত ব্যয় বোঝাচ্ছে এবং ১৮৫৮/৫৯ সালের অঙ্কগুলি বোঝাচ্ছে কেবল ১৮৫৯ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত ব্যয়।

সারণী ১৫

সামরিক ব্যয়ের বিস্তারিত ভাগ, কয়েক বছর পরে পরে ঃ ১৮৬৫-৬৬, ১৮৬৯-৭০, ১৮৭১-৭২। (মোট সামরিক ব্যয়ের সঙ্গে প্রতিটি খাতে ব্যয়ের অনুপাত বন্ধনীর মধ্যে)।

লক্ষ টাকায় (টাঃ ০০,০০০)

	১৮৬৫-৬৬		১৮৬৯-৭০		১৮৭১-৭২	
	টাকা লক্ষ	মোটের %	টাকা লক্ষ	মোটের %	টাকা লক্ষ	মোটের %
১. সৈন্যবাহিনী ও সৈন্যাবাসের কর্মচারী	৪৯	(২.৯)	৫২	(৩.২)	৪৬	(৩)
২. প্রশাসন কর্মচারী	২০	(১.২)	২০	(১.২)	২০	(১.৩)
৩. রেজিমেন্টের মাহিনা	৬৮৪	(৪০.৯)	৬৬৬	(৪০.৮)	৬৫০	(৪১.৫)
৪. দপ্তর খরচ	..	...	...	...	...	...
(এ) রসদ সরবরাহ	৩১৩	(১৮.৭)	২৪৩	(১৪.৯)	১৯৩	(১২.৩)
(বি) অশ্ববিভাগ	১৯	(১.১)	২৫	(১.৬)	১৮	(১.১)
(সি) জামাকাপড়	১৫	(০.৯)	১১	(০.৭)	১২	(০.৮)
(ডি) ব্যারাক	৩৩	(২)	৩৫	(২.২)	৩৪	(২.১)
(ই) সামরিক আইন	৪	(০.৩)	৪	(০.৩)	৫	(০.৩)
(এফ) মেডিকেল বিভাগ	৪৪	(২.৬)	৪৬	(২.৮)	৪২	(২.৭)
৫. সামরিক মালপত্রের সাজসরঞ্জাম	৪৫	(২.৭)	৫৪	(৩.৩)	৬০	(৩.৮)
৬. সমুদ্র পরিবহন	৩৪	(২)	১৫	(০.৯)	১১	(০.৭)
৭. বিবিধ কাজ	৫৭	(৩.৪)	৪৭	(২.৮)	৪৯	(৩.২)
৮. পেনসন (অ-ফলপ্রসূ)	১১৭	(৭)	৬৪	(৩.৯)	৬৩	(৪)
৯. ভারতে মোট	১৪৩৬	(৮৫.৭)	১২৮২	(৭৮.৬)	১২০৩	(৭৬.৮)
১০. ইংল্যাণ্ডে ব্যয়	...	...	...	...	...	...
(এ) মালপত্র	পাওয়া যায়নি	(পাওয়া যায়নি)	৮৮	(৫.৪)	৯৪	(৬)
(বি) ফলপ্রসূ ব্যয়	১২৮	(৭.৬)	১৪২	(৮.৭)	১৩২	(৮.৪)
(সি) অ-ফলপ্রসূ ব্যয়	১১১	(৬.৬)	১১৯	(৭.৩)	১৩৮	(৮.৮)
১১. ইংল্যাণ্ডে মোট	২৩৯	(১৪.২)	৩৫০	(২১.৪)	৩৬৪	(২৩.২)

সারণী ১৬.১

ব্রিটিশ ভারতে নিযুক্ত সৈন্যদের মোট সংখ্যা

	রাজকীয় বাহিনী ইউরোপীয়	ভারতীয় বাহিনী		মোট		সর্বমোট
		ইউরোপীয়	দেশীয়	ইউরোপীয়	দেশীয়	
১৮৫৯	৮৬,১৮৬	২০,১০৪	১৯৬,২৪৩	১০৬,২৯০	১৯৬,২৪৩	৩০২,৫৩৩
১৮৬০	৭২,১৫৮	২০,৭০৮	২১১,০০২	৯২,৮৬৬	২১৩,০০২	৩০৫,৮৬৮
১৮৬১	৬২,১২০	২২,১৭৪	১৮৪.৬৭২	৮৪,২৯৪	১৮৪,৬৭২	২৬৮,৯৬৬
১৮৬২	৬৭,৫৪৫	১০,৬২৯	১২৫,৯১৩	৭৮,১৭৪	১২৫,৯১৩	২০৪,০৮৭
১৮৬৩	৭১,০৭৪	৫,০০১	১২১,৭৭৫	৭৬,০৮৫	১২১,৭৭৫	১৯৭,৮৬০
১৮৬৪	৭০,৬৭৪	৪,২৮৭	১২১,০৬০	৭৪,৯৬১	১২১,০৬০	১৯৬,০২১
১৮৬৫	৬৫,৯০১	৫,৯৭৯	১১৮,৩১৫	৭১,৮৮০	১১৮,৩১৫	১৯০,১৯৫
১৮৬৬	৬২,৪৫১	৪,৩৬৩	১১৭,০৯৫	৬৬,৮১৪	১১৭,০৯৫	১৮৩,৯০৯
১৮৬৭	৬১,৪৯৮	৩,৯৬৯	১১৭,৬৮১	৬৫,৪৬৭	১১৭,৬৮১	১৮৩,১৪৮
১৮৬৮	৫৮,২৮১	৩,৬০৯	১১৯,১৬৯	৬১,৮৯৭	১১৯,১৬৯	১৮১,০৬৬
১৮৬৯	৬০,৯৬৯	৩,৮৮৯	১২০,০০০	৬৪,৮৫৮	১২০,০০০	১৮৪,৮৫৮
১৮৭০	৫৯,৪৮৭	৩,৫৫২	১১৭,৮৮১	৬২,৯০৯	১১৭,৮৮১	১৮০,৮২০

সারণী ১৬.২

ব্রিটিশ ভারতের প্রতিটি প্রেসিডেন্সিতে নিযুক্ত সৈন্যসংখ্যা—ইউরোপীয় ও দেশীয় সৈন্যসংখ্যা পৃথকভাবে দেখান

	বাংলা			মাদ্রাজ			বোম্বাই		
	ইউরোপীয়	দেশীয়	মোট	ইউরোপীয়	দেশীয়	মোট	ইউরোপীয়	দেশীয়	মোট
১৮৫৯	৬২,১৬৭	৮২,৬৮৭	১৪৪,৮৫৪	১৭,০৯১	৬৭,১৪১	৮৪,২৩২	২৭,০৩২	৪৬,৪১৫	৭৩.৪৪৭
১৮৬০	৫৭,৭৭৮	৯১,৯৯৮	১৪৯,৬৭৬	১৭,৮৫১	৭৮,৪৪০	৯৬,২৯১	১৭,২৩৭	৪২,৬৬৪	৫৯,৯০১
১৮৬১	৫১,৭৯১	৮৬,৬২০	১৩৮,৪১১	১৮,২৫৭	৬৩,৭২৭	৮১,৯৮৪	১৪,২৪৬	৩৪,৩২৫	৪৮,৫৭১
১৮৬২	৪৭,৯১২	৩৯,২১০	৮৭,১২২	১৬,৪২১	৫৫,৬৮৭	৭২,১০৮	১৩,৮৪১	৩১,০১৬	৪৪,৮৫৭
১৮৬৩	৪৬,৬১৪	৪০,৯৪৫	৮৭,৫৫৯	১৫,১১৩	৫০,৯৬৪	৬৬,০৭৭	১৪,৩৫৮	২৮,৮৬৬	৪৩,২২৪
১৮৬৪	৪৫,২৮৩	৪২,৯৩৮	৮৮,২২১	১৫,৫৮৩	৫০,১৩১	৬৫,৭১৪	১৪,০৯৫	২৭,৯৯১	৪২,০৮৬
১৮৬৫	৪২,১২৮	৪৩,৭৯৬	৮৫,৯২৪	১৬,০০২	৪৬,৬৯৩	৬২,৬৯৫	১৩,৭৫০	২৭,৮২৬	৪১,৫৭৬
১৮৬৬	৩৮,৯৯২	৪৩,৩৯৪	৮২,৩৮৬	১৪,১৮৪	৪৬,৪৩৫	৬০,৬১৯	২০,৬৩৮	২৭,২৬৬	৪০,৯০৪
১৮৬৭	৩৮,০২৯	৪৪,৪২৮	৮৩,৪৫৭	১৩,৫১১	৪৬,০৪৬	৫৯,৫৫৭	১২,৯২৭	২৭,২০৭	৪০,১৩৪
১৮৬৮	৩৫,১২৫	৪৫,৭৫৮	৮০,৮৮৩	১২,১৪৫	৪৫,৯৬১	৫৮,১০৬	১৪,৬২৭	২৭,৪৫০	৪২,০৭৭
১৮৬৯	৩৯,২৪৯	৪৬,১১২	৮৫,৩৬১	১২,৯৩৯	৪৫,৬৮১	৫৮,৬২০	১২,৬৭০	২৮,২০৭	৪০,৮৭৭
১৮৭০	৩৮,১০৬	৪৪,৬৪২	৮২,৭৪৮	১৩,৬৫০	৪৫,৭৪৪	৫৯,৩৯৪	১১,১৮৩	২৭,৪৯৫	৩৮,৬৭৮
১৮৭২	৪০,৬৯৮	৬৩,১৭০	১০৩,৮৬৮	১৩,৪৭১	৩২,৪৩৪	৪৫,৯০৫	১২,৫০৬	২৬,৭৬৪	৩৯,২৭০

টীকা : ১৮৭০-৭১ সালের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।

সারণী ১৭

প্রতিটি প্রেসিডেন্সিতে মোট সামরিক ব্যয় এবং ইংল্যাণ্ডে প্রদত্ত অর্থ
কোটি টাকায় (টাঃ ০,০০০,০০০)

	ভারত সরকার	মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি	বোম্বাই প্রেসিডেন্সি	ইংল্যাণ্ডে প্রদত্ত অর্থ	মোট ব্যয়
১৮৬৪	৭.১৬	৩.০৬	২.৪৭	১.৮১	১৪.৫১
১৮৬৫	৭.৪৯	৩.২৬	২.৭৫	২.২৮	১৫.৭৭
১৮৬৬	৮.১৫	৩.৩৪	২.৮৭	২.৩৯	১৬.৭৮
১৮৬৭	৬.৭২	৩.০৮	২.৬৪	৩.৩৮	১৫.৮২
১৮৬৮	৬.৭৫	৩.০৭	২.৭৮	৩.৫	১৬.১
১৮৬৯	৭.০১	৩.০২	২.৯৬	৩.২৮	১৬.২৭
১৮৭০	৬.৯৭	২.৯৯	২.৮৬	৩.৫	১৬.৩৩
১৮৭১	৬.৫১	২.৯১	৩.১২	৩.৫২	১৬.০৭
১৮৭২	৬.৫৪	২.৮৫	২.৬৪	৩.৬৪	১৫.৬৮

টীকা : (এ) কলাম ২ : বাংলা প্রেসিডেন্সির ব্যয় এই কলামে অন্তর্ভুক্ত। (বি) কলাম ৫ : সংশ্লিষ্ট বছরগুলিতে প্রদত্ত অর্থ বাদ দেবার পর ইংল্যাণ্ডে প্রাপ্ত অর্থ (১৮৬৩-৬৪ সালে ২৪.৯ লাখ টাকা, ১৮৬৪-৬৫ সালে ১.১ লাখ টাকা এবং ১৮৬৫-৬৬ সালে ৪.২ লাখ টাকা) এই হিসাবের মধ্যে দেখান হয়েছে।

সারণী ১৮

১৮৫৮-৫৯ থেকে ১৮৭২-৭৩ পর্যন্ত প্রতিটি আর্থিক বছরের শেষে ব্রিটিশ ভারতের অপরিশোধিত সরকারি ঋণের পরিমাণ ঃ

১০ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং-এ ১ পাঃ=১০ টাকা

বছর শেষ হল ঃ	১৮৫৯	১৮৬০	১৮৬১	১৮৬২	১৮৬৩	১৮৬৪	১৮৬৫	১৮৬৬
ইংল্যাণ্ডে ঋণ ঃ	১৫.০৯	২৬.১৪	২৯.৯৮	৩৫.১	৩১.৮৪	২৬.৩১	২৬.১২	২৬.৯৫
মোট ঃ	৮১.১৭	৯৮.১১	১০১.৮৮	১০৭.৫১	১০৪.৫	৯৮.৫২	৯৮.৪৮	৯৮.৩৮

বছর শেষ হল ঃ	১৮৬৭	১৮৬৮	১৮৬৯	১৮৭০	১৮৭১	১৮৭২	১৮৭৩
ইংল্যাণ্ডে ঋণ ঃ	২৯.৫৪	৩০.৭	৩১.৭	৩৫.২	৩৭.৬৩	৩৯.০১	৩৯.০১
মোট ঃ	১০২.০৬	১০১.৯৯	১০২.৮৭	১০৮.১৯	১১৯.০	১২১.৭৭	১২১.৫

টীকা ঃ ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড-এর ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টক এই বিবরণে অন্তর্ভুক্ত নয় ; ঐ স্টক বাবদ ব্যয়, 'ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টকের মালিকদের ডিভিডেণ্ট', ১১ নং সারণীর ১৬ নং কলামে ঋণ বাবদ ব্যয় সম্পর্কিত বিবরণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সারণী ১৯

১৮৬০-৬১ থেকে ১৮৭১-৭২ পর্যন্ত গ্যারান্টিপ্রাপ্ত কোম্পানিগুলিকে প্রদত্ত বার্ষিক সুদ ঃ

১০ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং-এ ১ পাঃ=১০ টাকা

বছর শেষ হল ঃ	১৮৬১	১৮৬২	১৮৬৩	১৮৬৪	১৮৬৫	১৮৬৬
পরিমাণ ঃ	১.৪৮	১.৭৮	২.১৭	২.৫৬	২.৬৯	২.৯

বছর শেষ হল ঃ	১৮৬৭	১৮৬৮	১৮৬৯	১৮৭০	১৮৭১	১৮৭২
পরিমাণ ঃ	৩.০৪	৩.৪৯	৩.৯১	৪.১৩	৪.৩৫	৪.৫

সারণী ২০

ইংল্যাণ্ডে ভারত সরকারের নীট খরচ : অন্তর্ভুক্ত প্রধান প্রধান দফা এবং যে সব প্রণালীতে খরচা যোগান হত

১০ লক্ষ পাউণ্ড ষ্টার্লিংএ নীট খরচ : ১ পাঃ = ১০ টাকা

	(২) মোট	(৩) ঋণ বাবদ ব্যয়	(৪) ভারতের জন্য মালপত্র	(৫) ব্রিটিশ সৈন্য ব্যবহারের দরুন খরচ	(৬) ব্রিটিশ সৈন্যদের যাতায়াত খরচ
১৮৫৭	৪.৪৩	০.৮৯	১.০৩	০.২৯	০.০৫
১৮৬১	৮.১২	১.৮৫	১.২৯	১.৫৬	০.৩৭
১৮৬২	১১.১৭	২.১৩	১.১২	১.০৩	০.১৫
১৮৬৩	৮.৬৩	২.২	০.৭	০.৯২	০.১৪
১৮৬৪	১১.৮৬	২.০৮	০.৪১	০.৫৮	০.১৭
১৮৬৫	৭.৫৭	১.৯৩	০.৭১	১.০৩	০.১৮
১৮৬৬	৯.১১	১.৯৫	১.২৮	০.৮৫	০.৪৬
১৮৬৭	৯.২	১.৯৭	১.১৬	০.৮৯	০.৮৫
১৮৬৮	৮.০৯	২.১৫	১.১৫	০.৯৭	০.৫৮
১৮৬৯	৯.১১	২.১৬	১.৬৩	০.৮৫	০.৪৪
১৮৭০	১২.০১	২.২১	১.৬৭	০.৯৫	০.২৮
১৮৭১	১১.৫৭	২.৩৫	১.৫৮	০.৯	০.৩১
১৮৭২	১২.২	২.৫৪	১.৪১	১.০৭	০.২৭

টীকা : ৫ নং কলামে ভারতে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্যদের কাজের জন্য 'হোম চার্জ' বর্ণিত হয়েছে এবং ৬ নং কলামে আছে ঐ সব সৈন্যদের ভারতে যাতায়াতের খরচ। এইসব ও অপরাপর দফার ব্যাখ্যার জন্য ২৮৫-৮৯ পৃষ্ঠায় দেখুন।

সারণী ২০ (চলছে)

	(৭) ভারতীয় অফিসারদের লম্বা ছুটিকালীন বেতন	(৮) ভারতীয় অফিসারদের পেন্সন	(৯) বিবিধ পেন্সন	(১০) ভারতীয়দের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড	(১১) ইংল্যাণ্ডের প্রশাসন
১৮৫৭	০.২৩	০.৯২	০.৩	০.৩৭	০.১৯
১৮৬১	০.৩	০.৯১	০.৩৮	০.৪৪	০.১৮
১৮৬২	০.৩	০.৯৪	০.৪	০.৪৬	০.১৯
১৮৬৩	০.২৭	১.১৩	০.৬৮	০.৪৫	০.১৭
১৮৬৪	০.২৪	১.১২	০.৫৩	০.৪৭	০.১৭
১৮৬৫	০.২৪	১.০৯	০.৩৭	০.৪৮	০.১৭
১৮৬৬	০.২৮	১.০৯	০.৩৭	০.৫২	০.১৮
১৮৬৭	০.৩	১.০৬	০.৩২	০.৪৩	০.১৯
১৮৬৮	০.৩৪	১.০৮	০.৩৯	০.৫:	০.২
১৮৬৯	০.৩৮	১.০৭	০.২৯	০.৫৬	০.২১
১৮৭০	০.৫৬	১.০৭	০.৪৪	০.৬	০.২১
১৮৭১	০.৬৫	১.০৬	০.৩৮	০.৬২	০.২২
১৮৭২	০.৬১	১.০৫	০.৩৪	০.৬৬	০˙২১

টীকা : কলাম ৭এ অফিসাররা ছুটিতে এবং ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন লম্বা-ছুটির ভাতা বা অনুপস্থিতি ভাতা অন্তর্ভুক্ত। ভারত সরকারের অবসর প্রাপ্ত কর্মচারীদের পেন্সন ও বার্ষিক বৃত্তি এবং পেন্সনের বদলে গ্র্যাচুইটি ও এককালীন (capital) অর্থপ্রদান নিয়ে কলাম ৮ গঠিত। ১১ নং কলামে বিবৃত হয়েছে সেক্রেটারি অব স্টেটের মাহিনা, আণ্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট, ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দের মাহিনা, ইণ্ডিয়া অফিসের দফতর খরচ ইত্যাদি বাবদ ব্যয়। এখানে যে সব খাতে ব্যয় দেখান হয়েছে তার বাইরে আরও দুটি চিত্তাকর্ষক খাত ছিল : ১৮৬২-৬৪ সালে 'ঋণ-মোচনের' পরিমাণ ছিল ১৭ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড ও ৫৫ লক্ষ ৩০ হাজার পাউণ্ড; 'গ্যারাণ্টিপ্রাপ্ত কোম্পানিগুলিকে' প্রদত্ত সুদ ১৯ নং সারণীতে দেখান হয়েছে।

সারণী ২০ (চলছে)

খরচা মেটানর উপায়-উপকরণ ঃ

	(১২) মোট খরচ	(১৩) হুণ্ডি	(১৪) গ্যারাণ্টিপ্রাপ্ত কোম্পানির নীট আয়	(১৫) বৃটিশ সরকার কর্তৃক পরিশোধ	(১৬) ভারতীয় সোনা রূপার বাট প্রেরণ	(১৭) গৃহীত ঋণ
১৮৫৭	৪.২৩	২.৮২	১.০৯	...	...	...
১৮৬১	৮.১২	...	১.৯৫	০.৯২	...	৩.৭১
১৮৬২	১১.১৭	১.১৯	৫.২২	০.৯৫	...	৩.৬৯
১৮৬৩	৮.৬৩	৬.৬৪	১.২৬	০.২৪	...	...
১৮৬৪	১১.৮৬	৮.৯৮	২.২৩	...	...	...
১৮৬৫	৭.৪৭	৬.৭৯	...	...	...	...
১৮৬৬	৯.১১	৬.৯৯	...	...	০.১৬	০.৮৫
১৮৬৭	৯.২	৫.৬১	..	...	০.৮৮	২.৬৪
১৮৬৮	৮.০৯	৪.১৪	১.৩৭	০.০৩	...	১.১৬
১৮৬৯	৯.২১	৩.৭১	০.১৮	৪.২৯	...	১.০৩
১৮৭০	১২.০১	৬.৯৮	...	১.৩৫	...	৩.৫৪
১৮৭১	১২.৫৭	৮.৪৪	...	০.১৩	০.৫৭	২.৪২
১৮৭২	১২.২	১০.৩১	...	...	...	১.৪১

টীকা ঃ ১৩ নং কলামে রয়েছে হুণ্ডি এবং লণ্ডনে গৃহীত অর্থ ভারত থেকে তারযোগে হস্তান্তরিত; চীনে কেনা ভারতের উপর হুণ্ডি এবং ভারতে কেনা লণ্ডনের উপর হুণ্ডি যার গুরুত্ব খুবই কম তা এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ১৫ নং কলামে চীনে ও আবিসিনিয়াতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ব্যবহারের জন্য ব্রিটিশ সরকার যে টাকা পরিশোধ করেছিল (আবিসিনিয়ার ক্ষেত্রে এই খাতে ইংল্যাণ্ডে করা খরচ আবার ফেরৎ দিয়ে যা বাড়তি হয়েছিল তাই দেখান হয়েছে)। ১৬ নং কলামে বর্ণিত হয়েছে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ইংল্যাণ্ডে প্রেরিত সোনারূপোর বাট এবং ১৪ নং কলামে আছে গ্যারাণ্টিপ্রাপ্ত কোম্পানিগুলির কাছ থেকে পাওয়া নীট আয়।

সারণী ২১.১

শিক্ষার ব্যয় ১৮৫৭/৫৮ থেকে ১৮৭১/৭২

	(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	(৩) ছাত্রদের গড় হাজিরা (হাজার)	(৪) মোট সরকারি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	(৫) সব উৎস থেকে মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১৮৫৮	৮০৭০	১৫১	২৩.১৫	পাওয়া যায়নি
১৮৫৯	১২৪৭৯	২৩৯	২৫.৯৪	,,
১৮৬০	১২৫৫০	৩০৬	২৩.৩৪	৩১.৫৪
১৮৬১	১৪৩২২	৩৩৩	২৩.৫৪	৩৬.৩৯
১৮৬২	১৩২১৯	৩৫১	২৪.৮৩	২৮.৪১
১৮৬৩	১[illegible]১৫৯	৩৯৬	২৭.৫৫	৪০.২৬
১৮৬৪	১৭০৫৮	৪৭৪	৩১.৯৯	৪৯.৭৮
১৮৬৫	১৭৮১৩	৪৪৮	৪০.৭	৬৪.৪৬
১৮৬৬	১৯৪৬৩	৫৯৩	৪৪.৫৬	৭৫.৬২
১৮৬৭	২০৬৮৩	৬৫৯	৪৬.১৪	৭৫.৫৫
১৮৬৮	২১৫৪৯	৬৭৫	৫৩.৭৬	৮৯.৬৮
১৮৬৯	২৩৩০০	৭৫৮	৫৯.১৬	১০০.৯৭
১৮৭০	২৪২৭৪	৭৮৯	৬৩.৭৫	১০৭.০৭
১৮৭১	২৫১৪৭	৮০০	৬৪.৯৭	১০৭.৯৪
১৮৭২	৪৩১৯২	৯৭৭	৬৮.৫৮	১০৮.৩৪

টীকা ঃ (ক) ২ নং কলামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা বিবৃত হয়েছে, সরকারের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও সরকারি রক্ষণাবেক্ষণাধীন প্রতিষ্ঠান এবং ৩ নং কলামে আছে ঐসব প্রতিষ্ঠনে ছাত্রদের গড় হাজিরা।

(খ) ৫ নং কলামে প্রদত্ত হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল সরকারি ও বেসরকারি উৎস থেকে পাওয়া তহবিল থেকে শিক্ষার জন্য ব্যয়।

সারণী ২১.২

শিক্ষার ব্যয় ঃ প্রধান প্রধান প্রদেশে / প্রেসিডেন্সিতে সরকারি ব্যয় (কলাম-ক) এবং সরকারি ও বে-সরকারি সকল উৎস থেকে মোট ব্যয় (কলাম খ)

লক্ষ টাকায় (টাঃ ০০,০০০)

	বাংলা		উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সমূহ		পাঞ্জাব		মাদ্রাজ		বোম্বাই	
	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ
১৮৫৮	১০.৪	১০.৫	৩.৩	পাওয়া যায় নি	১.৪	২.৩	৪.১	পাওয়া যায় নি	৩.৯	পাওয়া যায় নি
১৮৫৯	১০.২	১০.৩	৪.৬	,,	১.৭	২.৯	৫.১	,,	৪.৩	,,
১৮৬০	৮	১০.৪	৫	৬.৯	১.৬	৩.৪	৪.৯	,,	৩.৮	৫.৮
১৮৬১	৮.১	১১	৫	৯.৫	১.৫	৪.২	৫.৩	৫.৬	৩.৭	৬.১
১৮৬২	৮.৮	১১	৪.৯	পাওয়া যায় নি	১.৮	৫.১	৫.১	৫.৪	৪.৩	৬.৮
১৮৬৩	৯.৯	১২.৩	৪.৯	৭.৫	২.৬	৭.৩	৫.৬	৫.৬	৪.৪	৭.৫
১৮৬৪	১১.২	১৭.৩	৫.৪	৭.৬	২.৮	৬.৫	৬.১	৬.৫	৫.২	৯
১৮৬৫	১২.৬	২০.৩	৭.৩	১১.২	৪.১	৭.৯	৬.৭	৭.১	৭.১	১২
১৮৬৬	১৩.৮	২২.৮	৭.৮	১১.৯	৪.৮	৮.৭	৬.২	৭.২	৮.৭	১৭.১
১৮৬৭	১৩.৯	২২.৯	৭.৭	১২.৩	৫.৬	৯.৫	৬.২	৭.৩	৯.২	১৫.২
১৮৬৮	১৬.৬	২৭.৪	৯.৬	১৪.৯	৪.৭	৯.৫	৭.১	৮.৪	৮.৭	১৬.৭
১৮৬৯	১৭.৫	২৯.৫	৯.৭	১৮.১	৬	৯.৮	৮.৬	১০.৬	৮.৫	১৭.৬
১৮৭০	১৮.৪	৩১.৬	১০.৭	১৮.৯	৫.৮	১০	৯.৮	১১.৫	৮.৯	১৮.১
১৮৭১	১৮.৭	৩২	১০.৫	১৯.৪	৫.৯	১০.২	১০.২	১১.৭	৯.৫	২০.৯
১৮৭২	১৮.১	৩১.৯	১২.১	১৯.৪	৬.২	১০.৫	৮.৬	১৩.৬	৯	২০.৭

গ্রন্থ-বিবরণী (Bibliography)

১. প্রধান উৎস

(ক) সরকারী রেকর্ড

(খ) ব্যক্তিগত কাগজপত্র

(গ) ভারত সরকারের প্রকাশিত সরকারি কাগজপত্র

(ঘ) পার্লামেন্টের দলিল

(ঙ) সমসাময়িক পুস্তিকা, প্রবন্ধ ও বিতর্কমূলক রচনাবলী

(চ) প্রকাশিত চিঠিপত্র, বক্তৃতা, স্মৃতিচারণ ইত্যাদি

(ছ) সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা ও সংবাদপত্র

২. আনুষঙ্গিক উৎস

॥ ১. প্রধান উৎস ॥

(ক) সরকারী রেকর্ড

ভারত সরকারের অর্থসংক্রান্ত নীতির সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের সন্ধান অর্থ দফতরের রেকর্ড দিয়ে শুরু করা যেতে পারে, কিন্তু তা সেখানেই শেষ হওয়া উচিত না। ভারতীয় জাতীয় মহাফেজখানার (National Archives) কয়েকটি সিরিজে সরকারী রেকর্ডের মধ্যে উৎসগুলি ছড়িয়ে আছে এবং অর্থ দফতরের রেকর্ডের (যে গুলি আকারে বিরাট) মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করার অর্থ হবে অতীতের কয়েকটি খুশিমত প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে (এবং মহাফেজখানার ব্যবস্থা অনুয়ায়ী শ্রেণী বিভাগকে) অনুসন্ধানের পরিসর নির্ধারণ করতে দেওয়া। Sir Charles Trevelyan-এর ভাষায় 'অর্থ হল সব দফতরের চাবিকাঠি'। অর্থ দফতর সকল সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করত বলে সরকারের সব এজেন্সিই এই দফতরের সম্যক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কবলে পড়ত। এধরনের প্রত্যেকটি দফতর, স্পষ্টত, অর্থসংক্রান্ত বিষয়াদির দৃষ্টি-কোণ থেকে সমান গুরুত্বসম্পন্ন নয়ঃ অপেক্ষাকৃত অধিক গুরুত্বসম্পন্ন ছিল সামরিক, পূর্তকর্ম ও স্বরাষ্ট্র দফতরগুলি এবং রাজস্ব, কৃষি ও বাণিজ্যের এই নতুন (১৮৭১ সালে সৃষ্ট) দফতরগুলি। উপরন্তু যে সময়কাল ধরে

আমরা অনুশীলন করছি, সে সময়টা ছিল নতুন নতুন প্রথার প্রবর্তন ও পরীক্ষার সময়। গোড়ার বছরগুলিতে বিভিন্ন দফতরের মধ্যে কাজের ভাগ প্রণালীবদ্ধ ছিল না এবং ষাটের দশকে আর্থিক লেন-দেন, যার একটা বড় অংশ অর্থ দফতরের বাইরেই করা হত, সে সম্পর্কে বহু পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৮৪৩ সালে অর্থসংক্রান্ত বিষয়াদির জন্য একজন সেক্রেটারি নিযুক্ত হল এবং এই-ই ছিল একটি পৃথক অর্থদফতরের শুরু। শুরুতে এই দফতরের প্রধান কাজ ছিল ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা। আর্থিক লেন-দেনের একটা মোটা অংশ, বিশেষতঃ রাজস্ব সংগ্রহ শাখা, স্বরাষ্ট্রদফতরের দায়িত্বে ছিল ('রাজস্ব' ও 'পৃথক রাজস্ব' শাখা)। একজন 'ফিনান্স মেম্বারের' নিয়োগ (গভর্নর জেনারালের পরিষদে 'চতুর্থ সাধারণ সদস্য') অর্থদফতরকে একত্রিত করে দিয়েছিল; James Wilson কর্তৃক প্রচলিত অর্থসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীকরণের নীতি এবং বিশেষতঃ বাজেট মারফৎ নিয়ন্ত্রণের নতুন ব্যবস্থা অপরাপর দফতর বনাম অর্থ দফতরের দায়িত্ব ও ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। পরিষদে মন্ত্রী-দফতর ব্যবস্থা—ক্যানিং কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছিল এবং ১৮৬১ সালের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট পাশ হবার পর (যা পরিষদে উপযুক্তভাবে কার্য পরিচালনার জন্য গভর্নর-জেনারালকে নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছিল) তা আরও উন্নত হয়েছিল—বিভাগীয় কাজের আরও যুক্তিসঙ্গত ও প্রণালী-বদ্ধ ভাগাভাগি উৎসাহিত করেছিল। সরকারের লক্ষ্য ছিল সকল আর্থিক লেন-দেন ফিন্যান্স মেম্বার ও ফিন্যান্স সেক্রেটারির অধীনে নিয়ে আসা। ১৮৬১ সালের ২১শে মার্চ কয়েকটি দফা (ষ্ট্যাম্প শুল্ক ও বহিঃশুল্ক) স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে অর্থ দফতরের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল; কয়েকটি প্রশাসনিক অসুবিধার দরুন এই পরিবর্তন বাতিল করা হয়েছিল এবং ১৮৬২ সালের মার্চ মাসে ঐ সব কর আদায়ের কাজ স্বরাষ্ট্র দফতরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই দফাগুলি এবং সেই সঙ্গে লবণ শুল্ক, আফিম রাজস্ব ও আবগারি (Excise) শুল্ক শাখাগুলিকে ১৮৬৩ সালের অক্টোবর মাসে চূড়ান্তভাবে স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে অর্থ দফতরের অধীনে দেওয়া হয়েছিল। (১৮৬৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অযোধ্যা, পাঞ্জাব, ব্রিটিশ বার্মা ও মধ্যপ্রদেশ সমূহ এই পরিবর্তনের সীমার মধ্যে ছিল না)। অর্থ-সংক্রান্ত দৃষ্টিকোণ থেকে স্বরাষ্ট্র দফতর ছাড়া আরও দুটি গুরুত্বসম্পন্ন দফতর ছিল। একটি হল ১৮৬৫ সালে গঠিত কেন্দ্রীয় পূর্তকর্ম বিভাগ।

অপরটি হল **সামরিক বিভাগ**। বিদ্রোহের পর সামরিক ব্যয় নিয়মিতভাবে হ্রাসের নীতির জন্য একটি মিলিটারি ফিনান্স কমিশন সৃষ্টির (জুন, ১৮৫৯) প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই কমিশনকে পরে পরিবর্তন করে সৃষ্টি হয়েছিল সামরিক অর্থ দফতর, যার জায়গায় আবার পরে সামরিক দফতরের অ্যাকাউন্টান্ট-জেনারাল নামক আর একটি এজেন্সি স্থাপিত হয়েছিল (এপ্রিল, ১৮৬৪)। ১৮৭১ সালের জুন মাসে রাজস্ব, কৃষি ও বাণিজ্য দপ্তর স্থাপিত হয়েছিল এবং ভূমি রাজস্ব জরীপ বন্দোবস্ত, কৃষি ও বাণিজ্য পরিসংখ্যান, বন ইত্যাদি সম্পর্কিত কাজকর্ম স্বরাষ্ট্র, অর্থ ও পূর্তকর্ম বিভাগ থেকে সরিয়ে এই সব বিভাগে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল—এবং পরবর্তী কালে (১৮৭২-৭৭) আরও কয়েকটি দফা অর্থাৎ লবণ, আফিম, বহিঃশুল্ক, আবগারি শুল্ক ও ষ্ট্যাম্প ঐ সব দফতরে দেওয়া হয়েছিল।

Proceedings of the Governor-General in Council in Finance Department (Branches: Accounts and Finance, Leave of Absence, Pensions and Gratuities, Expenditure, Separate Revenue and Miscellaneous) 1858-75

Proceedings of the Governor General in Council in Finance Department. (Branch: Revenue, Separate Revenue, Public) 1858-72

Proceedings of the Governor-General in Council in Military Department (Branch: Finance) 1858-72

Proceedings of the Governor-General in Council in Public Works Department 1858-72

Proceedings of the Governor-General in Council in Agricultural, Revenue and Commerce Department,* 1871-73

Despatches from the Court of Directors to Government of India—

(a) Financial Despatches 1857-58

(b) Railway Despatches 1857-58

Despatches from Government of India to the Court of Directors—Financial Despatches 1857-58.

Despatches from Secretary of State for India to Government of India (Governor-General in Cauncil) :—

(a) Finance Despatches, 1858-75

(b) Revenue Despatches, 1858-75

(c) Separate Revenue (Home) Despatches, 1858-60

(d) Railway Despatches, 1858-72

(e) Military Despatches,1858-72

Despatches from Government of India (Governor-General in Cauncil) to Secretary of State for India—

(a) Financial Despatches,1859-72

(b) Revenue Despatches, 1859-72

(c) Public Works Despatches, 1859-72

(d) Military Despatches, 1859-72

(খ) ব্যক্তিগত চিঠিপত্র

ভারতের গভর্নর জেনারাল ১৮৬২-৬৩, 8th Earl of Elgin (১৮১১-১৮৬৩), James Bruce (MSS Eur. File 83, India Office Library)-এর কাগজপত্র। তাঁর কার্যকাল ছিল সংক্ষিপ্ত এবং এই গবেষণার দৃষ্টি-কোণ থেকে এই কাগজপত্র প্রান্তিক গুরুত্বসম্পন্ন।

ভারতের গভর্নর জেনারাল (১৮৬৪-৬৯), First Baron Lawrence Sir John Lawrence,-(১৮১১-৭৯)-এর কাগজপত্র (MSS Eur. F 90, India Office Library & microfilm, নম্বর বিহীন, ভারতের জাতীয় মহাফেজখানা)। সেক্রেটারি অব স্টেটের পক্ষ থেকে লেখা চিঠিপত্রের ভল্যুমগুলি খুবই দরকারী। ভল্যুম I এবং II, ১৮৬৪-৬৫ (Charles Wood) ; ভল্যুম III, ১৮৬৬, (Wood, Gray ও Ripon, Cranborne); ভল্যুম IV, ১৮৬৭ (Cranborne ও Northcote) ; Vol. V, ১৮৬৮ (Northcote)। বিভিন্ন সেক্রেটারি অব স্টেট ও গভর্নর-জেনারালের কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দের নিকট লেখা Lawrence-এর চিঠিপত্রও দরকারী বলে দেখা গিয়েছে।

ভারতের গভর্নর জেনারাল (১৮৬৯ ৭২), 6th Earl of Mayo (১৮২২-৭২) Richard Bourke-এর চিঠিপত্র (Add. ৭৪৯০, Cambridge University Library, এবং মাইক্রোফিলম, নম্বর দেওয়া নেই, ভারতের

জাতীয় মহাফেজখানা)। যে সব চিঠিপত্র প্রেরিত হয়েছিল তার সংখ্যা হবে প্রায় ১২০০ এবং এর বহুসংখ্যক চিঠিতে অর্থসংক্রান্ত প্রশ্নাদির উল্লেখ ছিল। বিভিন্ন সেক্রেটারি অব স্টেটের নিকট থেকে প্রাপ্ত চিঠি, সংখ্যায় প্রায় ১১১ এবং H. Bortle Frere, R, Temple, J, Strachey, S, Northcote, H, S, Maine, G, Campbell, S, Fitzgerald. ও অন্যান্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বহুসংখ্যক চিঠি খুবই তথ্যজ্ঞাপক। দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েকটি বাণ্ডিলের (যে গুলিতে নম্বর দেওয়া আছে) চিঠিগুলি সময়ানুক্রমিক ভাবে সাজান নেই বা তাতে কোনও নম্বরও দেওয়া নেই। প্রেরিত চিঠিগুলি অপেক্ষাকৃত ভালভাবে সাজান আছে।

মাদ্রাজের গভর্নর (১৮৫৯-৬০) ও ফিনান্স মেম্বার (১৮৬২-৬৫) Sir Charles Trevelyan (১৮০৭-১৮৮৬)-এর Letter books (আমি অক্সফোর্ডের Bodleian Library-এর মাইক্রোফিলম ব্যবহার করেছি; মূল চিঠিপত্রগুলি আগে Bodleian-এর হেফাজতে ছিল, এখন রয়েছে Tyne তীরস্থ Newcastle-এ; এইসব ব্যক্তিগত কাগজপত্র ব্যবহার করতে দেবার জন্য আমি মৃত Lady Mary Trevelyan-এর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়িকার নিকট কৃতজ্ঞ) ইংল্যাণ্ডে অসামরিক চাকুরির সঙ্গে সম্পর্কিত Trevelyan-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ছাড়া Trevelyan-এর Letter-books এখনও পর্যন্ত কাজে লাগান হয়নি। ১৮৪০ থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত সময়কালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৪৪ ভল্যুমের এই সংকলনটির শেষের দিককার ভল্যুমগুলি আমি ব্যবহার করেছি।

ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেট (১৮৫৯-৬৬) First Viscount Halifax, Sir charles Wood (1800-1885)-এর কাগজপত্র (MSS Eur. F, 78 India Office Library), Letter-books ১৮৫৯-৬৬, ২২ ভল্যুম।

Mayo, James Wilson, Bartle Frere, George Campbell, John Lawrence, Richard Temple ইত্যাদির জীবনী ও প্রকাশিত চিঠিপত্রে অনুপূরক মালমসলা আছে (গ্রন্থ বিবরণী, চ দেখুন)।

(গ) প্রকাশিত সরকারী কাগজপত্র

'Annual Financial Statement for the Official years 1860-61 to 1871-72' (Calcutta, 1871).

'Financial Statements relating to India delivered in Perliament by successive Presidents of the Board of Control and Secretaries of State for India : reprinted from Hansard's Perliamentary Debates' (Calcutta, 1872).

W. S. Meyer 'Memorandum on the Financial Powers of Government of India and the Provincial Governments for the Royal Commission on Decentralization' (Simla 1907).

'Correspondence and Debates in the Lagislative Council and Minutes relating to Direct Taxation in British India compiled in the Finance Department of Government of India' 2 vols. (Calcutta, 1882).

Papers regarding the collection of illegal cesses and duties in Bengal : Selections from the records of Government of Bengal. No. XLVI.' (Calcutta, 1873).

J. F. Finlay 'History of Provincial Financial Arrangements' (Calcutta, 188/).

'Statistical Abstracts of British India.' (Calcutta).

'Indian Lagislative Council Proceedings' upto 1861, Old Series (Vols. I to VII) and from 1862 New Series.(Calcutta).

(ঘ) পার্লামেণ্টের দলিল

[যেহেতু এইসব কাগজপত্রের বেশির ভাগই হল 'ক' ৰিভাগে উল্লিখিত রেকর্ড সমূহের উদ্ধৃতাংশ তাই সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের মাত্র কয়েকটি নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে]

	ভল্যুম	পৃষ্ঠা	দলিল	দলিলের বিষয়বস্তু
HC ১৮৫৯ Sess II	২৩	৩১	১৫৪	ঋণ : ব্রিটার্শে ভারতসরকার ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ঋণ দেখান হয়েছে
HC ১৮৬০	৪৯	২৪১	৩৩৯	অর্থ : ভারতে প্রস্তাবিত অর্থ-সংক্রান্ত ব্যবস্থাবলী সম্পর্কে চিঠি-পত্র

HC ১৮৬২	৪০	৭	২৩০	অবসরকালীন ভাতা এবং বে-সামরিক ও বেসামরিক বার্ষিক বৃত্তি তহবিল নিয়ে অভিযোগ সম্পর্কে ভারতের অসামরিক কর্ম-চারীদের স্মারকলিপি
HC ১৮৬২	৫০	৬৬৫	৩২৭	পতিত জমি বিক্রয়, চিরস্থায়ী ভাবে ভারতীয় ভূমি রাজস্ব রদ চিঠিপত্র, ১৮৫৯-৬১
HC ১৮৬৩	৪৩	৩৮৯	১৬৪	পতিত জমি বিক্রয় এবং ভূমি রাজস্ব রদের আরও অপর দলিল
HC ১৮৬৩	২২	৫	৮৭	পতিত জমি বিক্রয়, ভূমি রাজস্ব রদ ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসারণ
HC ১৮৬৭	৫০	১২৫	৪৫০	ভূমিরাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সমূহ)
HC ১৮৭১	৮	১	৩৬৩	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিনান্স ঃ কার্যবিবরণী সহ সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট
HC ১৮৭২	৮	১	৩২৭	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিনান্স ঃ কার্যবিবরণী সহ সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট
HC ১৮৭৩	১২	১	১৭৯	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিন্যান্স ঃ সিলেক্ট কমিটির পক্ষ থেকে প্রথম রিপোর্ট
HC ১৮৭৩	১২	৯	১৯৪	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিনান্স ঃ সিলেক্ট কমিটির পক্ষ থেকে দ্বিতীয় রিপোর্ট
HC ১৮৭৩	১২	১৯	৩৫৪	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিনান্স ঃ সিলেক্ট কমিটির পক্ষ থেকে তৃতীয় রিপোর্ট

HC ১৮৭৪ ৮ ১ ৩২৯ ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিনান্স : এই দেশে প্রদেয় ব্যয় যার জন্য ভারতের রাজস্ব দায়ী সে সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটির পক্ষ থেকে রিপোর্ট (সামরিক ব্যয়)

(ঙ) সমসাময়িক পুস্তিকা, রচনা, বিতর্কমূলক রচনা

(Contemporary Pamphlets, Tracts and Polemical Works)

R. Alexander	'The Rise and Progress of British Opium Smuggling' (Lond. 1856)
—	'Contraband Opium Traffic.' (Calcutta, 1857)
Anonymous	'The Finances of India' (London, 1853),
—	'Indian Railway and Indian Finance' (Bombay 1869)
—	'Indian Finance Defended : a refutation of the opinion too generally held that British India is overburdened with debt and taxation.' (London, 1878)
—	'The Injustice and Oppression of the Abkarry Department as exhibited in the Petitions of Toddy Merchants.' (Madras, 1859)
—	'A few letters on the Indian Administration of the Earl of Mayo 1869-72.' (Simla 1877) (Author : O. T. Burne)
—	Sketch of the Commercial Resources and Monetary and Mercantile System of British India.' (London, 1837)
—	'The late Government Bank of Bombay : its history.' (London 1868)
—	'How we tax India' (Leeds, 1858)

Maior Evans Bell — 'Retrospects and Prospects of Indian Police.' (London, 1868)

— (Ed.) 'Last Counsels of an Unknown Counsellor, John Dickinson.' (London, 1877)

Sorabjee Sapurjee Bengalee — 'A letter to the Right Hon. Lord Lytton against the contemplated repeal of the duties on the Import of foreign cotton goods into India.' (Bombay, 1877)

A. R. Binnie — 'Public Works in India : a letter addressed to the Right Hon. W. E. Gladstone, M.P. and other members of Her Majesty's Government.' (London, 1881)

British Indian Association — 'Correspondence between the Government of Bengal and the British Indian Association.' (Calcutta, 1862)

H. Bruce — 'Salt Sources of India and the Customs Preventive Establishment of the North Western Provinces, Central Provinces and the Punjab.' (Calcutta 1863)

O.T Burne — 'A few letters on the Indian Administration of the Earl of Mayo 1869-72.' (Simla, 1877) (Published anonymously, for private circulation only)

W. R. Callendar — 'The Commercial Crisis of 1857' (London, 1858).

F. J. Cockburn — 'The Customs Act of India, being Act VI of 1863' (Cal, 1863).

J. Chapman — 'Principles of Indian Reform being brief hints together with a plan for the improvement of the Constituency of the East India Company, and for the pro-

	motion of Indian Public Works.' (London, MDCCCLIII).
A. K. Connell	'The Economic Revolution of India and the Public Works Policy.' (London, 1883).
A. Cotton	'Public Works in India: their importance with suggestions for their extension and improvement.' (London, 1854).
H. J. S. Cotton	'Technical Education or the Indian Revolution in its economic aspects.' (London, 1883).
J. Da Costa	'The Indian Budget for 1876.' (London, 1876).
—	'The Government and the Finances of India.' (London, 1879).
J. Da Costa	'The Political and Financial Requirements of British India as set forth in a petition of the British Indian Association.' (London, 1880).
J. Dickinson	'India, its Government under a Bureaucracy.' (London, 1853)
Henry Fawcett. M.P.	'Indian Finance: three essays republished from the 'Nineteenth Century'.' (London, 1880)
A. Graham	'The means of ameliorating India.' (Glasgow, 1835).
W. H. Grimley	'The sea customs Law of India Act VII of 1878 and Tariff Act.' (Calcutta, 1879).
Lord George Hamilton	'Speech on the Finacial Statement in the House of Commons.' (London, 1876).

J. Hector — 'Underlying Principles of Indian Fiscal Administration.' (London, 1880).

Major Hough — 'A review of the territorial and miscellaneous revenues of British India for the four years ending 1835-36, and of the four years ending 1839-40, together with the civil and military charges for the same period.' (Cal. 1842).

W. W. Hunter — 'England's Works in India.' (London, 1881).

— 'Notes of a speech on some aspects of Indian Finance.' (London, 1880).

— 'Some aspects of Indian Finance.' (Manchester, 1881).

H. M. Hyndman — 'The Bankruptcy of India : An enquiry into the administration of India under the Crown, including a chapter on the silver question.' (London, 1886)

S, Idarof — 'British India from financial point of view.' (Simla, 1878).

T. W. B. Jeffries — 'National Credit and Public Works.' (Kurrachi, 1871).

Robert Knight — 'Indian Empire and our Financial Relations therewith.' (London, 1866).

— 'Speech on Indian Affairs at the Manchester Chamber of Commerce.' (London 1866).

— 'India : A Review of England's financial relations therewith.' (London, 1868).

— 'The Financial Statement that should have been delivered and was not' (Bombay, 1870). Printed anonymously.

—	'Decentralization of the Finances of India.' (Bombay, 1871).
—	'How the Permanent Settlement Pays' (Bombay, 1862).
—	'Manchester and India : a protest against Sir John Strachey's Financial Statement (Calcutta 1877).
Samuel Laing	'Financial Statement' (Calcutta, 1861).
Malcolm Lewin	'The Government of the East India Company and its monopolies, or the Young India Party and Free Trade ?' (London, 1857).
I. F. Macandrew	'On some Revenue matters, chiefly in the Province of Oudh.' (Calcutta, 1876).
Donald Matheson	'What is the Opium Trade.' (Edinburge, MDCCCLVII).
G. L. Molesworth	'British Juggernaut : Fre and Fair Trade (1884).
Thomas B. Moxon	'Indian Finance' (Manchester, 1881).
Sombhoo C. Mookherjee	'Wilson, Canning and the Income Tax' (Calcutta, 1860).
A. Mills	'India in 1858, a summary of the existing administration, Political, fiscal and judicial of British India' (London, 1858).
Dadabhai Naoroji	'Poverty of India' (Bombay, 1873).
—	'Essays, Speeches, Addresses and Writings on Indian Polities of the Hon'ble Dadabhai Naoroji.' (Ed. C. Parekh, Bombay, 1887).
G. Norton	'A new financial scheme for India, a step to political reform.' (London, 1857).

H. M. Parker	'The Empire of the Middle Classes' (London 1858).
Poona Sarbajanik Sabha	'Report from Sub-Committee appointed to collect information to be laid before the East India Finance Committee.' (Poona, 1872).
L. C. Probyn	'Is India Solvent ?' (London, 1880).
Mohini Mohan Raya	'Taxation in India' (Calcutta, 1889).
J. Rushton	'Indian Exchange how affected by Home Charges, with tables of indian imports and exports, from 1837 to 1887' (Calcutta, 1888).
Dinshah Ardeshir Teleyarkhan	'A review of the Bombay Taxation Discussion of 1871.' (Bombay, 1871).
W. M. Thorburn	'India Solvent' (Madras, 1880).
Robert Torrens	'Letter to the Right Hon. R. Vernon Smith, with a review of documents' (London 1856).
William Thomas Thornton	'Indian Public Works and cognate Indian topics' (London, 1875).
H, Tuckett	'The Indian Revenue System as it is' (London, 1840).
C. E. Trevelyan	'Letters of Indophilus to 'The Times" (London, 1875, Pseudonym 'Indophilus'),
Henry St. George Tucker	'Plans of finance lately introduced by the Hon'ble Court of Directors and by the Supreme Government of India' (London 1821).
Edward West	'Emigration to British India : profitable investments for Joint Stock Companies and for emigrants who possess capital : Employment for enterprising and intelligent men : Ample supplies of

raw cotton, silk, sugar, rice, tobacco, indigo, and other tropical productions: Increased demand for manufactured goods: superseding of slavery: Openings for missionary and educational societies: Employment of twenty millions of Hindu Laboures upon one hundred million acres of fertile land in British India, which is now waste and unproductive' (London, 1857).

George Wingate — 'A few words on our Financial Relations with India.' (London, 1859).

M. Wylie — 'India as a field for Commerce and Mission' (London, 1857).

(চ) প্রকাশিত চিঠিপত্র, ভাষণ ও স্মৃতিকথা
(Published Memoirs, Biographies, Correspondence, Speeches)

Duke of Argyll — 'India under Dalhousie and Canning' (London, 1865).

C. U. Aitchison — 'Lord Lawrence' (London, 1905).

— 'Lord Lawrence and the reconstruction of India under the Crown.' (London, 1894).

Emilie I. Barrington — 'The Servant of All: Pages from the Family, Social and Political life of my father James Wilson: Twenty years of Mid-Victorian life,' 2 vols. (London, 1927).

Betty Balfour — Lord Lytton's Indian Administration 1876-80' (London, 1899).

John Beames — 'Memoirs of a Bengal Civilian' (London, 1961).

H. S. Cunningham — 'Earl Canning' (London, 1903).

George Campbell — Memoirs of my Indian Career, Ed. Sir C. E,' Bernard, (London. 1893).

W. W. Hunter	'The Earl of Mayo' (London, 1892).
—	'A life of the Earl of Mayo, the fourth Viceroy of India, 2 vols.' (London, 1875).
J. W. Kaye	'Lives of Indian Officers 3 vols.' (London, 1875).
G, Lawrence	'Rominiscences of forty three years in India' (London, 1875).
Earl of Mayo	Speeches in England and India' (Calcutta, 1873).
Bernard Mallet	'Thomas George, Earl of Northbrook, a memoir' (London, 1908).
Michael Maclagan	'Clemency Canning' (London, 1963).
John Martineau	'The life and correspondence of Sir Bartle Frere' 2 vols, (London, 1895).
John Stuart Mill	'The Letters of John Stuart Mill', Ed. H.S.R. Elliot, 2 vols. (London, 1910).
Kristo Das Pal	'Speeches and Minutes, (Calcutta, 1882).
Marquis of Ripon	'Speeches' 2 vols. (Calcutta, 1883)
R. B. Smith	'Life of Lord Lawrence', 2 vols. (London 1883).
F. H. Skrine	'An Indian Journalist : being the life letters and correspondence of Dr. Sombhoo C. Mookerjee', late Editor of 'Reis and Rayyat' (Calcutta, 1895).
Richard Temple	'Men and Events of my Time in India' (London, 1882).
	'Lord Lawrence' (London, 1890).
	'The story of My Life,' (London, 1896).
Algernon West	'Sir Charles Wood's Administration of

Indian Affairs 1859-1866' (London, 1867).

G. M. Wrong — 'The Earl of Elgin' (London, 1905).

D. E. Wacha — 'Premchand Roychand : his early life and career.' (Bombay, 1913).

(ছ) সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা
(Contemporary Newspapers and Poriodicals)

(i) Newspapers (National Library, Calcutta).

'Bengal Hurkaru' (Calcutta)
'The Englishman' (Calcutta)
'The Friend of India' (Serampore)
'The Hindoo Patriot' (Calcutta)
'The Indian Daily News (Calcutta)
'The Madras Fxaminer (Madras)
'The Pioneer' (Allahabad)
'The Times of India' (Bombay)

(ii) দেশীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে রিপোর্ট (জাতীয় মহাফেজখানা, নতুন দিল্লী)

Reports of the Native Press (National Archives, New Delhi).

বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিগুলির দেশীয় সংবাদপত্রের উপরে রিপোর্ট এবং পাঞ্জাবে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ সমূহে, অযোধ্যায় ও মধ্যপ্রদেশ সমূহে মাতৃভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির নির্বাচিত অংশ ভারতের জাতীয় মহাফেজখানায় পাওয়া যায়। এগুলি হল সরকার কর্তৃক নিযুক্ত জাতীয় সংবাদপত্র সমূহের সরকারী অনুবাদক ও পরীক্ষকদের দ্বারা প্রদত্ত সাপ্তাহিক (বা পাক্ষিক) রিপোর্ট। এই রিপোর্টগুলির মধ্যে রয়েছে মাতৃভাষায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার ইংরাজি অনুবাদ, কখনও কখনও তা সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টের কয়েকটি কপি মুদ্রিত হয়েছিল এবং স্বরাষ্ট্রদপ্তরে 'গোপন' কাগজপত্র হিসাবে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এই রিপোর্টগুলি খুবই মূল্যবান কারণ মাতৃভাষায় প্রকাশিত

পুরনো সংবাদপত্রের আসল ফাইল এখন যোগাড় করা অসম্ভব। এই রিপোর্ট'গুলি উল্লেখ করার সময় সংক্ষেপে R. N. P. (Report on Native Press) এবং S. V. P. (Selection from Vernacular Newspapers) ব্যবহার করা হয়েছে ; মাতৃভাষায় (বাংলা, তামিল, মারাঠি, উর্দু ইত্যাদি) প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা এবং যে সব রিপোর্টে অনুবাদ করা অংশ পাওয়া যাবে সে সবের নাম ও তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, সোমপ্রকাশ, ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ ; R. N. P. (বাংলা) ১৮৬৮, পৃষ্ঠা ৮৯।

(iii) বিবিধ পত্র-পত্রিকা

(Miscellaneous Periodicals)

'Annual Register'

'The Economist' (London)

'Bengal Chamber of Commerce, Half-yearly Reports of the Committee of'—.

'Bombay Chamber of Commerce', Reports.

'Calcutta Review' (Calcutta) 1844.

'Calcutta Trades Association' Reports of the Committee of—. 1862.

'Journal of the East India Association' (London). 1867-

'The Indian Economist' (Bombay)1869-75.

'Kurrachi Chamber of Commerce', Reports'.

'Landholders' and Commercial Association, Reports of the Committee of'—. 1863.

॥ ২. আনুষঙ্গিক উৎস ॥

Vera Anstey — 'The Economic Development of India' (London, 3rd ed. 1936).

W. D. Arnold — 'Short Essays on Social and Indian Subjects' (Calcutta, 1869).

F. J. Atkinson — 'A Statistical Review of the Income and Wealth of British India'. 'Journal of

	the Royal Statistical Society,' 1902. LXV, p. 209.
J. C. Bagal	'History of the Indian Association' (Calcutta 1953).
D. C. Boulger	'India in the Nineteenth Century' (London 1901),
D. H. Buchanan	'Development of Capitalist Enterprise in India' (New York, 1934).
C. A. G. Bodelsen	'Studies in Mid-Victorian Imperialism, (1924).
E. Bell	'Trust as the basis of Imperial Policy'. 'Journal of East India Association', Vol. 6. 1872, p. 145.
R. N. Bhargava	'Public Finance—its theory and working in India' (Allahabad, 1954).
Pramathanath Banerjea	'Fiscal Policy in India' (Calcutta 1922).
—	'A History of Indian Taxation' (Calcutta, 1930).
—	Provincial Finance in India' (Calcutta, 1929).
A. K. Cairncross	'Home and Foreign Investment, 1870-1913,' (Cambridge, 1953).
G. Campbell	'Modern India : A sketch of the system of Civil Government' (London, 1852).
Gyan Chand	'The Financial system of India' (London, 1926).
W.N. Calkins	'A Victorian Free Trade Lobby'. 'Economic History Review', 2nd series, Vol. XIII, pp. 90-104.
Arthur Cotton	'On the proposed additional expenditure of 100 millions on Railways'. 'Journal of the East India Association, Vol, 4, 1870, pp. 1-6.

A. K. Connell — 'Discontent and Danger in India' (London, 1880).

George Chesney — 'Indian Polity : a view of the system of administration in India' (London, 1868).

Bipan Chandra — 'The Rise and Growth of Economic Nationalism in India : economic policies of Indian national leadership' 1880-1905 (New Delhi, 1966).

Jahangir Coyajee — 'Indian Currency System' 1835-1926 (Madras, 1930).

— 'Indian Fiscal Problem' (Patna, 1924).

M. N. Das — 'Studies in the Economic and Social Development of Modern India, 1848-56.' (Calcutta, 1959).

H. L. De — 'Policy of Protection in India : a Retrospect' (Poona, 1950).

Dharmpal — 'Administration of Sir John Lawrence' (Simla, 1952).

William Digby — "Prosperous" 'British India : A Revelation from Official records' (London, 1901).

Ramesh C. Dutt — 'Economic History of India in the Victorian Age' (London. 1903).

Karl Ellstaetter — 'The Indian Silver Currency, an historical and economic study' (Chicago Uuiversity, 1895) Tr. J. L. Laughlin.

C. R. Fay — 'Great Britain from Adam Smith to the present day : an economic and social survey' (London, 1932).

— 'Imperial Economy and its place in the formation of economic doctrine 1600-1932' (Oxford, 1934).

H. Bartle Frere	'The means of ascertaining public opinion in India'. 'Journal of East India Association,' Vol. 5, Part IV, 1871. pp. 102-172.
Girish Chandra Ghose	'Selection from the writings of Girish Chandra Ghose,' the founder and editor of the 'Hindoo Patriot' and the 'Bengalee', Ed. M. Ghosh (Calcutta. 1912).
D. R. Gadgil	'Industrial Evolution in India' (O.U.P. 1940).
B. N. Ganguli	'Dadabhai Naoroji and the Drain Theory' (Bombay, 1965).
S. Gopal	'British Policy in India 1858-1905' (Cambridge, 1965).
P. K. Gopalakrishnan	'Development of Economic Ideas' 1880-1914 (Delhi, 1954).
Percival Griffiths	'The British Impact on India' (London, 1952).
H. J. Habakkuk	'Free Trade and Commercial Expansion, 1853-70'. 'Cambridge History of the British Empire' Vol. II (1940), pp. 753-805.
Gerald Barkeley Hertz	'The Manchester Politician' 1750-1912 (London, 1912).
J. R. T. Hughes	'Fluctuations in Trade, Industry and Finance 1850-60' (Oxford, 1960).
Edward Hughes	'Sir Charles Trevelyan and Civil Service Reform 1853-55'. 'The English Historical Review,' Vol. LXIV, 1949, Parts 1 & 2, p. 53 & p. 206.
L. H. Jenks	'Migration of British Capital, to 1875' (New York, 1927 ; London, 1938).

V. G. Kale 'Dawn of Modern Finance in India' (Poona, 1922).
'Economics of Protection in India' (Pooan, 1929).

J. W. Kaye 'The Administration of the East India Company' (London, 1853).

John Maynard Keynes 'Indian Currency and Finance' (Landon, 1913).

Blair B. Kling 'The Blue Mutiny : the Indigo Disturbances in Bengal (Philadelphia, 1966).

Halen B. Lamb 'The state and economic development in India'. 'Economic Growth ; Brazil, India, Japan. Ed. S. Kuznets et al.' (Durham, 1955).

Micheal MacLagan "Clemency' Canning' (New York, 1962).

R. M. Martin 'The Political, Commercial and Financial Condition of the Anglo-Eastern Empire in 1832' (London, 1832).

— 'The Indian Empire, its history, topograpyh, government, finance, commerce and staple products.' (London, 1858-61).

J. Malcolm 'The Government of India' (London, 1833).

Bimanbehari Majumdar 'History of Political Thought ; From Ram-mohun to Dayananda 1821-84' (Calcutta, 1934).

S. D. Mehta 'The Cotton Mills of India 1854-1954 (Bombay, 1954).

Thomas R. Metcalf 'The aftermath of Revolts, India 1857-1870', (Princeton, 1964).

J. L. Morison	'Emigration and Land Policy 1815-1873'. 'Cambridge History of the British Empire' Vol. II (1940).
Hurrish C. Mookerji	'Selection from the Writings of Hurrish Chunder Mookerji compiled from the Hindoo Patriot', Ed. Nares C. Sengupta (Calcutta, 1910).
R. J. Moore	'Sri Charles Woods Indian Policy 1853-66', (Manchester, 1966).
B. B. Misra	'The Central Administration of the East India Company' (Manchester, 1959).
—	'The Indian Middle classes : their growth in modern times' (London, 1961).
W. J. Macpherson	'Investment in Indian Railways' 1845-75'. 'Economic History Review', Vol., VIII 2nd series (1955).
Dadabhai Naoroji	'Poverty and un-British Rule in India' (London, 1901).
Mark Naidis	'John Lawrence and Income Tax'. 'Bengal Past and Present', July-December, 1960.
J. P. Niyogi	'Evolution of Indian Income Tax (London, 1929).
George Paish	'Great Britain's capital investmemts in individual colonies and foreign countries'. 'Journal of the Royal Statistical Society', LXXIV (1910-11), p. 186.
Surendra J. Patel	'Long Term changes in output and income in India 1896-1960'. 'the Indian Economic Journal, January, 1958, Vol. V, No. 3 pp. 233-246.

C. H. Philips — 'et al (Ed.) The evolution of India and Pakistan 1858-1947.' Select Documete (London, 1962).

I. T. Prichard — 'The Administration of India from 1859 to 1868' 2 vols. (London, 1869).

R. Pares — 'Economic factors in the history of the British Empire'. Ec. H. R., Vol VII, May 1937, pp. 119-44.

V. K. R. V. Rao — 'An Essay on India's National Income 1925-29' (London, 1939).

Parimal Ray — 'India's Foreign trade, since 1870' (London, 1934).

A. Redford — 'Manchester Merchants and Foreign Trade', 2 vols. (Manchester, 1956).

J. Routledge — 'English Rule and Native Opinion in India, from notes taken 1870-74' (London, 1878).

A. B. Rudra — 'The Viceroy and Governor General of India' (OUP, 1940).

Anil Seal — 'The Emergence of Indian Nationalism : competion and collaboration in the later nineteenth century' (Cambridge; 1968).

Sunil K. Sen — 'Studies in Industrial Policy and Develoment in India' (Calcutta, 1964).

G. Subrahmaniya Ayar — 'Some Economic Aspects of British Rule in India' (Madras, 1903).

A. Silver — 'Manchester Men & Indian Cotton' (Manc. 1966).

Malcom C. C. Seton — 'The India Office' (London, 1926).

S. B. saul — 'Studies in British Overseas Trade (Liverpool, 1960).

W. Schlote	'British Overseas Trade from 1700 to the 1930's' (Oxford, 1952).
Hiralal Singh	'Indian Currency Problem 1885-1900'. 'Bengal Past and Present' January-June, 1961).
Eric Stokes	'English Utilitarians and India' (Oxford, 1959).
John Strachey	'India : its administration and progress' (London, 1911).
—	'India' (London, 1888).
— & R. Strachey	'The Finances and Public Works of 'India 1869-81' (London, 1882).
F. J. R. Sullivan	'One hundred years of Bombay, History of the Bombay Chamber of Commeres 1836-1936' (1937).
F. Shehab	'Progressive Taxation : A study in the Development of the progressive principle in the British Income Tax' (Oxford, 1953).
J. J. Spengler	'et al. Ed. Economic Growth' (Durham, 1955).
Joseph A. Schumpeter	'History of Economic Analysis' (New York, 1954).
S. N. Singh	'The Secretary of State for India and his Council' (Delhi, 1962).
G. Findlay Shirras	'Indian Finance and Banking' (London, 1920).
Richard Temple	'India in 1880' (London, 1880).
M. K. Thavaraj	'Public investment in India 1898-1914'. 'Indian Economic Review', Vol. II, 1955, pp. 37-52.

P. J. Thomas — 'The Growth of Federal Finance in India : being a survey of India's public finances from 1833 to 1939' (OUP, 1939).

L. J. Trotter — 'History of India under Queen Victoria 1836-1880' (London, 1886).

C. E. Trevelyan — 'Decentralization'. 'Journal of the East India Association', Vol. V, Part 2 1871, No. G2, pp. 108-27.

'On the finances of India'. 'Journal of the East India Association' Vol. IV, No. 82, 1870. pp. 290-323.

A. Tripathi — 'Trade and Finance in Bengal Presi decny 1793-1833'. (Calcutta, 1956).

'Land Revenue Policy' British Paramountcy and Indian Renaissance (Bombay, 1963).

C. N. Vakil — 'Financial Development in Modern India' (Bombay, 1924).

— & S. K. Muranjan — 'Currency and prices in India' (Bombay 1927).

M. Venkatarangaiya — Beginning of Local taxation in Madras (Madras, 1928).

N. P. Vandenberg — 'The Money market and Paper currency of British India' (Batavia, 1884).

Dinshaw E. Wacha — 'A Financial chapter in the history o the Bombay City' (Bombay, 1909).

নির্দেশিকা